বাবা সাহেব

ড: আম্বেদকর

রচনা-সম্ভার

বাবা সাহেব

ড. আম্বেদকর রচনা-সম্ভার

বাংলা সংস্করণ

ষোড়শ খণ্ড

বাবা সাহেব ড. আম্বেদকর

জন্ম : ১৪ এপ্রিল, ১৮৯১ মহা-পরিনির্বাণ : ৬ ডিসেম্বর, ১৯৫৬

'প্রভাবশালী বিদেশিরাও এই ধারণায় আকৃষ্ট না হলে এই অভিযোগকে বিদ্বেষ-প্রসূত প্রচার বলে নস্যাৎ করা যেত। স্বাধীনতার যুদ্ধে অস্পৃশ্যদের অংশ না নেওয়ার বিষয়ে কংগ্রেস যে ব্যাখ্যা দিয়েছে, তা অবাস্তব। এই ব্যাখ্যা কেবল শঠ ব্যক্তি দিতে পারে এবং মূর্খ ছাড়া কেউ তা স্বীকার করবে না। কিন্তু এটা নিশ্চিত, যে পরিস্থিতি আসছে তাতে ভারতের সমস্যা সম্বন্ধে বিদেশি মত কিছুদিন স্থায়ী হবে। আমি প্রকৃত পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন বোধ করি এবং তাদের মধ্যে অস্পৃশ্যদের সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণার অবকাশ রাখতে চাই না। বিশেষ করে যখন অস্পৃশ্যদের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ মিথ্যা প্রতিপন্ন করা সহজ এবং সহজে দেখানো যায় যে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সমর্থক বলে স্বাধীনতার যুদ্ধে অস্পৃশ্যরা অংশ নেয়নি এই অভিযোগ মিথ্যা, বরং তাদের আশঙ্কা ভারতের স্বাধীনতা এলে হিন্দুদের আধিপত্য কায়েম হবে। তাতে তাদের সামনে থেকে যাবতীয় সুযোগ, স্বাধীনতা, সুখ, জীবনের উন্নতির পথ রুদ্ধ হবে এবং তারা শ্রমদাসে পর্যবসিত হবে।'

ড. ভীমরাও আম্বেদকর

'একটি মিথ্যা অভিযোগ : অস্পৃশ্যরা কি ব্রিটিশের সহায়?' থেকে

AMBEDKAR RACHANA-SAMBHAR
(Collected Works of Dr Ambedkar in Bengali)

Volume-16

Total No Pages : 447 including 9 pages Index

প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর, ১৯৯৯
First Published : November, 1999

প্রচ্ছদ : বিশ্বনাথ মিত্র

প্রকাশক :
ড. আম্বেদকর ফাউন্ডেশন,
সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রক,
ভারত সরকার,
নতুন দিল্লি -১১০ ০০১

Published by
Dr Ambedkar Foundation,
Ministry of Social Justice and Empowerment, Govt. of India,
New Delhi-110 001.

লেজার টাইপ সেটিং এবং প্রিন্টিং
ইমেজ গ্রাফিক্স,
৬২/১, বিধান সরণি,
কলকাতা - ৭০০ ০০৬

দাম :
সাধারণ সংস্করণ : ৪০ টাকা (Rs. 40/-)
শোভন সংস্করণ : ১০০ টাকা (Rs. 100/-)

বিক্রয় কেন্দ্র :
ড. আম্বেদকর ফাউন্ডেশন,
২৫, অশোক রোড,
নতুন দিল্লি - ১১০ ০০১

পরিবেশক :
পিপলস্ এডুকেশন সোসাইটি,
সি-এফ, ৩৪২, সেক্টর-১,
সল্ট লেক সিটি,
কলকাতা - ৭০০ ০৬৪

পরামর্শ পরিষদ

শ্রীমতী মানেকা গান্ধী
মাননীয়া সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রী, ভারত সরকার

আশা দাস, আই. এ. এস
সচিব, সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রক, ভারত সরকার

শ্রী এস. কে. বিশ্বাস, আই. এ. এস
অতিরিক্ত সচিব, সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রক, ভারত সরকার

ড. এম. এস. আহ্মেদ, আই.এ.এস.
যুগ্ম সচিব, সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রক, ভারত সরকার
সদস্য সচিব, ড. আম্বেদকর ফাউন্ডেশন

শ্রীমতী কৃষ্ণা ঝালা, আই. এ. এস
সচিব, তফসিলি জাতি ও আদিবাসী
কল্যাণ বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

ড. ইউ. এন. বিশ্বাস, আই. পি. এস
যুগ্ম নিদেশক (পূর্ব) এবং স্পেশাল আই. জি. পি
কেন্দ্রীয় তদন্ত ব্যুরো, ভারত সরকার

কৃষণ লাল
নিদেশক, ড. আম্বেদকর ফাউন্ডেশন

অধ্যাপক আশিস সান্যাল
সম্পাদক

আম্বেদকর রচনা-সম্ভার

সংকলন : ইংরেজি ভাষায়
বসন্ত মুন

অনুবাদ : বাংলা ভাষায়
ড. সজল বসু
স্নেহাশিস সান্যাল
অন্তরা ঘোষ

অনুমোদন : বাংলা ভাষায়
আশিস সান্যাল

মুখবন্ধ

রাষ্ট্রপিতা মহাত্মা গান্ধী এবং ভারতরত্ন ড. আম্বেদকর বিশ শতকের এমন দুই মহাপুরুষ, যাঁদের সার্বিক মূল্যায়ন সাধারণ কোনও ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব নয়। এই দুই মহাপুরুষকে বুঝতে হলে তাঁদের মতো নিষ্ঠা, দেশভক্তি, একাগ্রচিত্ত এবং জন-সম্পর্কের প্রয়োজন। অচ্ছুৎদের উদ্ধারের জন্য এই দুই মহাপুরুষ অনেক কিছু করেছেন। এঁদের আত্মানুভূতির ভিন্ন পরিস্থিতির জন্য কর্মক্ষেত্রে কিছুটা পার্থক্য দৃষ্টিগোচর হতে পারে, কিন্তু মূল সমস্যার প্রতি উভয়ের-ই উপলব্ধি এবং লক্ষ্য ছিল এক। গান্ধী চেয়েছিলেন সমাজকে সচেতন করে এই সমস্যার ক্রম-পরিবর্তন। আর বাবা সাহেব ড. আম্বেদকর সমাজ-বিপ্লবের মাধ্যমে চেয়েছিলেন দ্রুত পরিবর্তন। বাবা সাহেবের 'কংগ্রেস এবং গান্ধী অস্পৃশ্যদের জন্য কী করেছেন?' গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছে এই বিষয়ক গভীর চিন্তা ও বিশ্লেষণ।

স্বাধীন ভারতের সংবিধানে অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের জন্য অস্পৃশ্যতা দণ্ডনীয় অপরাধ হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। আমাদের সরকার সংবিধানের রূপকারদের ভাবনাকে মর্যাদা দিয়ে সামাজিক পরিবর্তন সাধনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। আমার বিশ্বাস, ড. আম্বেদকরের 'কংগ্রেস ও গান্ধী অস্পৃশ্যদের জন্য কী করেছেন?' গ্রন্থের বাংলা অনুবাদকে বাঙালি পাঠক, সমাজসেবী ও রাজনীতিবিদরা প্রেরণামূলক ও উপযোগী বলে স্বীকৃতি দেবেন।

শ্রীমতী মানেকা গান্ধী
সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রী
ভারত সরকার

নতুন দিল্লি
নভেম্বর, ১৯৯৯
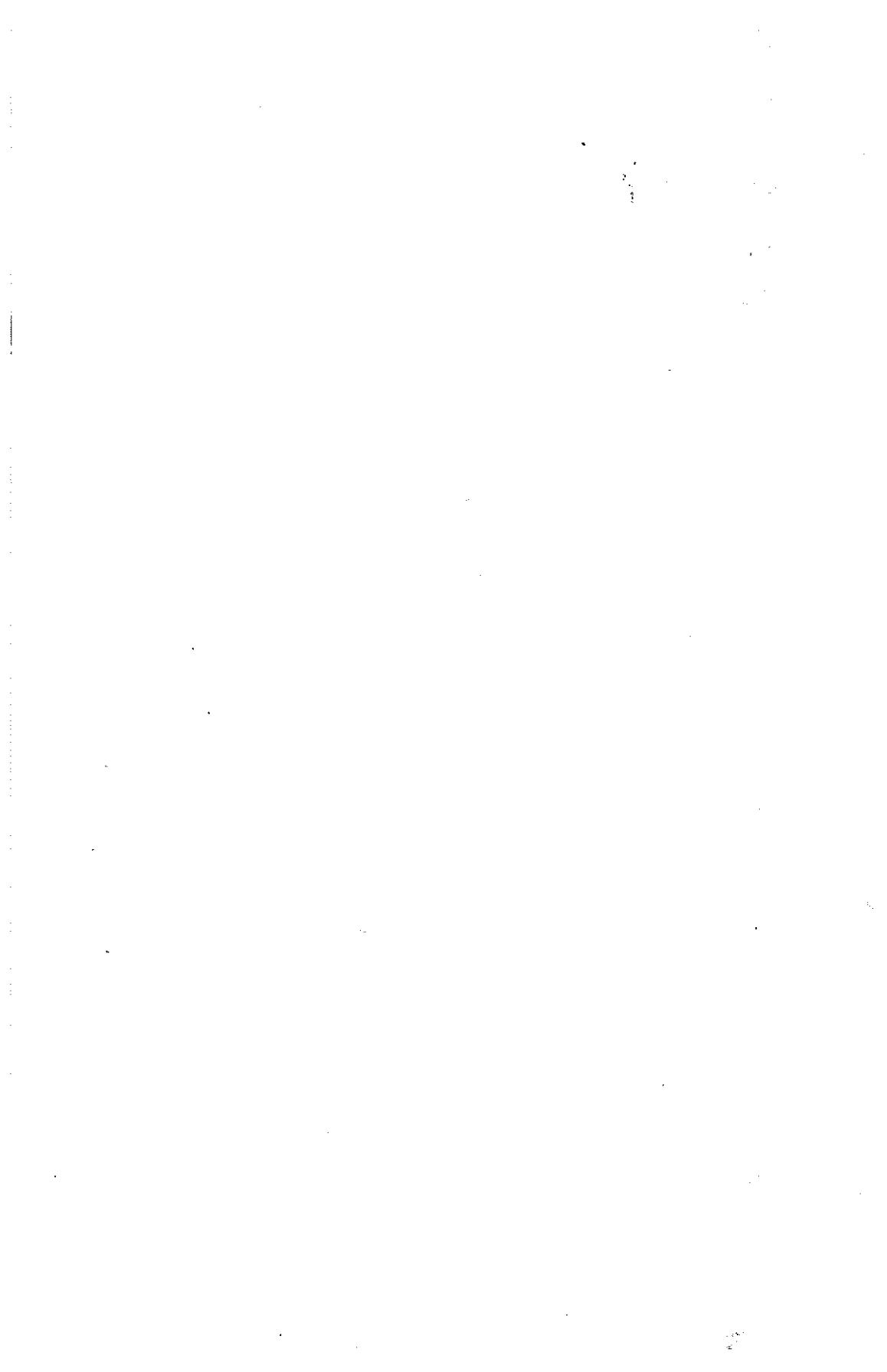
সদস্য সচিবের কথা

বাবা সাহেব ড. ভীমরাও রামজী আম্বেদকরের অবদান ভারতের নব-জাগৃতির ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত আছে। যুগ যুগ ধরে শোষিত ও দলিত মানুষদের সামাজিক-আর্থনীতিক উন্নতির জন্য তিনি আমৃত্যু সংগ্রাম করে গেছেন। শোষিত ও দলিত মানুষদের মধ্যে শিক্ষার প্রসারেও তাঁর প্রয়াস ছিল নিরলস। দলিতদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় তাঁর প্রয়াস্ ভারতের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

বাবা সাহেবের স্বপ্নকে মূর্তরূপ দেবার জন্য ভারত সরকার 'আম্বেদকর ফাউন্ডেশন' স্থাপন করেছেন। ফাউন্ডেশনের উদ্দেশ্য হল :—

(১) ড. আম্বেদকর রাষ্ট্রীয় পুস্তকালয় স্থাপন, (২) ড. আম্বেদকর রাষ্ট্রীয় পুরস্কার প্রবর্তন, (৩) ড. আম্বেদকর বিদেশ-ছাত্রবৃত্তি প্রদান, (৪) ড. আম্বেদকরের নামে অধ্যাপকপদ সৃষ্টি করা, (৫) ভারতীয় ভাষায় বাবা সাহেব ড. আম্বেদকরের রচনা ও বক্তৃতার অনুবাদ প্রকাশ করা, (৬) ড. আম্বেদকর আন্তর্জাতিক পুরস্কার প্রদান এবং (৭) দিল্লির ২৬ আলিপুর রোডে ড. আম্বেদকর রাষ্ট্রীয় স্মারক প্রতিষ্ঠা করা।

এই কার্যক্রম ও প্রকল্পগুলি রূপায়িত করে সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠায় কেন্দ্রীয় কল্যাণমন্ত্রী শ্রীমতী মানেকা গান্ধী এবং ভারত সরকারের কল্যাণ মন্ত্রকের সচিব শ্রী কে. কে. বক্সী বিভিন্ন সময়ে অমূল্য পরামর্শ দিয়েছেন। তাঁদের কাছে প্রকাশ করছি আমার কৃতজ্ঞতা।

বাবা সাহেবের রচনা-সম্ভার হিন্দি সহ অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় অনুবাদ করে প্রকাশ করবার এই জাতীয় মহত্ত্বপূর্ণ উদ্যোগকে বাস্তবায়িত করবার প্রয়াসে বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদক, অনুমোদক, সম্পাদক ও মুদ্রক নির্বাচনের দীর্ঘ প্রক্রিয়ার জন্য বিভিন্ন খণ্ড প্রকাশে কিছুটা দেরি হয়েছে। এজন্য আমি দুঃখ প্রকাশ করছি।

বাংলায় যোড়শ খণ্ড প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি খুব-ই আনন্দিত এবং এর জন্য সম্পাদক শ্রী আশিস সান্যালকে অভিনন্দন জানাই। ধন্যবাদ জানাই ফাউন্ডেশনের নিদেশক কৃষণ লালকে। এ-ছাড়াও অনুবাদক, অনুমোদক এবং আরও যাঁরা এই কাজে সহযোগিতা করেছেন, তাঁদের সকলকে আমার অভিনন্দন।

ফাউন্ডেশন এর মধ্যেই ড. আম্বেদকরের যে সব রচনা-সম্ভার প্রকাশ করেছে, সেগুলি প্রশংসিত হওয়ায় আমি আনন্দিত। সব শেষে জানাই, রচনা-সম্ভার সম্বন্ধে পাঠকের মতামত সাদরে গৃহীত হবে।

ড. এম. এস. আহমেদ
সদস্য-সচিব
ড. আম্বেদকর ফাউন্ডেশন

নতুন দিল্লি
নভেম্বর, ১৯৯৯

সম্পাদকের নিবেদন

মহাত্মা গান্ধী ও বাবা সাহেব ড. বি. আর. আম্বেদকর বিশ্বের ইতিহাসে বিংশ শতাব্দীর দুই বিস্ময়কর ব্যক্তিত্ব। ভারতের সমাজ বিবর্তনে সামাজিক সাম্য যে একান্ত জরুরি, এ-কথা দু'জনেই মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতেন। কেবল আর্থনীতিক সাম্য নয়, রাজনীতিক এবং সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠিত না হলে যে দেশের সার্বিক মুক্তি সম্ভব নয়, এ-কথা দু'জনেই বিশ্বাস করতেন। কিন্তু দু'জনের পথ ছিল ভিন্ন এবং এই কারণেই এই দুই মহান ব্যক্তিত্বের মধ্যে বার-বার মতাদর্শগত বিরোধ দেখা গেছে। দু'জনেই চেয়েছেন, অস্পৃশ্যতার বেড়াজাল থেকে মুক্ত ভারতে গড়ে উঠুক এক নতুন সমাজ। তবু দু'জনের পথের যে ভিন্নতা, তার অনুধাবন ভারতের সমাজ বিবর্তনের ও মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়।

ড. আম্বেদকর দলিত ও অস্পৃশ্যদের জন্য চেয়েছেন আইন ও সংবিধানের সুরক্ষা। গান্ধীজি এই সমস্যার সমাধান খুঁজেছেন আত্মার কল্যাণের পথে। ড. আম্বেদকর উপলব্ধি করেছিলেন যে, ব্রাহ্মণ্যবাদী ভারতীয় সমাজে দলিত এবং অস্পৃশ্যদের অর্জন করে নিতে হবে অধিকার। তিনি ছিলেন দলিত ও অস্পৃশ্যদের মুক্তির দিশারি। তাঁর অসামান্য পাণ্ডিত্য এবং বিশ্লেষণধর্মী এই গ্রন্থে বিষয়টি প্রাঞ্জলভাবে ফুটে উঠেছে।

মহারাষ্ট্র সরকার ইংরেজি ভাষায় যে 'আম্বেদকর রচনা-সম্ভার' প্রকাশ করেছেন, তার নবম খণ্ডে বর্তমান অংশটি রয়েছে। ভারতের বিভিন্ন ভাষায় ড. আম্বেদকরের যে রচনা-সম্ভার প্রকাশিত হচ্ছে, তার ষোড়শ খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এই অংশটি। অন্যান্য খণ্ডের মতো এই খণ্ডটি প্রকাশের ক্ষেত্রেও কেন্দ্রীয় সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রী শ্রীমতী মানেকা গান্ধীর সহযোগিতার কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি। এ-ছাড়াও অনুবাদক, অনুমোদক এবং এই প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত সকলকে অভিনন্দন জানাই সহযোগিতার জন্য। পাঠক কর্তৃক খণ্ডটি সমাদৃত হলে নিজেদের শ্রম সার্থক মনে করবো।

কলকাতা
নভেম্বর, ১৯৯৯

অধ্যাপক আশিস সান্যাল
সম্পাদক

সূচিপত্র

কংগ্রেস এবং গান্ধী অস্পৃশ্যদের জন্য কী করেছেন?

ভূমিকা

'১৯৮২ সালে ইংলন্ডের সংসদে নির্বাচন হয়। ওই নির্বাচনে লর্ড স্যালিসবারির নেতৃত্বাধীন রক্ষণশীলরা পরাজিত হন। গ্ল্যাডস্টোনের নেতৃত্বে উদারপন্থী দল জয়ী হয়। এই নির্বাচনের উল্লেখযোগ্য ব্যাপার ছিল পরাজিত হওয়ার পরও লর্ড স্যালিসবারি সংসদীয় রীতি-নীতি লঙ্ঘন করে নিজের দল উদারপন্থী নেতার কাছে পদত্যাগপত্র দিতে অস্বীকার করেন। সংসদের অধিবেশন বসলে রানি তাঁর সিংহাসন থেকে স্বাভাবিক সুন্দর ভাষণে স্যালিসবারি সরকারের সংসদীয় কর্মসূচি ঘোষণা করেন এবং সরকার তরফেও সম্রাজ্ঞীর প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপনের প্রস্তাব পেশ করা হয়। ব্রিটেনের সংবিধানের মৌলিক নীতির প্রতি চ্যালেঞ্জস্বরূপ এই নীতি অনুসারে সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল-ই সরকার গঠনের অধিকারী। উদারপন্থীরা এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে ভাষণের ওপর এক সংশোধনী পেশ করেন। এই সংশোধনে সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা না থাকা সত্ত্বেও স্যালিসবারির সরকারে বসে থাকার নিন্দা করা হয়। এই সংশোধন প্রস্তাব পেশ করার দায়িত্ব পড়ে প্রয়াত লর্ড আসকুইথের ওপর। সংশোধনী প্রস্তাবের সমর্থনে বক্তৃতায় তিনি সেই বিখ্যাত উক্তি করেন : Causa finita est : Roma locuta est অর্থাৎ, রোমের নির্দেশ এসেছে এবং বিবাদ শেষ করতে হবে। এই উক্তিটি আসলে সেন্ট অগাস্টিনের, অন্য প্রসঙ্গে একথা বলেছিলেন। ধর্মীয় বিতর্কের প্রসঙ্গে এটি ব্যবহৃত হয়েছিল। পোপের সার্বভৌমত্বের ভিত্তি হিসাবে ব্যবহার হয়। আসকুইথ রাজনৈতিক প্রবচন হিসাবে ব্যবহার করে এর মধ্যে সংসদীয় গণতন্ত্রের মূল নীতি ব্যক্ত করেছিলেন। এখন এটা জনপ্রিয় সরকারের মূল ভিত্তি হিসাবে স্বীকৃত অর্থাৎ রাজনৈতিক ভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ অর্জনকারীদের শাসন করার অধিকার থাকবে। এটি স্যালিসবারি সরকারের বিরুদ্ধে রায় দেয়। এবং সংসদীয় গণতন্ত্রে নির্বাচনে ব্যর্থদের বিরুদ্ধে এই রায় প্রযোজ্য।

ভারত শাসন আইন, ১৯৩৫ অনুসারে ১৯৩৭ সালে ভারতের বিভিন্ন প্রাদেশিক আইনসভার নির্বাচনের ফলাফল ঘোষিত হওয়ার পর এই প্রবচনের কথা আমার স্মরণে আসে। কংগ্রেসিরা অবশ্য বলেননি 'Causa finita est, India locuta est' (ভারতের রায় পাওয়া গেছে, সব বিবাদের নিষ্পত্তি হল)। তবে নির্বাচনে কংগ্রেসের বিরোধিতা করেছিল এমন দলগুলির পক্ষে এই প্রবচন অন্তত নির্বাচনের ফলাফলের পর প্রযোজ্য। গোল টেবিল বৈঠক ও যুক্ত সংসদীয় কমিটিতে পাঁচ বছর ধরে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে অস্পৃশ্য জাতদের লড়ার পরিপ্রেক্ষিতে আমিও নির্বাচনী

ফলাফলে প্রভাবিত হইনি একথা বলব না, আমার কাছে প্রশ্ন ছিল : অস্পৃশ্য জাতগোষ্ঠীরা কি কংগ্রেসের পক্ষে গিয়েছিল? এটা আমার কাছে অচিন্ত্য ছিল। কারণ, আমার বিশ্বাস হয় না, একমাত্র কিছু দালাল কংগ্রেসের টাকা পেয়ে বিশ্বাসঘাতকের ভূমিকা নেওয়া ছাড়া আর কেউ সদলবলে কংগ্রেসের পক্ষে যেতে পারে। গান্ধী এবং কংগ্রেসের নিজেদের স্বার্থরক্ষায় অস্পৃশ্যদের রাজনৈতিক সুরক্ষার সবক'টি দাবির কীভাবে বিরোধিতা করেছে, তা তো দেখেছি। সেজন্য আমি ১৯৩৭ সালের নির্বাচন পর্যালোচনা করার সিদ্ধান্ত নিই।

অন্ত্যজদের দৃষ্টিতে এই পর্যালোচনার গুরুত্ব সম্বন্ধে স্থিরনিশ্চিত হওয়ার পর কাজ অত্যন্ত ধীরগতিতে এগিয়ে চলে। এর তিনটি কারণ রয়েছে। অন্যান্য লেখার কাজ এবং তার গুরুত্বের জন্য পর্যালোচনার কাজ বন্ধ থাকে। দ্বিতীয়ত, ১৯৩৭-এর নির্বাচনে ফলাফল সমন্বিত নীল বইতে যা তথ্য ছিল, আমার কাজের পক্ষে যথেষ্ট ছিল না। এতে তফসিলি ভোটারদের ভোটদানের ধরন এবং তফসিলি প্রার্থীদের প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যা ছিল না। এতে ছিল শুধু বিভিন্ন কেন্দ্রের ভোটসংখ্যা, হিন্দু ও তফসিলিদের ভোটের পৃথক সংখ্যা ছিল না, কাজেই বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকারের কাছে চিঠি দিয়ে জানাতে হয়, তফসিলি ভোটারদের দেয় ভোটের সংখ্যা এবং তফসিলি প্রার্থীদের প্রাপ্ত ভোটসংখ্যার বিবরণ আমায় যেন পাঠানো হয়। এতে কাজের দেরি হয়। তৃতীয় কারণ, নির্বাচনী ফলাফল পরীক্ষা করা অত্যন্ত দুরূহ কাজ, পরিশিষ্টে দেওয়া পরিসংখ্যান দেখলেই তা বুঝা যাবে।

কাজেই কাজের দেরি হতে লাগল। আমি এর জন্য দুঃখপ্রকাশ করছি। কারণ, আমি জানি, এই সময়ের মধ্যে কংগ্রেস কত খারাপ কাজ করেছে। নির্বাচনের ফলাফল প্রচার করে কংগ্রেস নিজেদেরকে অস্পৃশ্যদের প্রতিনিধি হিসাবে জাহির করছে। এই প্রচারের মূল কথা হল, তফসিলিদের জন্য নির্দিষ্ট ১৫১টি কেন্দ্রের মধ্যে আমার দল ইন্ডিপেনডেন্ট লেবার পার্টি পেয়েছে মাত্র ১২টি এবং বাকি সব পেয়েছে কংগ্রেস। কংগ্রেসের রন্ধনশালা থেকে এই খাদ্য সরবরাহ করে প্রমাণের চেষ্টা হচ্ছে যে, কংগ্রেস-ই তফসিলদের প্রতিনিধি। এই মিথ্যা প্রচার কিছু অংশের মধ্যে প্রভাব ফেলেছে। এমন কী মিঃ এইচ. এন. ব্রেইলসফোর্ডের মতো ব্যক্তিও সত্যতা যাচাই না করেই কংগ্রেসের এই অবাস্তব ভাষ্য তাঁর 'সাবজেক্ট ইন্ডিয়া' গ্রন্থে ব্যবহার করেছেন। আমি নিশ্চিত যে, এই নীল বইয়ে দেওয়া নির্বাচনী ফলাফল এই মিথ্যা প্রচারকে ঠিক প্রতিপন্ন করতে সাহায্য করবে। ১৯৩৭-এর নির্বাচনী ফলের কংগ্রেসি ভাষ্য অত্যন্ত বিকৃত। বাস্তবে এতে অস্পৃশ্যদের প্রতিনিধিত্ব করার

কংগ্রেসি দাবি নস্যাৎ হয়েছে। কংগ্রেসি ভাষ্য সমর্থিত হওয়ার চেয়ে বরং দেখা যাচ্ছে : (১) ১৫১টি আসনের মধ্যে কংগ্রেস পেয়েছে মাত্র ৭৩টি; (২) প্রায় প্রতি কেন্দ্রেই অস্পৃশ্যরা কংগ্রেসের বিরুদ্ধে নিজেদের প্রার্থী দিয়েছেন; (৩) জেতা ৭৩টি কেন্দ্রের বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কংগ্রেস হিন্দু ভোটের জোরে জিতেছে, সুতরাং তারা কোনওভাবেই তফসিলিদের প্রতিনিধিত্ব করে না; এবং (৪) কংগ্রেসের জেতা ১৫৩টি কেন্দ্রের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে মাত্র ৩৮টি কেন্দ্রে তফসিলি সংখ্যাগরিষ্ঠ। ইন্ডিপেনডেন্ট লেবার পার্টি ১৯৩৭ সালে নির্বাচনের কয়েক মাস আগে গঠিত হয়। শুধু বোম্বাই প্রদেশে এরা সক্রিয় ছিল। অন্যান্য প্রদেশে সংগঠিত হওয়ার মতো সময় ছিল না। লেবার পার্টির প্রার্থী হয়ে নির্বাচন প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুধু বোম্বাইতেই হয়েছে এবং সেখানে পার্টির সাফল্য আশাতীত। বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে ১৫টি তফসিলি কেন্দ্রের মধ্যে ১৩টিতে লেবার পার্টি জিতেছে, এছাড়া আরও দুটি সাধারণ কেন্দ্রে জিতেছে। সেজন্য আমি খুশি। তফসিলিদের জন্য সংরক্ষিত সবক'টি কেন্দ্রে কংগ্রেস জিতেছে এবং লেবার পার্টি ব্যর্থ, এটা কত বড় মিথ্যা প্রচার তা আমি নিঃসন্দেহে প্রমাণ করতে পেরেছি। আমার বিশ্বাস, নির্বাচন বিষয়ে উৎসাহী এবং সত্যান্বেষীরা এই বইয়ের মধ্যে আকর্ষক তথ্য পাবেন। ভূমিকা শেষ করার আগে, যাঁরা আমায় এই বইয়ের কাজে বিভিন্ন রকম সাহায্য করেছেন তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই। প্রাদেশিক সরকারের কাছে আমি কৃতজ্ঞ, আমার পরিপত্রের (Circular) উত্তরে তাঁরা বাড়তি তথ্য, পরিসংখ্যান আমায় পাঠিয়েছেন। সারণি প্রস্তুত করার ব্যাপারে সাহায্য করেছেন করণ সিং, বি.এ, এম.এল.এ, প্রাক্তন সংসদীয় সচিব, উত্তরপ্রদেশ কংগ্রেস; তাঁকে ধন্যবাদ জানাই।'

ওপরের ভূমিকা পড়ে তার সঙ্গে বিষয়বস্তুর সারণি তুলনা করলেই পাঠক বুঝবেন, এই গ্রন্থ কীভাবে তার পরিসরের বাইরের বিষয় পর্যালোচনা করেছে। উৎসুক পাঠক জানতে চাইবেন কীভাবে ভূমিকা বিষয়বস্তুর তালিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। এর ব্যাখ্যা হল, বইয়ের বর্তমান আকার আগেকার মূল আকার থেকে ভিন্ন। বর্তমান গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে আলোচিত চার, পাঁচ, ছয়, সাত ও নয় অধ্যায় এবং পরিশিষ্ট পরিসংখ্যান মূল বইয়ে খুব সংক্ষিপ্ত ছিল। আগেকার ভূমিকাটা বইয়ের প্রথম মূল আকারের। সেজন্য পুরো অংশটি উদ্ধৃতির মধ্যে রেখেছি। উৎসুক ব্যক্তিরা আরও জানতে চাইবেন, বর্তমান বইটি আগের মূল আকার থেকে এত ভিন্ন কেন। এর ব্যাখ্যা সোজা। মূল আকারের বইটির প্রুফ দেখে দিয়েছিলেন এক বন্ধু ও সহকর্মী। তিনি বইয়ের বিষয়বস্তুর ব্যাপারে সন্তুষ্ট ছিলেন না, এবং তিনিই বলেন যে,

অস্পৃশ্যদের প্রতিনিধিত্ব করার দাবিদার কংগ্রেসের মুখোশ খুলতে শুধু নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশ যথেষ্ট নয়। আমাকে আরও অনেক কিছু আলোচনা করতে হবে। অস্পৃশ্যদের জ্ঞাতার্থে এবং বিদেশিদের গোচরে আনার জন্য কংগ্রেস ও গান্ধী অস্পৃশ্যদের উন্নতির জন্য কী করেছেন তা দেখাতে হবে। কারণ, ঘটনা ভুলভাবে উপস্থাপনা করে কংগ্রেস বিদেশিদের বিভ্রান্ত করেছে। তাছাড়া, মুশকিল হয়েছিল বইয়ের প্রুফ হয়ে গিয়েছিল। সেই অবস্থায় এতসব পরিমার্জন করা শক্ত ছিল, কিছু বিষয় আমার সাধ্যাতীতও হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তিনি নাছোড়বান্দা ছিলেন। আমাকে তাঁর পরিকল্পনা বাধ্য হয়ে গ্রহণ করতে হয়। মূল বইয়ের কাজ ছাপা ৭৫ পাতার মধ্যে হতো, পুরো লেখাই আমূল পালটাতে হয়। বর্তমান আকারের এই বই সম্পূর্ণভাবে পরিবর্তিত। এতে শ্রী গান্ধী ও কংগ্রেসের ১৯১৭ থেকে অদ্যাবধি অস্পৃশ্যদের সমস্যা নিয়ে কাজকর্মের বিবরণ রয়েছে। কংগ্রেস সম্বন্ধে অনেক লেখা হয়েছে, গান্ধী সম্পর্কে আরও বেশি। কিন্তু অস্পৃশ্যদের জন্য তাঁরা কী করেছেন, তার গল্প কেউই লেখেননি। সবাই জানেন যে, শ্রী গান্ধী নিজেকে অহিংসা ও স্বরাজের প্রবক্তার চেয়ে অস্পৃশ্যদের রক্ষাকর্তা হিসাবেই পরিগণিত করতে চান। গোল টেবিল বৈঠকে তিনি অন্ত্যজদের একমাত্র রক্ষাকর্তা হিসাবে প্রতিপন্ন করতে চান এবং অন্য কাউকে এই ভূমিকার অংশীদার করতে প্রস্তুত ছিলেন না। এই দাবি প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হলে তিনি কীভাবে দৃশ্য সৃষ্টি করেন তা এখনও আমার মনে আছে। গান্ধী শুধু নিজেই অন্ত্যজদের পরিত্রাতা হিসাবে দাবি করেন না, কংগ্রেসকেও পরিত্রাতা প্রতিপন্ন করতে চান। তিনি বলেন, কংগ্রেস অন্ত্যজদের প্রতি অন্যায়ের প্রতিকারে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, এবং তার যুক্তি অন্ত্যজদের রাজনৈতিক সুরক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করার দরকার নেই, এটা ক্ষতিকারক। গান্ধী ও কংগ্রেসের এই দাবির বিষয়ে কোনও বিস্তারিত চর্চা করা হয়নি, এটাই দুর্ভাগ্যজনক।

গান্ধীর অন্ধ ভক্ত হিন্দুদের কাছে এই বিশ্লেষণ পছন্দসই হবে না, নিশ্চিতভাবে তারা এতে ক্ষিপ্ত হবে। 'গান্ধীর থেকে সাবধান' এই উপসংহার হলে তারা ক্ষিপ্ত হবেন ছাড়া কি! বৃহত্তর দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করলে এতে হিন্দুদের ক্রুদ্ধ হওয়ার যুক্তি নেই। ভারতে অন্ত্যজরাই একমাত্র গোষ্ঠী নয় যারা গান্ধীকে এইভাবে দেখে। মুসলমান, ভারতীয় খ্রিস্টান, শিখরা, গান্ধী সম্বন্ধে এক-ই বিচার করেন। বাস্তবত, হিন্দুদের এ সম্বন্ধে চিন্তা করে প্রশ্ন করা উচিত : তিনি নিজেকে মুসলমান, শিখ, খ্রিস্টানদের বন্ধু বলা সত্ত্বেও তাঁকে এরা বিশ্বাস করে না কেন? আমার বিচারে গান্ধী যেভাবে সবার কাছে অবিশ্বাসের পাত্র হয়েছেন তা, যে কোনও নেতার পক্ষে

দুঃখদায়ক। তবে আমি নিশ্চিতভাবে জানি, হিন্দুরা এভাবে প্রতিক্রিয়া দেখাবেন না। স্বভাবতই, তাঁরা বইটির নিন্দা করবেন, আমার দুর্নাম দেবেন। কিন্তু প্রবাদে আছে, কুকুর চিৎকার করলেও মরুযাত্রীদের চলতেই হবে। সদৃশভাবে শত্রুরা আমার বিরুদ্ধে যাই বলুক, আমাকে আমার কাজ করে যেতে হবে। ভলতেয়ার বলেছিলেন, 'সমসাময়িক কালের ইতিহাস রচয়িতাকে তার সব বক্তব্যের জন্য ও অনুচ্চারিত বাক্যের জন্য আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু হতে হবে; যিনি সত্য ও স্বাধীনতার পথিক, নির্ভীক, কিছু চান না বা আকাঙ্ক্ষা করেন না এবং রচনার কৃষ্টিসাধনে স্বকীয় উচ্চাকাঙ্ক্ষা সীমিত রাখেন, তাঁর কাছে এইসব ছোট দুর্বলতা নিরুৎসাহজনক নয়।'

বইটা একটু বড় হয়ে গেল। কিছু পুনরুক্তি ও পুনর্ব্যাখ্যার বাড়তি বোঝা প্রকট হতে পারে। আমি এ-বিষয়ে সচেতন। তবে আমি এই গ্রন্থ রচনা করেছি মূলত অন্ত্যজ ও বিদেশিদের জন্য। তাঁদের কারও তরফেই আমি প্রাসঙ্গিক ঘটনা সম্বন্ধে পুরোপুরি জ্ঞান রাখি না। ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গিতে আমি মনে করি, ঘটনা ও যুক্তি দুই-ই তুলে ধরা আমার কর্তব্য এবং তথ্যজ্ঞানসম্পন্ন, সংস্কৃতিমগ্ন ব্যক্তিদের রসবোধ ও সূক্ষ্ম শিল্পবোধের দাবি মেটাবার জন্য চেষ্টা করার দরকার নেই।

অন্ত্যজদের রাজনৈতিক নিরাপত্তার জন্য আন্দোলন সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্যের সমাহারগ্রন্থ করাই আমার এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য, সেজন্য পরিসংখ্যান ছাড়া আরও কিছু প্রাসঙ্গিক দলিল পরিশিষ্ট অংশে দিয়েছি। এতে সরকারি বেসরকারি দলিল রয়েছে, যাতে আন্দোলন সম্বন্ধে তথ্য যুক্ত। অন্ত্যজদের সমস্যা জানতে আগ্রহীরা এইসব তথ্য হাতের সামনে পেয়ে খুশি হবেন নিশ্চয়-ই। সাধারণ পাঠক হয়তো বলবেন, পরিশিষ্টে বড্ড বেশি বিষয় যুক্ত হয়েছে। এক্ষেত্রে আমার বক্তব্য, সাধারণ পাঠকের আয়ত্তের মধ্যে রয়েছে এমন তথ্য অন্ত্যজরা পাবেন না। সাধারণ পাঠকের প্রয়োজনীয়তা নয়, অন্ত্যজদের জন্য এই পরীক্ষা গৃহীত হয়েছে।

একটা শেষ কথা বলি। পাঠক দেখবেন, গ্রন্থে আমি অন্ত্যজদের বহু পরিভাষা নির্বিচারে ব্যবহার করেছি, যেমন দলিত শ্রেণী, তফসিলি জাতি, হরিজন, দাস শ্রেণী। আমি জানি, এতে বিভ্রান্তি হবে, বিশেষ করে ভারতীয় পরিস্থিতি সম্বন্ধে অনভিজ্ঞদের পক্ষে। একটা পরিভাষা ব্যবহার করতে পারলে আমার চেয়ে কেউ বেশি খুশি হতেন না। দোষটা আমার নয়। বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি ভাবে এইসব পরিভাষা ব্যবহৃত হয়েছে। 'ভারত শাসন আইন' অনুসারে পরিভাষা হল তফসিলি জাতি। কিন্তু এটা ব্যবহৃত হয় ১৯৩৫ সালের পর। তার আগে অন্ত্যজদের 'হরিজন'

অভিধায় ব্যবহার করতেন গান্ধী। সরকার বলত দলিত, শ্রেণীগোষ্ঠী। এইরকম আলগা পরিস্থিতিতে একটা নাম ব্যবহার করা সম্ভব ছিল না, কারণ একটা স্তরে ওই নাম সঠিক হলেও পরে তা ভুল পরিগণিত হত। পাঠক যদি মনে রাখেন যে, এইসব পরিভাষা সমগোত্রীয় এবং এক-ই শ্রেণীর পরিচয়বাহী, তবে এই অসুবিধা দূর হবে।

অধ্যাপক মনোহর চিটনিস নির্ঘন্ট করে দিয়েছেন, তাঁর কাছে আমি কৃতজ্ঞ; এস. সি. যোশি প্রুফ দেখে দিয়েছেন বলে তাঁকে ধন্যবাদ জানাই।

২৪ জুন, ১৯৪৫ বি. আর. আম্বেদকর
২২ পৃথ্বীরাজ রোড
নয়াদিল্লি

অধ্যায় ১

এক বিচিত্র ঘটনা :
কংগ্রেস অস্পৃশ্যদের বিষয়ে অবগত হল

১৯১৭ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে এক বিচিত্র ঘটনা হয়। ওই অধিবেশনে কংগ্রেস নিম্নোক্ত মর্মে প্রস্তাব গ্রহণ করে :

'এই কংগ্রেস ভারতের মানুষের কাছে আবেদন জানাচ্ছে, দেশের তথা দলিত শ্রেণীর ওপর আরোপিত নিপীড়ন ও অক্ষমতা নিরসনের প্রয়োজনীয়তা ও ন্যায্যতা যেন তারা উপলব্ধি করে, কারণ এর ফলে এইসব শ্রেণীর মানুষ অসুবিধা ও কষ্ট ভোগ করছে।'

ওই অধিবেশনে সভাপতি ছিলেন মিসেস অ্যানি বেসান্ত। প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন মাদ্রাজের জি. এ. নাটেশন, সমর্থন করেন বোম্বাইয়ের ভোলাভাই দেশাই, দিল্লির আসফ আলি, মালাবারের রাম আয়ার। নাটেশন বলেন :

'ভদ্রমহোদয় ও ভদ্রমহিলাবৃন্দ, এই প্রশ্নটি অনেকদিন ধরেই অন্যান্য মঞ্চে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। কিন্তু কংগ্রেসের বিশিষ্ট চরিত্র বিচার করে বিষয় নির্বাচনী উপসমিতি (Subject Committee) ভারতের স্বশাসিত সরকার গঠনের পরিকল্পনা রচনা করে মনে করছে স্বশাসিত সরকারের দায়িত্ব পালনের জন্য প্রস্তুতিপর্ব শেষ করতে হবে। প্রথম মহান দায়িত্ব হল, সব ধরনের অসাম্য ও অন্যায়ের অবসান করা। আপনারা দেখছেন, এই প্রস্তাব সবচেয়ে দমনমূলক ও প্ররোচনাপূর্ণ বৈষম্যের অবসান করার জন্য আপনাদের আহ্বান জানাচ্ছে। কংগ্রেস চাইছে, আপনাদের ধর্মীয় বোধ ও ধর্মীয় ঐতিহ্যে আঘাত না করে বিদ্যালয়ে ও অন্যত্র এইসব মানুষের প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা রদ করা হোক। কংগ্রেস আরও চাইছে, দেশের বিভিন্ন স্থানে এইসব মানুষ যে সাধারণ জলাধার ব্যবহার করতে পারে না, তার অবসানে আপনারা সক্রিয় হোন। নিজেদের উন্নীত করা এবং এইসব পীড়াদায়ক নিষেধাজ্ঞা অবসানের চেষ্টা করে আমরা ভারতীয় মনুষ্যত্বকে উন্নীত করছি; এবং দায়িত্বশীল স্বায়ত্ত সরকার দেওয়া হলে আমরা বলতে পারব যে, শ্রেণী-মত-নির্বিশেষে সব ভারতীয়ের এক-ই সামাজিক অধিকার, বিদ্যালয়ে শিক্ষা গ্রহণের অধিকার, সব সংস্থায় যুক্ত হওয়ার

অধিকার রয়েছে ; এতে ভারতীয় মনুষ্যত্বের যথার্থ বিকাশ হবে।'

প্রস্তাব সমর্থনকারী বক্তৃতায় ভোলাভাই দেশাই বলেন : 'আমাদের সহোদররা যেসব অন্যায়ের শিকার তা আমাদের ঘোষিত সবার জন্য সাম্য ও সৌভ্রাতৃত্বের আদর্শের পরিপন্থী। আজ সকালে আপনারা যে মহান প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন, তদনুসারে আমাদের নিজেদের সহোদরদের উন্নীত করতে না পারলে ব্রিটিশ গণতন্ত্রের বা অন্য শক্তির কাছে আমরা দাবি করব কীভাবে? তাঁরা বলবেন, 'নিজেদের হাতে যে ক্ষমতা আছে তা দিয়ে নিজেদের লোকদের সামাজিক অধঃপতনের বিলোপে আপনারা অক্ষম!' আমরা নিজেদের সাহায্য করেই এটা করতে পারি এবং এ ব্যাপারে অন্যদের কাছে যাওয়ার দরকার নেই। এতে প্রমাণ হয় কংগ্রেস এই প্রস্তাব আপনাদের সামনে পেশ করে কী বিরাট পদক্ষেপ নিয়েছে।..... এই গভীর বিষের অস্তিত্ব হিন্দুধর্মের পক্ষে এক কলঙ্ক। সুতরাং, প্রয়োজনীয়তা ও ন্যায়বিচার উভয় স্বার্থেই, ন্যায়পরায়ণতার খাতিরে, আপনাদের ঘোষিত সত্যাদর্শের জন্য এই প্রস্তাবের দাবি অনুযায়ী আপনারা তাদের বঞ্চিত রাখেন কীভাবে, বিশেষ করে ন্যায়বিচারের দন্ড যখন আপনাদের হাতে? এবং আপনারা এতে ব্যর্থ হলে কোন মুখে স্বশাসিত সরকার চাইবেন?'

রাম আয়ার বলেন :

'এই প্রস্তাবে সামাজিক স্বাধীনতার মাধ্যমে নিম্নশ্রেণীর মানুষদের শৃঙ্খল ভাঙার ডাক দেওয়া হয়েছে। এরাই আমাদের জাতির পদপৃষ্ঠ, আপনি আমি যদি স্বশাসনের পাহাড়ে উঠতে চাই, তবে আগে এদের পদশৃঙ্খল মুক্ত করতে হবে, তখনই স্বশাসন আসতে পারে..... একইসঙ্গে কেউ রাজনৈতিক গণতন্ত্রী ও সামাজিক স্বৈরাচারী হতে পারে না। মনে রাখবেন, যে মানুষ সামাজিক দাসত্বে বন্দি, সে রাজনৈতিকভাবে স্বাধীন মানুষ হতে পারে না। আমরা সবাই এখানে এসেছি ঐক্যবদ্ধ ভারতের স্বপ্ন নিয়ে, শুধু রাজনৈতিকভাবে নয়, সব স্তরে ঐক্যবদ্ধ দেশ..... সুতরাং, আসুন আমরা যাঁরা ব্রাহ্মণ, উচ্চবর্ণের মানুষ, স্ব স্ব গ্রামে গিয়ে নিম্নবর্ণের মানুষদের শৃঙ্খলমোচন করি। এরা আমাদের নিজেদের সামাজিক আমলাদের বিরুদ্ধে যে লড়াই করছে তাতে শামিল হই।'

আসফ আলি বলেন :

'দলিত শ্রেণীর সমস্যা অত্যন্ত জটিল। এতদিন তারা আমলাতান্ত্রিক বিশৃঙ্খলাকারীদের বিরুদ্ধে লড়ছে, এখন দলিত অস্পৃশ্যদের পালা, এবার তারা

ভারতীয়দের লজ্জায় নিমজ্জিত করবে। সহস্র বছর ধরে কোটি কোটি অভাগা মানুষ নীরবে তাদের বৃত্তির কাজ করে যাচ্ছে, দেশের অন্যায় রীতিনীতির নিষ্ঠুরতার মধ্যে অধঃপতিত জীবন যাপন করছে, এর থেকে নিস্তারের পথ ছিল না। বসন্তের আশাব্যঞ্জক নীলিমায়, বা অন্যের কাজের রূপায়ণে। সবসময়েই এই দুর্ভাগা মানুষেরা হতাশার হিমঘরে বাস করছিল। এক নিষ্ঠুর পরিহাস যে, যারা মানবাধিকার রক্ষা বা অর্জনের পক্ষে তীব্র কলরব করছিল তারা অন্যদের ন্যায্য অধিকারের ব্যাপারে উদাসীন। মানব সমাজের একালে যারা যুদ্ধক্ষেত্রে নীরবে রক্ত বিসর্জন দিয়েছে যে অন্যায়ের প্রতিরোধে, তারা একই অন্যায়ের বলি হয়ে যাতনা ভোগ করবে? অন্ত্যজদের ধমনীতেও তো শাসক প্রভাবশালীদের ধমনীর মতোই লাল রক্ত প্রবাহিত হয়! দলিত শ্রেণীর মানুষ অধিকারভোগী শ্রেণীর মতো সমান ব্যবহারিক সুযোগ সুবিধা ভোগের অধিকারী, মানুষের জন্মগত অধিকার থেকে তাদের বঞ্চিত করা যাবে না। ভারতীয়দের পক্ষে এটা এক কলঙ্কস্বরূপ যে, তাদের সমাজে দলিত শ্রেণী রয়েছে, এবং এই কলঙ্কের অবসানের পক্ষে তারা প্রার্থনা করছে।'

অনেকে আশ্চর্য হবেন, আমি কংগ্রেসের অধিবেশনে এই মনোজ্ঞ বাক্যপূর্ণ প্রস্তাব গ্রহণকে বিচিত্র ঘটনা ব্যাখ্যা দিচ্ছি কেন। কিন্তু যাঁরা এই পূর্ববর্তী ঘটনাবলী জানেন, তাঁরা একে অসত্য বলবেন না। নানা কারণে এটা বিচিত্র।

প্রথমত অধিবেশনের সভাপতি ছিলেন প্রয়াত শ্রীমতী অ্যানি বেসান্ত। তিনি একজন সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব এবং নানা গুণের জন্য ভারতের ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিকরা ওঁকে স্মরণ করবেন। উনি ভারতের দিব্যজ্ঞানচর্চা সমাজের 'থিয়সফিক্যাল সোসাইটি অব্ ইন্ডিয়া **(Theosophical Society of India)** প্রতিষ্ঠাতা, এর কেন্দ্র আদ্যায়ার-এ। শ্রীমতী বেসান্ত উত্তরসুরি মোহন্ত হিসাবে অবসরপ্রাপ্ত এক রেজিস্ট্রার ব্রাহ্মণের পুত্র কৃষ্ণমূর্তিকে গড়ে তোলার জন্য সুপরিচিতা, বেসান্ত 'হোমরুল লীগ' **(Home Rule League)**-এর প্রতিষ্ঠাত্রী হিসাবে পরিচিত। আরও অনেক কিছু থাকতে পারে যার জন্য তাঁর অনুগামীরা বেসান্তের জন্য সম্মানজনক স্থান দাবি করেন। কিন্তু আমি জানি না, তিনি কোনওদিন অন্ত্যজদের বন্ধু ছিলেন কি না। আমি যতটা জানি, তিনি বরং অন্ত্যজদের প্রতি বৈরীভাব পোষণ করতেন। অন্ত্যজদের সন্তানদের সাধারণ বিদ্যালয়ে ভর্তি করা উচিত কি না, এই প্রশ্নে তাঁর নিবন্ধ 'দি 'আপলিফট অব দি ডিপ্রেসড্ ক্লাসেস' প্রকাশিত হয় 'ইন্ডিয়ান রিভিউ', ফেব্রুয়ারি ১৯০৯ সংখ্যায়। উনি বলেন :

সব দেশে সামাজিক পিরামিডের ভিত্তি হিসাবে বৃহৎ অংশের মানুষ অজ্ঞ অধঃপতিত, ভাষায় এবং ব্যবহারে নোংরা, সমাজের প্রয়োজনীয় বহু কাজ করে, কিন্তু সেই সমাজে অবহেলিত ও ঘৃণিত থাকে এরা। ইংলন্ডে এদের বলা হয়, দারিদ্র্য দুর্দশায় নিমজ্জিত দশম (**Submerged tenth**)। জনসংখ্যার ১৭ ভাগ এরা। দারিদ্র্যসীমার প্রান্তে এদের অবস্থান। এবং একটু বেশি চাপ আসলেই এরা নিচে নেমে যায়। এরা সবসময়েই অপুষ্টিতে ভোগে, এবং তৎপ্রসূত রোগভোগের শিকার। নিম্নস্তরের স্নায়ুতন্ত্রীসম্পন্ন অন্যান্য জীবের মতো এরা বহুসন্তানপ্রসূ, এদের সন্তানরা প্রায়-ই অপুষ্ট ক্ষীণজীবী, রোগভোগে মারা যায়। এদের মধ্যে একটু ভাল ধরনের মানুষরা অদক্ষ শ্রমিক, এরাই জঞ্জাল সাফ, মল পরিবহণ, ডক-এর মতো দুর্বহ শ্রমের কাজ করে: এবং এদের মধ্যে সবচেয়ে বদ ধরনের লোক — মদ্যপ, ভবঘুরে, অলস, অসচ্চরিত্র, দাগী অপরাধী, দুর্বৃত্ত রয়েছে। প্রথম ধরনের মানুষ সাধারণত সৎ, পরিশ্রমী; দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকদের কড়া নিয়ন্ত্রণে রাখতে হয়। জোর করে রুজিতে আবদ্ধ রাখতে হয়। ভারতে এই শ্রেণীর মানুষ জনসংখ্যার $\frac{১}{৬}$ অংশ, এরা দলিত শ্রেণী নামে পরিচিত। দেশের আদিম অধিবাসী থেকে এরা উদ্ভূত, আক্রমণকারী আর্যরা এদের ওপর আধিপত্য এনে দাস হিসাবে পরিগণিত করে..... এরা মদ্যপ এবং খাদ্য বাসস্থান-এ পরিচ্ছন্নতার বিষয়ে উদাসীন; তবে বিবাহে কিছুটা প্রথা অনুসরণ করা হয়, শিশুদের প্রতি যত্ন নেওয়া হয়, এবং হিংসা অপরাধ জিঘাংসাবৃত্তি কম। বংশপরম্পরায় চোর, বা অপরাধী গোষ্ঠীগুলি পৃথক জায়গায় বাস করে, এবং এরা জমাদার, ডোম, কৃষক, কারিগরদের সঙ্গে মেশে না। এইসব পেশাজীবীরাই দলিত শ্রেণীর বৃহদাংশ। এরা অত্যন্ত নম্র, ভদ্র, শ্রমমুখী, শোচনীয়ভাবে বশ্য, অভাবের সময় না হলে হাসিখুশি, সীমিত বুদ্ধি সত্ত্বেও বুদ্ধিমান; বিশ্বস্ততা ও নাগরিক গুণাবলী নেই বললেই চলে — এছাড়া অন্যরকম হবে কীভাবে? কিন্তু তারা স্নেহপরায়ণ, সামান্য সহৃদয়তা পেলে কৃতজ্ঞ এবং স্বভাবজ ধর্মের অনুসারী। বাস্তবিক, তারা সরল, সাধারণ, সুস্থ নাগরিক জীবনের পক্ষে উৎকৃষ্ট উপাদান..... 'যাঁরা এদের প্রতি বর্বর প্রথার অত্যাচার সম্বন্ধে বলেন এবং স্বাধীনতার দাবি সোচ্চারকারী ভারতীয়রা যাঁরা অন্যের স্বাধীনতা ও সম্মানদানের কথা বলেন, তাঁরা এদের জন্য কী করতে পারেন?

'সব জায়গার মতো এখানেও শিক্ষার মাধ্যমে তাদের উন্নতির আশা করতে পারি। কিন্তু প্রথমেই একটা অসুবিধা দেখা দেবে। কারণ, সমাজের একটা শ্রেণী সহৃদয়তা ও করুণার বোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে পরিস্থিতির বিস্তারিত পর্যালোচনা করেই

উচ্চশ্রেণীর ছেলেমেয়েরা যেসব স্কুলে পড়ে সেখানেই এদের প্রবেশাধিকারের পক্ষপাতী। এই নীতির বিরোধীদের তাঁরা ভ্রাতৃত্ববোধহীন বলে নিন্দা করেন। কাজেই, এই প্রশ্ন উঠবে যে, ভ্রাতৃত্ববোধের অর্থ কি নিচে নামিয়ে সমান করা, না পরিবারে বড় ছেলে ও শিশুর প্রতি এক-ই ব্যবহার করা স্বাভাবিক? এটা এমন এক ভাবাবেগ যা জ্ঞানলব্ধ বা প্রকৃতি অনুযায়ী নয়, এর দ্বারা সাম্যের স্থানে ভ্রাতৃত্ব জায়গা পাবে এবং সংস্কৃতিবান ও মার্জিত লোকদের থেকে দাবি করা হবে তাঁদের কয়েক প্রজন্মলব্ধ শিক্ষার ফসল তাঁরা স্বেচ্ছায় ত্যাগ করুন কৃত্রিম সমতা সৃষ্টির জন্য। এটা ভবিষ্যতে প্রগতির পক্ষে ক্ষতিকর হবে। বর্তমান থেকে উন্নতির পক্ষেও অর্থহীন হবে। দলিত শ্রেণীর শিশুদের প্রথমে পরিচ্ছন্নতা শেখাতে হবে, ভদ্র আচরণ এবং শিক্ষা, ধর্ম ও নৈতিকতার প্রাথমিক শিক্ষা দিতে হবে। এখন তাদের গায়ে দুর্গন্ধ, মদের গন্ধ এবং দুর্গন্ধযুক্ত খাদ্যের অভ্যেস কয়েক প্রজন্ম ধরে চলেছে। কয়েক প্রজন্ম ধরে বিশুদ্ধ খাদ্য ও পরিচ্ছন্ন জীবন যাপন করলে তবে তারা প্রতিবেশী বিদ্যালয়ের ছেলেমেয়েদের পাশে বসার যোগ্য হবে, এই ছেলেমেয়েরা ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা, বিশুদ্ধ খাদ্যাভ্যাসের ঐতিহ্য অনুসরণ করে তাদের বর্তমান শরীর পেয়েছে। দলিত শ্রেণীর মানুষদের শারীরিক শুদ্ধতার এই স্তরে উন্নীত করতে হবে, পরিচ্ছন্নতার নোংরামোর স্তরে নামিয়ে নয়, এটা যতক্ষণ না করা হচ্ছে উভয়ের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ অনাকাঙ্ক্ষিত। তাদের বর্তমান অবস্থার জন্য সন্তানদের বা পিতামাতাদের দায়ী করছি না, বাস্তব ঘটনা যা, তাই বলছি। ওইসব শিশুর দৈনিক প্রথম শিক্ষা হবে রোজ স্নান করে পরিষ্কার জামা-কাপড় পরা; দ্বিতীয় হবে পরিচ্ছন্ন সুষম খাদ্য গ্রহণ। এইসব প্রাথমিক চাহিদা মেটানো সম্ভব নয় এমন বিদ্যালয়ে, যেখানে শিশুরা রোজ প্রত্যূষে স্নান করে ভাল খাদ্যগ্রহণ করে আসে।

'এইসব শিশুর শিক্ষকদের পক্ষে আরেক অসুবিধা তাদের সংক্রামক রোগ। দৃষ্টান্তস্বরূপ, এদের মধ্যে প্রায়শই অবহেলাজনিত চোখের রোগ ব্যাপক। মাদ্রাজে আমাদের পঞ্চম বিদ্যালয়ে শিক্ষকরা এ-ব্যাপারে সজাগ, শিশুদের চোখ রোজ পরিষ্কার করানো হয় এবং এতে রোগ প্রতিরোধ হয়। কিন্তু এটা কি কাম্য যে, বাবা-মার দৈনিক দৃষ্টি ও যত্নে এই নোংরা রোগ রোধ সম্ভব হলেও তারা ইচ্ছে করে এইসব সংক্রামক রোগ বিদ্যালয়ে ছড়াতে দেবেন?

'এইসব শিশুর আচার-ব্যবহারও সুন্দরভাবে পুষ্ট সন্তানরা অনুকরণ করবে তা কাম্য নয়। ভদ্রতা, বিনয় নিরন্তর আত্মসংযম ও অন্যের সুবিধা বিবেচনার ফল। শিশুরা অভিভাবক ও শিক্ষকদের আচার-ব্যবহার অনুকরণ করে এবং উপযুক্ত

ধর্মানুশাসন ও তিরস্কার দ্বারা নির্ধারিত হয়। বিদ্যালয়ে যদি অশিক্ষণপ্রাপ্ত শিশুদের সহযোগী হয়, তারা সহজেই চারপাশে যা দেখছে তার দ্বারা প্রভাবিত হবে। কারণ সদাচার যদি দীর্ঘকাল অনুসরণের দ্বারা প্রোথিত না হয়, তাহলে সহজেই তা নির্ভুল না হয়ে বিশৃঙ্খল হয়ে যায়। যেসব পরিবারের ঐতিহ্য শালীনতা, ভদ্র ব্যবহার, তার শিশুরা কি এই ঐতিহ্য থেকে নির্বাসিত হবে? এই ঐতিহ্য অপহরণে কারও সমৃদ্ধি হবে না, বরং জাতি অধঃনমিত হবে। মিত বাক্য, সুকণ্ঠ, কৌতুকপূর্ণ ব্যবহার দীর্ঘকাল কৃষ্টির ফসল। এবং এসব ভূলুণ্ঠিত করায় প্রকৃত সৌভ্রাতৃত্ব হতে পারে না।

ইংলন্ডে সব শ্রেণীর ছেলেমেয়েদের একসঙ্গে শিক্ষাদান কোনওকালে বিবেচ্য হয়নি, অসমদের সমান করার এই চেষ্টা ঘৃণা সহকারে প্রত্যাখ্যাত হয়। ইটন ও হ্যারো উচ্চশ্রেণীর সন্তানদের শিক্ষাকেন্দ্র, রাবগী ও উইনচেস্টার একটু অভিজাত, ভদ্র সন্তানদের শিক্ষাস্থল। এরপর আছে বহু বিদ্যালয়, প্রাদেশিক মধ্যবিত্তদের জন্য। এছাড়া বোর্ডের বিদ্যালয়গুলোতে শ্রমিক ও কারিগর শ্রেণীর সন্তানরা পড়ে, এবং এর নিচে আছে দরিদ্র পরিবারের ছেলেমেয়েদের জন্য বিদ্যালয় **(ragged schools)**। নামেই এর শিক্ষা ও দাতব্য চরিত্র প্রকট। ইংলন্ডে কেউ যদি বলেন এইসব ছেলেমেয়ে ইটন ও হ্যারোতে ভর্তি হোক, তবে কেউ তা নিয়ে তর্ক করে না, উপহাস করে। এখানে এক-ই প্রস্তাব করা হয়েছে ভ্রাতৃত্ববোধের নামে, লোকে এর অবাস্তবতা বলতে দ্বিধা করে এবং তারা মনে করে না যে, এটা দলিত শ্রেণীর ওপর দীর্ঘকালের অন্যায়ের বিরূপ প্রতিক্রিয়া, সচকিত বিবেকের আর্তনাদ এখনও আবেগকে ঠিকমতো যুক্তিসঙ্গত পথে প্রকাশ করতে পারেনি। অনেক সময় বলা হয়, সরকারি বিদ্যালয়ে সামাজিক ব্যবধান গণ্য করা হয় না, এতেই বুঝা যাচ্ছে যে এটা 'বহিরাগত' মানসিকতার ব্যাপার। তাঁরা নিজেদের দেশের ছেলেমেয়েদের ক্ষেত্রে এটা করবেন না। ভারতের ক্ষেত্রে হয়তো সব শিশুকে, পরিচ্ছন্ন নোংরা সবাইকে এক জায়গায় ফেলবেন। যুবকদের কণ্ঠের আওয়াজে পার্থক্য বুঝা যায় যখন কৃষ্টিসম্পন্ন ঘরের ছেলেমেয়েরা কোনও বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়। এবং ভারতীয়দের স্বার্থেই ছেলেদের এমন বিদ্যালয়ে পাঠাতে হবে, যেখানে বাজে প্রভাব থেকে রক্ষা করা যায়। ইংরেজরা তাদের সন্তানদের এভাবে সুরক্ষিত রাখে।'

এই প্রস্তাব গ্রহণকে বিচিত্র ঘটনা আখ্যা দেওয়ার দ্বিতীয় কারণ হল, এটা কংগ্রেসের ঘোষিত নীতির পরিপন্থী। এখন যখন সর্বত্র গঠনমূলক কার্যক্রমের কথা কংগ্রেস প্রচার করছে, এবং যখন কংগ্রেস অসহযোগ ও আইন অমান্য প্রচারের পর বিরতি

পালন করছে, তখন এই ঘোষণা কংগ্রেসকর্মী ও বন্ধুদের বিস্মিত করবে। কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে কংগ্রেস সভাপতিদের প্রদত্ত ভাষণ দেখলেই বুঝা যাবে যে, কংগ্রেসের নীতিতে সামাজিক সংস্কার লক্ষ্য হিসাবে কোথাও স্থান পায়নি। প্রথমে ১৮৮৬ সালে কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশনের সভাপতি দাদাভাই নৌরজির কথা ধরা যাক। সভাপতির ভাষণে সমাজ সংস্কার নিয়ে কংগ্রেসের দৃষ্টিভঙ্গি সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্য :

'এটা উচ্চকণ্ঠে করে বলা হয়েছে যে, কংগ্রেসের উচিত সমাজ সংস্কারের কাজ শুরু করা (হ্যাঁ, হ্যাঁ চিৎকার), এবং আমরা এটা করতে না পারলে আমাদের বিরুদ্ধে তীব্র নিন্দা হবে। সমাজ সংস্কার প্রশ্নে কংগ্রেসের কোনও সদস্যের চেয়ে আমি কম চিন্তিত নই; কিন্তু ভদ্রমহোদয়গণ, সবকিছুর একটা উপযুক্ত পরিস্থিতি, স্থান-কাল-পাত্রের ব্যাপার আছে (হর্ষধ্বনি)। আমরা একটা রাজনৈতিক মঞ্চ হিসাবে আমাদের রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষা শাসকদের কাছে পেশ করার উদ্দেশ্যে সমবেত হয়েছি, সামাজিক সংস্কার বিষয়ে আলোচনার জন্য আমরা আসিনি। আপনারা যদি এ ব্যাপারটি অবহেলার জন্য আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন, তাহলে গণিতশাস্ত্রের জটিল সমস্যা বিষয়ে আলোচনা না করার জন্য 'হাউস অব কমন্স'কেও অভিযুক্ত করা যায়। তাছাড়া এখানে সব জাতিগোষ্ঠীর হিন্দু আছেন, এক-ই প্রদেশে এঁদের নিজেদের মধ্যেই আচার-নীতির পার্থক্য রয়েছে — বিভিন্ন গোষ্ঠীর মুসলমান ও খ্রিস্টান আছেন। আছেন পারসি, শিখ, ব্রাহ্ম ইত্যাদি। এইসব বিভিন্ন গোষ্ঠী ও শ্রেণীর মানুষ নিয়েই তো ভারতবর্ষ (তুমুল হর্ষধ্বনি)। এই সভায় সব ধরনের মানুষের সামাজিক সংস্কার নিয়ে চর্চা হবে কীভাবে? শুধু সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠীর মানুষ-ই তাদের সংস্কার নিয়ে মাথা ঘামাতে পারে। জাতীয় কংগ্রেস সেসব সমস্যা পর্যালোচনা করতে পারে যাতে সমগ্র জাতি জড়িত। সমাজ সংস্কার ও অন্যান্য শ্রেণীর সমস্যা সংশ্লিষ্ট শ্রেণীর হাতে ছেড়ে দেওয়া উচিত।'

সমস্যাটি আবার তুলে ধরেন সম্মানীয় বদরুদ্দিন তৈয়বজি, ১৯৮৭ সালের কংগ্রেস অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে। শ্রী ত্যাবজি বলেন :

'.....আমাদের সভার বিরুদ্ধে বলা হচ্ছে যে, কংগ্রেস সমাজ সংস্কার প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করে না।..... আমি স্বীকার করছি যে, অভিযোগটা বিচিত্র মনে হচ্ছে আমার কাছে। কারণ বিশেষ কোনও গোষ্ঠী বা শ্রেণী, ভারতের একটি অঞ্চলের প্রতিনিধির সংস্থা নয়, দেশের বিভিন্ন অংশ ও বিভিন্ন শ্রেণীগোষ্ঠী এতে সমন্বিত। সমাজ সংস্কারের যে কোনও বিষয় যেহেতু বিশেষ অঞ্চল বা শ্রেণীর ওপর প্রভাব

ফেলবে এবং সেজন্যই বলতে চাই বন্ধুগণ, আমার মনে হয়, যদিও হিন্দু বা পারসীদের মতো আমাদের মুসলমানদের নিজেদের বিশেষ সমস্যা রয়েছে, তবু এইসব সমস্যা সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায়ের লোকরাই সমাধান করতে পারবে (হাততালি)। তাই, ভদ্রমহোদয়গণ, আমি মনে করি যে, আমাদের পক্ষে একমাত্র সম্ভাব্য এবং সুচিন্তিত পথ হবে সমগ্র ভারতের সমস্যায় আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখা এবং বিশেষ শ্রেণী বা সম্প্রদায়ের সমস্যা পর্যালোচনা থেকে বিরত থাকা।'

তৃতীয়বার এই সমস্যা ওঠে ১৮৯২ সালে, ডব্লু. সি. ব্যানার্জি তাঁর সভাপতির অভিভাষণে এই মত ব্যক্ত করেন :

'কিছু সমালোচক আমাদের ব্যাপার আমাদের চেয়ে ভাল বুঝেন মনে করে বলতে শুরু করেছেন যে, রাজনৈতিক বিষয়ে মাথা না দিয়ে আমাদের উচিত সামাজিক বিষয়ে দৃষ্টি নিবদ্ধ করা এবং দেশের সামাজিক ব্যবস্থার উন্নতি করা; আমি অন্তত : সামাজিক বিষয়ে প্রকাশ্য আলোচনায় বিশ্বাসী নই, আমার মতে সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠীর লোকদের হাতেই তাদের সামাজিক ব্যবস্থার উন্নতির ভার ছেড়ে দেওয়া উচিত। আমরা জানি, সামাজিক প্রশ্ন সর্বসাধারণের মধ্যে আলোচিত হলে লোকে উত্তেজিত হয়ে ওঠে। কিছুদিন আগেই 'রাজপ্রতিনিধির বিধান পরিষদে' (Vice-regal Legislative Council) 'বিবাহের বয়স সংক্রান্ত বিধেয়ক' পেশ করা হলে এর নমুনা প্রত্যক্ষ করেছি। আইনের সুবিধা সম্পর্কে আমি কিছু বলতে চাই না। কিন্তু আমরা তখন দেখেছি সামাজিক প্রশ্ন প্রকাশ্যে তিক্ত পরিস্থিতির মধ্যে বিতর্ক হলে জনমানস কীভাবে বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে..... আমার ধারণা সমাজ সংস্কার বলতে আমরা অনেকেই এর যথার্থ অর্থ বুঝি না। আমাদের কেউ কেউ চান যে, আমাদের মেয়েরাও ছেলেদের মতো শিক্ষালাভ করুক, বিশ্ববিদ্যালয়ে যাক এবং শিক্ষিত পেশা গ্রহণ করুক ; যারা একটু ভীরুপ্রকৃতির তাদের শিশুদের বাল্যবিবাহ রদ হোক এবং বালবিধবা চিরকাল যেন বিধবা না থাকে, সেটা দেখে খুশি হোক। আরও ভিতুরা নিজেদের সামাজিক সমস্যা সমাধান করুক..... কংগ্রেস আগেকার মতো ভবিষ্যতেও শুধু রাজনৈতিক সংস্থা হিসাবে রাজনৈতিক বিষয়েই দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখুক। আমার আশঙ্কা, দেশে ও বিদেশে যাঁরা সামাজিক বিষয়কে কাজের অংশ না করার জন্য আমাদের সমালোচনা করেন তাঁদের মনোবাঞ্ছা আমরা 'বিবাহের বয়স সংক্রান্ত বিধেয়ক'-এর মতো অন্যান্য বিষয়ে নিমগ্ন থেকে কলঙ্কজনক ব্যর্থতার বলি হই। তাঁরা আমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী নন এবং তাঁরা যখন কংগ্রেসকে সামাজিক সমস্যা নিয়ে কাজ করার উপযুক্ত বলেন, আমার মনে হয় তাঁদের এড়িয়ে চলাই শ্রেয়.....

'যাঁরা বলেন আমরা সমাজ সংস্কার ছাড়া রাজনৈতিক সংস্কার করতে পারব না, আমি তাঁদের কথা মানতে রাজি নই। এই দুইয়ের মধ্যে সম্পর্ক কোথায় তা তো দেখি না। যেমন ধরা যাক, একই আধিকারিকের হাত থেকে বিচার ক্ষমতাকে প্রশাসনিক ক্ষমতা থেকে পৃথক করা, বহু বছর ধরে আমরা এটা বলছি। রাজনৈতিক সংস্কার ও সামাজিক সংস্কার, এই দুইয়ের মধ্যে কি সম্পর্ক থাকতে পারে? সদৃশভাবে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত, বনভূমি সংক্রান্ত আইন ও অন্যান্য বিষয়ে আমরা দাবি করছি —এসবের সঙ্গে সামাজিক সংস্কারের যোগ কোথায়? আমাদের বিধবারা পুনর্বিবাহ করতে পারে না, বা মেয়েদের বাল্য বয়সে বিয়ে হয় বলে কি আমরা পূর্বোক্ত দাবি করতে পারব না? আমাদের স্ত্রী-কন্যারা একসঙ্গে গাড়িতে বন্ধুদের কাছে যায় না বলে কি আমরা অযোগ্য? অক্সফোর্ড বা কেম্‌ব্রিজে মেয়েদের পাঠাতে পারি না বলে কি আমরা রাজনৈতিক দাবি করতে পারব না? (হর্ষধ্বনি)

শেষবার এই বিষয়টি ওঠে পুনায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেস অধিবেশনে, ১৮৯৫ সালে। সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি ছিলেন সভাপতি। সভাপতির ভাষণে এই বিষয়ে শ্রী ব্যানার্জি বলেন :

'আমাদের শিবিরে বিভেদ হতে দেওয়া যায় না। ইতিমধ্যে ওঁরা বলছেন, এটা হিন্দুদের কংগ্রেস, মুসলমান বন্ধুদের উপস্থিতি এই বক্তব্য খণ্ডন করছে। কংগ্রেসকে একটা বিশেষ গোষ্ঠীর সংস্থা বলতে দেওয়া হবে না। কংগ্রেস হচ্ছে হিন্দু, মুসলমান শিখ, খ্রিস্টান, পারসীর ঐক্যবদ্ধ ভারতের কংগ্রেস। যারা সামাজিক রীতির সংস্কার করবে, যারা করবে না, তাদের উভয়ের কংগ্রেস। এখানে আমরা একই মঞ্চে সমবেত হয়েছি— সামাজিক ধর্মীয় ব্যবধান মুছে দিয়ে আমরা এই ব্যাপারে ঐকবদ্ধ হয়েছি যে, একই সার্বভৌম শাসক, একই সরকার ও একই রাজনৈতিক সংস্থার অধীনে আমাদের একই অধিকার ও অভিযোগ রয়েছে। এই অধিকার প্রসার ও অভিযোগ মোচনের উদ্দেশ্যে এই কংগ্রেস আমরা আহ্বান করেছি। একদল ডাক্তার বিজ্ঞানের মৌলিক প্রশ্নে একমত হয়েও তাঁদের কন্যাদের বিয়ের বয়স বা বিধবা মেয়েদের পুনর্বিবাহ প্রশ্নে ভিন্নমত হয়ে পৃথক হলে আমরা কি বলব..... আমাদের এটা রাজনৈতিক আন্দোলন, সামাজিক আন্দোলন নয়; আমরা সামাজিক সংস্থা নই বা আমাদের বন্ধু আইন ব্যবসায়ীরা ডাক্তার নন। এজন্য আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ হতে পারে না। এমন কী রাজনৈতিক প্রশ্নেও সংখ্যালঘুদের মতামতের প্রতি আমাদের সম্মান এত যে, ১৮৮৭ সালে একদা আমাদের সভাপতি এবং পরে বোম্বাই উচ্চ-ন্যায়লয়ের ন্যায়াসনে উন্নীত বদরুদ্দিন তৈয়বজির প্রয়াসে এক প্রস্তাব গৃহীত হয়

এই মর্মে যে, কংগ্রেসে সংখ্যালঘু অথচ একটি শ্রেণী সর্বসম্মতভাবে বলছে যে, বিশেষ কোনও প্রশ্ন আলোচ্য হবে না, তবে তাই হবে।'

'আমাদের মতো সংগঠনে এক বিশেষ ধরনের বিপদ রয়েছে, এর বিরুদ্ধে রক্ষাকবচ চাই..... দলের ভেতরেই ভিন্নমত ও ঝগড়া থেকে উদ্ভূত বিপদ।'

দুই

এইসব বক্তব্যে দুটি প্রশ্ন রয়েছে, যার ব্যাখ্যা প্রয়োজন। এক, সভাপতি কর্তৃক উল্লিখিত 'সমাজ সংস্কার দল' (Social Reform Party) ব্যাপারটা কী? দুই, কেন ১৮৯৫ কংগ্রেস অভিভাষণেই সভাপতি সুরেন্দ্রনাথ সামাজিক সমস্যার সঙ্গে কংগ্রেসের যোগসূত্র সম্বন্ধে বলেন, এবং কেনই বা ১৮৯৫-র পর কোনও সভাপতিই এই বিষয়ে উল্লেখ করার প্রয়োজন বোধ করেননি।

প্রথম প্রশ্ন বুঝতে হলে মনে রাখতে হবে, ১৮৮৫ সালে যখন বোম্বাইয়ে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন নেতারা মনে করেছিলেন যে, জাতীয় আন্দোলন শুধু রাজনৈতিক হবে না, সঙ্গে সঙ্গে ভারতের সামাজিক অর্থনীতির প্রশ্নসমূহও বিবেচ্য হবে এবং যাবতীয় সামাজিক কু-প্রথা ও অন্যায় নিরসন করে হিন্দু সমাজকে পুনরুজ্জীবিত করার প্রয়াস করবে। দেওয়ান বাহাদুর আর. রঘুনাথ রাও, বিচারপতি (রায়বাহাদুর) এম. জি. রানাডে এই মত প্রকাশ করে বোম্বাই কংগ্রেসে প্রথম সভায় সামাজিক সংস্কারের ওপর বক্তব্য রাখেন। কলকাতায় ১৮৮৬ সালে এ বিষয়ে আর কিছু হয়নি। অবশ্য কংগ্রেস আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ ও ভারতের শিক্ষিত নেতারা চর্চা করতে থাকেন, কংগ্রেস শুধু সামাজিক প্রশ্ন নিয়েই কাজ করবে, না এর জন্য পৃথক একটা সংস্থা গড়া হবে? দেওয়ান বাহাদুর আর. রঘুনাথ রাও, রানাডে, নরেন্দ্রনাথ সেন, জানকীনাথ ঘোষাল ও অন্যান্যদের আলোচনার পর ঠিক হয় যে, ভারতের সামাজিক অর্থনীতি সংক্রান্ত বিষয়গুলি পর্যালোচনার জন্য একটি পৃথক সংস্থা 'ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল সোসাল কনফারেন্স' (Indian National Social Conference) গঠিত হবে। মাদ্রাজে ১৮৮৭ সালের ডিসেম্বর মাসে ভারতের জাতীয় সামাজিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতির আসন গ্রহণ করেন স্বর্গীয় রাজা টি. মাধবরাও কে. সি. এস. আই। প্রথম সম্মেলনে অবশ্য বেশি কাজ হয়নি। অন্য সব প্রস্তাব গ্রহণ ছাড়া উপস্থিত সদস্যরা ঠিক করেন, প্রতি বছর দেশের বিভিন্ন স্থানে এই জাতীয় সম্মেলন করে সমাজের স্থিতি ও বিধির উন্নয়নের বিষয় পর্যালোচনা করা হবে এবং সব প্রদেশে একটা উপ-সমিতি গঠন করা হবে।

এ বিষয় সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হয় যে, আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে থাকবে বিদেশে সমুদ্রযাত্রার ওপর আরোপিত বিধি-নিষেধ, বিবাহের অত্যধিক ব্যয়ের পরিণাম, বিবাহের নিম্নতম বয়স নির্ধারণ, যুবতী বিধবাদের পুনর্বিবাহ, বৃদ্ধদের বহুবিবাহ তথা যুবতী বিবাহ, এক-ই জাতগোষ্ঠীর ও উপগোষ্ঠীর মধ্যে বিবাহ ও পুনর্বিবাহ ইত্যাদি বিষয়।

সামাজিক রীতিনীতির ব্যাপারে উপ-সমিতি নিয়োগ করে বিভিন্ন প্রশ্ন পর্যালোচনার কথা চিন্তা করা হয়। নীতি লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে শাস্তি ও তা কার্যকরীর জন্য সাব কমিটিকে দায়িত্ব দেওয়া হয় মৌলিক নীতি নির্ধারণের। 'সমাজ সংস্কার দল'-এর (Social Reform Party) সদস্যরাও শাস্তির আওতাভুক্ত থাকবে :

১) উপ-সমিতির সদস্যদের দ্বারা, ২) সম্ভবমতো স্বকীয় ধর্মীয় গুরুর মাধ্যমে, বা ৩) ন্যায়ালয়ের মাধ্যমে, অথবা সবকটি ব্যর্থ হলে ৪) সরকারের কাছে আর্জি জানানো হবে, যাতে সমিতির শপথবদ্ধ সদস্যরা বিধি পালন করেন।

'সমাজ সংস্কার দল' সামাজিক কু-প্রথার পর্যালোচনা ও হিন্দু সমাজ পুনরুজ্জীবনে পৃথক সংস্থা গড়লেও সমাজ সংস্কার প্রশ্নে কংগ্রেসের অনীহায় অসন্তুষ্ট ছিল। এঁদের কেউ কেউ রাজনৈতিক সংস্কারের আগে সামাজিক সংস্কার কাম্য কি না, এই প্রশ্নে সিদ্ধান্ত গ্রহণের দাবি তুলতে আগ্রহী ছিলেন। এই সূত্রে তাঁরা বহু সার্থক বন্ধু পান। তার মধ্যে ভারত সরকার, 'রাজপ্রতিনিধির পরামর্শ পরিষদ'-এর সদস্য স্যার অকল্যান্ড কলভিন সজোরে বলেন যে, 'ভারতের প্রতি ব্রিটিশের দায়িত্ব শিক্ষাদানের' আগে ভারতীয়দের উচিত নিজেদের সমাজ সংস্কারে সযত্ন হওয়া।

এই পরিপ্রেক্ষিতে সমাজ সংস্কার বিষয়ে কংগ্রেস সভাপতিদের ভাষণ সহজেই বোধগম্য। সমাজ সংস্কার সম্বন্ধে কংগ্রেসের অনুৎসাহের বিরুদ্ধে 'সমাজ সংস্কার দল'-এর সমালোচনার উত্তরেই এইসব কথা।

দ্বিতীয় প্রশ্ন, অর্থাৎ কংগ্রেস সভাপতি ১৮৮৫ সালের ভাষণে কেন সামাজিক সংস্কার সম্বন্ধে উল্লেখ করেছিলেন। এর উত্তর হচ্ছে, ১৮৯৫-এর আগে সামাজিক সংস্কার বনাম রাজনৈতিক সংস্কার প্রশ্নে কংগ্রেসে দুটি মত ছিল। দাদাভাই নৌরজি, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি, বদরুদ্দিন তৈয়বদের একটা মত। অন্যদিকে উমেশচন্দ্র ব্যানার্জি প্রবক্তা আরেক মতের। প্রথম দল সামাজিক সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেও মনে করতেন, এর জন্য কংগ্রেস যথোপযুক্ত মঞ্চ নয়। দ্বিতীয় দল এটা অস্বীকার করে বলতেন, সামাজিক সংস্কার ছাড়া রাজনৈতিক সংস্কার সম্ভব নয়, এই বক্তব্য ঠিক নয়। যদিও এই দুই গোষ্ঠী মৌলিকভাবে পরস্পর বিরোধী ছিল, ১৮৯৫-এর আগে ঝগড়া ও অসহনশীলতা প্রকট হয়নি। প্রথম মতাবলম্বীরা প্রভাবশীল ছিলেন।

এর জন্যই জাতীয় কংগ্রেস ও সোশ্যাল কনফারেন্স পৃথক সংস্থা হিসাবে স্বকীয় লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে কাজ করত। এদের মধ্যে সহযোগিতা ও সদিচ্ছার মনোভাব এত প্রবল ছিল যে, কংগ্রেস ও সোশ্যাল কনফারেন্স-এর বার্ষিক সম্মেলন এক-ই মণ্ডপে পরপর অনুষ্ঠিত হত। এবং প্রতিনিধিদের বৃহদাংশই দুই সম্মেলনেই যোগ দিতেন। কংগ্রেসের মধ্যেকার সামাজিক সংস্কার বিরোধী অংশের কাছে অবশ্য সোশ্যাল কনফারেন্স চক্ষুশূলস্বরূপ ছিল। কংগ্রেসের প্রভাবশালী অংশের এদের প্রতি সমর্থন ও একই মণ্ডপ ব্যবহারে এই গোষ্ঠী ক্রমশ ক্ষুব্ধ হয়। ১৮৯৫ সালে পুনায় কংগ্রেস অধিবেশনের সময়ে সংস্কার-বিরোধী অংশ বিদ্রোহ করে এবং সোশ্যাল কনফারেন্সকে মণ্ডপ ব্যবহার করতে দিলে মণ্ডপ পুড়িয়ে দেওয়ার ভয় দেখায়। এর নেতৃত্বে ছিলেন তিলকের মতো ব্যক্তি, যিনি রাজনৈতিকভাবে চরমপন্থী, সামাজিকভাবে রক্ষণশীল ছিলেন এবং যাঁর উক্তি 'স্বরাজ আমার জন্মগত অধিকার' কংগ্রেসের কুলচিহ্নস্বরূপ। ওই বিদ্রোহ সফল হয় কারণ, সমাজ সংস্কারপন্থীরা তখন বিরোধীদের সঙ্গে লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। এই বিদ্রোহের একটা ফল হয়েছিল।[১] কংগ্রেস সমাজ সংস্কারের ব্যাপারে আর মাথা ঘামাবে না, এটা ঠিক হয়ে যায়।[২] এইজন্যই ১৮৯৫ সালের পর কোনও কংগ্রেস সভাপতিই তাঁর ভাষণে সমাজ সংস্কারের কথা উল্লেখ করেননি। ১৮৯৫-এর কাজের দ্বারা কংগ্রেস মূলত রাজনৈতিক সংস্থা হয়ে দাঁড়ায়, সামাজিক অন্যায়ের অবসানে এর ভূমিকা থাকে না।

তিন

এই পটভূমিকায় ১৯১৭ সালে অনুন্নত শ্রেণীদের বিষয়ে কংগ্রেসের গৃহীত প্রস্তাব এক বিচিত্র ঘটনাস্বরূপ। এর আগে ৩২ বছরের জীবনে কংগ্রেস এরকম কাজ করেনি। এটা কংগ্রেসের ঘোষিত নীতির পরিপন্থী।

---

১. কংগ্রেসের সংস্কারপন্থীরা যে এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণে উৎসাহী ছিলেন না, তা বুঝা যায় রানাডেকে লেখা সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জির চিঠিতে। কংগ্রেসের মণ্ডপ ব্যবহার সম্পর্কে তিলকের মন্তব্য সম্বন্ধে উনি লেখেন, 'আমাদের আলোচনায় সমাজ সংস্কার প্রশ্ন বাদ দেওয়ার যুক্তি হচ্ছে, এতে বিভেদ বেড়ে সংঘাত সৃষ্টি হবে, দল ভাগ রোধ করাই আমাদের লক্ষ্য। অন্য পক্ষের অনুরোধ খুব-ই অযৌক্তিক। কিন্তু বৃহত্তর ক্ষতি এড়াতে যুক্তিহীন দাবি মেনে নিতে হচ্ছে।'

২. কোনও কোনও সংস্কারপন্থী আবার এই বিদ্রোহ তথা সংস্কার সম্মেলন বিরোধিতাকে স্বাগত জানায়। দেওয়ান বাহাদুর আর.রঙ্গনাথ রাও রানাডেকে লেখেন যে, তিনি 'খুশি যে মণ্ডপ সমাজ সংস্কারপন্থীদের ব্যবহার করতে দেওয়া হয়নি, কারণ কংগ্রেস ইংরেজদের এই ধারণা দিয়েছে যে, তারা সমাজ সংস্কারপন্থীদের সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করে, এই মিথ্যা ফাঁস হয়ে গেছে। এখন ইংরেজরা বুঝবেন যে, কংগ্রেস সোশ্যাল কনফারেন্স-এর সঙ্গে কাজ করায় উৎসাহী নয়।'

১৯১৭ সালে এই প্রস্তাব গ্রহণের দরকার হল কেন? কিসের জন্য কংগ্রেস অন্ত্যজদের বিষয়ে সচেতন হল? এর থেকে কী ফায়দা তুলতে চাইল কংগ্রেস? কাদের বোকা বানাতে চাইল? দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনের জন্য, না কিছু সুদূরপ্রসারী উদ্দেশ্যে এই পরিবর্তন? এইসব প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে ১৯১৭ সালে বোম্বাইতে অনুষ্ঠিত অনুন্নত শ্রেণীদের দুটি সভার দুইজন পৃথক সভাপতির সভায় গৃহীত প্রস্তাব দেখতে হবে। প্রথম সভা হয়েছিল ১১ নভেম্বর, ১৯১৭। সভাপতি ছিলেন স্যার নারায়ণ চন্দ্রভারকার। সেই সভায় এই প্রস্তাব পাশ হয় :

'প্রথম প্রস্তাব — ব্রিটিশ সরকারের প্রতি আনুগত্য এবং মিত্রশক্তির জয়লাভের জন্য প্রার্থনা।'

'সংখ্যাগরিষ্ঠ সমর্থনে ১২ জনের বিরোধিতায় দ্বিতীয় প্রস্তাবে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস ও সর্বভারতীয় মুসলিম লীগের সুপারিশকৃত প্রশাসনিক সংস্কার পরিকল্পনা গৃহীত হয়।'

'সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত তৃতীয় প্রস্তাবে বলা হয়, ভারতের অনুন্নত শ্রেণীর মানুষের সংখ্যা বৃহৎ এবং তারা অন্ত্যজ হিসাবে গণ্য, এই অবিচারের দরুন তাদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। এবং যেহেতু এর জন্য তারা সমাজের অন্যান্য শ্রেণীর চেয়ে শিক্ষায় অনগ্রসর, উন্নতির সুযোগ গ্রহণে অক্ষম, অনুন্নত শ্রেণীর এই সভা মনে করে, সংস্কার ও বিধান পরিষদ পুনর্গঠন পরিকল্পনায় সরকার এইসব শ্রেণীর স্বার্থের বিষয় বিবেচনা করবে। সুতরাং এই সভা ব্রিটিশ সরকারের কাছে আবেদন করছে, তারা সহৃদয় হয়ে এই শ্রেণীর স্বার্থে বিধান পরিষদে এদের জনসংখ্যা অনুপাতে নিজস্ব প্রতিনিধি নির্বাচনের সুযোগ দেবে।'

সভায় সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত চতুর্থ প্রস্তাব হল : 'যে কোনও সম্প্রদায়ের সামাজিক উন্নতির জন্য তাদের মধ্যে শিক্ষার সর্বজনীন বিস্তার দরকার এবং অনুন্নত শ্রেণীর অনগ্রসরতা অশিক্ষা ও অজ্ঞতাজনিত, এই বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে সরকারের কাছে আবেদন, অবিলম্বে আবশ্যিক শিক্ষা চালু করা হোক।'

পঞ্চম প্রস্তাবে বলা হয়েছে : 'এই সভায় সভাপতিকে দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে, তিনি জাতীয় কংগ্রেসের কাছে অনুরোধ করুন আগামী অধিবেশনে যাতে ধর্ম ও রীতি অনুসারে অনুন্নত গোষ্ঠীর মানুষদের ওপর যেসব বৈষম্য ও বিধিনিষেধ আরোপিত, তার অবসান করে ভারতের সব মানুষের জন্য ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠাকল্পে

প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। কারণ, এইসব বিধি-নিষেধ অত্যন্ত অবমাননাকর ও নিপীড়নমূলক, এর দ্বারা এইসব শ্রেণীর মানুষদের বিদ্যালয়ে, হাসপাতালে, ন্যায় আদালতে, সরকারি অফিসে, সাধারণ জলাশয়ে প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ। এইসব অক্ষমতার উৎস সামাজিক, এর থেকেই আইন ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে শক্তিহীনতার জন্ম এবং বৈধভাবেই এইসব প্রশ্ন জাতীয় কংগ্রেসের রাজনৈতিক কার্যক্রমের অংশ হোক।'

ষষ্ঠ প্রস্তাবে বলা হয়েছে : 'উচ্চবর্ণের হিন্দু জাতগোষ্ঠীর কাছে আবেদন করা হোক। অনুন্নত শ্রেণীর অনগ্রসরতার কলঙ্ক দূর করার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা হোক। এরা নিজেদের মাতৃভূমিতেই জঘন্য অবমাননার শিকার।'

দ্বিতীয় সভাটিও হয় ১৯১৭ সালের নভেম্বর, প্রথম সভার সপ্তাহখানেক পর। সভাপতি ছিলেন জনৈক বাপুজি নামদেও, অব্রাহ্মণ পার্টির নেতা। ওই সভায় নিম্নোক্ত প্রস্তাব গৃহীত হয় :

১) 'ব্রিটিশ সিংহাসনের প্রতি আনুগত্য।'

২) '১১ নভেম্বর ১৯১৭ তারিখের সভায় গৃহীত ও ঘোষিত হলেও এই সভায় কংগ্রেস-লীগের পরিকল্পনা সমর্থন করতে পারে না।'

৩) 'এই সভার মনোভাব হচ্ছে, যতদিন না অনুন্নত শ্রেণীসমূহ দেশের প্রশাসনে যথার্থভাবে অংশ নিতে পারছে না, ততদিন প্রশাসন ব্রিটিশের নিয়ন্ত্রণে থাকা দরকার।'

৪) 'ব্রিটিশ সরকার যদি ভারতীয়দের হাতে কিছু রাজনৈতিক সুবিধা দেয়, এই সভা মনে করে, সরকারের উচিত, অন্ত্যজদের রাজনৈতিক ও নাগরিক অধিকার সুরক্ষায় তাদের নিজেদের প্রতিনিধি নির্বাচনের ব্যবস্থা করা।'

৫) 'এই সভা 'বহিষ্কৃত ভারত সমাজ' **(Depressed India Association)**-এর উদ্দেশ্য লক্ষ্য অনুমোদন করছে, এবং মন্টেগুর কাছে প্রদত্ত ডেপুটেশন সমর্থন করে।'

৬) 'এই সভা সরকারের কাছে আবেদন করছে, অনুন্নত শ্রেণীর বিশেষ প্রয়োজনীয়তা বিচারে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক করা হোক। অনুন্নত শ্রেণীর ছাত্রদের শিক্ষাবৃত্তি দানের ব্যবস্থা হোক।'

৭) 'এই সভা সভাপতিকে ক্ষমতা ন্যস্ত করছে, এই প্রস্তাব বোম্বাই সরকার ও ভাইসরয়ের কাছে পেশ করুন।'

এটা স্পষ্ট যে, নারায়ণ চন্দ্রভারকরের সভাপতিত্বে বোম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত অনুন্নত শ্রেণী সম্মেলনের প্রস্তাব এবং অনুন্নতদের উন্নয়নে কংগ্রেসের প্রস্তাব (১৯১৭) পরস্পর যুক্ত ছিল। এই আন্তঃ সম্পর্ক বুঝতে ১৯১৭-এর রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিচার করা দরকার। এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য যে, ১৯১৭ সালের ২০ আগস্ট ভারত সরকারের তদানীন্তন সচিব মন্টেগু ব্রিটিশ হাউস অব কমন্স-এ ব্রিটিশ সম্রাটের ভারত-বিষয়ক নীতি ঘোষণা করেন, মূলত ওই নীতি ছিল 'ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অংশ হিসাবে দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠার পথে স্বশাসিত সংস্থার ক্রমবিকাশ সাধন।' ভারতের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পক্ষ থেকে এ ধরনের এক নীতি ঘোষণা আশা করছিলেন এবং এই নীতির পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের সংবিধানের কাঠামোর প্রয়োজনীয় পরিবর্তনের পরিকল্পনা নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করছিলেন। যেসব পরিকল্পনার কথা চলছিল, তার মধ্যে দুটির প্রতি সাধারণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। একটার নাম 'উনিশের পরিকল্পনা' (Scheme of the Nineteen)। আরেকটি ছিল কংগ্রেস-লীগ পরিকল্পনা। তৎকালীন সাম্রাজ্যাধীন বিধান পরিষদের (Inperial Legislative Council) ১৯ জন সদস্য প্রথমটি রচনা করেন। দ্বিতীয়টি কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ সমর্থিত রাজনৈতিক সংস্কার। এটি 'লখনউ চুক্তি' নামে পরিচিত ছিল। এই দুটি পরিকল্পনাই ১৯১৬ সালে উদ্ভূত, অর্থাৎ মন্টেগুর ঘোষণার এক বছর আগে।

দুটির মধ্যে কংগ্রেস চাইছিল নিজের পরিকল্পনাটা রাজকীয় সরকার যাতে গ্রহণ করে নেয়। এই লক্ষ্য সামনে রেখেই কংগ্রেস এই কংগ্রেস-লীগ পরিকল্পনাকে জাতীয় দাবি হিসাবে প্রতিপন্ন করতে চাইছিল। ভারতের সব সম্প্রদায়ের সমর্থন পেলে এটা সম্ভব হত। মুসলিম লীগ এই পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল, কাজেই মুসলমান সম্প্রদায়ের সমর্থন আদায়ের সমস্যা ছিল না। এর পরে সংখ্যার দিক থেকে আসে অনুন্নত সম্প্রদায়গুলি। মুসলমানদের মতো সংগঠিত না হলেও তারা রাজনৈতিকভাবে সচেনত, প্রস্তাবগুলিই এর প্রমাণ। শুধু রাজনৈতিক সচেতন-ই নয়, তারা বরাবরই কংগ্রেস বিরোধী। ১৮৯৫ সালে তিলক যখন সোশ্যাল কনফারেন্সের সামাজিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে সম্মেলন অনুষ্ঠান কংগ্রেস মণ্ডপ-এ করতে দিলে মণ্ডপ জ্বালিয়ে দেওয়ার ভয় দেখান, অন্ত্যজরা তখন কংগ্রেসের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ ও কুশপুত্তলিকা দাহ করেন। তারপর থেকেই কংগ্রেসের বিরুদ্ধে মনোভাব সক্রিয় রয়েছে। ১৯১৭

সালে বোম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত অনুন্নত গোষ্ঠীদের সভাগুলিতে গৃহীত প্রস্তাবে প্রমাণিত হয় যে, কংগ্রেসের বিরুদ্ধে অনুন্নত গোষ্ঠীর মানুষদের কী তীব্র বিদ্বেষ। কংগ্রেস-লীগ পরিকল্পনার জন্য অনুন্নত সম্প্রদায়ের সমর্থন লাভে উৎসাহী কংগ্রেস জানত যে, তারা সমর্থন পাবে না। তখন কংগ্রেস অবশ্য এখনকার মতো মানুষদের কলুষিত করার কায়দা জানত না, তবে ভূতপূর্ব কংগ্রেস সভাপতি স্যার নারায়ণ চন্দ্রভারকর-এর সাহায্য নেওয়া হয়েছিল। ডিপ্রেসড ক্লাশেস মিশন সোসাইটি (Depressed Classes Mission Society)-র সভাপতি হিসাবে অনুন্নত সম্প্রদায়ের মানুষদের মধ্যে তাঁর প্রভাব ছিল। তাঁর প্রতি সম্মান ও প্রভাবের দরুন-ই অনুন্নত শ্রেণীর একাংশ কংগ্রেস-লীগ পরিকল্পনা সমর্থন করে।

প্রস্তাব থেকেই বুঝা যায়, কংগ্রেস-লীগ পরিকল্পনায় নিঃশর্ত সমর্থন দেওয়া হয়নি। সমর্থনের জন্য শর্ত ছিল, কংগ্রেস অন্ত্যজদের সামাজিক অক্ষমতা নিরসনকল্পে একটা প্রস্তাব নেবে। কংগ্রেসের প্রস্তাব অনুন্নত শ্রেণীসমূহের সঙ্গে কংগ্রেসের চুক্তির পরিণতি, স্যার চন্দ্রভারকর এই চুক্তির জন্য মধ্যস্থতা করেছিলেন। এর মধ্যেই অনুন্নতদের বিষয়ে কংগ্রেসের প্রস্তাবের (১৯১৭) উৎস নিহিত, চন্দ্রভারকরের মধ্যস্থতায় যে চুক্তি হয় তার সঙ্গে এর সম্পর্ক বুঝা যায়। এর থেকেই পরিষ্কার যে, কংগ্রেসের প্রস্তাবের পেছনে দুরভিসন্ধি ছিল। এই অভিসন্ধি ছিল আধ্যাত্মিক, এবং রাজনৈতিক।

কংগ্রেস প্রস্তাবের পরিণতি কী হল? অনুন্নত সম্প্রদায়ের প্রস্তাবে উচ্চবর্ণের কাছে আবেদন ছিল, উঁচু জাতের লোকেরা, যারা রাজনৈতিক অধিকার দাবি করছে, অনুন্নত সম্প্রদায়ের মানুষদের অবমাননার কলঙ্ক, নিজেদের দেশে জঘন্য আচরণাবধি নিষেধাজ্ঞার পরিস্থিতির অবসানে যথাযথ ব্যবস্থা নিক।' অনুন্নত শ্রেণীর এই দাবির ব্যাপারে কংগ্রেস কী করল? এদের সমর্থনের বিনিময়ে কংগ্রেসের উচিত ছিল অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে প্রচার, প্রস্তাবে নিহিত আবেগের প্রতি সম্মানজ্ঞাপনে এটাই ছিল পথ। কংগ্রেস কিছুই করেনি। প্রস্তাব গ্রহণ আন্তরিকতাহীন ব্যাপার ছিল। কংগ্রেস-লীগ পরিকল্পনার প্রতি সমর্থনের শর্তপূরণে কংগ্রেস এই প্রস্তাব নেয়। কংগ্রেসিরা অস্পৃশ্যতা এবং মানুষের প্রতি মানুষের অমানবিক আচরণের বিরুদ্ধে বিবেকদগ্ধ ছিলেন না। প্রস্তাব গ্রহণের পর সেদিনই তাঁরা প্রস্তাবের বিষয়টা ভুলে গেলেন। প্রস্তাবটি মৃত পত্রের মতো হয়ে যায়। এর থেকে কিছুই হয়নি।

এইভাবেই অস্পৃশ্যদের প্রতি কংগ্রেসের আচরণের প্রথম পর্বের ইতিহাস সমাপ্ত হয়।

অধ্যায় ২

এক কুৎসিত প্রদর্শনী : কংগ্রেসের নিজের পরিকল্পনা বাতিল

গান্ধী ভারতীয় রাজনীতিতে আসেন ১৯১৯-এ। কিছু সময়ের মধ্যেই তিনি কংগ্রেস দখল করে নেন। শুধু দখল-ই নয়, তিনি কংগ্রেসকে আমূল পালটিয়ে নতুন রূপ দেন। তিনটি মূল পরিবর্তন আনেন তিনি। পুরনো কংগ্রেসে বিধি প্রণয়নের বাধ্যবাধকতা ছিল না, প্রস্তাব গৃহীত হত, সেইভাবেই রেখে দেওয়া হত এই আশায় যে, ব্রিটিশ সরকার এ নিয়ে কিছু করবে। ব্রিটিশ সরকার কিছু না করলে পরের বছর কংগ্রেস আবার এক-ই প্রস্তাব নিত। বছরের পর বছর এই চলত। পুরনো কংগ্রেস মূলত বুদ্ধিজীবীদের সমাবেশস্থল ছিল। কংগ্রেস আন্দোলনে সাধারণ মানুষকে সহযোগী করার জন্য তাদের কাছে যেত না, কারণ গণ-কার্যক্রমে বিশ্বাস-ই ছিল না। গণ-আন্দোলন করার মতো সংগঠন, তহবিল কংগ্রেসের ছিল না। আমজনতাকে আকৃষ্ট করার জন্য বা ব্রিটিশের কাছে নিজেদের শক্তি প্রদর্শন করার জন্য বিরাট রাজনৈতিক সমাবেশ করায় বিশ্বাস ছিল না। নতুন কংগ্রেসে সব বদলে গেল। সদস্যপদ সবার জন্য উন্মুক্ত করে কংগ্রেস গণ-সংগঠন হয়ে উঠল। যে কেউ বছরে চার আনা দিলেই কংগ্রেসের সদস্য হতে পারেন। অসহযোগ ও সত্যাগ্রহের নীতি গ্রহণ করে গৃহীত প্রস্তাব কার্যকরী করার বাধ্যবাধকতা আনা হয়। এটা নীতি হয় যে, অসহযোগের ভিত্তিতে বিক্ষোভ প্রদর্শন ও আইন অমান্য করে কারাবরণ-এর কার্যক্রম রূপায়িত হবে। কংগ্রেসের পক্ষে দেশব্যাপী প্রচার ও সংগঠন গড়ে তোলা হয়। সামাজিক উন্নতির জন্য রচনাত্মক কর্মসূচি গৃহীত হয়। এসব কাজের জন্য ১ কোটি টাকার তহবিল গড়ে তোলা হয়। এর নাম ছিল তিলক স্বরাজ তহবিল। এভাবে ১৯১২ সালের মধ্যেই গান্ধী কংগ্রেসকে আমূল পালটিয়ে দেন। নাম ছাড়া আর সবকিছুতে পুরনো কংগ্রেসের সঙ্গে নতুন কংগ্রেসের আকাশ-পাতাল তফাত। সামাজিক উন্নতির জন্য গঠনমূলক কার্যক্রম কংগ্রেসের এক গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। ফেব্রুয়ারি, ১৯২২ বরদৌলিতে অনুষ্ঠিত কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে এর রূপলেখা রচিত হয়। এটি বরদৌলি কার্যক্রম হিসাবেও পরিচিত। প্রস্তাবে কর্মসূচির বিশদ বিবরণে বলা হয় :

'ওয়ার্কিং কমিটি সব কংগ্রেস সংগঠনকে নিম্নোক্ত কর্মসূচি গ্রহণের সুপারিশ করছে :

১) কংগ্রেসের এক কোটি সদস্য সংগ্রহ।

২) চরকা কাটা জনপ্রিয় করে তোলা এবং হাতে বোনা খদ্দর ও সুতি উৎপাদনে নিযুক্ত হওয়া।

৩) জাতীয় বিদ্যালয় সংগঠিত করা।

৪) দলিত শ্রেণীদের উন্নতি, জাতীয় বিদ্যালয়ে ছেলেমেয়েদের পাঠাবার জন্য উৎসাহিত করা। অন্য নাগরিকরা যেসব সাধারণ সুযোগ পায়, তা অর্জনের ব্যবস্থা করা।

৫) মদ্যপায়ীদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে মদ্যপান বর্জনের প্রচার সংগঠিত করা। পিকেটিং-এর চেয়ে মদ্যপায়ীর বাড়ির মধ্যে গিয়ে এর বিরুদ্ধে আবেদন করা।

৬) ব্যক্তিগত ঝগড়ার মীমাংসায় গ্রাম ও শহর পঞ্চায়েত সংগঠিত করা, জনমতের শক্তির ওপর ভরসা করা এবং পঞ্চায়েতের সিদ্ধান্তের সত্যনিষ্ঠতা দিয়ে তার প্রতি আস্থা অর্জন।

৭) সব শ্রেণী ও জাতির মধ্যে ঐক্য সদিচ্ছা প্রতিষ্ঠাই অসহযোগ আন্দোলনের মূল লক্ষ্য। অসুস্থতা বা দুর্ঘটনার সময়ে সবার শুশ্রূষার জন্য সমাজসেবা বিভাগ সংগঠিত করা।

৮) 'তিলক স্মারক স্বরাজ' তহবিল সংগ্রহ চালু রাখা এবং প্রতিটি কংগ্রেসকর্মী ও পৃষ্ঠপোষকদের কাছ থেকে তাদের আয়ের এক-দমাংশ ১৯২১ সালের মধ্যে আদায় করা। প্রতিটি প্রদেশ তিলক স্বরাজ তহবিল-এর আয়ের থেকে ২৫% নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটিকে প্রেরণ করবে।'

প্রস্তাবটি নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির ২০ ফেব্রুয়ারি, ১৯২২ দিল্লিতে অনুষ্ঠিত সভায় পেশ ও গৃহীত হয়। পুনর্গঠন কর্মের কার্যক্রম-এর পরিণতি কী হল, তা ব্যাখ্যা করার মাথাব্যাথা আমার নেই। আমার শুধু একটা বিষয়েই চিন্তা : অনুন্নত সম্প্রদায় সংক্রান্ত প্রশ্নে, এবং সে বিষয়েই আমি পর্যালোচনা করতে চাই।

অস্পৃশ্যদের বিষয়ে বরদৌলি প্রস্তাবের পরিণতি কী হল, সেই গল্প আমি বিস্তৃতভাবে তুলে ধরতে চাই। শুরুতেই বলা দরকার, বরদৌলি প্রস্তাবটি নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটিতে গৃহীত হয়েছিল। এবং সেটি রূপায়ণের জন্য ওয়ার্কিং

কমিটির কাছে পাঠানো হয়। ওয়ার্কিং কমিটির লখনউতে অনুষ্ঠিত জুন, ১৯২২-এর বৈঠকে বিষয়টি ওঠে। অস্পৃশ্যদের উন্নতি সংক্রান্ত বরদৌলি প্রস্তাবের সেই অংশটি নিয়ে ওয়ার্কিং কমিটি নিম্নোক্ত প্রস্তাব গ্রহণ করে :

'এই সভা দেশের সর্বত্র তথাকথিত অস্পৃশ্যদের উন্নতিকল্পে বাস্তব পরিকল্পনা রচনার জন্য স্বামী শ্রদ্ধানন্দজি, শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু এবং ইন্দুলাল যাজ্ঞিক, জি. বি. দেশপাণ্ডেকে নিয়ে এক কমিটি নিযুক্ত করছে। ওয়ার্কিং কমিটির আগামী বৈঠকে কমিটি তার সুপারিশ রাখবে ; এই কাজের জন্য ২ লক্ষ টাকা সংগ্রহের ব্যবস্থা হবে।'

ওয়ার্কিং কমিটির এই প্রস্তাব জুন, ১৯২২ লখনউর এ. আই. সি.সি-র সভায় পেশ করা হয় ও গৃহীত হয় একটি সংশোধনী সহ। সংশোধনে বলা হয়, 'পরিকল্পনার জন্য প্রস্তাবিত ২ লক্ষ টাকার জায়গায় ৫ লক্ষ টাকা এখনকার মতো সংগ্রহ করা হবে।'

ওয়ার্কিং কমিটি প্রস্তাবটি গ্রহণ করার আগেই অন্যতম সদস্য স্বামী শ্রদ্ধানন্দ পদত্যাগ করেন। ওয়ার্কিং কমিটির যে সভায় কমিটি নিয়োগের প্রস্তাব গৃহীত হয়, সেই সভায় এক-ই বিষয়ে আরেকটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় : 'স্বামী শ্রদ্ধানন্দজি'র ৮ জুন, ১৯২২ তারিখের পত্র পাঠ, অনুন্নত শ্রেণীর জন্য কাজের পরিকল্পনা রচনার জন্য আগাম কিছু টাকা দাবি। এই সভা প্রস্তাব করছে শ্রী গঙ্গাধর রাও, বি. দেশপাণ্ডে উপ-সমিতির আহ্বায়ক হিসাবে কাজ করুন এবং তিনি অবিলম্বে একটি সভা ডাকুন। স্বামী শ্রদ্ধানন্দের চিঠি সাব কমিটিতে পাঠিয়ে দেওয়া হোক।'

এই কৌতূহল উদ্দীপক প্রস্তাবের ইতিহাসে কমিটি গঠনের বিষয়টি দ্বিতীয় ধাপ হিসাবে গণ্য।

কমিটি নিয়োগ সম্পর্কে পরবর্তী উল্লেখ দেখা যায় জুলাই, ১৯২২-এ বোম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির কার্যবিবরণীতে। সেই সভায় প্রস্তাব হয় :

'সাধারণ সম্পাদক স্বামী শ্রদ্ধানন্দকে পদত্যাগপত্র পুনর্বিচার তথা প্রত্যাহারের জন্য অনুরোধ করুন, এবং অনুন্নত সম্প্রদায় উপ-সমিতির কাজ চালাবার জন্য আহ্বায়ক জি. বি. দেশপাণ্ডের কাছে ৫০০ টাকা দেওয়া হোক।'

এখানেই ব্যাপারটি শেষ হয়, ১৯২২ সালের মতো। আর কিছু করা হয়নি। ১৯২৩ এসে গেল। অস্পৃশ্যদের অবস্থার উন্নতিতে পরিকল্পনার কাজ কিছুই হয়নি

দেখে ওয়ার্কিং কমিটি জানুয়ারি ১৯২৩ সভায় বিষয়টি নিয়ে নিম্নোক্ত প্রস্তাব গ্রহণ করে :

'স্বামী শ্রদ্ধানন্দের পদত্যাগের বিষয়ে প্রস্তাব হল অনুন্নত সম্প্রদায় সাব কমিটির অন্যান্য সদস্যরা কমিটি গঠন করুন এবং শ্রীযাজ্ঞিক আহ্বায়ক হোন।'

তারপর আবার ওয়ার্কিং কমিটি বোম্বাইয়ে মে, ১৯২৩-এর সভায় প্রস্তাব নিল : 'প্রস্তাব করছে যে অস্পৃশ্যদের অবস্থার প্রশ্নটি ওয়ার্কিং কমিটির কাছে পেশ করা হোক যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য।'

বিশেষ কমিটির কাছে অস্পৃশ্যদের প্রশ্নটি পাঠাবার ব্যাপারে প্রস্তাবের ইতিহাসে দ্বিতীয় ধাপ এখানেই শেষ। তৃতীয় ধাপ হল বোম্বাইয়ে মে, ১৯২৩ ওয়ার্কিং কমিটির সভায় গৃহীত প্রস্তাব। প্রস্তাবটি ছিল : 'কংগ্রেসের নীতির প্রতিক্রিয়ায় তথাকথিত অস্পৃশ্যদের প্রতি আচরণে কিছু উন্নতি ঘটেছে বটে, কমিটি মনে করে, এ-ব্যাপারে আরও অনেক করণীয় আছে এবং অস্পৃশ্যতার ব্যাপারটি হিন্দু সম্প্রদায়ের বিষয় বলে কমিটি সর্বভারতীয় হিন্দু মহাসভাকে অনুরোধ করছে এই ব্যাপারটি সম্বন্ধে দায়িত্ব নিয়ে কাজ করুক, হিন্দুদের মধ্যে থেকে এই পাপ নিরসনের চেষ্টা করুক।'

এই হল প্রস্তাবের দুঃখজনক কাহিনী, এর শুরু ও শেষ। এক উজ্জ্বল শুরুর লজ্জাজনক পরিসমাপ্তি!

•

কংগ্রেস অস্পৃশ্যদের সমস্যার বিষয়ে কিভাবে দায়িত্ব ত্যাগ করেছিল তা বুঝা যাবে। হিন্দু মহাসভার ঘাড়ে দিয়ে ব্যাপারটি কাটা ঘায়ে নুনের ছিটের মতো করেছে। অস্পৃশ্যদের উন্নতির কাজে হিন্দু মহাসভার চেয়ে অযোগ্য আর কেউ নয়। এটি একটি জঙ্গি হিন্দু সংস্থা। এর মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে হিন্দুদের সাংস্কৃতিক ধর্মীয় সবকিছু রক্ষা করা। সমাজ সংস্কারের সংস্থা এটা নয়। মূলত রাজনৈতিক সংস্থা হিসাবে তারা ভারতীয় রাজনীতিতে মুসলমানদের প্রভাব রোধ করার লক্ষ্যে কাজ করে। এর রাজনৈতিক শক্তি অটুট রাখার জন্য এরা সামাজিক সংহতি বজায় রাখতে চায়, এবং সেই সংহতির স্বার্থে জাত বা অস্পৃশ্যতা নিয়ে তারা কিছু বলবে না। অস্পৃশ্যদের জন্য কাজ করার ব্যাপারে কংগ্রেস এদের কথা ভাবল কী করে সেটা আমার পক্ষে বুঝা দুষ্কর। এর থেকেই বুঝা যায়, কংগ্রেস এই অস্বস্তিকর সমস্যা থেকে রেহাই পেতে এবং এর দায়িত্ব ত্যাগ করতে চায়। অবশ্য হিন্দু মহাসভা এ-কাজ নিতে আসেনি, কারণ এর জন্য আগ্রহ নেই তাদের, কংগ্রেস একটা ভণ্ডামিপূর্ণ প্রস্তাবে এই কাজের জন্য অর্থ মঞ্জুর ছাড়াই তাদের কথা সুপারিশ করেছে। কাজেই

প্রকল্পটির কলঙ্কজনক সমাপ্তি হয়েছে।

এই অধ্যায় শেষ করার আগে কংগ্রেস অস্পৃশ্যদের সামাজিক উন্নতিসাধনের বিষয়ে ঢক্কানিনাদের পর কাজ বন্ধ করল কেন, সেটা অবধারণ করায় ক্ষতি নেই। কংগ্রেস বোধহয় চেয়েছিল প্রকল্পটি ২-৫ লক্ষ টাকার মধ্যে ছোট আকারের হবে। কিন্তু সেক্ষেত্রে স্বামী শ্রদ্ধানন্দকে কমিটিতে নিয়ে ভুল করল কেন? এবং স্বামীর বিশাল প্রকল্পের বিরুদ্ধে দ্বন্দ্বে আসার অবকাশ দিল কেন, কংগ্রেস তো জানত যে, ওই প্রকল্প গ্রহণ বা বাতিল করতে কংগ্রেস অক্ষম? কংগ্রেস বরং প্রথমে তাকে আহ্বায়ক[১] করতে অস্বীকার করে পরে কমিটি বাতিল করল এবং ওই কাজ হিন্দু মহাসভাকে দিল। এই উপসংহারের বিরুদ্ধে ছিল না পরিস্থিতি। স্বামী ছিলেন অস্পৃশ্যদের স্বার্থের সবচেয়ে বড় পৃষ্ঠপোষক ও প্রবক্তা। এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই যে, তাঁকে কাজ করতে দিলে তিনি এক বিরাট পরিকল্পনা দিতেন। কংগ্রেস যে কমিটিতে তাঁকে চায়নি এবং কংগ্রেসের ভয় ছিল তিনি অস্পৃশ্যদের স্বার্থ পূরণে কংগ্রেস তহবিলের বিরাট অংশ দাবি করবেন। কংগ্রেসের তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক মতিলাল নেহরুর সঙ্গে স্বামীর পত্র বিনিময়ে[২] (দ্রঃ পরিশিষ্ট) তা পরিষ্কার। এই উপসংহার যদি সঠিক হয় তবে কংগ্রেসের গৃহীত প্রস্তাব যে কত ভণ্ডামিপূর্ণ ছিল তা প্রকট হয়।

কংগ্রেস এই কর্মসূচি বাতিল করেছিল এটা বৈপ্লবিক ছিল বলে? প্রস্তাবটি কোনও অর্থেই বৈপ্লবিক ছিল না। ওয়ার্কিং কমিটি প্রস্তাবটির সংযোজনীতে যে নোট দেন তা থেকেই এটা পরিষ্কার, এ. আই. সি. সি-ও এটি অনুমোদন করে। নোটে বলা হয় :

'যেসব স্থানে অস্পৃশ্যদের বিরুদ্ধে সংস্কার বেশি সেখানে পৃথক বিদ্যালয় এবং পৃথক জলাধার রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে কংগ্রেসের তহবিলের টাকায়। সেইসব বিদ্যালয় থেকে শিশুদের জাতীয় বিদ্যালয়ে নিয়ে আসার চেষ্টা করতে হবে এবং লোককে বোঝাতে হবে যাতে অস্পৃশ্যরা সাধারণ জলাধার ব্যবহার করতে পারে।'

স্পষ্টতই, কংগ্রেস, অস্পৃশ্যতা উচ্ছেদের জন্য প্রস্তুত ছিল না। কংগ্রেস পৃথক

---

১. কংগ্রেস দেশপাণ্ডেকে আহ্বায়ক করতে উৎসাহী ছিল। এর থেকে পরিষ্কার, তারা ব্যাপারটি স্বামী শ্রদ্ধানন্দের হাতে ছেড়ে দিতে রাজি ছিল না। দেশপাণ্ডের মনোনয়নে বুঝা যায়, তারা এ বিষয়ে কিছু করতে উৎসাহী ছিল না, কারণ কট্টর ব্রাহ্মণ দেশপাণ্ডে অস্পৃশ্যদের উন্নতির ব্যাপারে উৎসাহহীন ছিলেন।

২. দ্রষ্টব্য: পরিশিষ্ট।

বিদ্যালয়, পৃথক জলাধারের নীতি গ্রহণ করেছে। এই প্রস্তাব অন্ত্যজদের অবস্থার উন্নতির জন্য কিছু করেনি। এমনকী এই দুর্বল ও নরম কার্যক্রমও কংগ্রেস রূপায়ণ করেনি, বরং নির্লজ্জভাবে তা বাতিল করেছে।

দুই

টাকা ছিল না বলে কি কংগ্রেস এই কর্মসূচি বাতিল করেছিল? ঘটনা এর বিপরীত। কংগ্রেস 'তিলক স্বরাজ তহবিল' শুরু করে ১৯২১-এ। কত টাকা সংগ্রহ হয়েছিল? নিচের সারণিতে কিছু ধারণা পাওয়া যাবে। জনসাধারণের দানে ১ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা সংগ্রহ হয়েছে। তহবিল সংগ্রহ হয়েছিল কংগ্রেসের প্রচার অভিযানের জন্য এবং বরদৌলি প্রস্তাব অনুযায়ী পুনর্গঠনমূলক কাজের জন্য। কংগ্রেস এই বিশাল অর্থ খরচ করেছে কীভাবে? ১৯২১, ১৯২২, ১৯২৩ এই তিন বছরে ওয়ার্কিং কমিটি যেসব কাজে অনুদান মঞ্জুর করেছে তার থেকে ধারণা পাওয়া যাবে এই খরচের ধরন।

সারণি - ১

তিলক স্বরাজ তহবিল*

জমা টাকা

	১৯২১	১৯২২	১৯২৩	মোট
	টা. আ. প.	টা. আ. প.	টা. আ. প.	টা. আ. প.
সাধারণ সংগ্রহ	১৯২১	১৯২২	১৯২৩	
সংযোজনী ১	৬৪,৩১,৭৭৯-১৫-১০	৩,৯২,৪৩০-২-৬½	২,৬৪,২৮৮-৯-১	৭০,৮৮,৪৯৮-১১-৫½
বিশেষ (সুনির্দিষ্ট)	৩৭,৩২,২৩০-২-১০½	৯,৪৫,৫৫২-১-৪½	৭,১০,৮০১-১০-৩	৫২,৮৮,৫৮৩-১৪-৬
দান বা অনুদান				
নং-২	১,০১,৬৪,০১০-২-৮½	১৩,৩৭,৯৮২-৩-১১	৯,৭৫,০৯০-৩-৪	১,২৪,৭৭০৮২-৯-১১½
সংযোজন: বিবিধ জমা, সুদ, অন্যান্য তহবিল, বন্যা, দুর্ভিক্ষ				৫,৪২,৩৩২-৫-৭½
প্রাদেশিক সদস্যভুক্তি, প্রতিনিধি, অনুমোদন ইত্যাদি ১৯২১-২৩				১,৩০,১৯,৪১৫-১৫-৭

I. ১৯২১-এর মঞ্জুরি

I. ওয়ার্কিং কমিটির কলকাতায় অনুষ্ঠিত জানুয়ারি ৩১-৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯২১-এর

* দি ইন্ডিয়ান অ্যানুয়াল রেজিস্ট্রার, ১৯২৩, পৃষ্ঠা ১১২।

সভায় অনুমোদিত অনুদান :

১. মহাত্মা গান্ধীর কাছে ১,০০,০০০ টাকা গচ্ছিত রাখা হবে আইন ব্যবসা পরিত্যাগকারী আইনজীবীদের সাহায্যের জন্য (প্রস্তাব IV).

২. চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারি প্রেরিত তারবার্তা, ৩১ জানুয়ারি ১৯২১ :

'সভায় যেতে না পারার জন্য দুঃখিত। তামিল, কেরল, কর্ণাটক আংশিক-এর জন্য সারাক্ষণের কর্মী নির্বাচিত, এর মধ্যে ৪০ জন আইনজীবী পেশা ছেড়েছেন। তিলক তহবিল সংগ্রহ মুলতুবি, মাসে ৫৬০০ টাকা নেওয়া হচ্ছে। ছাত্র আন্দোলন চলছে, সংবাদপত্রে খবর বেরুচ্ছে না। বাবা-মার বিরোধিতার বিরুদ্ধে দু'মাস চালাতে হবে। এর জন্য মাসে অন্তত ৩০০০ টাকা দিতে হবে। কমিটি অবিলম্বে স্বরাজ তহবিলের রসিদ করার কর্তৃত্ব দিক কংগ্রেসের নামে, খিলাফত রসিদের মতো বিভিন্ন পরিমাণ টাকার। তিন মাসের অগ্রিম পূরণের ব্যাপারে নিশ্চিত। বেশি টাকা মাদ্রাজ থেকে আশা নেই।'

প্রস্তাব করা হচ্ছে তামিল, কেরল, মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির অংশ কর্ণাটকের জন্য এককালীন অগ্রিম ৮৬০০ টাকা এক মাসের জন্য দেওয়া হোক এবং ভবিষ্যতের অগ্রিমের বিষয় আগামী ওয়ার্কিং কমিটির সভায় পেশ করা হোক (প্র XX).

II. বেজওয়ারায় ৩১ মার্চ-১ এপ্রিল, ১৯২১ অনুষ্ঠিত ওয়ার্কিং কমিটির সভায় অনুমোদিত মঞ্জুরি :

৩. প্রচার ও তহবিল সংগ্রহের কাজে যুক্তপ্রদেশ কংগ্রস কমিটির সম্পাদক পণ্ডিত মোহনলাল নেহরুকে এককালীন ৬০০০ টাকা অগ্রিম দেওয়া হোক (প্রঃ V).

৪. 'সভাপতি, সম্পাদক, কোষাধ্যক্ষের দফতরের এই বছরের বাকি সময়ের জন্য ১৭,০০০ টাকা মঞ্জুর করা হোক, এর থেকে মাসে ৩০০ টাকা রাজাগোপালাচারিকে দেওয়া হোক তাঁর সচিব ও স্টেনো-টাইপিস্টের জন্য (প্রঃ VII)।

৫. ডি. ভি. এস রাও, আমেরিকার 'ইণ্ডিয়া হোম রুল লীগ' (India Home Rule League), ১৪, ব্রডওয়ে নিউ ইয়র্কে ১০০ ডলার পাঠানো হোক (প্রঃ VIII)।'

III. ওয়ার্কিং কমিটির ৩১ জুলাই, ১৯২১, ১৮ নম্বর প্রস্তাবে অনুদানের জন্য সব আবেদন মঞ্জুর করার জন্য এক অনুমোদন সাব কমিটি গঠন করেন, তার সদস্য ছিলেন শ্রী গান্ধী, পণ্ডিত মতিলাল নেহরু, শেঠ যমুনালাল বাজাজ। কয়েকটি

বৈঠকে এই উপ-সমিতি নিম্নোক্ত অনুদান মঞ্জুর করে :—

৬. 'বিহারে স্বদেশীর কাজের জন্য ১ লক্ষ টাকা অনুদান এবং এক-ই কাজে ৪ লক্ষ টাকা ঋণ মঞ্জুর (প্রঃ i)।

৭. মধ্যপ্রদেশ (হিন্দুস্থানি) প্রাদেশিক কংগ্রেসের স্বদেশীর কাজের জন্য ৩৫০০০ টাকা ঋণ দেওয়া (ii)।

৮. যুক্তপ্রদেশে দুর্ভিক্ষ ত্রাণে ২৫,০০০ টাকা (iii)।

৯. দুর্ভিক্ষ ত্রাণ ও জাগরণ বিদ্যালয়ের জন্য পঞ্জাব প্রদেশ কংগ্রেসকে ২৫,০০০ টাকা।

১০. মালাবারে দুর্গতদের জন্য তারবার্তা যোগে সাহায্যের আবেদনে ৫০,০০০ টাকা (V)।

১১. গান্ধী আশ্রম, বারানসীর জন্য ১৫,০০০ টাকা (VI)।

১২. পল্লীপাড়ু আশ্রমের জন্য ১০,০০০ টাকা (VII)।

১৩. অন্ধ্র জাতীয় কলাশালা, মাসুলিপটমের জন্য ১৫,০০০ টাকা (VIII)।

১৪. কারজত (মহারাষ্ট্র) তালুক কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক ১০,০০০ টাকা (XX)।

১৫. অনাথ বিদ্যার্থী গৃহ, চিনচাওয়াও (মহারাষ্ট্র) ১০,০০০ টাকা (X)।

১৬. কে. জি. পাটাড়ে, সহকারী সাধারণ সম্পাদক, ডিপ্রেসড ক্লাসেস সোসাইটি অব ইন্ডিয়া, কুল্লাদলকুরিটি জাতীয় বিদ্যালয় (বিদ্যাসঙ্গম), রাজমুন্ডি ডিপ্রেসড ক্লাসেস মিশন, এদের আবেদনপত্র বাতিল হয় উপ-সমিতির নির্দেশাবলী অনুযায়ী না হওয়ার দরুন (XIII)।

১৭. চরকা ও খাদি বোনা জনপ্রিয় করার জন্য খরচ বাবদ কেরল প্রদেশ কংগ্রেসকে ১০,০০০ টাকা (XX)।

১৮. মাদ্রাজ প্রদেশ কংগ্রেসকে ৬০,০০০ টাকা (XXII)।

১৯. যুক্তপ্রদেশ কংগ্রেস কমিটির জন্য ১,৫০,০০০ টাকা (XXIII)।

২০. সিন্ধুপ্রদেশ কংগ্রেস কমিটির জন্য ৬৩,০০০ টাকা (XXIV)।

২১. অন্ধ্রের ছেড়ে দেওয়া জেলাগুলির দুর্ভিক্ষ ত্রাণে ২৫,০০০ টাকা (XXV)।

২২. মহারাষ্ট্র প্রদেশ কংগ্রেসের জন্য ২০,০০০ টাকা (XXVI)।

২৩. স্বদেশী, খাদি ও চরকা জনপ্রিয় করার কাজে গঞ্জাম জেলা কংগ্রেসকে ২০,০০০ টাকা (XVII)।

ওয়ার্কিং কমিটি ৬ নভেম্বর, ১৯২১ ছয় নম্বর প্রস্তাববলে উপ-সমিতি বাতিল করে এবং অনুদান মঞ্জুর নিজের হাতে গ্রহণ করে।

IV. ৩, ৫, ৬ নভেম্বর, ১৯২১ তারিখ ওয়ার্কিং কমিটির সভায় অনুমোদিত অনুদান :

'২৪. খদ্দর ও হাতে বোনা সুতার তুলো কেনার জন্য অসমের শ্রীফুকনকে ২৫,০০০ টাকা (IX)।

২৫. কৃষ্ণপুরম, গুন্টুর জেলা, অন্ধ্র ৫০০০ টাকা (X)।

২৬. অন্ধ্র জাতীয় কলাশালার জন্য বাড়তি ১০,০০০ টাকা (XI)।

২৭. রাজমুণ্ডি ডিপ্রেসভ ক্লাসেস মিশনকে ১০০০ টাকা (XII)।

২৮. অঙ্গালুর জাতীয় পরিশ্রমালয়ম ৫০০০ টাকা (XIII)।

২৯. কৌতরম্, অন্ধ্র ৩০০০ টাকা (XIV)।

৩০. সাধারণ স্বদেশী কাজের জন্য অন্ধ্রপ্রদেশ কংগ্রেস কমিটিকে ১৫,০০০ টাকা (XV)।

৩১. মাসুলিপট্টম জেলা কংগ্রেস কমিটি ৩০০০ টাকা (XVI)।

৩২. খাদি ও হাতে বোনা সুতোর নির্দিষ্ট কাজে উৎকল প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি ৩০,০০০ টাকা (XVII)।

৩৩. পেশা পরিত্যাগে ইচ্ছুক থানে জেলার তাড়ি নির্মাতাদের জন্য ৩০০০ টাকা (XVII)।

৩৪. নাগপুর তিলক বিদ্যালয় ৫০০০ টাকা (XIX)।

৩৫. নাগপুর অসহযোগাশ্রম ৫০০০ টাকা (XX)।

৩৬. খদ্দর ও চরকা কাটা জনপ্রিয় করার জন্য আজমের প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি ২৫,০০০ টাকা (XXI)।

৩৭. সম্ভব হলে গুজরাটকে ১৮,০০,০০০ টাকা, অথবা অন্তত ১০,০০,০০০ টাকা (XXII)।

৩৮. মালাবারের দুর্গতদের ত্রাণে রাজাগোপালাচারিকে অবিলম্বে ৪০,০০০ টাকা প্রেরণ (XXIII)।'

V. ২২-২৩ নভেম্বর ১৯২১ বোম্বাইয়ে ওয়ার্কিং কমিটির সভায় অনুমোদিত অনুদান :

'৩৯. জাঠ অ্যাংলো-সংস্কৃত হাই স্কুল, রোটাক, পঞ্জাব ১০,০০০ টাকা (III)।

৪০. দুর্ভিক্ষ ত্রাণ ও স্বদেশীর জন্য বিজাপুর জেলা কংগ্রেস কমিটি ২৫,০০০ টাকা (III)।

৪১. মাদ্রাজে ছাঁটাই হওয়া শ্রমিকদের স্বদেশী কাজে লাগাবার জন্য ৩০,০০০ টাকা সাহায্য (III)।'

II. ১৯২২ সালে অনুমোদন

I. ১৭ জানুয়ারি ১৯২২ বোম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত ওয়ার্কিং কমিটির সভায় অনুমোদন :

'৪২. যুক্তপ্রদেশ কংগ্রেস কমিটির ৫০,০০০ টাকার আবেদন ইতিমধ্যে অনুমোদিত। স্বদেশী কাজের জন্য আরও ১ লক্ষ টাকা চূড়ান্ত করতে বরাদ্দের বিষয়টি মহাত্মা গান্ধীর কাছে পেশ (II)।

৪৩. মঞ্জুরীকৃত ৫০,০০০ টাকার বকেয়া ২৫,০০০ টাকার জন্য অসম প্রদেশ কংগ্রেসের আবেদন মহাত্মা গান্ধীর কাছে প্রেরণ (VI)।'

II. ২৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯২২ দিল্লিতে অনুষ্ঠিত ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে অনুমোদন :

'৪৪. মহাত্মা গান্ধী রচিত বিদেশি প্রকল্পের প্রাথমিক খরচ বাবদ ১০,০০০ টাকা (i)।

৪৫. চলতি বছরের দফ্‌তর খরচ বাবদ ১৪,০০০ টাকা (II)।

III. ১৭-১৮ মার্চ, ১৯২২ আমেদাবাদে অনুষ্ঠিত ওয়ার্কিং কমিটির সভায় অনুমোদন সূচি :

'৪৬. খদ্দরের বেশি উৎপাদন ও বাজার তৈরির জন্য ৩,০০,০০০ টাকা (I)।

৪৭. যুক্তপ্রদেশ কংগ্রেস কমিটির জন্য মঞ্জুরীকৃত ৫০,০০০-এর ১০,০০০ টাকা (IX)।

৪৮. কংগ্রেসের সাধারণ কাজে কেরল প্রদেশ কংগ্রেসকে ৫০০০ টাকা ; মালাবারে ত্রাণকার্য বাবদ মঞ্জুরীকৃত ৮৪,০০০ টাকার থেকে এই টাকা বাদ যাবে, আরও ২০,০০০ টাকা বাদ হবে (X)।

৪৯. রোটাক অ্যাংলো-ভর্নাকুলার স্কুল ১০,০০০ টাকা (XI)।

৫০. অন্ধ্রের ছেড়ে দেওয়া জেলাগুলির দুর্ভিক্ষ ত্রাণ বাবদ মঞ্জুরি ২৫,০০০ টাকার থেকে ১৫,০০০ টাকার অন্ধ্রপ্রদেশ কংগ্রেস কমিটির প্রতিনিধিত্বকারী টি. প্রকাশনকে পাঠাতে হবে।

IV. ২০-২২ এপ্রিল, ১৯২২ কলকাতায় অনুষ্ঠিত ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে অনুমোদন :

'৫১. অন্ত্যজ কার্যালয়, আমেদাবাদ ৫০০০ টাকা। গুজরাটের অনুন্নত সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষা সংগঠিত করার জন্য (V)।

৫২. খদ্দরের কাজের জন্য মৌলবী বদরুল হাসান, হায়দ্রাবাদ, ২৫,০০০ টাকা ঋণ (VI)।

৫৩. ন্যাশনালিস্ট জার্নাল লিঃ-এর 'ইন্ডিপেনডেন্ট পত্রিকা' কংগ্রেসপন্থী হিসাবে পুনঃপ্রকাশের জন্য ২৫,০০০ টাকা ঋণ, ঋণ পরিশোধকাল পর্যন্ত সংস্থার সম্পত্তি ন্যস্ত থাকবে (IX)।'

V. ১২, ১৩, ১৪, ১৫ মে, ১৯২২ বোম্বাইয়ে ওয়ার্কিং কমিটির সভায় প্রস্তাবিত অনুদান :

'৫৪. অন্ত্যজ কার্যালয়, আমেদাবাদ আগের ৫০০০ ছাড়া বাড়তি ১৭,৩৮১ টাকা (X)।

৫৫. প্রস্তাবে বলা হচ্ছে, সাহদারা অনুন্নত শ্রেণীসমূহের পূনর্বাসনকল্পে পঞ্জাব প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির ১,২৫,০০০ টাকার জন্য আবেদন বিবেচনা করা হবে না যতক্ষণ না স্থানীয়ভাবে তহবিল সংগ্রহ করে প্রকল্পের কাজ শুরু হচ্ছে (XI)।

৫৬. প্রস্তাব করছে আহমেদনগর অনুন্নত শ্রেণীর মানুষদের আবাসন-এর জন্য ৫০০০ টাকা বরাদ্দ হোক। তবে ওয়ার্কিং কমিটি যখন নিশ্চিত হবে যে, স্থানীয়

চেষ্টায় আবাস-এর কাজ শুরু হয়েছে, তখনই টাকা দেওয়া হবে (XII)।

৫৭. শ্রীনিবাস আয়েঙ্গারের আবেদন অনুসারে মাদ্রাজের অনুন্নত সম্প্রদায়ের জন্য ১০,০০০ টাকা নির্দিষ্ট করা হবে, প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির মাধ্যমে এই আবেদন পাঠাতে হবে এবং প্রাদেশিক কমিটিকে নিশ্চিত হতে হবে যে, স্থানীয় প্রয়াসে সমপরিমাণ টাকা সংগৃহীত হয়েছে (XIII)।

৫৮. অন্ধ্রে অনুন্নত সম্প্রদায়ের লোকদের জন্য টি. প্রকাশনকে ৭০০০ টাকা (XXIV)।

VI. ৬, ৭, ১০ জুন, ১৯২২ লক্ষ্ণৌতে অনুষ্ঠিত ওয়ার্কিং কমিটির সভায় অনুদান :

'৫৯. সিন্ধু প্রদেশের খদ্দরের কাজের জন্য ৫০,০০০ টাকা (VII)।

৬০. বিবিধ ব্যয়ের অগ্রিম হিসাবে চক্রবর্তী রাজাগোপালচারিকে ১০০০ টাকা (VIII)।'

VII. ৩০ জুন, ১৯২২ দিল্লিতে অনুষ্ঠিত ওয়ার্কিং সভায় অনুদান :

'৬১. অসমে কর্মরত বাংলার ৬ জন কর্মীর জন্য আগামী তিন মাস মাসিক ১৮০ টাকা (VI)।'

VIII. ১৮-১৯ জুলাই, ১৯২২ বোম্বইয়ে অনুষ্ঠিত ওয়ার্কিং কমিটির সভায় অনুদান :

'৬২. অসমের জন্য ৫০০০ টাকা (I)।

৬৩. অন্ধ্র ও উৎকলে খাদির কাজের জন্য ১,৫০,০০০ টাকা প্রদেশপিছু (X)।'

IX. ১৮, ১৯, ২৫ নভেম্বর, ১৯২২ কলকাতায় অনুষ্ঠিত ওয়ার্কিং কমিটির সভায় অনুদান :

'৬৪. গুজরাটে অনুদান ৩,০০,০০০ টাকা (XII)।

৬৫. অসহযোগ তদন্ত কমিটির খরচের জন্য ১৬,০০০ টাকা (XXI)।'

III. ১৯২৩ সালে অনুদান

I. ১-২ জানুয়ারি, ১৯২৩ গয়ায় অনুষ্ঠিত ওয়ার্কিং কমিটির সভায় প্রস্তাবিত অনুদান :

'৬৬. অস্পৃশ্যতা নির্মূল এবং সহনশীলতা ও সাম্প্রদায়িক ঐক্য বৃদ্ধির জন্য সাধারণ সম্পাদক, ভারতের জাতীয় সমাজ সম্মেলন-এর ৩০০০ টাকা (XXII)।

৬৭. এলাহাবাদের হিন্দি দৈনিক নবযুগকে ১২০০ টাকা সাহায্য, এর শর্ত গয়ায় গৃহীত কংগ্রেস প্রস্তাবানুযায়ী প্রচার চালাবে ওই পত্রিকা (XXXI)।

৬৮. কংগ্রেস প্রচারকেন্দ্রের জন্য ১০,০০০ টাকা (XXXII)।'

II. ২৬, ২৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯২৩ এলাহাবাদে অনুষ্ঠিত ওয়ার্কিং কমিটির সভায় প্রস্তাবিত অনুদান :

'৬৯. তামিলদেশ প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি কর্তৃক অনুন্নত সম্প্রদায়ের পক্ষে কাজের জন্য ১০,০০০ টাকা (VI)।

৭০. পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর আবেদন অনুযায়ী উত্তরপ্রদেশ প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিকে ঋণ ১৫,০০০ টাকা (X)।

৭১. চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারির আবেদনক্রমে তামিলদেশ প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির জন্য অগ্রিম ১৫,০০০ টাকা (X)।

৭২. বারাণসী গান্ধী আশ্রমের জন্য উত্তরপ্রদেশ কংগ্রেস কমিটি ৫০০০ টাকা (XI)।'

III. ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮ মে, ১৯২৩ বোম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত ওয়ার্কিং কমিটির সভার মঞ্জুরীকৃত অনুদান :

'৭৩. দেশের বিভিন্ন প্রদেশে জমে থাকা উদ্বৃত্ত খাদি খালাস করার জন্য গুজরাট প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিকে ঋণ বাবদ ৫ লক্ষ টাকা (V)।

৭৪. খাদির কাজে বাংলা প্রাদেশিক কমিটিকে ঋণ বাবদ অগ্রিম ৫০,০০০ টাকা (VIII)।

৭৫. বিহার রাষ্ট্রীয় বিদ্যালয় ১৫,০০০ টাকা (XII)।

৭৬. সত্যবাদী বিদ্যালয় ১০,০০০ টাকা।

৭৭. স্বাবলম্বন রাষ্ট্রীয় পাঠশালা ৫০০০ টাকা (XIV)।

৭৮. কংগ্রেস শ্রমিক কমিটির সিদ্ধান্তানুসারী কাজ করার জন্য ডাঃ সাথায়েকে ৫০০০ টাকা (XXXIV)।'

IV. ৭, ৮, ১১, ১২ জুলাই, ১৯২৩ নাগপুর অনুষ্ঠিত ওয়ার্কিং কমিটির সভায় গৃহীত অনুদান :

'৭৯. মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে হিন্দুস্থানি শিক্ষাদানের জন্য হিন্দি সাহিত্য সম্মেলনের সম্পাদক শ্রীযুক্ত ব্রজরাজ ২০,০০০ টাকা (IX)।

৮০. নাগপুর সত্যাগ্রহের কাজে সাহায্য এবং কংগ্রেসের সাধারণ কাজে মধ্যপ্রদেশ প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি ২০০০ টাকা (XI)।'

এই বিভিন্ন খাতের ব্যয় থেকে কংগ্রেস জনসাধারণের টাকা অপচয় করেছে না সঠিকভাবে ব্যয় করেছে, তা সাধারণ পাঠক নাও বুঝতে পারেন। এই ব্যয় কি কোনও নীতি অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত হয়েছে? বিভিন্ন প্রদেশের দরকার অনুযায়ী কি বন্টন করা হয়েছে? নিচের সারণিগুলি থেকে তা বোঝা যাবে।

সারণি - ২

প্রদেশ	মঞ্জুরীকৃত অর্থ	জনসংখ্যা	মঞ্জুরির শতকরা অংশ জনসংখ্যা অনুপাতে	প্রদত্ত অনুদানের শতকরা
সারা ভারত (বর্মা ও করদ রাজ্য বাদ)	৪,৯৪,০০০	২২৭,২৩৮,০০০	—	১০
বোম্বাই	২৬,৯০,৩৮১	১৬,০১২,৬২৩	৮	৫৪.৩
মাদ্রাজ	৫,০৫,০০০	৪২,৩১৯,০০০	১৮	১০.১
বিহার ও ওড়িশা	৫,৬৫,০০০	৩৩,৮২০,০০০	১৫	১১.৩
যুক্তপ্রদেশ	৩,১১,২০০	৪৫,৩৭৬,০০০	২০	৬.২৬
সিন্ধু	১,১৩,০০০	৩,২৭৯,৩৭৭	—	২.২
অসম	৫১.০৮০	৬,৭৩৫,০০০	৩	১.১
বাংলা	৫০,০০০	৪৬,২৪১,০০০	২০	১.০
মধ্যপ্রদেশ	৪৭,০০০	১২,৭৮৩,০০০	৫	.৯৫

প্রদেশ	মঞ্জুরীকৃত অর্থ	জনসংখ্যা	মঞ্জুরির শতকরা অংশ জনসংখ্যা অনুপাতে	প্রদত্ত অনুদানের শতকরা
পঞ্জাব	৪৫,০০০	২০,৬৭৫,০০০	৯	.৯
হায়দ্রাবাদ	৪০,০০০	—	—	.৮১
আজমের	২৫,০০০	—	—	.৫
বিদেশি সাহায্য	১৪,০০০	—	—	.২৮
মোট	৪৯,৫০,৬৬১			

উৎস : সাইমন কমিশন রিপোর্ট, ১ম খণ্ড, ১৯২১

সাংস্কৃতিক অঞ্চল বা আয়তনের ভিত্তিতে কি টাকা বন্টন হয়েছিল? নিচের সংখ্যাগুলির তুলনা করা যাক :

সারণি - ৩

ভাষাগত অঞ্চল	মোট অনুদান টাকা	অনুদানের পরিমাণ টাকা	প্রদেশে অনুদানের অনুপাত	প্রদেশের জনসংখ্যা সংখ্যা অনুপাতে জনসংখ্যা শতকরা
বোম্বাই প্রেসিডেন্সি	২৬,৯০,৩৮১	—	—	১০০
গুজরাট	—	২৬,২২,৩৮১	৯৭.৪%	১৮
মহারাষ্ট্র	—	৪৩,০০০	১.৬	৬৯
কর্ণাটক	—	২৫,০০০	.৯৩	১৩
মধ্যপ্রদেশ সমূহ	৪৭,০০০	—	—	১০০
মারাঠি জেলাসমূহ	—	১০,০০০	২১.২	৪৫
হিন্দুস্থানি জেলাসমূহ	—	৩৭,০০০	৭৮.৭	৫৫
মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি	৫,০৫,০০০	—	—	১০০
তামিলনাদ	—	১,০৩,০০০	২০.৪	৩৮

ভাষাগত অঞ্চল	মোট অনুদান টাকা	অনুদানের পরিমাণ টাকা	প্রদেশে অনুদানের অনুপাত	প্রদেশের জনসংখ্যা সংখ্যা অনুপাতে জনসংখ্যা শতকরা
অন্ধ্র	—	৩,০২,০০০	৬০.০	৫২
কেরল	—	১,০০,০০০	১৯.৬	১০
বিহার ও ওড়িশা	৫৬৫,০০০	—	—	১০০
বিহার	—	৫,১৫,০০০	৯১	৭৩
ওড়িশা	—	৫০,০০০	৯	২৭

উপরের তথ্য থেকে এটা পরিষ্কার যে, কোনও বোধগম্য নীতির ভিত্তিতে টাকা বন্টন করা হয়নি। জনসংখ্যা ও অনুদানের পরিমাণে কোনও সম্পর্ক নেই। সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রগুলির দাবি ও অনুদানের মধ্যেও সম্পর্ক নেই। বোম্বাই-এর মতো দেড় কোটি জনসংখ্যার প্রদেশ পেল ২৭ লক্ষ টাকা, যুক্তপ্রদেশ ও মাদ্রাজ চার কোটি জনসংখ্যা সত্ত্বেও পেল ৫ লক্ষ টাকা করে। সাংস্কৃতিক একক হিসাবে অনুদান বিচার করা যাক। বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে তিনটি সাংস্কৃতিক ক্ষেত্র—মহারাষ্ট্র, গুজরাট, কর্ণাটক। মাত্র ১৮% জনসংখ্যার গুজরাট বোম্বাই প্রেসিডেন্সির মঞ্জুরির ৯৭.৪% অনুদান পেল। ৬৯% জনসংখ্যা সত্ত্বেও মহারাষ্ট্র পেল ১.৬% অর্থাৎ ৪৩,০০০ টাকা, কর্ণাটক ১৮% জনসংখ্যা নিয়ে পেল ২৫,০০০ টাকা বা .৯%। মধ্যপ্রদেশ হিন্দুস্থানি ভাষার জেলাগুলি ৫৫% জনসংখ্যা নিয়ে অনুদানের ৭৮.৯% বা ৩৭,০০০ টাকা পেল। মারাঠি জেলাগুলি ৪৫% জনসংখ্যা নিয়ে পেল ২১.২% বা ১০,০০০ টাকা। বিহার ও ওড়িশার মোট ৫ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকার মধ্যে বিহার পেল ৫ লক্ষ ১৫ হাজার বা ৯১% মোট জনসংখ্যার ৭৮% জনসংখ্যা নিয়ে। ওড়িশা ২৭% জনসংখ্যা নিয়ে মাত্র ৯% বা ৫০ হাজার টাকা পেল। মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতেও একইভাবে বৈষম্য করা হয়েছে।

শুধু নীতিহীনতাই নয়, তহবিল বন্টনে নির্লজ্জ স্বজনতোষণ হয়েছে। তিন বছর মোট ৪৯.৫ লক্ষ টাকা বন্টনের মধ্যে গান্ধীর প্রদেশ গুজরাটই পেয়েছে ২৬.৫ লক্ষ টাকা বাকি সারা দেশ পেয়েছে ২৮ লক্ষ টাকা। এর অর্থ ২৯.৫ লক্ষ জনসংখ্যা পেয়েছে ২৬.৫ লক্ষ টাকা, বাকি ২৩ কোটি ভারতবাসী পেল ২৩ লক্ষ টাকা!

এ-ব্যাপারে কোন নিয়ন্ত্রণ বা বাধা ছিল, কাদের কিসের জন্য টাকা দেওয়া হচ্ছে কেউ জানত না। নিচের দৃষ্টান্ত তুলে ধরা যাক :

সারণি - ৪

টাকা বরাদ্দ, কিন্তু ব্যক্তিগত হেফাজতে গচ্ছিত, কোনও নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য উল্লেখ নেই		কোনও উদ্দেশ্য বা জামিনদার ছাড়া টাকা মঞ্জুর	
	টাকা		টাকা
মৌলবী বদরুল হোসেন	- ৪০,০০০	গুজরাটকে	৩,০০,০০০
টি প্রকাশন	- ৭০০০	গুজরাটকে	১৮,০০,০০০
সি. রাজাগোপালাচারি	- ১০০০	গুজরাটকে	৩,০০,০০০
ব্রজরাজ	- ২০,০০০		
গান্ধী	-১,০০,০০০		

এই বিরাট পরিমাণ টাকা ব্যক্তিবিশেষকে দেওয়ার বিষয় হিসাবে দেখানো হয়েছে কি না, বা অনামা ব্যক্তিদের জন্য দেয় টাকা কে নিয়েছে সেটা জানা যায়নি। এসব প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর থাকলেও এটা নিঃসন্দেহ যে, অপচয় ও আড়ম্বরপূর্ণ ব্যয় কত হয়েছে তা বার করা শক্ত হবে। এটা অত্যন্ত দুঃখজনক ঘটনা যে, কংগ্রেসের নীতিবাগীশ নেতৃবৃন্দ বিবেক বিসর্জন দিয়ে নিজেদের কেন্দ্র পরিযেবায় জনসাধারণের টাকা নয়ছয় করেছেন।

পরবর্তী বছরগুলিতে কংগ্রেসিরা বাকি ১.৩ কোটি টাকা কীভাবে সংগঠিত ভাবে লুঠ করেছে, তা অনুসন্ধানের প্রয়োজন নেই। এটা বলাই যথেষ্ট যে, এর আগে কখনও এভাবে সংগঠিত লুঠ হয়নি। একটা বিষয় বুঝা দরকার, এই অনুদান তালিকা বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, যে স্বরাজ তহবিল অন্ত্যজদের উন্নতির জন্য বন্টনের কথা ছিল, তার কোনও উল্লেখ নেই। কংগ্রেসের কাছে এটা আশা করা হয়েছিল, কংগ্রেসিরা স্বরাজ তহবিল-এর প্রথম লক্ষ্য হিসাবে অন্ত্যজদের উন্নতির বিষয়টি রাখবেন। প্রথম না হলেও অন্যতম লক্ষ্য হিসাবে রাখা উচিত ছিল, বিশেষ করে যখন মক্কেলহীন উকিলদের ভরণ-পোষণের জন্য হাজার হাজার টাকা

দেওয়া হয়েছে। অনুসন্ধান করে দেখা হয়নি তাদের পসার ছিল কিনা, বা তারা আদৌ পেশা ছেড়েছেন কিনা। তাড়ি প্রস্তুতকারকদের পেছনে হাজার হাজার টাকা খরচ হয়েছে এবং আরও বহু কিম্ভূতকিমাকার প্রকল্পে টাকার অপচয় হয়েছে। কংগ্রেস তা হিসাবে রাখেনি। বরং অন্ত্যজদের উন্নয়নের জন্য পৃথক তহবিল গঠনের কথা বলেছে। এই পৃথক অন্ত্যজদের তহবিলের মাত্রা কী ছিল? নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি এর জন্য ৫ লক্ষ টাকা ধার্য করে। ওয়ার্কিং কমিটি আবার এই টাকা অন্ত্যজদের উন্নতির জন্য অতিরিক্ত মনে করে তা দু'লক্ষ টাকা করে। ৬ কোটি অন্ত্যজদের জন্য ২ লক্ষ টাকা!!

অস্পৃশ্যদের উদ্ধারের জন্য কংগ্রেস মোট এই টাকা বরাদ্দ করে। এর কতটা আসলে পাওয়া গিয়েছিল? নিচের সারণি দেখুন :

সারণি - ৫

উদ্দেশ্য	বরাদ্দীকৃত টাকা
রাজামুন্দ্রি ডিপ্রেসড ক্লাস মিশন	১,০০০
অন্ত্যজ কার্যালয়, আহমেদাবাদ	৫,০০০
অন্ত্যজ কার্যালয়, আহমেদাবাদ	১৭,৩৮১
ক্লাশেস ওয়ার্ক ইন অন্ধ্র ন্যাশনাল সোশ্যাল ডিপ্রেসড ক্লাসেস ওয়ার্ক ইন অন্ধ্র	৭,০০০
ন্যাশনাল সোশ্যাল কনফারেন্স ফর ডিপ্রেসড ক্লাসেস ওয়ার্ক	৩,০০০
তামিল জেলা পি.সি.সি. ফর ডিপ্রেসড ক্লাসেস ওয়ার্ক	১০,০০০
	মোট - ৪৩,৩৮১

সারকথা হল, কংগ্রেস পুনর্গঠন কর্ম তথা বরদৌলি কর্মসূচির মোট ৪৯.৫ লক্ষ টাকার মধ্যে অন্ত্যজদের উন্নতির জন্য মাত্র ৪৩,৩৮১ টাকা বরাদ্দ করতে সমর্থ হয়েছিল। এর চেয়ে বড় ফাঁকিবাজি কী হতে পারে? অন্ত্যজদের জন্য কুম্ভীরাশ্রু বিসর্জনকারী কংগ্রেসের অন্ত্যজপ্রেম কোথায় গেল? তাদের উন্নয়নে কংগ্রেসের সদিচ্ছা কোথায়? অন্ত্যজদের ব্যাপারে বরদৌলি প্রস্তাব কংগ্রেসের একটা প্রতারণা বলা কি

অন্যায় হবে?

অবশ্য একটা প্রশ্ন আসবেই। অন্ত্যজদের ব্যাপারে কংগ্রেস শিবিরে যখন এসব ব্যাপার ঘটছে, তখন শ্রী গান্ধী কোথায় ছিলেন? এই প্রশ্ন খুব-ই প্রাসঙ্গিক, কেননা কংগ্রেসে আসার পর থেকে গান্ধী জোর দিয়ে বলছেন, স্বরাজ অর্জনের সঙ্গে অস্পৃশ্যতা নিরসনের সম্পর্ক রয়েছে। গান্ধীর মুখপত্র 'ইয়ং ইন্ডিয়া'-তে ৩রা নভেম্বর, ১৯২১ তিনি লিখছেন :

'কর্মসূচিতে অস্পৃশ্যতাকে গৌণ স্থান দিলে চলবে না। এই কলঙ্কের অবসান ছাড়া স্বরাজ নিরর্থক। কর্মীরা এই কাজ করতে সামাজিক বর্জন, জনসমক্ষে নিন্দার নীতি নেবে। স্বরাজ অর্জনের পথে অস্পৃশ্যতা নিরসনকে আমি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে মনে করি।'

সেইমতো তিনি অন্ত্যজদের ব্রিটিশের সঙ্গে হাত না মেলাবার জন্য মিনতি করছেন। কিন্তু হিন্দুদের স্বার্থে কাজ করে স্বরাজ অর্জন করতে চাইছেন। 'ইয়ং ইন্ডিয়া' তে ২০ অক্টোবর, ১৯২০ শ্রী গান্ধী এক নিবন্ধে অন্ত্যজদের উদ্দেশ্য করে বলছেন :

'জাতীয় নিপীড়িতদের কাছে তিনটি পথ খোলা রয়েছে। ধৈর্যহীনতার জন্য তারা দাস-মালিক সরকারের সহযোগিতা চাইতে পারে। সেটা তারা পাবে। কিন্তু এতে তারা গরম চাটু থেকে জ্বলন্ত উনুনে পড়বে। এখন তারা দাসেরও দাস। সরকারের সাহায্য চাইলে তারা তাদের আত্মজনদের নিপীড়নে ব্যবহৃত হবে। পাপের শিকার হওয়ার পরিবর্তে তারা নিজেরা পাপী হবে। মুসলমানরা সেই চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছে। তারা দেখল, এতে তাদের অবস্থা আরও খারাপ হয়েছে। শিখরা অনিচ্ছাকৃতভাবে তাই করে ব্যর্থ। বর্তমানে ভারতে শিখদের মতো অসন্তুষ্ট সম্প্রদায় নেই। সুতরাং সরকারি সাহায্য কোনও সমাধান নয়।

দ্বিতীয় বিকল্প, হিন্দুধর্ম ত্যাগ এবং ইসলাম বা খ্রিস্টান ধর্মে সদলবলে ধর্মান্তর গ্রহণ। এবং ধর্মান্তর করে যদি ব্যবহারিক উন্নতি সম্ভব হত, আমি বিনা দ্বিধায় তা সুপারিশ করতাম। কিন্তু ধর্ম অন্তরের ব্যাপার। কোনও দৈহিক অসুবিধার জন্য নিজধর্ম ত্যাগ অভিপ্রেত নয়। পঞ্চমদের প্রতি অমানুষিক ব্যবহার যদি হিন্দুধর্মের অংশ হয়, তবে তাদের এবং আমার মতো ধর্মে অন্ধে ভক্তির বিরোধীদের কর্তব্য হচ্ছে পবিত্র ধর্মের নামে সব ধরনের কু-প্রথার অবসানে তৎপর হওয়া। কিন্তু আমার বিশ্বাস, অস্পৃশ্যতা হিন্দুধর্মের অংশ নয়। বরং এই ক্ষত যে-কোনও উপায়ে নির্মূল করা দরকার। এবং হিন্দুধর্মের এই কলঙ্কমোচনে বহু হিন্দু সংস্কারপন্থী তৎপর

হয়েছেন। আমার মতে, ধর্মান্তর গ্রহণ কোনও সমাধান নয়। এছাড়া আত্মসাহায্য ও স্বনির্ভরতার পথ আছে, অপঞ্চম হিন্দুরা এর সাহায্যে নিজেদের পন্থা ঠিক করবে। এবং এখানেই অসহযোগের ব্যবহার প্রশ্ন আসছে... সুতরাং হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে যতদিন না তাদের ক্ষোভ প্রশমিত না হয়, পঞ্চমরা ততদিন অন্যান্য হিন্দুদের সঙ্গে সম্পর্ক ও যোগাযোগ ছিন্ন রাখতে পারে। কিন্তু এটা সংগঠিত বুদ্ধিদীপ্ত চেষ্টা। আমি যতদূর জানি, পঞ্চমদের মধ্যে এমন কোনও নেতা নেই, যিনি অসহযোগের মাধ্যমে জয় অর্জন করতে পারেন।

কাজেই পঞ্চমদের পক্ষে এর চেয়ে শ্রেয় পথ হবে জাতীয় আন্দোলনে যুক্ত হওয়া, বর্তমান সরকার উচ্ছেদ করে দাসত্ব মোচনের এই আন্দোলন চলছে। পঞ্চম বন্ধুদের পক্ষে এটা বুঝা সহজ হবে যে, এই দুষ্ট সরকারের বিরুদ্ধে অসহযোগ সফল করতে ভারতীয় জাতির বিভিন্ন অংশের মধ্যে সহযোগিতা দরকার।'

ওই এক-ই নিবন্ধে গান্ধী হিন্দুদের বলেন :

'হিন্দুদের বুঝতে হবে যে, সরকারের বিরুদ্ধে অসহযোগ সফল করতে হলে তাদের পঞ্চমদের সঙ্গে হাত মেলাতে হবে, যদিও তারা মুসলমানদের সঙ্গে একজোট হয়েছে।'

ইয়ং ইন্ডিয়ায় ২৯ ডিসেম্বর, ১৯২০ তিনি এক-ই সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন 'সরকারের বিরুদ্ধে অসহযোগ' মানে শাসিতদের মধ্যে সহযোগিতা, এবং হিন্দুরা অস্পৃশ্যতার পাপ দূর না করলে এক বা একশো বছরেও স্বরাজ আসবে না..... হিন্দু-মুসলমান ঐক্য ছাড়া যেমন স্বরাজ অর্জন সম্ভব নয়, অস্পৃশ্যতার পাপ দূর না করলেও স্বরাজ আসবে না।'

এইসব থেকে আশা করা যায়, গান্ধী অস্পৃশ্যদের অবস্থার উন্নতিকল্পে গৃহীত বরদৌলি প্রস্তাব রূপায়ণে কংগ্রেসের নীতি কার্যকর করার জন্য তৎপর হবেন। ঘটনা হচ্ছে, গান্ধী অনেক সদিচ্ছা প্রকাশ করলেও অন্ত্যজদের উন্নতির ব্যাপারে ন্যূনতম উৎসাহ দেখাননি। তাঁর সেই মানসিকতা থাকলে তিনি আরও একটি কমিটি নিয়োগ করতে পারতেন, তিলক স্বরাজ তহবিলের বিরাট অপচয়, লুঠ বন্ধ করে অন্ত্যজদের উন্নতির কাজে লাগাতে পারতেন। বিচিত্র মনে হলেও তিনি চুপচাপ ও অনীহ ছিলেন। কোনও অনুশোচনার ভাব প্রকাশ করার পরিবর্তে গান্ধী অন্ত্যজদের ব্যাপারে নিজের অনীহা যুক্তিসিদ্ধ করার জন্য এমন কথা বলেন, যা অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে অনেকের কাছে। ২০ অক্টোবর, ১৯২০ ইয়ং ইন্ডিয়া-তে রয়েছে :

'ইংরেজদের হাত ধুতে বলার আগে কি আমরা হিন্দুরা নিজেদের রক্ত সিক্ত হাত ধোব? এটা একটা উপযুক্ত প্রশ্ন নিশ্চয়ই। দাস, জাতির কোনও সদস্য যদি অনুন্নত শ্রেণীর মানুষদের দাসত্বমুক্ত করতে পারে, নিজের দাসত্ব থেকে মুক্ত করতে পারে, তবে আমি আজ তাই করব। কিন্তু এ এক অসম্ভব দায়িত্ব। ঠিক কাজ করার স্বাধীনতাও একজন দাসের নেই।'

গান্ধী উপসংহার বলছেন : 'সেই প্রক্রিয়া আরম্ভ হয়েছে, এবং পঞ্চমরা এতে স্বেচ্ছায় যোগ দিক বা না দিক, এদের অবজ্ঞা করার সাহস হিন্দুদের হবে না, অবজ্ঞা করলে হিন্দুদের নিজেদেরই ক্ষতি। সেজন্য পঞ্চমদের সমস্যা আমার কাছে জীবনের মতোই মহার্ঘ, জাতীয় অসহযোগে সর্বাত্মক দৃষ্টি দিতে পেরে আমি সন্তুষ্ট। আমি নিশ্চিত যে, বৃহত্তর অংশে ক্ষুদ্রতরও যুক্ত।'

এভাবেই অন্ত্যজদের জন্য কংগ্রেসের কর্মকাণ্ডের সমাপ্তি। এই বিয়োগান্ত নাটকের দুঃখজনক দিক হল, গান্ধীও কীভাবে মোহজালে আবিষ্ট হয়ে গেলেন সেটা অনুভব করা গেল। গান্ধী মায়ার জগতে থাকতে চান কিনা সন্দেহ। কিন্তু এটা নিঃসন্দেহ যে, তাঁর লালিত প্রস্তাব যুক্তিসিদ্ধ করার জন্য গান্ধী মোহজাল সৃষ্টি করতে চান। অন্ত্যজদের উন্নতির জন্য ব্যক্তিগত দায়িত্ব গ্রহণে অস্বীকার করার যে যুক্তি দেন তা গান্ধীর এই মোহসৃষ্টির অভ্যাসের দৃষ্টান্তস্বরূপ। হিন্দুদের বিরুদ্ধে কিছু না করার জন্য অন্ত্যজদের বলা, কারণ তাতে তাদের নিজের আত্মীয়স্বজনদের বিরুদ্ধে কাজ হবে, এটা বোঝা যায়। কিন্তু হিন্দুরা অন্ত্যজদের আত্মীয়স্বজন বলে ভাবছে, এটা বলার অর্থ মোহসৃষ্টি। অস্পৃশ্যতা নিরসনের জন্য হিন্দুদের বলা একটা সুপরামর্শ। কিন্তু নিজেদের এই বলে প্রবোধ দেওয়া ভুল যে, অস্পৃশ্যদের প্রতি অমানবিক ব্যবহারে হিন্দুরা লজ্জিত হয়ে অস্পৃশ্যতা নিরসনে সচেষ্ট হবে এবং এই কাজে বহু হিন্দু সংস্কারকে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। অন্ত্যজদের বোকা বানাবার জন্য এটা একটা মিথ্যা ছল-স্বরূপ, সারা পৃথিবীকে এভাবে বিভ্রান্ত করা ভুল। যুক্তির দিক থেকে এটা সহজ বোধ যে, সমগ্রের পক্ষে মঙ্গল অংশের পক্ষেও মঙ্গল এবং সেজন্য শুধু অংশে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখা ঠিক নয়। কিন্তু, অন্ত্যজদের মতো পৃথক অংশ হিন্দু সমষ্টির অংশ মনে করা আত্মপ্রবঞ্চনা ছাড়া কিছু নয়। গান্ধীর মোহসৃষ্টির জন্য দেশ এবং অন্ত্যজদের কী করুণ পরিণতি হয়েছে তা কম লোকই জানেন।

অধ্যায় ৩

একটি জঘন্য চুক্তি
কংগ্রেস ক্ষমতা ছাড়তে নারাজ

এক

ভারত শাসন আইনের (১৯১৯) একটি ধারায় দশ বছর অন্তর রাজকীয় কমিশন (Royal Commission) নিয়োগ করার ব্যবস্থা রয়েছে, এই কমিশন সংবিধান-এর বাস্তব প্রয়োগ ও প্রয়োজনীয় পরিবর্তন বিষয়ে রিপোর্ট দেবে। সেইমতো ১৯২৮ সালে স্যার জন সাইমনকে সভাপতি করে রাজকীয় কমিশন নিযুক্ত হয়। ভারতীয়রা আশা করেছিলেন, এর গঠন হবে মিশ্র চরিত্রের। কিন্তু ভারত-সচিব লর্ড বার্কেনহেড এই কমিশনে ভারতীয়দের অন্তর্ভুক্ত করার বিরোধী ছিলেন এবং একে একটি সংসদীয় কমিশন রূপে রাখতে চান। এতে কংগ্রেস ও উদারপন্থীরা অপমানিত বোধ করেন। তাঁরা কমিশন বর্জন ও বিরুদ্ধে বিক্ষোভ সংগঠিত করেন। এই ক্ষোভ প্রশমনে সম্রাটের সরকার ঘোষণা করে যে, কমিশনের কাজ সম্পূর্ণ হওয়ার পর ভারতীয় প্রতিনিধিরা ভারতের নতুন সংবিধানের ব্যাপারে আলোচনার জন্য সমবেত হবেন। এই ঘোষণা অনুসারে প্রতিনিধিত্বকারী ভারতীয়দের লন্ডনের 'গোল টেবিল বৈঠকে' সংসদের প্রতিনিধি ও সরকারের সঙ্গে আলোচনায় যোগ দেওয়ার জন্য আহ্বান জানানো হয়।

১২ নভেম্বর, ১৯৩০ মহামান্য সম্রাট প্রয়াত রাজা পঞ্চম জর্জ ভারতীয় 'গোল টেবিল বৈঠক' উদ্বোধন করেন। এই সম্মেলনের তাৎপর্য হল, ভারতের সংবিধান রচনার ব্যাপারে ভারতীয়দের আলোচনার অধিকার স্বীকৃত হয়। অন্ত্যজদের পক্ষে এ এক ঐতিহাসিক ঘটনা। কারণ সেই প্রথম অন্ত্যজদের পক্ষে এই লেখক ও দেওয়ান বাহাদুর আর. শ্রীনিবাসন পৃথক প্রতিনিধি হন। এর অর্থ, অন্ত্যজরা হিন্দুদের থেকে পৃথক বলে গণ্য হল এবং ভারতের সংবিধান রচনায় তাদের আলোচনায় যোগ দেওয়ার অধিকার স্বীকৃত হল।

সম্মেলনের কাজ নয়টি কমিটির মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়। এর একটি হল সংখ্যালঘু কমিটি। সাম্প্রদায়িক প্রশ্নের মতো সবচেয়ে কঠিন সমস্যার সমাধানের দায়িত্ব দেওয়া হয় এই কমিটিকে। এটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কমিটি বিবেচনা করে

প্রধানমন্ত্রী স্বঃ র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড নিজে এর সভাপতি হন। সংখ্যালঘু কমিটির সভা-বিবরণী অন্ত্যজদের পক্ষে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, কংগ্রেস ও অন্ত্যজদের মধ্যে কী ঘটনা হয়েছিল যার জন্য উভয়ের মধ্যে তিক্ততার সৃষ্টি, তার সব বিবরণ এতে আছে। 'গোল টেবিল বৈঠক' অন্ত্যজদের ছাড়া অন্যান্য সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক দাবি পূরণ করেছিল, এটা বহুজনবিদিত। ১৯১৯-এর সংবিধানে এরা বিধিবদ্ধ সংখ্যালঘু হিসাবে স্বীকৃত এবং তাদের সুরক্ষা ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা ছিল। তাদের ক্ষেত্রে এই ব্যবস্থার সম্প্রসারণ বা পরিবর্তনের প্রশ্ন ছিল। অনুন্নত শ্রেণীর মানুষদের ক্ষেত্রে স্থিতি ছিল ভিন্ন। সংবিধানের পূর্ববর্তী 'মন্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড রিপোর্টে' পরিষ্কার বলা আছে যে, এদের জন্য নিরাপত্তার ব্যবস্থা থাকবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত যখন সংবিধানের বিস্তারিত অবয়ব রচিত হয়, ভারত সরকারের পক্ষে এদের সুরক্ষার জন্য কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ শক্ত পরিগণিত হয়। ব্যতিক্রম হিসাবে আইনসভায় এদের নামমাত্র প্রতিনিধিত্ব মনোনয়নের ব্যবস্থা গৃহীত হয়। প্রথম প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা ছিল, হিন্দুদের অত্যাচার ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে অন্ত্যজদের নিরাপত্তা সুরক্ষিত করা। সেটা আমি করি 'গোল টেবিল বৈঠকে' সংখ্যালঘু কমিটির কাছে এক স্মারকলিপি পেশ করে। আমি যেসব নিরাপত্তার ব্যবস্থা বিবৃত করি, তার সম্পর্কে ধারণা হবে স্মারকলিপিতে—অনুন্নত শ্রেণীসমূহের রাজনৈতিক সুরক্ষার জন্য সাংবিধানিক ব্যবস্থার একটি প্রকল্প 'গোল টেবিল বৈঠকে' পেশ করা হয়। নিম্নোক্ত শর্তাবলীতে অনুন্নত সম্প্রদায় স্বশাসিত ভারতে সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসনে থাকতে সম্মত হবে :

শর্ত ১ : নাগরিকত্বে সমান অধিকার

বর্তমান বংশপরম্পরায় দাসত্বের অধীনে থাকতে অনুন্নত শ্রেণীর লোকেরা রাজি নয়। সংখ্যাগরিষ্ঠ শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে অস্পৃশ্যতার উচ্ছেদ ঘটাতে হবে। সংখ্যাগরিষ্ঠদের মর্জির ওপর এদের ছেড়ে দেওয়া সম্ভব নয়। অনুন্নত শ্রেণীর মানুষদের রাষ্ট্রের অন্য নাগরিকদের সমান নাগরিকাধিকার দিয়ে স্বাধীন নাগরিক করতে হবে।

(ক) অস্পৃশ্যতার নিরসনে এবং সমান নাগরিকত্বের জন্য নিম্নোক্ত মৌলিক অধিকার ভারতের সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

মৌলিক অধিকার

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সংবিধান সংশোধন XIV

'ভারতে রাষ্ট্রের সব প্রজা আইনের চোখে সমান ও সমান নাগরিক অধিকারসম্পন্ন। কোনও আইন, বিধি, নির্দেশ, রীতি বা আইনের ব্যাখ্যা, যার ফলে শাস্তি, সুযোগহানি, অক্ষমতা

এবং আয়ারল্যান্ড সরকার আইন ১৯২০, ১০ ও ১১, Geo V, ch. 67. Sec. 5 (2)।

জারি হয় বা অস্পৃশ্যতার দরুন রাষ্ট্রের অধিবাসীর প্রতি বৈষম্য হয়, এই সংবিধান কার্যকরী হওয়ার পর-ই ভারতে কার্যকরী হবে না।

(খ) ভারত সরকার আইন-এর ১১০ ও ১১১ ধারা অনুযায়ী কার্যনির্বাহি আমলারা যেসব অব্যাহতি ও ছাড় ভোগ করেন এবং তাদের কাজের জন্য দায় ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজার ক্ষেত্রে দায়িত্বের মতো ব্যাপক ভাবে প্রযোজ্য হবে।

সব সংবিধানেই এটা আছে। দ্রষ্টব্য : অধ্যাপক কিথের মন্তব্য Cmd. ২০৭, পৃ. ৫৬।

শর্ত ২ : সমান আইন স্বাধীনভাবে ভোগ

সমানাধিকারের ঘোষণা অবদমিত সম্প্রদায়ের কোন কাজে লাগবে। এতে কোনও সন্দেহ নেই যে, নাগরিকত্বের সমান অধিকার প্রয়োগ করতে গেলে অনুন্নত সম্প্রদায়কে রক্ষণবাদী সমাজের সমগ্র শক্তির মখোমুখি হতে হবে। সেজন্য অবদমিত সম্প্রদায় মনে করে যে, এইসব অধিকারের ঘোষণা শুধু কথার কথা না হয়ে দৈনন্দিন জীবনে বাস্তব করতে হলে ঘোষিত অধিকার হরণের বিরুদ্ধে যথাযথ শাস্তির বিধি রাখতে হবে।

(ক) অনুন্নত সম্প্রদায় সেজন্য প্রস্তাব করছে ভারত শাসন আইন, ১৯১৯-এর XI অংশে অপরাধ, শাস্তি ও প্রয়োগবিধির ব্যাপারে নিম্নোক্ত সংযোজন আনতে হবে।

i) নাগরিকত্ব লঙ্ঘনের অপরাধ

আইনানুগ কারণ ছাড়া যে-কোনও ব্যক্তি অস্পৃশ্যতার কারণে কাউকে বাসস্থান, সুবিধাভোগ, হোটেলের সুযোগ, শিক্ষাসংস্থা, রাস্তাঘাট, জলাশয়, পুকুর এবং অন্যান্য জলের স্থান, জন পরিবহণ, থিয়েটার বা মনোরঞ্জনের অন্যান্য স্থান, অবকাশ স্থান বা জনসাধারণের ব্যবহার্যে রক্ষণাবেক্ষণকৃত স্থান কোনও ব্যক্তিকে ব্যবহার করতে বাধা দেয়, তাকে সুনির্দিষ্ট কালের জন্য কারাদণ্ড, যা পাঁচ বছর পর্যন্ত হতে পারে, এবং জরিমানার শাস্তি দিতে হবে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিধি। নাগরিক অধিকার সুরক্ষা বিধি এপ্রিল ৯, ১৮৬৬ ও মার্চ ১, ১৮৭৫। নিগ্রোদের মুক্তির পর তাদের স্বার্থে গৃহীত।

(খ) অবদমিত সম্প্রদায়ের লোকদের অধিকারসমূহ শান্তিপূর্ণ ভাবে ভোগের পক্ষে অন্তরায় শুধু কট্টর ব্যক্তিদের বাধাদানেই সীমাবদ্ধ নয়। সবচেয়ে সাধারণ প্রতিরোধ হচ্ছে সামাজিক বর্জন পদ্ধতি। কট্টর শ্রেণীর হাতে এটি হচ্ছে সবচেয়ে শক্তিশালী অস্ত্র, তারা অনুন্নতদের কোনও কাজ বা অধিকার অপছন্দ করলে এই অস্ত্র দিয়েই বাধা দেয়। কীভাবে এটা করা হয় এবং কোন উপলক্ষে এটা প্রয়োগ করা হয়, তার বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে বোম্বাই সরকার নিযুক্ত কমিটির (১৯১৮) রিপোর্টে।

এর উদ্দেশ্য ছিল 'বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে অনুন্নত সম্প্রদায় ও আদিবাসীদের সামাজিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষাগত অবস্থা তদন্ত করে তাদের উন্নতির জন্য ব্যবস্থা সুপারিশ।' নিচের প্রাসঙ্গিক মন্তব্য :

অনুন্নত সম্প্রদায় ও বয়কট

'১০২. যদিও সাধারণ ব্যবহার্য স্থান ব্যবহারের জন্য অবদমিত সম্প্রদায়ের অধিকার সুরক্ষিত করার ব্যবস্থা সুপারিশ করেছি, কিন্তু আমাদের আশঙ্কা আগামী বেশ কিছুকাল তাদের অধিকার প্রয়োগ করা শক্ত হবে। প্রথম অসুবিধা হচ্ছে, কট্টর শ্রেণীদের হিংসাত্মক আক্রমণের সম্ভাবনা। এটা মনে রাখতে হবে, সব গ্রামেই অবদমিতরা সংখ্যায় কম, সংখ্যাগরিষ্ঠ কট্টরবাদীরা তাদের স্বার্থ ও সুবিধা রক্ষায় অবদমিত শ্রেণীর প্রবেশের বিরুদ্ধে সক্রিয়। পুলিশের শাস্তির ভয় হিংসা প্রয়োগ সীমাবদ্ধ করেছে, পরে হিংসার ঘটনা কমেই গেছে।

'দ্বিতীয় অসুবিধা, অবদমিতদের বর্তমান আর্থিক স্থিতিজনিত। প্রেসিডেন্সির সর্বত্রই এদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা নেই। কেউ কেউ কট্টরপন্থীদের জমিতে প্রজা হিসাবে চাষ করে, অন্যেরা কট্টরদের ভূমি-মজুর থেকে দিন গুজরান করে, বাকিরা তাদের ভৃত্য হিসাবে কাজ করে যে ধান বা চাল পায় তাতে বেঁচে থাকে। আমরা অনেক ঘটনা শুনেছি, যেখানে অনুন্নত শ্রেণীর মানুষ একটু বিদ্রোহ করে অধিকার চেয়েছে, তাদের উৎখাত করে, কাজ না দিয়ে, বা ভৃত্যদের মজুরি না দিয়ে শায়েস্তা করেছে। এই বর্জন এমন পরিকল্পিত ও সর্বব্যাপী যে, অনুন্নতদের সাধারণ রাস্তা ব্যবহার বা প্রয়োজনীয় দ্রব্য কেনা বন্ধ করে দেওয়া হয়। সাক্ষ্য-প্রমাণ বলছে, সামান্য অজুহাতে অনুন্নতদের বিরুদ্ধে বয়কট প্রয়োগ হয়। প্রায়ই যা হয়, অবদমিতরা সাধারণ পুকুর, জলাধার ব্যবহার করলেই সামাজিক বয়কট করা হয়। কিন্তু বয়কট কঠোরভাবেও প্রয়োগ করা হয়, অবদমিতদের কেউ উপবীত পরলে, ভাল জামাকাপড় বা অলঙ্কার পরলে, বা বিয়েতে বর-বউ নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে মিছিল করলে।

'অবদমিতদের অধিকার দমনে সামাজিক বয়কটের চেয়ে কার্যকরী অস্ত্র আর কী আছে আমরা জানি না। প্রকাশ্য হিংসার পদ্ধতিও এর কাছে নগণ্য, এর পরিধি বিস্তৃত, পরিণাম ভয়াবহ। এটা সবচেয়ে বিপজ্জনক, কারণ ছোঁয়াছুঁয়ির স্বাধীনতার তত্ত্ব অনুযায়ী আইনগত পদ্ধতিরূপে প্রযোজ্য হয়। অনুন্নতদের বাক-স্বাধীনতা ও উন্নতির প্রয়োজন সুরক্ষিত করতে হলে সংখ্যাগরিষ্ঠের এই স্বৈরাচার বন্ধ করতে হবে, এটা আমরা স্বীকার করি।'

অবদমিত সম্প্রদায়ের অভিমত, তাদের অধিকার ও স্বাধীনতার ওপর এই অন্যায়

প্রতিরোধ অবসানে বয়কটকে আইনত শাস্তিযোগ্য করতে হবে। সেজন্য তারা চায়, ভারত শাসন আইন ১৯১৯, অংশ XI অপরাধ, শাস্তি, ও পদ্ধতি সংক্রান্ত ধারায় নিম্নোক্ত সংযোজন চাইছে।

I. বয়কটের অপরাধের সংজ্ঞা

i) কোনও ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে বর্জন করেছেন বলে গণ্য হবে—

ক) যদি তিনি কোনও বাড়ি, জমি ব্যবহার বা বাস করতে অস্বীকার করেন, বা তাকে বা তার থেকে কোনও পরিষেবা গ্রহণ, দান করতে রাজি না হন, অথবা স্বাভাবিক ব্যবসায়িক সূত্রে যে শর্তে কাজ হয় সেইমতো উপরোক্ত কাজগুলি করতে বা দিতে অস্বীকার করেন, অথবা

এটি এবং নিম্নলিখিত বিধিসমূহ বর্মা বয়কট বিরোধী আইন, ১৯২২ থেকে নেওয়া হয়েছে, প্রয়োজনীয় পরিবর্তন-সহ।

খ) সামাজিক, পেশাগত, ব্যবসায়িক সম্পর্ক থেকে বিরত থাকা, সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত বিধি সংবিধানে ঘোষিত মৌলিক অধিকার বা অন্যান্য অধিকারের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ হলে, অথবা

গ) যে-কোনও ভাবে অন্যের আইনগত অধিকার প্রয়োগে হস্তক্ষেপ, বিরক্ত বা আঘাত করলে।

II. বয়কটের জন্য শাস্তি

যে-কোনও ব্যক্তি আইনসম্মত কাজ করলে বা আইনমতে কাজ না করার অধিকার অনুযায়ী সেই কাজ না করলে, অথবা কাউকে এমন কাজ করতে প্ররোচিত করলে যা আইনসম্মত নয়, অথবা আইন অনুযায়ী এমন কাজ করতে বাধ্য, সেই কাজ তাকে করতে না দিলে, বা কাউকে দৈহিক, মানসিক মর্যাদাগত বা সম্পত্তির ব্যাপারে ক্ষতি করলে, বা তার জীবিকা বা ব্যবসা করতে না দিলে, সেই ব্যক্তির স্বার্থযুক্ত কোনও ব্যক্তিকে বর্জন করলে তার শাস্তি হবে সাত বছর অবধি কারাদণ্ড বা জরিমানা, বা উভয়-ই একসঙ্গে।

এই ধারা অনুযায়ী কাউকে দোষী সাব্যস্ত করা যাবে না, যদি আদালত মনে করে যে, অভিযুক্ত ব্যক্তি অন্য কারও প্ররোচনায় বা কারও সঙ্গে যুক্ত হয়ে বা কোনও চক্রান্ত বা চুক্তি বা ঐক্যসূত্রে বর্জন করেছেন।

III. বয়কট করার প্ররোচনা বা পক্ষে কাজ করার শাস্তি

যে-কোনও ব্যক্তি—

ক) প্রকাশ্যে বা ছেপে বা প্রচারের উদ্দেশ্যে, বা

খ) ছাপায়, মুখে, বা প্রচারকল্পে বক্তব্য রাখলে, বা গুজব বা সংবাদের জন্য, বা সে যদি বিশ্বাস করার পক্ষে যুক্তি দেয়, বা

গ) অন্যভাবে কোনও ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে বয়কটের পক্ষে প্ররোচনা, বা পক্ষে বলে, তার শাস্তি ৫ বছর অবধি কারাদণ্ড, বা জরিমানা, বা দুই-ই।

ব্যাখ্য : এই ধারায় অপরাধ গণ্য হবে যদিও আক্রান্ত ব্যক্তি বা সম্ভাব্য ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি উপর্যুক্ত ধরনের কাজে যুক্ত ব্যক্তির নাম বা শ্রেণীর নাম না জানা যায়, কিন্তু তার কাজ বা বিশেষ ধারায় কাজ না করায় কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হলেও অপরাধ হিসাবে গণ্য হবে।

IV. বয়কটের ভীতি প্রদর্শনের জন্য শাস্তি

যে-কোনও ব্যক্তি অন্য কারও আইনসম্মত কাজের পরিণামে, বা আইনানুগ কাজ না করার অধিকার অনুসারে কাজ না করলে, বা কাউকে এমন কাজ করতে বাধ্য করলে, যা আইনানুযায়ী করতে সে বাধ্য নয়, বা কাজ না করতে বাধ্য করলে, সেই ব্যক্তি বা তার স্বার্থে উৎসাহী ব্যক্তিকে বয়কটের ভীতি প্রদর্শন করলে পাঁচ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড, জরিমানা, বা দুই-ই।

ব্যতিক্রম, এটা বয়কট নয়—

i) যথার্থ শ্রমিক বিরোধের পক্ষে কোনও কাজ করলে।

ii) সাধারণ ব্যবসায়িক প্রতিযোগিতামূলক কাজ।

বিঃ দ্রঃ— এইসব কাজ শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসাবে গণ্য হবে।

শর্ত ৩ : বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবন্ধতা

ভবিষ্যতে আইনসভার দ্বারা বা প্রশাসনিক নির্দেশের ফলে বৈষম্য আরোপ করা হবে বলে অনুন্নত শ্রেণীর আশঙ্কা রয়েছে। সেজন্য তারা কোনও সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের শাসনাধীন থাকতে রাজি নয়, যদি না আইনসভা বা প্রশাসনের পক্ষে বৈষম্য সাধনের ক্ষমতা অসম্ভব করা না হয়। সুতরাং ভারতের সাংবিধানিক আইনে নিম্নোক্ত বিধি অন্তর্ভুক্তির প্রস্তাব করা হচ্ছে :

'ভারতে কোনও আইনসভা বা প্রশাসন এমন আইন বা নির্দেশ অনুমোদন করার ক্ষমতা পাবে না, যার দ্বারা রাষ্ট্রের কোনও প্রজার অধিকার লঙ্ঘন হতে

পারে, ভারতীয় রাষ্ট্রের অধীনে সর্বত্র পূর্বেকার অস্পৃশ্যতার রীতি চালু থাকলেও এই লঙ্ঘন গণ্য হবে।

১) চুক্তি সম্পাদন, অভিযুক্ত করা, পক্ষ হওয়া এবং সাক্ষ্য দান, ক্রয়, উত্তরাধিকারী হওয়া, লিজ বা বিক্রি, সম্পত্তি রাখা বা বিক্রি করার ব্যাপারে আইনসভা/প্রশাসনের বাধাদানের ক্ষমতা থাকবে না।

২) সামরিক ও অসামরিক চাকরি গ্রহণ, সব শিক্ষা সংস্থায় অধিকার, তবে রাষ্ট্রের সব শ্রেণীর প্রজার প্রাপ্য প্রতিনিধিত্ব সংক্রান্ত ব্যবস্থার জন্য শর্ত ও সীমাবদ্ধতা ব্যতিরেকে এই অধিকার অলঙ্ঘনীয় থাকবে।

৩) আবাসন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, পরিষেবা, হোটেলের সুযোগ, নদী, জলসম্পদ, কুয়ো-পুকুর, রাস্তাঘাট, স্থল জল ও আকাশ পরিবহণ, থিয়েটার এবং জন-মনোরঞ্জনের অন্যান্য স্থান ব্যবহারের সুযোগ। অন্যসব শ্রেণী জাত বর্ণ মত-এর পক্ষে যেসব ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতার শর্ত থাকবে, সেইসব ক্ষেত্র ব্যতিরেকে সব সুযোগ অলঙ্ঘনীয় থাকবে।

৪) ধর্মীয় বা দাতব্য সংস্থা, যেগুলি জনসাধারণের জন্য বা এক-ই ধর্ম বা বিশ্বাসের লোকদের জন্য প্রতিষ্ঠিত ও নিবেদিত, সেইসব সংস্থার পরিষেবা গ্রহণের অধিকার অলঙ্ঘনীয়।

৫) সব প্রজার মতো ব্যক্তিগত নিরাপত্তা ও সম্পত্তির রক্ষার যাবতীয় আইন ও বিধির সুযোগ ভোগ করার দাবি থাকবে, অস্পৃশ্যতার পূর্বশর্ত থাকুক বা না থাকুক, এই অধিকার ভঙ্গের শাস্তি এবং জরিমানা জারি হবে।

শর্ত ৪ : আইনসভায় যথোপযুক্ত প্রতিনিধিত্ব

স্বকীয় উন্নয়নের স্বার্থে অনুন্নত শ্রেণীর যথেষ্ট রাজনৈতিক ক্ষমতা দিতে হবে, যাতে তারা আইনসভা ও প্রশাসনে প্রভাব রাখতে পারে। এই দৃষ্টিভঙ্গির পরিপ্রেক্ষিতে তারা দাবি করছে, নির্বাচনী আইনে নিম্নোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করে তাদের জন্য মঞ্জুর করুক :

১) কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইনসভায় যথাযথ প্রতিনিধিত্বের অধিকার।

২) নিজেদের লোক প্রতিনিধিরূপে নির্বাচনের অধিকার[১]।

ক) সর্বজনীন ভোটাধিকার দিয়ে এবং

খ) প্রথম দশ বছর পৃথক নির্বাচন কেন্দ্র এবং পরে যুক্ত কেন্দ্র এবং

সংরক্ষিত আসন দান, তবে এটা বুঝে নিতে হবে যে, অনুন্নতদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যুক্ত নির্বাচন কেন্দ্র করা যাবে না, অবশ্য সর্বজনীন ভোটাধিকার ছাড়া যুক্ত কেন্দ্র গ্রহণযোগ্য নয়।*

শর্ত ৫ : চাকরিতে যথাযথ প্রতিনিধিত্ব

সরকারি দপ্তরে উচ্চবর্ণের আধিকারিকরা আইন অপপ্রয়োগ করে বা স্বেচ্ছাক্ষমতা প্রয়োগ করে একচেটিয়া প্রাধান্য কায়েম করাতে অনুন্নত শ্রেণীর লোকেরা দুর্দশাগ্রস্ত হয়েছে এবং ন্যায়বিচার, সমতা বা বিবেক গ্রাহ্য না করে বর্ণহিন্দুদের সুবিধা দেওয়া হয়েছে। সরকারি চাকরিতে বর্ণহিন্দুদের একচেটিয়া প্রাধান্য খর্ব করে এই ক্ষতি এড়ানো যেতে পারে, এবং নিয়োগের ব্যাপারে অবদমিত সহ সব সম্প্রদায়ের যথোপযুক্ত অংশ নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। এই উদ্দেশ্যে অবদমিত শ্রেণীর নিম্নোক্ত প্রস্তাব সংবিধান আইনের অন্তর্ভুক্ত হোক :

১) ভারতে ও ভারতের সব প্রদেশে সরকারি চাকরিতে নিয়োগ ও নিয়ন্ত্রণের জন্য জন-কৃত্যক প্রতিষ্ঠিত করা হোক।

২) কৃত্যকের কোনও সদস্যকে আইনসভার প্রস্তাব ছাড়া বরখাস্ত করা চলবে না অবসর গ্রহণের পর সম্রাটের কোনও চাকরিতে নিয়োগ করা চলবে না।

৩) জন-কৃত্যকের কাজ হবে, দক্ষতার পরীক্ষা অনুযায়ী :

(ক) চাকরিতে এমনভাবে নিয়োগ করা, যাতে সব সম্প্রদায়ের প্রাপ্য যথোপযুক্ত প্রতিনিধিত্ব থাকে, এবং

(খ) কোনও বিশেষ চাকরিতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্বে সমন্বয় সাধনের মাঝে মাঝে নিযুক্তিতে অগ্রাধিকার দান।

শর্ত ৬ : স্বার্থ অবজ্ঞা বা পক্ষপাতমূলক ব্যবস্থার প্রতিকার

ভবিষ্যতের সংখ্যাগরিষ্ঠদের শাসন হবে কট্টরপন্থীদের-ই, এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অনুন্নত শ্রেণীর আশঙ্কা এই সংখ্যাগরিষ্ঠ শাসন তাদের প্রতি সহানুভূতিপূর্ণ হবে না,

* বিঃ দ্রঃ- অন্যান্য সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব কত না জানলে অবদমিতদের যথোপযুক্ত প্রতিনিধিত্ব সংখ্যা ঠিক করা মুশকিল। তবে এটা বুঝে নিতে হবে যে, অন্যান্য সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব সংখ্যার চেয়ে কম প্রতিনিধিত্বতে রাজি হবে না অনুন্নতরা। এক্ষেত্রে অসুবিধাজনক অবস্থা মেনে নেবে না তারা। যাই হোক না কেন, বোম্বাই ও মাদ্রাজে অবদমিতদের জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্ব চাই, অন্যান্য সংখ্যালঘুদের বিভিন্ন রাজ্যে প্রতিনিধিত্ব সংখ্যার সঙ্গে বোম্বাই ও মাদ্রাজের ব্যাপারে এক করলে হবে না।

তাদের স্বার্থের বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্ব এবং চাহিদার প্রতি অবহেলা এদের থাকবেই। এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা রাখতে হবে। কেননা, যথোপযুক্ত প্রতিনিধিত্ব পেলেও অবদমিতরা সব আইনসভাতে সংখ্যালঘু থাকবে। অবদমিত শ্রেণী মনে করে সংবিধানেই এর প্রতিকারের ব্যবস্থা রাখতে হবে। সেজন্য প্রস্তাব করা হচ্ছে, ভারতের সংবিধানে নিম্নোক্ত ব্যবস্থা রাখতে হবে :

'১. সব প্রদেশে এবং ভারতে, আইনসভার প্রশাসন বা আইনসৃষ্ট কর্তৃত্বের দায়িত্ব এবং বাধ্যতা থাকবে অবদমিত শ্রেণীর সামাজিক রাজনৈতিক জন্য যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ, শিক্ষা, পয়ঃপ্রণালী, সরকারি চাকরিতে নিয়োগের ব্যবস্থা করা, এবং এমন কিছু না করা যাতে তাদের বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্ব হতে পারে।'

ব্রিটিশ উত্তর আমেরিকা আইন ১৮৬৭, ধারা ৯৩।

'২. কোনও প্রদেশে বা ভারতে এই ধারা লঙ্ঘন করা হলে, সংশ্লিষ্ট প্রাদেশিক কর্তৃপক্ষের বা কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের কোনও কাজ বা সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সপার্ষদ্ বড়লাট এবং ভারত-সচিবের কাছে আবেদন করা যাবে।'

'৩. সপার্ষদ্ বড়লাট বা ভারত-সচিবের মনে হবে যে প্রাদেশিক কর্তৃপক্ষ বা কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ এই ধারা রূপায়িত করার জন্য পদক্ষেপ নেননি, সেক্ষেত্রে এবং এ-ধরনের সব ক্ষেত্রেই, এবং প্রতিটি ক্ষেত্রেই যেখানে বড়লাট বা ভারত-সচিব আপিল বিচারের ক্ষমতাসম্পন্ন, তাঁদের বিবেচনা অনুযায়ী সেই সময় পর্যন্ত এই ধারা কার্যকরী করার জন্য প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন, এবং তা অভিযুক্ত কর্তৃপক্ষর ওপর জারি থাকবে।'

শর্ত ৭ : বিশেষ বিভাগীয় তত্ত্বাবধান

অবদমিতদের অসহায়, দুর্ভাগ্য এবং প্রাণশক্তিহীন অবস্থার জন্য কট্টরপন্থীদের তীব্র ঘৃণ্য বিরোধিতাই দায়ী, এরা অনুন্নতদের প্রতি সমমর্যাদা ও সমান সুযোগ বরদাস্ত করবে না। তারা দারিদ্র্যপীড়িত, ভূমিহীন মজুর, এটা ঘটনা হলেও এইটুকু বললেই তাদের আর্থিক অবস্থার কথা পুরো বলা হল না। এটা মনে রাখা দরকার যে, অনুন্নত মানুষদের দারিদ্র্য প্রতিকূল সামাজিক সংস্কারের দরুন, এর জন্যই বহু পেশার দরজা তাদের কাছে বন্ধ। এই সুবাদেই একজন অনুন্নত মজুর ও বর্ণহিন্দু মজুরের পার্থক্য বিরাজমান এবং এটাই এই দুইয়ের মধ্যে ঝগড়ার সূত্র। এও মনে রাখা দরকার যে, অবদমিতদের বিরুদ্ধে স্বৈরাচার ও দমনপীড়নের ধরন নানারকমের এবং এর থেকে তাদের আত্মরক্ষার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। এই সম্পর্কে ঘটনাবলী যা সারা ভারতে সচরাচর ঘটে থাকে, তার বিবরণ রয়েছে মাদ্রাজের রাজস্ব-পর্ষদ্

(Board of Revenue)-এর ৫ নভেম্বর, ১৮৯২ তারিখের ৭২৩ নম্বর কার্যবিবরণীতে। এর অংশ নিম্ন মতের :

'১৩৪. অনেক ধরনের অত্যাচার, আগে যার সম্বন্ধে ইঙ্গিত থাকত তার ভাসা ভাসা উল্লেখ থাকা দরকার। অন্ত্যজদের অবাধ্যতার শাস্তি হিসাবে প্রভুরা ব্যবস্থা নিতেন—

ক) গ্রাম আদালতে বা আদালতে মিথ্যা মামলা আনতেন।

খ) চারপাশের সরকারি পতিত জমি আবেদন করে নিয়ে নিতেন যাতে অন্ত্যজদের গরু বা মন্দির যাওয়ার পথ বন্ধ হয়।

গ) সরকারি আয়-ব্যয়ের খাতায় অবাধ্যদের নাম মিথ্যাভাবে ঢুকিয়ে দেওয়া।

ঘ) কুটির ভেঙে দিয়ে বাড়ির উঠানের নির্মাণ নষ্ট করা ;

ঙ) স্মরণাতীত কালের উপস্বত্ব অধিকার অস্বীকার ;

চ) অন্ত্যজদের শস্য কেটে তাদের বিরুদ্ধে চুরি ও দাঙ্গার অভিযোগ দায়ের;

ছ) মিথ্যে বিবৃতি দিয়ে দলিলে সই করিয়ে ভবিষ্যতে তাদের সর্বনাশ সাধন;

জ) জমির জলধারার উৎস বন্ধ বা কেটে দেওয়া;

ঝ) আইনগত বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই উপস্বত্ব ভোগের অধিকার জমিদারের বাকি খাজনার জন্য ক্রোক করে নেওয়া।

'১৩৫. বলা হবে, এসব অত্যাচার প্রতিকারে দেওয়ানি ও ফৌজদারি আদালত রয়েছে। আদালত আছে ঠিক-ই, কিন্তু ভারতের গ্রামে অপটু বীর না থাকার অবকাশ নেই। আদালতে যাওয়ার মত সাহস চাই, টাকা চাই আইনজীবী নিয়োগের জন্য, এর ওপর আছে মামলার খরচ, এবং মামলা ও আপীল চলাকালে সংসার খরচ নির্বাহ। তাছাড়া, বেশিরভাগ মামলা নির্ভর করে নিম্ন আদালতের রায়ের ওপর, এইসব আদালতের কর্তৃপক্ষ সাধারণত: দুর্নীতিগ্রস্ত, এবং নানা কারণে ধনী ও জমিদার শ্রেণী ভুক্ত ও তাদের সমর্থক।

'১৩৬. এইসব শ্রেণীর প্রভাব সরকারি স্তরে অপরিসীম। দেশীয়দের কাছে বটেই, ইউরোপীয়দের ওপরও এদের দাপট। সব দফতরে ওপর থেকে নীচ অবধি এদের প্রতিনিধিরা রয়েছেন, এই শ্রেণীর স্বার্থ ক্ষুন্নকারী কোনও প্রস্তাব আসে না, কিন্তু এরা যেকোনও প্রস্তাবের শুরু থেকে রূপায়ণ পর্যন্ত প্রভাবিত

করতে পারেন।'

এহেন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এটা নিঃসন্দেহ যে, সরকারি কার্যক্রমের মুখ্য গুরুত্ব না পেলে এবং সরকারি সুনির্দিষ্ট নীতি এবং দৃঢ় প্রয়াসের মাধ্যমে সুযোগে সমতা আনতে না পারলে অবদমিতদের উন্নতির প্রশ্নটি শুধু শুভ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত আশাই থেকে যাবে। এই লক্ষ্যপূরণে অবদমিত শ্রেণীসমূহের প্রস্তাব হল, সাংবিধানিক ব্যবস্থার মাধ্যমে বিধিবদ্ধ আইন চাপিয়ে দেওয়া হোক, যাতে সমস্যা সংক্রান্ত বিষয়ের জন্য একটি বিভাগ সর্বসময়ের জন্য চালু করা হয় এবং ভারত সরকার আইনে নিম্নোক্ত মর্মে একটি ধারা সংযোজন করা হোক—

'১. এই সংবিধান প্রবর্তনের সঙ্গে এর-ই অংশরূপে ভারত সরকারের একটি দফতর একজন মন্ত্রীর অধীনে সৃষ্টি করে অবদমিত সম্প্রদায়ের স্বার্থ রক্ষা এবং উন্নয়নের ব্যবস্থা হোক।

'২. কেন্দ্রীয় আইনসভার আস্থা অটুট থাকা অবধি মন্ত্রী এই পদে আসীন থাকবেন।

'৩. মন্ত্রীর কাজ হবে তাঁর ওপর দেওয়া ক্ষমতা ও দায়িত্ব পালন করা বা আইন প্রদত্ত ক্ষমতার প্রয়োগ, অবদমিত সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে অত্যাচার বা পীড়ন, সামাজিক অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিকারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ এবং সারা ভারতে অবদমিতদের উন্নতির পক্ষে সহায়ক কাজ করা।

'৪. বড়লাটের পক্ষে এগুলি আইনসম্মত হবে—

ক) অবদমিত সম্প্রদায়ের শিক্ষা, পয়ঃপ্রণালী বিষয়ক ক্ষেত্রে আইন বিধিবদ্ধ হলে তাদের উন্নয়নের জন্য যাবতীয় ক্ষমতা মন্ত্রীর কাছে হস্তান্তর করা।

খ) প্রত্যেক প্রদেশে মন্ত্রীর সহযোগিতায় তাঁর অধীনে কাজ করার জন্য অবদমিত সম্প্রদায় উন্নয়ন দফতর খুলতে হবে।'

শর্ত ৮ : অনুন্নত সম্প্রদায় ও মন্ত্রিসভা

আইনসভায় আসন লাভ করে সরকারি নীতি প্রভাবান্বিত করার ক্ষমতা থাকা যেমন প্রয়োজন, তেমন-ই এটাও কাম্য যে, অবদমিত সম্প্রদায়ের সুযোগ থাকা উচিত সরকারের নীতি রচনায়। এটা তারা পারবে মন্ত্রিসভায় আসন থাকলে। সেজন্য অনুন্নত সম্প্রদায় দাবি করছে, অন্যান্য সংখ্যালঘুদের মতো সমানভাবে মন্ত্রিসভায় তাদের প্রতিনিধিত্ব পাওয়ার নৈতিক অধিকার আছে। এই উদ্দেশ্যে অবদমিত সম্প্রদায়ের প্রস্তাব :

নির্দেশাবলী অনুযায়ী বড়লাটের মন্ত্রিসভায় অবদমিত সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব দিতে বাধ্য থাকবেন।

II

অন্ত্যজদের এইসব দাবির পরিণতি কী হল এবং সংখ্যালঘু কমিটির সদস্যদের প্রতিক্রিয়া কী হল, তা বুঝা যাবে 'গোল টেবিল বৈঠকে' পেশ করা সংখ্যালঘু কমিটির প্রতিবেদনে। নিচে প্রতিবেদনের কিছু অংশ তুলে ধরা হল:

'৫. বিভিন্ন সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়, সম্প্রদায়ভিত্তিক প্রতিনিধিত্ব ও আসন অনুপাতের সংখ্যা বেঁধে দেওয়া হোক। এটাও আর্জি করা হয়, কোনও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের আসনসংখ্যা যেন এর জনসংখ্যার অনুপাতে কম না হয়। যেসব পদ্ধতিতে এটা করা যাবে তা হল :

১) মনোনয়ন,

২) নির্বাচকমণ্ডলী, এবং

৩) পৃথক নির্বাচন কেন্দ্র।

'৬. মনোনয়ন-এর প্রস্তাব সর্বসম্মতভাবে খারিজ হয়।

'৭. যুক্ত নির্বাচন কেন্দ্র করার বিষয়ে প্রস্তাব হয় এই শর্তে যে, সম্প্রদায়গুলির জন্য বিশেষ আসন সংরক্ষিত থাকবে। এভাবে নির্বাচনকে আরও গণতান্ত্রিক রূপ দেওয়া যাবে, অন্যদিকে নির্বাচকমণ্ডলীর উদ্দেশ্য সফল হবে। সন্দেহ প্রকাশ করা হয় যে, এই নির্বাচন প্রথায় সংখ্যালঘুদের প্রতিনিধিত্ব অর্জন হবে, কিন্তু তা যথার্থ হবে তার নিশ্চয়তা নেই। কিন্তু এতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি নির্বাচিত হবেন সংখ্যাগুরুদের মনোনয়নে। এর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলা হয়েছিল, কার্যত এটা সম্প্রদায় প্রতিনিধিত্ব স্বরূপ এবং বাস্তবে সম্প্রদায়ভিত্তিক নির্বাচক মণ্ডলীর প্রত্যক্ষ পদ্ধতি।

'৮. আলোচনায় পরিষ্কার হয় যে, একমাত্র পৃথক নির্বাচকমণ্ডলীর দাবিই গ্রহণযোগ্য হবে। এই পরিকল্পনার বিরুদ্ধে সাধারণ আপত্তি ভারতে আগে থেকে আলোচনা হয়ে আসছে। এতে জড়িত রয়েছে সমাধানের পক্ষে সবচেয়ে জটিল সমস্যা—মূলত বিভিন্ন প্রদেশে ও কেন্দ্র সম্প্রদায়ভিত্তিক প্রতিনিধিত্বের পরিমাণ কী হবে; যদি সমগ্র বা সামগ্রিক স্তরে আইনসভার আসন সম্প্রদায় ধরে ঠিক করা হয়, তাহলে স্বাধীন জনমত বা যথার্থ অর্থে রাজনৈতিক দল গড়ে উঠবে না। এবং এই সমস্যা আরও

জটিল হয় অনুন্নত সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের এই দাবিতে, হিন্দু জনসংখ্যার থেকে তাদের সম্প্রদায়কে পৃথক করে দেওয়া হোক এবং নির্বাচনের ক্ষেত্রে পৃথক সম্প্রদায় গণ্য করা হোক।

'৯. সম্প্রদায়গুলির জন্য আসন নির্দিষ্ট করে দেওয়ার বিরুদ্ধে আপত্তির মোকাবিলায় প্রস্তাব করা হয়, একটা আনুপাতিক অংশ—৮০% বা ৯০% এভাবে দেওয়া হোক—বাকিটার মুক্ত নির্বাচন হোক। কিছু সম্প্রদায় এই প্রস্তাবকে তাদের প্রয়োজনীয় সুরক্ষার উপযোগী গণ্য করেননি।

'১০. উপ-সমিতির সদস্য মৌলানা মহম্মদ আলি, যাঁর মৃত্যু আমরা নিন্দা করি, প্রস্তাব করেছেন, যতটা সম্ভব—৪০% ভোট পেলে তবেই সম্প্রদায়ের প্রার্থী নির্বাচিত হবেন, এই ব্যবস্থা অনুযায়ী অন্য সম্প্রদায়ের ভোট বিবেচ্য হয়েছিল। তবে এটা বলা হয়েছিল, এই পরিকল্পনায় সাম্প্রদায়িক রেজিস্টার রাখতে হবে এবং পৃথক নির্বাচক মণ্ডলীর বিরুদ্ধে আপত্তির অবকাশ রাখা হয়েছিল।

'১১. যুক্ত নির্বাচন কেন্দ্র মহিলাদের পক্ষ থেকে কোনও আসন সংরক্ষণ বা পৃথক নির্বাচক মণ্ডলীর দাবি করা হয়নি, পুরুষদের মতো মহিলারা একই-ভাবে নির্বাচনের যোগ্য। কিন্তু রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মহিলাদের সক্রিয় অংশগ্রহণের বিষয়টি জনমতের কাছে স্বচ্ছন্দ করে তোলার জন্য এবং আইনসভায় তাদের অন্তর্বর্তী প্রতিনিধিত্বের জন্য প্রথম তিনটি পরিষদে—৫% আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষণ করার কথা বলা হয় এবং প্রস্তাব করা হয়। এই আসন পূর্ণ করা হবে নির্বাচিত সদস্যদের আনুপাতিক ভোটের মাধ্যমে।

'১২. উপ-সমিতি II (প্রাদেশিক সংবিধান)-এর সুপারিশ, প্রাদেশিক কার্যনির্বাহক গুরুত্বপূর্ণ সংখ্যালঘু কমিটিতে প্রতিনিধিত্বের বাস্তবিক গুরুত্ব নতুন সংবিধান রূপায়ণের পক্ষে জরুরি। এ-ব্যাপারে সাধারণ সম্মতি ছিল, একই কারণে এ-ও মেনে নেওয়া হয় যে, প্রজাতান্ত্রিক কার্যনির্বাহে মুসলমানদের প্রতিনিধি থাকা উচিত। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক ক্ষমতাকেন্দ্রে ক্ষুদ্র সংখ্যালঘুদের ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত প্রতিনিধিত্বের দাবি করা হয়, এবং এটা সম্ভব না হলে সংখ্যালঘুদের স্বার্থরক্ষার প্রতি মন্ত্রিসভার একটা মন্ত্রক রাখার কথা বলা হয়। (ড. আম্বেদকর এবং সরদার উজ্জ্বল সিং যোগ করতে চান, 'এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সংখ্যালঘু' মুসলমান কথার পরে)। দায়িত্বপূর্ণ ক্ষমতা নির্বাহে যুক্তভাবে কাজ করার অসুবিধা সম্বন্ধে বলা হয়।

'১৩. প্রশাসনের ব্যাপারে এটা একমত হয় যে, কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক চাকরিতে নিয়োগের ভার থাকবে জন-কৃত্যকের ওপর। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের দাবি এবং সরকারি

চাকরিতে ন্যায়সঙ্গত প্রতিনিধিত্বের সঙ্গে দক্ষতার মান অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য নির্দেশাবলী দেওয়া হয় কৃত্যককে।

'১৬. এটা পরিষ্কার করা হয়েছে যে, ব্রিটিশ সরকার কোনও সম্মতির সুযোগ পেলেই সম্প্রদায়গুলির ওপর নির্বাচনী নীতি চাপিয়ে দেবে যা ভবিষ্যতে বিরোধীদের ভার হয়ে উঠবে। সুতরাং এটা পরিষ্কার যে, সর্বসম্মতি না হলে সব দুর্বলতা ও অসুবিধা সত্ত্বেও যুক্ত নির্বাচকমণ্ডলী অটুট রাখতে হবে, নতুন সংবিধানে নির্বাচনী ব্যবস্থার ভিত্তি হবে এটা। এর থেকেই অনুপাতের প্রশ্ন আসবে। এই অবস্থায় অনুন্নত সম্প্রদায়ের দাবি যথাযথভাবে বিবেচনা করতেই হবে।

'১৮ ভারতের জন্য কোনও স্বশাসনযুক্ত সংবিধান সংখ্যালঘু ও অনুন্নত সম্প্রদায়ের লোকেরা মেনে নেবে না। তাদের শর্ত ছিল তাদের দাবি-দাওয়া মেনে নিতে হবে।'

'গোল টেবিল বৈঠকে' আরও একটি প্রজাতান্ত্রিক কাঠামো কমিটি কেন্দ্রীয় সরকারের গঠন ও দায়িত্ব নির্ধারণ করার সময়ে কেন্দ্রীয় আইনসভায় অন্ত্যজদের প্রতিনিধিত্বের প্রশ্ন পর্যালোচনা করার দায়িত্ব প্রাপ্ত ছিল। বৈঠকে পেশ করা প্রতিবেদনে কমিটি বলেন :

'সংখ্যালঘু উপ-সমিতির প্রতিবেদন সাপেক্ষ অনুযায়ী এটা সর্বসম্মতভাবে ঠিক হয় যে, উভয় আইনসভায় এবং নিশ্চিতভাবে নিম্নসভায় বিশেষ স্বার্থগোষ্ঠীর—যেমন, অনুন্নত সম্প্রদায়, মুসলমান, ভারতীয় খ্রিস্টান, ইউরোপীয়, ইঙ্গ-ভারতীয়, জমিদার, বাণিজ্য সংস্থা (ভারতীয় ও ইউরোপীয়) এবং শ্রমিকদের প্রতিনিধিত্ব দিতে হবে।

III

'গোল টেবিল বৈঠকে'র প্রথম অধিবেশন শেষ হওয়ার আগেই ওই উভয় কমিটির প্রতিবেদন পেশ করা ও গৃহীত হয়। এটা বুঝা যায় যে, বিশদ ব্যাপারে সহমতের অভাব ছিল বটে, তবে রাজনৈতিক ও সাংবিধানিক ক্ষেত্রে অন্ত্যজদের পৃথক অস্তিত্ব স্বীকার করায় সবার সম্মতি ছিল।

'গোল টেবিল বৈঠকে'র প্রথম অধিবেশন শেষ হওয়ার সময় পর্যন্ত এই সিদ্ধান্তের ব্যাপারে যে দলের দৃষ্টিভঙ্গি জানা যায় নি, সেটা হল কংগ্রেস। এর কারণ, কংগ্রেস এই বৈঠক বর্জন করেছিল এবং সরকারের বিরুদ্ধে আইন অমান্য আন্দোলনে ব্যস্ত ছিল। 'গোল টেবিল বৈঠকে'র দ্বিতীয় অধিবেশন ধার্য হওয়ার আগে সম্রাটের সরকারের সঙ্গে কংগ্রেসের একটা সমঝোতা হয় এবং এর ফলে কংগ্রেস বৈঠকে

যোগ দিতে রাজি হয় এবং সম্মেলনে আলোচ্য বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে অবদান রাখে। বৈঠকের প্রথম অধিবেশনে যোগদানকারী সবাই প্রতিনিধিদের মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ ব্যবহার, সুন্দর মেজাজ ও আদান-প্রদানের পরিবেশ দেখে আশা করেছিলেন, যে অগ্রগতি হয়েছে তা পরবর্তী অধিবেশনগুলিতে অব্যাহত থাকবে। চুক্তি সম্পাদনে অগ্রগতির হার কংগ্রেসের যোগদানে আরও দ্রুত হবে বলে আশা করা গিয়েছিল। বাস্তবত, কংগ্রেসের বন্ধুরা অভিযোগ করেন যে, অধিবেশনে কোনও চুক্তি না হওয়ার কারণ কংগ্রেসের অনুপস্থিতি।

কাজেই সবাই বৈঠকে কংগ্রেসের নেতৃত্বদানের আশায় অপেক্ষা করছিল। দুর্ভগ্যবশত কংগ্রেস শ্রী গান্ধীকে প্রতিনিধি বেছে নেয়। ভারতের ভাগ্য পরিচালনার এর চেয়ে খারাপ ব্যক্তি কেউ ছিলেন না। ঐক্যের বাতাবরণ সৃষ্টিতে তিনি ব্যর্থ। গান্ধী নিজেকে নম্রতাপূর্ণ ব্যক্তি হিসাবে উপস্থিত করেন। কিন্তু 'গোল টেবিল বৈঠকে' দেখা যায়, জয়ের উচ্ছ্বাসে গান্ধীর ব্যবহার অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ-মনের হতে পারে। সম্মেলনে যোগ দেবার আগে সরকারের সঙ্গে সফল চুক্তি করার পর সম্মেলনে অন্যান্য অ-কংগ্রেস প্রতিনিধিদের অবজ্ঞা করেন। যখন-ই সুযোগ এসেছে তিনি তাঁদের অপমান করে প্রকাশ্যে বলেছেন যে তাঁরা কেউ নন, এবং কংগ্রেসের প্রতিনিধি হিসাবে তিনিই দেশের প্রতিনিধিত্ব করেন। ভারতীয় প্রতিনিধিদের ঐক্যবদ্ধ না করে গান্ধী অনৈক্য বাড়িয়েছেন। তথ্য-জ্ঞানের দৃষ্টি বিচারে, গান্ধী নিজেকে খুব অ-ওয়াকিবহাল প্রতিপন্ন করেছেন। সম্মেলনের সামনে যেসব সাংবিধানিক ও সাম্প্রদায়িক প্রশ্ন এসেছিল সে-সম্পর্কে গান্ধী বহু মামুলি উক্তি করেছেন, কিন্তু কোনও পুনর্গঠনমূলক প্রস্তাব বা মতদান করতে পারেননি। তিনি নিজেকে এক বিচিত্র জটিল মানুষ হিসাবে প্রতিপন্ন করেন, কিছু ক্ষেত্রে নীতির প্রশ্ন তুলে যে-কোনও সমঝোতাকে তিনি সর্বাত্মকভাবে প্রতিরোধ করেন, যদিও অনেকে একে নীতি না বলে পক্ষপাত মনে করেন, অন্যান্য ঘটনায় বিশেষ প্রশ্নে অনেকে যাকে মৌলিক নীতি বলে মনে করেন, সেক্ষেত্রে তিনি অতি বাজে সমঝোতা করেন।

'গোল টেবিল বৈঠকে'র দ্বিতীয় অধিবেশনে অন্ত্যজদের দাবির প্রশ্নে শ্রী গান্ধীর দৃষ্টিভঙ্গি তাঁর চরিত্রের বিচিত্র বৈশিষ্ট্যের অন্যতম দৃষ্টান্ত। 'গোল টেবিল বৈঠকে'র দ্বিতীয় অধিবেশনে প্রতিনিধিরা সমবেত হওয়ার সময়ে 'ফেডারেল স্ট্রাকচার কমিটি' প্রথমবার বসে। ১৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৩১ ওই কমিটির সামনে প্রথম বক্তৃতায় গান্ধী অন্ত্যজদের প্রশ্নে বলেন :

'কংগ্রেস তার সূচনা থেকেই তথাকথিত 'অস্পৃশ্যদের' সমস্যাগুলি কর্মসূচিতে

গ্রহণ করেছে। একটা সময় ছিল, যখন কংগ্রেসের প্রতিটি বার্ষিক অধিবেশনের সঙ্গে বসত সমাজ-সংস্কার বিষয়ে সম্মেলন। প্রয়াত রানাডে তাঁর অনেক কাজের মধ্যে এর জন্য শক্তি ব্যয় করেছেন। তাঁর নেতৃত্বে, লক্ষ্য করবেন, অস্পৃশ্যদের নিয়ে সংস্কারের অনেক উল্লেখ্য কর্মসূচি সম্মেলন গ্রহণ করেছে। কিন্তু ১৯২০ সালে কংগ্রেস একটি বৃহত্তর পদক্ষেপ নিয়ে দলীয় কর্মসূচি হিসাবে অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের বিষয়টি রাজনৈতিক মঞ্চে নিয়ে আসে একটি উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক কার্যক্রম হিসাবে। হিন্দু-মুসলমান ঐক্য যেমন কংগ্রেস মনে করে—তেমনি সব শ্রেণীর ঐক্যের প্রয়োজন স্বরাজ অর্জনের জন্য অপরিহার্য মনে করে। অস্পৃশ্যতার অভিশাপ দূরীকরণ পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য তেমনি অপরিহার্য মনে করে। ১৯২০ সালের সিদ্ধান্ত এখনও এক-ই রয়েছে। সুতরাং, আপনারা লক্ষ্য করবেন, কংগ্রেস সূচনা থেকেই যা করতে চাইছে এবং নিজেকে যেভাবে ব্যাখ্যাত করছে, অর্থাৎ সর্ব অর্থেই জাতীয় প্রতিষ্ঠান।'

যে কেউ, যিনি ১৯২২ সালে কংগ্রেসের বারদৌলি অধিবেশনে অস্পৃশ্যদের অবস্থার উন্নয়নে গৃহীত প্রস্তাব কার্যকর করবার দায়িত্ব শেষ পর্যন্ত হিন্দুমহাসভার ওপর অর্পন করা হয়েছে, তা লক্ষ্য করেছেন, তিনি শ্রী গান্ধীর বক্তব্য অসত্য বলতে দ্বিধা করবেন না। শ্রী গান্ধী বক্তৃতায় অবশ্য এখন কোনও ইঙ্গিত দেননি, যা থেকে বুঝা যাবে অস্পৃশ্যদের জন্য কি দাবি পেশ করতে যাওয়া হচ্ছে, কিন্তু আমি লক্ষ্য করছি একটা বিচ্যুতি।[১] অবশ্য তিনি তাঁর অবস্থান জানাতে বেশি সময় নেন না। 'ফেডারেল স্ট্রাকচার কমিটি'র ১৯৩১ সালের ১৭ সেপ্টেম্বরের সভা তাঁকে সেই সুযোগ দিয়েছে। সভার আলোচ্যসূচিতে প্রজাতান্ত্রিক বিধানমণ্ডলে সদস্য নির্বাচনের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত হয়। তাঁর অভিমত প্রকাশ করে শ্রী গান্ধী নিম্নোক্ত বিবৃতি দেন :

'আমি (V) অনুশিরোনামের বিশেষ স্বার্থের জন্য বিশেষ কেন্দ্রের বিষয়ে বলতে এসেছি। এখানে আমি কংগ্রেসের পক্ষ থেকে বলছি। কংগ্রেস হিন্দু, মুসলমান, শিখ বিরোধের অবসানে বিশেষ সুবিধার ব্যাপারটি মেনে নিয়েছে। এর পক্ষে ঐতিহাসিক কারণ রয়েছে, কিন্তু কংগ্রেস এই তত্ত্বকে আর কোনও ভাবে প্রসারিত করতে চায় না। বিশেষ স্বার্থের তালিকা সম্বন্ধে শুনেছি। অন্ত্যজদের প্রশ্নে ড. আম্বেদকর কী বলতে চান তা আমার বোধগম্য হয়নি, কিন্তু কংগ্রেস অবশ্যই ড. আম্বেদকরের সম্মানে অন্ত্যজদের বিশেষ স্বার্থের ব্যাপারে শরিক হবে। ভারতের স্থায়ী ব্যাপ্ত

১. 'গোল টেবিল বৈঠকে'র প্রথম অধিবেশনে যাবার আগে বোম্বাইতে শ্রী গান্ধীর সঙ্গে আমার যে সাক্ষাৎকার হয়, তাতে তিনি আমাকে বলেছিলেন যে, তিনি রাজনৈতিক কারণে আলাদা পরিচয়ের বিরোধী।

পরিসরে অন্যান্য গোষ্ঠী বা ব্যক্তির স্বার্থের মতো এই বিশেষ স্বার্থ সম্বন্ধে কংগ্রেস ওয়াকিবহাল। সুতরাং, আমি আর কোনও বিশেষ প্রতিনিধিত্বের তীব্র বিরোধিতা করব।'

এটা অন্ত্যজদের বিরুদ্ধে শ্রী গান্ধী ও কংগ্রেসের যুদ্ধ ঘোষণা ছাড়া কিছু নয়। যাই হোক, এর ফল দু'পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ। এই ঘোষণার পর আমি বুঝে নিই, শ্রী গান্ধী সংখ্যালঘু কমিটির মূল মঞ্চে এই প্রশ্নে কী করবেন।

শ্রী গান্ধী অন্য তিন গোষ্ঠীর—হিন্দু-মুসলমান-শিখের মধ্যে পাকা ব্যবস্থা করে অন্ত্যজদের প্রশ্ন এড়িয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করছিলেন। সংখ্যালঘু কমিটির বৈঠকের আগে উনি মুসলমানদের সঙ্গে আপস আলোচনা চালাচ্ছিলেন, কিন্তু সেটার উপসংহার হয়নি, পরে ২৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৩১ সংখ্যালঘু কমিটির বৈঠকে জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেন স্যার আলি ইমাম। তিনি শুরু করেন এই বলে :

'মুসলমান প্রতিনিধিদের সম্বন্ধে বলতে পারি, কোনও আপস আলোচনা হয়েছে বলে আমি জানি না। বর্তমানে কোনও প্রস্তাব বিবেচনাধীন আছে কিনা, তা জানার সুযোগ হয়নি। এটা হতে পারে, আমি শুনেছি যে, একটা বুঝাপড়া হয়েছে। এর পক্ষে আমি সাক্ষী হচ্ছি না, এর কিছুই আমি জানি না। স্যার, আপনি যদি চান, জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের দৃষ্টিভঙ্গি আপনার সামনে পেশ করি, তা করব; কিন্তু আপনার অনুমতি আবশ্যক, কিন্তু এর জন্য কিছু সময় লাগবে এবং এ-ধরনের সভায় সময়ের পরিমিত ব্যবহার অন্যতম লক্ষ্য।

'**সভাপতি**: প্রশ্ন হচ্ছে, কমিটির দায়িত্ব সীমিত সংখ্যালঘু সমস্যার সঙ্ঘবদ্ধ পর্যালোচনা।

'**স্যার ইমাম** : সেই দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই আমি বিষয়টা দেখতে চাইছি।

'**সভাপতি**: আর কোনও সরকারি আপত্তি না থাকলে আমি কি স্যার ইমামকে আহ্বান করব?'

এর পরই মহামান্য আগা খান উঠে বলেন :

'আমার ধারণা, মহাত্মা গান্ধী আজ রাতে মুসলমান প্রতিনিধিদের সঙ্গে দেখা করবেন। আমরা আশা করি, আজ আমাদের বন্ধুর সঙ্গে সৌহার্দ্যপূর্ণ আলোচনা হবে। কোনও সম্ভাব্য আপস আলোচনার ব্যাপারে এটাই আমি বলতে পারি।'

পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যও বলেন, একটা সংক্ষিপ্ত বিরতি হলে কিছু ফল হতে পারে। এটা একটা কুচক্র বুঝে আমি তক্ষুণি দাঁড়িয়ে উঠে বলি :

'বিরতি হওয়ার আগে আমি একটা কথা বলতে চাই। আপনার প্রস্তাবমতো যখন এইসব আপস আলোচনা চলছে, অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায় তাঁদের বক্তব্য সম্বন্ধে প্রস্তুতি নিতে পারেন—এ-ব্যাপারে আমার কথা, অনুন্নত সম্প্রদায়ের ব্যাপারে আমি সংখ্যালঘু কমিটির গত বৈঠকে সবকিছু পেশ করেছি।

'সভা বিরতির আগে শুধু একটা কথা, কমিটির সামনে এবার বিভিন্ন আইনসভায় প্রতিনিধিত্ব সংখ্যার ব্যাপারে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখতে চাই। এর বাইরে আমার আর কিছু করার নেই ; তবে প্রথম থেকেই আমি একথা বলার জন্যই উদ্‌গ্রীব। সাম্প্রদায়িক প্রশ্নের মীমাংসায় অনেক আপস আলোচনা চলছে শুনে আনন্দিত, কিন্তু প্রথমেই আমি আমাদের অবস্থা পরিষ্কার করতে চাই। এ প্রশ্নে কোনও সন্দেহ থাকুক, তা চাই না। যাঁরা এসব আপস আলোচনা করছেন, তাঁদের উদ্দেশ্যে বলি, কমিটি এদের কাউকে পূর্ণ ক্ষমতাসম্পন্ন মধ্যস্থ মীমাংসাকারী হিসাবে নিযুক্ত করেননি। শ্রী গান্ধীর প্রতিনিধিত্ব চরিত্র যাই হোক বা অন্য যেসব পক্ষের সঙ্গে তিনি কথাবার্তা বলছেন, তাঁরা কেউ-ই আমাদের বাধ্য করার মতো অবস্থায় নেই, নিশ্চিতভাবেই নেই। এই সভায় তা খুব জোরের সঙ্গে বলছি।'

'আর একটা ব্যাপার বলতে চাই—অন্যান্য সম্প্রদায়, তাদের যেসব দাবি পেশ করেছে তা অন্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের দাবির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। কাজেই, কোনও সংখ্যালঘু গোষ্ঠী যদি কংগ্রেসের সঙ্গে বা অন্য দলের সঙ্গে চুক্তি করে অন্যান্য সম্প্রদায়ের দাবির কথা না বিচার করে, সেক্ষেত্রে তা আমাদের ওপর প্রযোজ্য হবে না, এটা পরিষ্কার বলতে চাই। অন্য কোনও সম্প্রদায় কতটা গুরুত্ব পাবে বা না পাবে তা নিয়ে আমার বিরোধ নেই, কিন্তু এটা আমার পরিষ্কার কথা—যেই যতটা গুরুত্ব পাক বা দিক এবং নিজের ক্ষমতাবহির্ভূত গুরুত্ব দান করুক, সেটা যেন আমার অংশ থেকে কেটে দান করা না হয়। আমি এটা চূড়ান্তভাবে বলে দিতে চাই।'[১]

এর পরের ঘটনা নিম্নোক্ত সভাবিবরণীতে স্পষ্ট :

'সভাপতি : কোনও ভুল বুঝাবুঝির অবকাশ নেই। এটাই সেই সংস্থা যেখানে চূড়ান্ত সমাধান পেশ করতে হবে এবং প্রস্তাব হচ্ছে কিছু কিছু সংখ্যালঘু বা

১. এটা আমি অন্য একটা স্মারকলিপিতে পেশ করেছি। পরিশিষ্ট II দেখুন।

গোষ্ঠীর মধ্যে যদি পারস্পরিক দ্বন্দ্ব থাকে, সেইসব অসুবিধা দূর করার প্রয়াসে সময় নিক। সাধারণ সহমতের ক্ষেত্রে সেটা একটা গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ হবে, তবে চুক্তিটা সর্বসাধারণের জন্য হবে।

'**ড. আম্বেদকর** : আমি আমার অবস্থান স্পষ্ট করেছি।

'**সভাপতি** : ড. আম্বেদকরের অবস্থান খুব পরিষ্কার, তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে তিনি এ-ব্যাপারে কোনও বিভ্রান্তির অবকাশ রাখেননি, এবং বিরতির পর সভা পুনরায় বসার সময়ে এটি উত্থাপিত হবে। আমি যেটা আপনাদের সবাইকে বুঝতে বলি, আমরা সবাই একটা সাধারণ সমঝোতার জন্য সহযোগিতা করছি, দুই বা তিন পক্ষের মধ্যে নয়, একটা সম্পূর্ণ চুক্তি চাই।

'পরিস্থিতি হল, এখন আমরা বিরতি ঘোষণা করছি, পরে আবার বসব। আপস আলোচনা দুই বা তিন পক্ষের মধ্যে চলাকালে, আমরা অন্যান্য সম্প্রদায়ের বক্তব্য, দাবি শুনতে পারি। আমার মনে হয়, এটা খুব কাজের হবে। সময় বাঁচবে, এবং এতে বিভিন্ন পক্ষের মধ্যে সম্ভাব্য ঐক্যস্থাপন বিঘ্নিত হবে না, যেমন, শিখ 'বন্ধু যাদের আমরা জানি দৃঢ়সঙ্কল্প স্বনির্ভর জাতি হিসাবে—শ্রী গান্ধী ও তাঁর বন্ধুবর্গ এবং আগা খান ও বন্ধুবৃন্দ।

'**ড. আম্বেদকর** : আমি প্রস্তাব করছি, বিভিন্ন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি, গান্ধী সহ কংগ্রেস প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে একটা ছোট কমিটি গঠন করা সম্ভব কি দেখুন, তাঁরা সভা স্থগিতকালে ঘরোয়াভাবে বসে সমস্যা নিয়ে আলোচনা করুন।

'**সভাপতি** : আমি এই প্রস্তাবই করতে যাচ্ছিলাম। আমায় সেই কমিটি গঠনের জন্য বলবেন না, আপনারাই করুন! আমি আপনাদের এখানে আমন্ত্রণ করেছি একত্র হওয়ার জন্য। আপনারা ঠিক করে ঘরোয়া সভায় নিজেদের মধ্যে বিষয়গুলি নিয়ে কথা বলুন এবং তারপর এখানে যখন কথা বলবেন তখন অন্যের ওপর আপনাদের বক্তব্যের প্রভাব সম্বন্ধে যথাযথ জ্ঞান নিয়েই বলবেন। এভাবে কি আমরা করতে পারি?

'**ড. আম্বেদকর** : আপনি যা ভাল মনে করেন।

'**সভাপতি** : সেটা অনেক ভাল হবে।

বিরতির সময়ে তিন পক্ষের মধ্যে কোনও সহমত হয়নি। পরে সংখ্যালঘু কমিটি ১ অক্টোবর, ১৯৩১ বৈঠকে বসলে শ্রী গান্ধী বলেন :

মাননীয় সভাধিপতি, গত রাতে মহামান্য আগা খান ও অন্যান্য মুসলমান নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করে আমরা এই উপসংহারে আসি যে, আমরা যে উদ্দেশ্যে এখানে সমবেত হয়েছি, তা সার্থক হবে এক সপ্তাহ সভা মুলতুবি করলে। আমার সতীর্থদের সঙ্গে আলাপ করার সুযোগ পাইনি, তবে আমি নিশ্চিত, তাঁরা আমার প্রস্তাবে সহমত হবেন।'

আগা খান এই প্রস্তাব সমর্থন করেন। আমি উঠে এর বিরোধিতা করি। সভা-বিবরণী থেকে উদ্ধৃত আমার নিম্নোক্ত বক্তব্য স্পষ্ট :

'সম্ভাব্য সব মীমাংসার প্রয়াসে এই কমিটির প্রচেষ্টা সমস্যা সমাধানে সংশ্লিষ্ট পক্ষের আপস চেষ্টায় আমি কোনও বাধা সৃষ্টি করতে চাই না, এবং মহাত্মা গান্ধী প্রস্তাবিত কোনও সমাধান অর্জন করা গেলে আমি তাতে আপত্তি জানাব না।

'কিন্তু অনুন্নত সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি হিসাবে আমি একটা অসুবিধার সম্মুখীন। আমি জানি না, মহাত্মা গান্ধী সভা মুলতুবি কালে কী ধরনের কমিটি করে এই প্রশ্নের পর্যালোচনা করতে চাইছেন, আশা করি অনুন্নত সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব ওই কমিটিতে থাকেবে।

'শ্রী গান্ধী : নিঃসন্দেহে।

'**ড. আম্বেদকর** : ধন্যবাদ। কিন্তু আমি জানি না, আমার বর্তমান অবস্থায় প্রস্তাবিত কমিটিতে আমি কতটা কাজ করতে পারব। এবং এই কারণেই মহাত্মা গান্ধী 'ফেডারেল স্ট্রাকচার কমিটি-তে' (Federal Structure Committee)-প্রথমদিন-ই বলেছিলেন যে, ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিনিধি রূপে তিনি মুসলমান ও শিখদের ছাড়া আর কোনও সম্প্রদায়কে রাজনৈতিক স্বীকৃতি দিতে প্রস্তুত নন। ইঙ্গ-ভারতীয়, অনুন্নত সম্প্রদায় এবং ভারতীয় খ্রিস্টানদের তিনি স্বীকৃতি দিতে রাজি নন। আমি মনে করি না, এই কমিটিতে বাস্তব ঘটনা তুলে ধরে শিষ্টাচার ভঙ্গ করছি, এক সপ্তাহ আগে মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাতে অনুন্নত সম্প্রদায়ের সমস্যা নিয়ে আমার আলোচনা হয়, এবং গতকাল অন্যান্য সম্প্রদায়ের সদস্যরা তাঁর দফতরে বসে আলোচনার সময়ে তিনি সোজাসুজি বলেছেন যে, 'ফেডারেল স্ট্রাকচার কমিটিতে-তে' (Federal Structure Committee) গৃহীত তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি অটল ও সুচিন্তিত। আমি যেটা বলতে চাইছি, প্রথমেই যদি জানতে না পারি যে ভবিষ্যৎ ভারতের সংবিধানে অনুন্নত সম্প্রদায়ের মানুষ সম্প্রদায় হিসাবে রাজনৈতিক স্বীকৃতি পাবে কিনা, সেক্ষেত্রে মহাত্মা গান্ধী প্রস্তাবিত এই কমিটিতে যোগ দিয়ে আমার সার্থকতা কী! সুতরাং কমিটির কাছ থেকে যদি এই মর্মে আশ্বাস না পাই যে, গত

বছরে সংখ্যালঘু কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী সব সম্প্রদায় ভারতের ভবিষ্যৎ সংবিধানে স্বীকৃতি পাবে, সেক্ষেত্রে আমি মুলতুবি প্রস্তাব সমর্থন করতে পারব কিনা জানি না, অথবা মনোনীত এই কমিটির কাছে সর্বান্তঃকরণে সহযোগিতা করতে পারব কিনা। এ ব্যাপারে আমি পরিষ্কার হতে চাই।

* * * *

'ড. আম্বেদকর : আমি আমার অবস্থান আরও পরিষ্কার করতে চাই। মনে হচ্ছে, আমার বক্তব্য নিয়ে ভুল ধারণা রয়েছে। আমি সভা মুলতুবির বিরুদ্ধে নই ; সংশ্লিষ্ট প্রশ্ন পর্যালোচনার জন্য নিযুক্ত কমিটির কাজে যুক্ত হতে আপত্তি করছি, তাও নয়। এই কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পূর্বে আমি আমার কমিটির কাজে যোগ দেওয়ার সুযোগ দিলে আগে আমি জানতে চাইব, কিসের জন্য এই কমিটি? শুধু হিন্দুদের সঙ্গে মুসলমানদের সম্পর্ক প্রশ্ন বিচার? এই কমিটি কি শুধু পঞ্জাবে মুসলমানদের সঙ্গে শিখদের সম্পর্ক পর্যালোচনা করবে? এরা খ্রিস্টান, অনুন্নত সম্প্রদায়, অ্যাংলো ইন্ডিয়ানদের সমস্যা বিচার করবে কি?

'শুরুর আগে যদি আমরা বুঝি যে, এই কমিটি শুধু হিন্দু ও মুসলমানদের, হিন্দু ও শিখদের প্রশ্নই নয়, অনুন্নত সম্প্রদায়, খ্রিস্টান, ইঙ্গ-ভারতীয়দের সমস্যাও বিচার করবে, সেক্ষেত্রে আমি এই মুলতুবি প্রস্তাব বিনা দ্বিধায় মেনে নেব। তবে, আমি বলতে চাই, আমায় যদি উপেক্ষা করা হয় এবং এই বিরতিকে শুধু হিন্দু-মুসলমান প্রশ্নের সমাধানে কাজে লাগানো হয়, আমি চাইব সংখ্যালঘু কমিটি অন্য কোনও বেসরকারি কমিটির হাতে সংখ্যালঘু সমস্যার সমাধানের দায়িত্ব ছেড়ে না দিয়ে নিজে এই প্রশ্ন পর্যালোচনা করুক।

'শ্রী গান্ধী : প্রধানমন্ত্রী ও বন্ধুগণ, আমি দেখছি আমাদের মধ্যেই কাজের দায়িত্ব তথা পরিধি নিয়ে ভুল বুঝাবুঝি রয়েছে। আমার আশঙ্কা, ড. আম্বেদকর, কর্নেল গিডনি এবং অন্যান্য বন্ধুরা আশু ঘটনা নিয়ে অহেতুক ঘাবড়ে যাচ্ছেন। কোনও ব্যক্তিগত স্বার্থ, শ্রেণীর স্বার্থ বা ভারতের একজন ব্যক্তির রাজনৈতিক মর্যাদা অস্বীকার করার আমি কে? কংগ্রেসের প্রতিনিধি হিসাবে যদি একটি জাতীয় স্বার্থও বলি দেওয়ার জন্য দোষী হই, তবে কংগ্রেস আমার ওপর যে দায়িত্ব দিয়েছে তার পক্ষে আমি অনুপযুক্ত। এইসব প্রশ্নে আমি আমার মতামত প্রকাশ করেছি। আমি স্বীকার করি যে, এইসব মতে আমি বিশ্বাসী। কিন্তু সব স্বার্থ সুরক্ষিত করার উপায় রয়েছে। একটি পরিকল্পনা উদ্ভূত করার জন্য আমরা সবাই সমবেত হয়েছি। এই ঘরোয়া সভা বা সম্মেলনে নিজের মত অন্যের ওপর চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হলে কারও

ক্ষতি হবে না।

'সেজন্য আমি মনে করি না যে, কেউ নিজের মত প্রকাশ বা মতামত গ্রহণ করাতে ভীত হবেন। আমার মত অন্য সবার মত সমান পর্যায়ের হবে, এর ওজন বেশি হবে তা নয়, আমার এমন কর্তৃত্ব নেই যে, অন্যের মতের বিরুদ্ধে আমার মত গ্রহণ করাতে পারব। আমি জাতীয় স্বার্থে আমার মত প্রকাশ করেছি, এবং যখন-ই সুযোগ পাব আমি এই মত প্রকাশ করব। এই মত গ্রহণ করা বা বাতিল করা আপনাদের ব্যাপার। সুতরাং, দয়া করে মনকে ভারমুক্ত করুন, যে সভার আভাস দিয়েছে সেখানে বা সম্মেলনে মত জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হবে, এমন কথা ভাববেন না। আপনারা যদি মনে করেন, টেবিলের সামনে আড়ষ্ট হয়ে বসে থাকার চেয়ে এরকম ঘরোয়া সভায় কাজ হবে, তবে আপনারা এই মুলতুবি প্রস্তাব গ্রহণ না করে এই ঘরোয়া বৈঠকে দেওয়া প্রস্তাবের পক্ষে সহযোগিতা করবেন।'

* * * *

'**সভাপতি**: তাহলে আমি বলি। বন্ধুগণ, পরিষ্কার ভাবে আমি বলতে চাই, সময় অপচয় চলবে না এবং এই বৈঠক, গান্ধী যাকে ঘরোয়া আখ্যা দিয়েছেন। তবে আমার মতে খুব তাৎপর্যপূর্ণ ও ফলপ্রসূ বৈঠক পরবর্তী সভার আগে হবে। আমি আশা করি, আপনারা সেইভাবে সময়টা কাজে লাগাবেন।'

মুলতুবি হওয়ার পর ঘরোয়া বৈঠকে কী হয়েছিল সেটা জানানো দরকার। এটা একেবারে ব্যর্থ হয়েছে, নিষ্ফল তো বটেই। সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রী গান্ধী। সাম্প্রদায়িক প্রশ্নের সবচেয়ে জটিল বিষয় পঞ্জাবে শিখ-মুসলমান ঝগড়া দিয়ে তিনি শুরু করেন। একটা পর্বে এই সমস্যা সমাধানের কাছাকাছি এসেছিল যখন সংশ্লিষ্ট সব পক্ষ একজন সালিশির সিদ্ধান্ত মেনে নিতে রাজি হয়। তবে শিখরা সালিশ-এর নাম না জানা পর্যন্ত বেশিদূর এগোতে রাজি হয়নি। মুসলমানরা সালিশির নাম জানাতে অস্বীকার করায় ব্যাপারটা ভেস্তে যায়। শ্রী গান্ধী অন্যান্য সংখ্যালঘু, বিশেষ করে অন্ত্যজ সম্প্রদায়ের সমস্যা নিয়ে উৎসাহী ছিলেন না, যদিও তিনি অন্যান্য সম্প্রদায়কে তাদের দাবির একটা তালিকা দাখিল করার প্রহসন দেখান। তিনি তাদের কথা শোনেন কিন্তু কোনও উৎসাহ দেখাননি। তিনি কি সভায় এগুলি পেশ করেছিলেন? শিখ-মুসলমান বোঝাপড়া ভেঙে যেতেই তিনি সভা বন্ধ করে দেন। সংখ্যালঘু কমিটি (Minority Committee) ৮ অক্টোবর, ১৯৩১ বৈঠকে বসে। প্রধানমন্ত্রী শ্রী গান্ধীকে প্রথমে বলতে আহ্বান করলে তিনি বলেন :

'প্রধানমন্ত্রী ও বন্ধুগণ, অত্যন্ত দুঃখ ও তীব্র বেদনার সঙ্গে জানাচ্ছি, সাম্প্রদায়িক

প্রশ্নে বিভিন্ন গোষ্ঠীর প্রতিনিধিদের পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে মীমাংসার প্রয়াস ব্যর্থ হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী ও সতীর্থদের কাছে এক সপ্তাহ অমূল্য সময় অপচয়ের জন্য মার্জনা চাইছি। আমার একমাত্র স্বান্ত্বনা এই আলোচনা শুরু করার দায়িত্ব গ্রহণকালে এর সাফল্য সম্বন্ধে আমি আশান্বিত ছিলাম এবং তার জন্য আমি চেষ্টার কোনও ত্রুটি রাখিনি।'

'কিন্তু, এই আলোচনা লজ্জাজনকভাবে ব্যর্থ হয়েছে, এটুকু বললে সব সত্য বলা হল না। ভারতীয় প্রতিনিধিত্বের গঠনেই ব্যর্থতার কারণ নিহিত। আমাদের বেশিরভাগই কেউ পার্টি বা গোষ্ঠীর নির্বাচিত প্রতিনিধি নন, সরকার সবাইকে মনোনীত করেছে। সর্বসম্মত মীমাংসার জন্য যাদের উপস্থিতি প্রয়োজন ছিল, তারা কেউ এখানে নেই। তাছাড়া, আমার ধারণা, সংখ্যালঘু কমিটি আহ্বানের যথার্থ সময় এটা নয়। এই বাস্তবজ্ঞানবর্জিত পরিপ্রেক্ষিতে আমরা জানি না, আমরা কী পাব। আমরা যদি জানতাম, আমাদের দাবি আমরা পাব, তবে নোংরা ঝগড়াঝাটি করে সব ভেস্তে দেওয়ার আগে আমরা পাঁচবার ভাবতাম, কারণ যদি বলে দেওয়া হত যে, বর্তমান প্রতিনিধিরা সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধানে সহমত হলে তবেই দাবিপূরণ করা হবে, তবে অন্যরকম হত। স্বরাজ সংবিধানের ভিত্তিতে নয়, শীর্ষে রেখে সমাধান হতে পারে। কারণ, আমাদের মধ্যেকার পার্থক্য কঠিন হয়ে গেছে, বিদেশি আধিপত্যের দরুন-ই এটা হয়েছে। আমার মনে বিন্দুমাত্র সংশয় নেই যে, স্বাধীনতা সূর্যের আলোকে সাম্প্রদায়িক পার্থক্যের বরফ গলে যাবে।

'সেজন্য আমি প্রস্তাব করতে চাইছি যে, অনির্দিষ্টকালের জন্য সংখ্যালঘু কমিটি মুলতুবি রাখা হোক এবং সংবিধানের মৌলিক বিষয়গুলি যথাসত্বর সুনির্দিষ্ট করা হোক। ইতিমধ্যে, সাম্প্রদায়িক সমস্যার প্রকৃত সমাধানে বিধি-বহির্ভূত প্রয়াস চলতে থাকুক। তবে তা যেন সংবিধান প্রণয়নে কোনও বাধা না হয়। এর থেকে দৃষ্টি অন্যত্র সরিয়ে সংবিধান কাঠামোর ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হবে।

'কমিটির কাছে বলার দরকার দেখি না যে, আমার ব্যর্থতার অর্থ এই নয় যে, একটা সর্বসম্মত বুঝাপড়ার আশা নির্মূল হয়েছে। আমার ব্যর্থতা মানে আমার পরাজয় নয়, এরকম শব্দ অভিধানে নেই। আমার স্বীকারোক্তির অর্থ বিশেষ তৎপরতার ব্যর্থতা, যার জন্য আমি এক সপ্তাহের আনুকূল্য প্রার্থনা করেছি এবং আপনারা সেটা দিয়েছেন।

'এই ব্যর্থতাকে সাফল্যের সোপান রূপে ব্যবহারের প্রস্তাব করছি, আপনাদেরও তা করার জন্য আহ্বান করছি। তবে সর্বসম্মত বুঝাপড়ার চেষ্টা ব্যর্থ হলে, এমনকী 'গোল টেবিল বৈঠকে'র শেষ চেষ্টার পর্বেও আমি প্রস্তাব করব সম্ভাব্য সংবিধানে

বিচার বিভাগীয় ন্যায়পীঠ (Tribunal) নিয়োগের একটি ধারা সংযোজন করা হোক। এই ন্যায়পীঠ সব পক্ষের দাবি পরীক্ষা করে যাবতীয় অমীমাংসিত বিষয়ে চরম সিদ্ধান্ত নেবে।'

পরবর্তী আলোচনায় সবাই সরকার কর্তৃক প্রতিনিধি নিয়োগ প্রশ্নে শ্রী গান্ধীর অভিযোগ অস্বীকার করেন। আমার স্থিতি ব্যাখ্যা করতে উঠে বলি :

'মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, গত রাতে আমরা যখন রীতি-বহির্ভূত কমিটির সভা ত্যাগ করি, ব্যর্থতাবোধ সত্ত্বেও একটা বিষয়ে বুঝাপড়া হয়েছিল যে, আমরা আজকের সভায় কেউ এমন কিছু বলব না যাতে ক্ষোভ সৃষ্টি হয়। আমি দুঃখিত, শ্রী গান্ধী সেই বুঝাপড়ার শর্ত ভঙ্গ করায় দোষী। অনুগ্রহ করে আমায় বলতে দিন। তিনি শুরুতে কমিটির ব্যর্থতার কারণ সম্বন্ধে বললেন। এখন এই ব্যর্থতার কারণ সম্বন্ধে আমার মতামত বলতে পারি, কিন্তু আমি তা করব না। শ্রী গান্ধীর কথা শুনে আমার যেটা খারাপ লাগছে, সংখ্যালঘু কমিটি অনির্দিষ্ট কালের জন্য মুলতুবি রাখা হোক, এই মর্মে তাঁর প্রস্তাবের ওপর বক্তব্যের চেয়ে তিনি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উপস্থিত প্রতিনিধিদের সম্বন্ধে কিছু মন্তব্য করলেন। তিনি বলেন, প্রতিনিধিরা সরকার মনোনীত এবং তাঁরা সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায়ের মতামতের প্রতিনিধিত্ব করেন না। আমরা সরকার মনোনীত, এই অভিযোগ অনস্বীকার্য, কিন্তু নিজের ব্যাপারে আমি বলতে পারি আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে অনুন্নত সম্প্রদায় তাদের প্রতিনিধি নির্বাচনের সুযোগ পেলে আমি সেখানে জায়গা পাবই। সেজন্য আমি বলতে পারি, মনোনীত হই বা না হই, আমি আমার সম্প্রদায়ের দাবির প্রতিনিধিত্ব করছি। এ-ব্যাপারে কারও যেন সন্দেহ না থাকে।

'মহাত্মা সবসময়ে দাবি করছেন যে, কংগ্রেস অনুন্নত সম্প্রদায়ের পক্ষে এবং আমি বা আমার সতীর্থদের চেয়ে বেশি কংগ্রেস অনুন্নতদের প্রতিনিধিত্ব করে। এই দাবির ব্যাপারে বলতে পারি, দায়িত্বহীন ব্যক্তিদের অন্যান্য মিথ্যা দাবির অন্যতম এই দাবি সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায়ের মানুষ সবসময়েই অস্বীকার করে।

'এখনই আমার কাছে এইমাত্র আসা এক তারবার্তা রয়েছে, এটা এমন জায়গা থেকে এসেছে যেখানে আমি কোনদিন যাইনি, প্রেরক আলমোড়া কুমায়ুনের 'ডিপ্রেসড ক্লাশেস ইউনিয়ন'-এর (Depressed Classes Union) সভাপতিকে আমি জীবনে দেখিনি, মনে হয় যুক্তপ্রদেশ থেকে এসেছে, এবং এতে প্রস্তাব করা হয়েছে :

'এই সভা দেশে ও দেশের বাইরে সংগঠিত কংগ্রেস আন্দোলনের প্রতি অনাস্থা ঘোষণা করছে এবং কংগ্রেস কর্মীদের অনুসৃত পন্থার নিন্দা করছে।'

'আর পড়ার প্রয়োজনীয়তা দেখছি না, তবে আমি বলতে পারি (এবং মনে হয় শ্রী গান্ধী যদি তার অবস্থা পরীক্ষা করেন তাহলে সত্য ঘটনা জানতে পারবেন) কংগ্রেসের মধ্যে অনুন্নত সম্প্রদায়ের প্রতি সহানুভূতিশীল লোক থাকতে পারেন কিন্তু অনুন্নতরা কংগ্রেসে নেই। এই বিবৃতির সমর্থনে আমি প্রমাণ দিতে চাইছি। বেশি বিতর্কের মধ্যে যেতে চাই না। আমার মূল বক্তব্যের আওতায় সেটা আসে না। শ্রী গান্ধীর বক্তব্যের সারকথা হল, সংখ্যালঘু কমিটি মুলতুবি রাখা হোক। এই প্রস্তাবের ব্যাপারে আমি স্যার মহম্মদ সফির দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে একমত। আমি এই প্রস্তাবে সায় দিতে পারি না। আমার মনে হয়, দুটি বিকল্প আছে—সংখ্যালঘু কমিটি সমস্যা পর্যালোচনা করে সন্তোষজনক মীমাংসায় আসার প্রচেষ্টা চালাক, অথবা তা সম্ভব না হলে ব্রিটিশ সরকার সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব নিক। আমরা তৃতীয় পক্ষের হাতে সালিসির দায়িত্ব ছেড়ে দিতে পারি না। ব্রিটিশ সরকারের দায়িত্ববোধের মতো তাদের দায়িত্ববোধ থাকতে পারে না।

'প্রধানমন্ত্রী মহোদয়, আমায় একটা ব্যাপার পরিষ্কার করতে দিন। অনুন্নত সম্প্রদায় উদ্বিগ্ন নয়, তারা কলরব করছে না, তারা এই দাবিতে আন্দোলনও করছে না যে অবিলম্বে ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে তাদের বিশেষ অভিযোগ আছে এবং আমি সরব হয়ে বলেছি যে, এইসব অভিযোগ সম্বন্ধে আমরা তীব্রভাবে ক্ষুব্ধ। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কী, প্রকৃত অবস্থা হচ্ছে তারা রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য লালায়িত নয়। তাদের অবস্থা সোজা কথায়, তারা ক্ষমতা হস্তান্তরে উদ্বিগ্ন নয়, কিন্তু ব্রিটিশ সরকার দেশের সেইসব ক্ষমতা হস্তান্তরে আগ্রহী শক্তির প্রতিরোধ করতে অক্ষম হলে—এবং আমরা জানি বর্তমান পরিস্থিতিতে এটা প্রতিরোধ করার মতো অবস্থায় অনুন্নত সম্প্রদায় নেই—আমাদের নিবেদন, আপনারা ক্ষমতা হস্তান্তর করলে তা এমন ব্যবস্থা ও পরিস্থিতিযুক্ত করুন যাতে ক্ষমতাটা একটা চক্রের হাতে, একটা শাসক বা গোষ্ঠীর, মুসলমান বা হিন্দু সম্প্রদায়ের হাতে না যায়। সমাধানটা এমন হতে হবে, যাতে ক্ষমতা সব সম্প্রদায়ের হাতে সমানুপাতে যায়। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আমি ভাবতে পারছি না কীভাবে 'ফেডারেল স্ট্রাকচার কমিটি'র (Federal Structure Committee)-র আলোচনায় যুক্ত হতে পারি, যতক্ষণ না বুঝি আমাদের সম্প্রদায়ের স্থিতি কোথায়।'

সমাপ্তিকালীন বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রী বলেন : 'এখন সভা মুলতুবি রাখা যাক। আমরা পরে আবার সবাইকে ডাকব। ইতিমধ্যে আমি যেটা চাইব, আপনারা, যারা আমার বিপরীত দিকে বসে আছেন, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরা, আপনারাও

চেষ্টা করুন। আপনাদের মধ্যে যদি সহমত হয়, আমি বলব আপনারা সেটা প্রচার করুন... ব্রিটিশ সরকার চুক্তি সম্পাদনের পথে অন্তরায় নয়.... সুতরাং, এইমাত্র আমরা যে হতাশাব্যঞ্জক বক্তব্য শুনলাম, তার পরিপ্রেক্ষিতে আমি যা চাইব, তা হচ্ছে : ব্রিটিশ সরকার চায় এই চেষ্টা চলুক, আপনারা এই চেষ্টা চালিয়ে যান। আপনারা শেষ পর্যন্ত যেতে না পারলে ব্রিটিশ সরকার ব্যবস্থা নেবে, যাতে ভারত শাসন আইন আরও ভাল হয়, ভারত সরকার আমাদের ভাবধারার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হয়, যাতে ভারত সরকার আরও কার্যকরীভাবে বৃহত্তর সম্প্রসারণের মাধ্যমে স্বাধীনতার পথে যেতে পারে। এটাই আমরা চাই। আজ আমি প্রতিনিধিদের কাছে আবেদন রাখছি—সব সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের বলছি, আমাদের পথে বাধা হবেন না, কারণ এটাই হচ্ছে।'

IV

প্রধানমন্ত্রীর প্রস্তাবানুসারে একটা সিদ্ধান্তে আসা যায় কিনা বিচার করার জন্য সংখ্যালঘুরা মিলিত হন। তাঁরা চেষ্টা করে একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর কাছে পেশ করেন সংখ্যালঘু কমিটির ১৩ নভেম্বর, ১৯৩১ বৈঠক বসার আগের দিন সন্ধ্যায়। তার প্রারম্ভিক ভাষণে প্রধানমন্ত্রী বলেন :

'কমিটির কাজ প্রথম থেকেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, আমি দুঃখিত যে আপনারা সর্বসম্মত কোনও সিদ্ধান্ত দিতে পারেননি।

'গতকাল রাতে অবশ্য আমি মুসলমান, অনুন্নত সম্প্রদায়, ভারতীয় খ্রিস্টানদের একাংশ, ইঙ্গ-ভারতীয়, ব্রিটিশদের প্রতিনিধি দল আমার কাছে আসেন। আমার ধারণা, এটাই পুরো বিন্যাস। গত রাতে হাউস অফ কমন্স-এ আমার ঘরে তাঁরা দেখা করেন একটা দলিল নিয়ে, তাদের মধ্যে গৃহীত সিদ্ধান্ত ওই দলিলে ছিল। দলিলটা আমার কাছে দেওয়ার সময়ে তাঁরা জানান, এতে ব্রিটিশ ভারতের প্রায় ৪৬% মানুষের অভিমত অন্তর্ভুক্ত।

'আমি মনে করি, সবচেয়ে ভাল হয়, যেহেতু এটা পর্যালোচনা করার মতো সময় নেই, এই দলিল কমিটির কাছে রেকর্ড হিসাবে থাকুক এবং সেজন্য আমি মহামান্য আগা খানকে অনুরোধ করছি এটি সরকারিভাবে পেশ করুন যাতে আমাদের সরকারি নথিতে এটি অন্তর্ভুক্ত হয়।'

মহামান্য সম্রাট আগা খান তখন উঠে বলেন :

'প্রধানমন্ত্রী মহাশয়, মুসলমান, অনুন্নত সম্প্রদায়, ইঙ্গ-ভারতীয়, ইউরোপীয় এবং ভারতীয় খ্রিস্টানদের এক বৃহদাংশের তরফ থেকে আমি দলিলটা পেশ করছি, এতে

আন্তঃসাম্প্রদায়িক সমস্যা সম্বন্ধে গৃহীত সিদ্ধান্ত রয়েছে, 'গোল টেবিল বৈঠক' ও সংখ্যালঘু কমিটি এই বিষয়ে সংশ্লিষ্ট। আমরা এটা পরিষ্কার করতে চাই যে, বহু আলোচনা ও সতর্ক বিচারের পর এই জটিল সমস্যার ওপর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে, এবং একে সামগ্রিকভাবে গ্রহণ করতে হবে। এর সবক'টি অংশ পরস্পর নির্ভর এবং এটি গ্রহণ বা বাতিল করতে হলে সামগ্রিকভাবে করতে হবে।'

এই দলিলটি সংখ্যালঘু চুক্তি (**Minority Pact**) হিসাবে পরিচিত[১]। সাধারণ আলোচনা সম্পর্কে গান্ধীর বক্তৃতা সবচেয়ে বেশি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। শ্রী গান্ধী একেবারে ক্ষিপ্ত ছিলেন, সংখ্যালঘু চুক্তিতে শরিক সবাইকে তীব্র আক্রমণ করেন। অন্ত্যজদের পৃথক রাজনৈতিক অস্তিত্ব হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়ার বিরুদ্ধে তিনি বিশেষ করে ক্ষুব্ধ হন। শ্রী গান্ধী এই কথা বলেন :

'আগের বক্তব্যই আবার বলছি, হিন্দু, শিখ ও মুসলমানদের গ্রহণযোগ্য যে কোনও প্রস্তাব কংগ্রেস মেনে নেবে, কিন্তু পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী কিছুতেই নয়। .... তথাকথিত অন্ত্যজদের উদ্দেশ্যে আরও একটা কথা, অন্যান্য সংখ্যালঘুদের দাবির ব্যাপার বুঝি, কিন্তু অন্ত্যজদের পক্ষ থেকে দাবি সবচেয়ে নিষ্ঠুর আঘাত। এর অর্থ চিরস্থায়ী বিদ্বেষপূর্ণ বিভাগ। এমনকী ভারতের স্বাধীনতার জন্যও আমি অন্ত্যজদের স্বার্থ বিক্রি করে দেব না। আমি নিজেকে অন্ত্যজ জনমানবের প্রতিনিধি হিসাবে দাবি করি। এখানে আমি শুধু কংগ্রেসের পক্ষ থেকে কথা বলছি না, আমি আমার নিজের কথা বলছি, এবং আমি দাবি করি, অন্তজদের মধ্যে যদি গণভোটের ব্যবস্থা হয়, তবে আমি সবার চেয়ে বেশি ভোট পাব এবং ভারতবর্ষের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত অব্দি গিয়ে আমি অন্ত্যজদের বলব যে, পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী ও সংরক্ষণ এই বিদ্বেষমূলক বাধা দূর করবে না, এই ব্যবস্থা কেবল তাদের নয়, কট্টর হিন্দুবাদের পক্ষেও লজ্জার বিষয়।

'এই কমিটি ও সারা বিশ্ব জানুক যে, অস্পৃশ্যতার এই কলঙ্ক দূর করতে হিন্দু সংস্কারপন্থীরা সক্রিয়। আমাদের নথিপত্রে ও আদমশুমারে অন্ত্যজদের পৃথক শ্রেণী হিসাবে নথিভুক্ত দেখতে চাই না। শিখরা হয়তো সেভাবে চিরদিন থাকতে পারে, মুসলমান ও ইউরোপীয়রাও হয়তো তাই। কিন্তু অন্ত্যজরা কি চিরদিন অস্পৃশ্য থাকবে? অস্পৃশ্যতা চিরস্থায়ী হওয়ার চেয়ে আমি বরং চাইব হিন্দুধর্মের অবসান। সুতরাং ড. আম্বেদকরের প্রতি সম্মান সহকারে বলছি, এবং অন্ত্যজদের উন্নতির জন্য তাঁর সদিচ্ছা, এবং তাঁর দক্ষতার প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করে, আমি বিনীতভাবে

১. পরিশিষ্ট III দ্রষ্টব্য।

বলছি, যে ভয়াবহ অন্যায় এবং তিক্ত অভিজ্ঞতার জন্য, মনে হয়, তাৎক্ষণিকভাবে তাঁর বিচারবোধ পক্ষপাতদুষ্ট হয়ে গেছে। এটা বলতে আমার কষ্ট হচ্ছে বটে, কিন্তু এটা না বললে অন্ত্যজদের আমার জীবনের ঐকান্তিক দায়িত্ববোধ থেকে বিচ্যুত হব। সারা বিশ্বের সম্রাট হওয়ার বিনিময়েও আমি তাদের স্বার্থ নিয়ে দর কষাকষি করব না। সব দায়িত্ববোধ নিয়েই বলছি যে, ড. আম্বেদকরের সারা ভারতের অন্ত্যজদের পক্ষে কথা বলার দাবি যথার্থ নয়। এতে হিন্দুবাদীদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হবে, যেটা আমি খুশিমনে স্বীকার করতে পারি না। অন্ত্যজরা খ্রিস্টান বা ইসলাম-এ ধর্মান্তরিত হলে আমি কিছু মনে করি না। আমার সেটা মেনে নেওয়া উচিত, কিন্তু গ্রামেগঞ্জে হিন্দুদের মধ্যে ভাগ হয়ে গেলে আমি সেটা সহ্য করতে পারব না। যাঁরা অন্ত্যজদের রাজনৈতিক স্বাধীনতার পক্ষে বক্তব্য রাখেন, তাঁরা তাঁদের দেশ ভারতবর্ষকে জানেন না, কীভাবে ভারতীয় সমাজ বিন্যস্ত হয়েছে জানেন না, এবং সেজন্যই আমি জোরের সঙ্গে দাবি করতে পারি যে, এটা প্রতিরোধের পক্ষে মাত্র একজন সমর্থক থাকলেও আমি জীবন দিয়ে তা করব।'

সংখ্যালঘু কমিটি অনির্দিষ্টকাল মুলতুবির আগে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হবে না বুঝতে পেরে সভাপতি প্রতিনিধিদের কাছে একটা প্রস্তাব রাখেন। তিনি বলেন :

'আপনারা, এই কমিটির প্রতিটি সদস্য কি আমার কাছে স্বাক্ষরসহ অনুরোধ করে এই সাম্প্রদায়িক প্রশ্নের মীমাংসায় আমায় দায়িত্ব দিয়ে আমার সিদ্ধান্ত স্বীকারের শপথ নিতে পারেন? আমার মনে হয়, এটা একটা ন্যায্য প্রস্তাব.... আমি যে কোনও একটি গোষ্ঠীকে বা ব্যক্তিকে চাই। এই কমিটির সদস্যরা কি একটা ঘোষণাপত্রে সই করে সাম্প্রদায়িক প্রশ্নে একটা সিদ্ধান্ত, এমনকী অস্থায়ী সিদ্ধান্ত দিতে বলবেন এবং তা মেনে নিতে রাজি থাকবেন? আমি এখন-ই এটা চাইছি না, আমি বলি, আপনারা এতে স্বাক্ষর করে কি আমায় দেবেন এবং আশ্বাস দেবেন যে, এই সিদ্ধান্ত আপনারা গ্রহণ ও নতুন সংবিধান রূপায়ণের পথে সিদ্ধান্ত যথাসাধ্য কার্যকরী করবেন? আমি বিভিন্ন গোষ্ঠী ও ব্যক্তিকে বারবার বলেছি একথা, কিন্তু পাইনি। এতে পরিস্থিতি জোরদার হতে পারে, তাছাড়া সভার শুরুতে আমি যা বলেছি, ভুলবেন না দয়া করে, প্রতিশ্রুতি পূরণে এবং সংবিধান প্রণয়নে সরকার সাম্প্রদায়িক পার্থক্যের বাধা বরদাস্ত করবে না। সুতরাং, সাম্প্রদায়িক পার্থক্যকে বেশি গুরুত্ব দেবেন না।'

V

সাম্প্রদায়িক সমস্যা নিরসনে সংখ্যালঘু কমিটির প্রয়াস এইভাবেই শেষ হয়।

কমিটিতে আলোচনা সূত্রে অন্ত্যজদের প্রতি শ্রী গান্ধীর দৃষ্টিভঙ্গি প্রকট হয়। সবাই বুঝেন যে, শ্রী গান্ধী অন্ত্যজদের কট্টর বিরোধী। অন্ত্যজদের প্রশ্নে গান্ধী এত বেশি গুরুত্ব ও সময় দেন যাতে এটা বলা অন্যায় হবে না যে, তাঁর 'গোল টেবিল বৈঠকে' আসার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল অন্ত্যজদের দাবির বিরোধিতা করা।

শ্রী গান্ধীর বন্ধুরা অন্ত্যজদের দাবির প্রতি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি বুঝতে সক্ষম হননি। মুসলমান ও শিখদের স্বীকৃতি এবং অন্ত্যজদের ক্ষেত্রে এই স্বীকৃতির বিরোধিতায় তাঁরা বিস্মিত ও বিভ্রান্ত। যখনই তাঁরা ব্যাখ্যা চেয়েছেন, গান্ধী কিছু না বলে শুধু ক্রোধান্বিত হয়েছেন। অন্ত্যজদের বিরোধিতার পক্ষে গান্ধী কোনও সঙ্গতিপূর্ণ যুক্তি দেখাতে পারেননি। 'গোল টেবিল বৈঠকে'র মধ্যে আত্মপক্ষ সমর্থনে তাঁর বক্তব্য, হিন্দুরা অন্ত্যজদের স্বার্থের পক্ষে কাজ করছে এবং সেজন্য তাদের রাজনৈতিক নিরাপত্তা দেওয়ার পক্ষে যুক্তি নেই। 'গোল টেবিল বৈঠকে'র বাইরে তিনি ভিন্ন কারণ দেখিয়েছেন। নিজের অবদান সমর্থনে বক্তৃতায় গান্ধী বলেন :

'মুসলমান ও শিখরা সুসংগঠিত। অন্ত্যজরা তা নয়। তাদের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা খুব কম এবং এত নির্মম আচরণ করা হয় তাদের প্রতি যে, আমি তাদের বিরুদ্ধে তাদের রক্ষা করতে চাই। তাদের পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী দেওয়া হলে গ্রামে তাদের জীবন দুর্বিষহ করে তুলবে কট্টর হিন্দুরা। হিন্দুদের উৎকৃষ্ট শ্রেণীর লোকেরা অস্পৃশ্যদের প্রতি যুগযুগান্ত অনাচারের প্রায়শ্চিত্ত করবেন। সক্রিয় সামাজিক সংস্কারের দ্বারাই এই প্রায়শ্চিত্ত করা সম্ভব, অস্পৃশ্যদের নির্বাচকমণ্ডলীর চেয়ে বরং অবদমিত অবস্থা সহনীয় করার কাজ দিয়ে এই প্রায়শ্চিত্ত সম্ভব। তাদের পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী দিয়ে আপনারা অন্ত্যজ ও কট্টর হিন্দুদের অনৈক্য সৃষ্টির ইন্ধন যোগাচ্ছেন। আপনাদের অবশ্যই বুঝতে হবে যে, মুসলমান শিখদের পৃথক প্রতিনিধিত্ব একটা প্রয়োজনীয় ক্ষতি হিসাবে মেনে নিচ্ছি। অস্পৃশ্যদের ক্ষেত্রে এটা বিপদ হবে। আমি নিশ্চিত, অন্ত্যজদের জন্য পৃথক নির্বাচন কেন্দ্র সরকারের আধুনিক উৎপাদন। তাদের একমাত্র প্রয়োজন ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্তি এবং সংবিধানে তাদের জন্য মৌলিক অধিকারের ব্যবস্থা করা। অবিচারের ঘটনা, বা তাদের প্রতিনিধিত্ব ইচ্ছে করে বাদ দিলে, তাদের যেন বিশেষ নির্বাচন ন্যায়পীঠের অধিকার থাকে, এই ন্যায়পীঠ তাদের সম্পূর্ণ নিরাপত্তা দেবে। ন্যায়পীঠের ক্ষমতা থাকবে নির্বাচিত কোনও প্রার্থীকে বাতিল করা এবং পরাজিত প্রার্থীকে নির্বাচিত ঘোষণা করা।

'অন্ত্যজদের জন্য পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী হলে তাদের চিরতরে দাসত্বের মধ্যে ফেলে দেওয়া হবে। মুসলমানদের পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী দিলে তারা অ-মুসলমান হয়ে যাবে না। আপনারা কি চান যে অন্ত্যজরা চিরকালই অর্ন্ত্যজ থাকুক? হ্যাঁ, পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী এই কলঙ্কচিহ্ন চিরস্থায়ী করবে। যেটা দরকার তা হল অস্পৃশ্যতা ধ্বংস করা, এবং এটা করা হলে বিভেদপূর্ণ বিভাগের যে বেড়া 'নিকৃষ্ট' শ্রেণীর ওপর উদ্ধত উচ্চশ্রেণী চাপিয়ে দিয়েছে, তা ধ্বংস হবে। এই বিভেদের বেড়া ভেঙে দিলে আপনারা কার জন্য পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী করবেন? ইউরোপের ইতিহাসের দিকে তাকান। সেখানে কি আপনারা শ্রমিক শ্রেণী বা মহিলাদের জন্য পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী করেছেন? সর্বজনীন ভোটাধিকার দিয়ে আপনারা অন্ত্যজদের সম্পূর্ণ নিরাপত্তা দিয়েছেন। এমনকী কট্টরপন্থীদেরও তাদের কাছে গিয়ে ভোট চাইতে হবে।

'এখন আপনারা জানতে চান, তাদের প্রতিনিধি ড. আম্বেদকর কি তাদের জন্য পৃথক নির্বাচনক্ষেত্র চাইবেন? ড. আম্বেদকরের প্রতি আমার গভীর শ্রদ্ধা রয়েছে। তাঁর তিক্ত হওয়ার অধিকার আছে। তিনি যে আমাদের মাথা ভাঙেন না, এটা তাঁর সংযমের পরিচয়। এখন তিনি অবিশ্বাসের শেষ সীমায় আছেন বলে অন্য কিছু দেখতে পাচ্ছেন না। সব হিন্দুকে তিনি অন্ত্যজ-বিরোধী ধরে নেন, এবং এটাই স্বাভাবিক। দক্ষিণ আফ্রিকাবাসের প্রথম দিকে আমারও অনুরূপ মানসিকতা হয়েছিল, আমি যেখানেই যাই ইউরোপীয়রা আমায় তাড়া করত। এটা তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক যে, তিনি তাঁর ক্রোধ প্রকাশ করছেন। কিন্তু তিনি যে পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী চাইছেন, তা সামাজিক সংস্কার দেবে না। তিনি নিজে হয়তো ক্ষমতা ও মর্যাদার শীর্ষে পৌঁছবেন, কিন্তু অন্ত্যজদের ভাল কিছু হবে না। বহুদিন অন্ত্যজদের সঙ্গে বসবাস এবং তাদের সুখ-দুঃখের সঙ্গী হয়ে আমি এটা হক করে বলতে পারি।'

শ্রী গান্ধী 'গোল টেবিল বৈঠকে' শুধু প্রচার নিয়েই খুশি ছিলেন না। যখন দেখলেন যে আশা অনুযায়ী প্রচারে কাজ হচ্ছে না, তখন উনি ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলেন। যখন গান্ধী শুনলেন যে প্রধানমন্ত্রীর প্রস্তাব অনুযায়ী সংখ্যালঘুরা একটা বুঝাপড়ায় এসে যাবেন এবং এর সূত্রে অন্ত্যজরা অন্যান্য সংখ্যালঘু, বিশেষ করে মুসলমানদের সমর্থন পেয়ে যাচ্ছেন, তখন তিনি বিব্রত বোধ করলেন। অন্ত্যজদের বিচ্ছিন্ন করার জন্য তিনি একটা পরিকল্পনা ফাঁদলেন। এজন্য শ্রী গান্ধী মুসলমানদের সরিয়ে আনতে তাঁদের ১৪ দফা দাবি মেনে নিলেন, আগে এই দাবি তিনি মানতে অরাজি ছিলেন। যখন তিনি দেখলেন যে, মুসলমানরা অন্ত্যজদের সমর্থন দিতে চলেছে, তখন তাঁদের ১৪ দফা দাবি মানতে রাজি হলেন এই শর্তে যে, তাঁরা অন্ত্যজদের থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করবেন। একটা চুক্তির খসড়া করা হয়। এর

বয়ান নিচে দেওয়া হল :

গান্ধী-মুসলমান চুক্তির খসড়া[১]

গোল টেবিল বৈঠকে মুসলমান প্রতিনিধিবর্গ[২]

ফোন : ভিক্টোরিয়া ২৩৬০
টেলিগ্রাম : কোর্টলাইক, লন্ডন

কুইন্স হাউস
৫৭, সেন্ট জেমস কোর্ট
বাকিংহাম গেট
লণ্ডন এস. ডব্লু. ১
৬ অক্টোবর ১৯৩১

নিম্নলিখিত প্রস্তাবসমূহ নিয়ে শ্রী গান্ধী ও মুসলমান প্রতিনিধিদের মধ্যে আলোচনা হয় গতকাল রাত ১০ টায়। তাঁরা দুই মতে ভাগ হয়ে যান—অধিকার সুরক্ষিত করার জন্য মুসলমানদের প্রস্তাব এবং কংগ্রেসনীতি নিয়ে গান্ধীর প্রস্তাব। এই প্রস্তাবগুলি তুলে ধরা হল, গান্ধী এগুলি অনুমোদন করে মুসলমান প্রতিনিধিদের কাছে দেন তাঁদের মতামতের জন্য।

মুসলমান প্রস্তাবসমূহ	শ্রী গান্ধীর প্রস্তাব
১। পঞ্জাব ও বাংলায় মুসলমানদের মাত্র ১% সংখ্যাগরিষ্ঠতা। এখন প্রশ্ন হল যুক্ত নির্বাচকমণ্ডলী না আইনসভায় ৫১% সংরক্ষণ, এটি নতুন সংবিধানে কার্যকরী হওয়ার আগে মুসলমান ভোটারদের সামনে রাখতে হবে এবং তাদের রায় মেনে নিতে হবে। ২। যেসব প্রদেশে মুসলমানরা সংখ্যালঘু, সেখানে বর্তমানে চালু গুরুত্বভার (Weightage) প্রথা থাকবে,	১। প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচন হবে। ২। শিখ ও হিন্দু সংখ্যালঘু ছাড়া বিশেষ সংরক্ষণ থাকবে না। ৩। কংগ্রেসের দাবিসমূহ : ক) সম্পূর্ণ স্বাধীনতা। খ) প্রতিরক্ষায় অবিলম্বে পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ। গ) পররাষ্ট্র বিষয়ে পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ। ঘ) অর্থ বিষয়ে পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ।

১. এই দলিলটি আমার 'থটস্ অন পাকিস্তান' (Thoughts on Pakistan)-এ পরিশিষ্টে ছেপেছি ১৯৩৯ সালে। প্রথম প্রকাশিত হয় তখন-ই। এর প্রামাণিকতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠেনি। এর কপি আমি এক হিন্দু প্রতিনিধির কাছ থেকে সংগ্রহ করি, মুসলিম লীগের সঙ্গে তিনি এই গোপনতায় শরিক ছিলেন।

২. এর থেকে স্পষ্ট, দলিলটি মুসলিম লীগ প্রতিনিধিদের কাগজে লেখা।

মুসলমান প্রস্তাবসমূহ	শ্রী গান্ধীর প্রস্তাব
কিন্তু আসনগুলি যুক্ত নির্বাচকমণ্ডলী না পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী হবে নতুন সংবিধানে তা মুসলমানদের মধ্যে গণভোটে ঠিক করতে হবে এবং তাদের রায় মেনে নিতে হবে। ৩। কেন্দ্রীয় আইনসভার উভয় কক্ষে ব্রিটিশ ভারতীয় মোট প্রতিনিধিদের ন্যূনতম ২৬% মুসলমান প্রতিনিধিত্ব এবং রীতি অনুযায়ী ৭% মুসলমান থাকবে প্রাদেশিক কোটায়, অর্থাৎ কেন্দ্রীয় আইনসভায় এক তৃতীয়াংশ প্রতিনিধিত্ব। ৪। অনির্ধারিত ক্ষমতা থাকবে ব্রিটিশ ভারতের প্রজাতান্ত্রিক প্রদেশসমূহে। ৫। নিচের বিষয়গুলি সম্বন্ধে সহমত হল : ১) সিন্ধু[১] ২) উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ[২] ৩) জন-কৃত্যকে[৩] ৪) মন্ত্রিসভায়[৪] ৫) মৌলিক অধিকার এবং সংস্কৃতি ও ধর্মের নিরাপত্তা ৬) কোনও সম্প্রদায়ের ক্ষতিকারক আইনের বিরুদ্ধে সুরক্ষা	ঙ) সরকারি ঋণের বিষয়ে ও অন্যান্য দায় সম্বন্ধে নিরপেক্ষ ন্যায়পীঠ নিয়ে তদন্ত। চ) অংশীদার ব্যবস্থার মতো উভয় পক্ষের অধিকার থাকবে চুক্তি বাতিলের।

১. সিন্ধুর বিভাগের পরের অবস্থা
২। উত্তর পশ্চিম সীমান্তের দায়িত্বশীল সরকার ও প্রাদেশিক স্বাধিকারের পর।
৩। জন-কৃত্যকে প্রতিনিধিত্ব
৪। মন্ত্রিসভায় প্রতিনিধিত্ব

এটা সত্য যে, খসড়া চুক্তিতে অন্ত্যজদের উল্লেখ নেই। তবে মুসলমান, শিখ ছাড়া আর কোনও সংখ্যালঘুকে সমর্থন করবে না, এর থেকে পরিষ্কার, তারা অন্ত্যজদের পক্ষে সমর্থন করবে না। এই চক্রান্তে শ্রী গান্ধী ব্যর্থ হন, ব্যর্থ হতে বাধ্য যে, মুসলমানরা নিজেদের নিরাপত্তার জন্য দাবিতে উচ্চকণ্ঠ, তারা অন্ত্যজদের দাবির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে বিরোধিতা করতে পারেনি। অন্ত্যজদের দমনে আবেগ-তাড়িত শ্রী গান্ধীর ন্যায়-অন্যায় বোধ এমন লুপ্ত হয়েছিল যে, সৎ পন্থা এবং অসৎ পন্থার পার্থক্য ভুলে গিয়েছিলেন। গান্ধী তাঁর নিজের কথার সম্মান দেননি। শ্রী গান্ধী বলেছিলেন, কমিটি অন্ত্যজদের জন্য পৃথক স্বীকৃতির দাবি মেনে নিতে চাইলে তা করতে পারে, যার অর্থ দাঁড়ায় যে, তিনি সংখ্যাগরিষ্ঠের সিদ্ধান্ত মেনে নেবেন। কিন্তু তিনি যখন বুঝলেন যে, অন্যান্য সংখ্যালঘুরা অন্ত্যজদের সমর্থনে রাজি, তিনি মুসলমানদের কাছে যেতে দ্বিধা করলেন না এবং তাদের ১৪ দফা দাবি মেনে মুসলমানদের অন্ত্যজ-বিরোধী করে তুললেন, অথচ আগে এই ১৪ দফা কংগ্রেস, হিন্দু মহাসভা, এমনকী সাইমন কমিশনও প্রত্যাখ্যান করেছিল। শ্রী গান্ধী জনমত ও জন-নৈতিকতা অবজ্ঞা করতে প্রস্তুত ছিলেন, গান্ধীর এই শয়তানি ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়, কারণ মুসলমানরা এতে যুক্ত হয়ে নিজেদের অবমানিত করতে রাজি হননি। 'গোল টেবিল বৈঠকে'র দ্বিতীয় দফা মুলতুবি হলে প্রতিনিধিরা সংখ্যালঘু কমিটির কাছে লিখিতভাবে সাম্প্রদায়িক প্রশ্নের মীমাংসা সালিসির দায়িত্ব দেন। শ্রী গান্ধী সহ বহু প্রতিনিধি[১] তা করেন প্রতিনিধিদের ভারতে ফিরে আসা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না এবং প্রধানমন্ত্রীকে একমাত্র সালিসি করায় তাঁর সিদ্ধান্তের জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া কোনও উপায় ছিল না।

VI

আমার কথা পুনরায় শুরুর আগে এবং প্রধানমন্ত্রীর সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে বলার আগে, আমার উচিত সেই বিচিত্র ঘটনার বিবরণ দেওয়া, ভোটাধিকার কমিটির **(Franchise committee)** সদস্য হিসাবে এটা আমি প্রত্যক্ষ করি 'গোল টেবিল বৈঠকে'র দ্বিতীয় অধিবেশন বন্ধের পর। প্রধানমন্ত্রী মনে করেন, নতুন সংবিধানে ভোটাধিকার প্রশ্ন একটি কমিটিকে দিয়ে পরীক্ষা করানো দরকার। সেইমতো, ডিসেম্বর ১৯৩১ তিনি প্রয়াত লর্ড লোথিয়ানকে সভাপতি করে এক কমিটি বসান। এর মূল বিষয়সূচি ছিল ভোটাধিকারের একটা প্রথা উদ্ভাবন সভাপতিকে দেওয়া নির্দেশপত্রে তাঁর ভাষাতেই উদ্ধৃত করা যাক :

---

১. আমি বিধিমতো কোনও দাবি করিনি। আমি মনে করি, অস্পৃশ্যতার দাবি এত যুক্তিযুক্ত যে, এর জন্য কোনও সালিসির দরকার নেই।

'যেসব আইনসভার ওপর দায়িত্ব দেওয়া হবে তাতে সাধারণ মানুষের প্রতিনিধিরাই থাকবেন, এবং কোনও সম্প্রদায়ের গুরুত্বপূর্ণ অংশ যেন নিজের চাহিদা ও মতামত প্রকাশের পক্ষে সঙ্গতিহীন না হয়।'

১৯৩২, জানুয়ারির শুরুতে কমিটি কাজ আরম্ভ করে। কমিটির কাজে সাহায্য করে প্রাদেশিক সরকারসমূহ এবং প্রদেশের বেসরকারি প্রতিনিধি সমন্বিত প্রাদেশিক ভোটাধিকার কমিটিগুলি। কমিটি প্রশ্নাবলী প্রকাশ করে, সেগুলির উত্তর দেয় প্রাদেশিক সরকার, প্রাদেশিক ভোটাধিকার কমিটি এবং বিভিন্ন ব্যক্তি। কমিটি প্রতিটি প্রাদেশিক ভোটাধিকার কমিটির সঙ্গে বসে সাক্ষ্য পরীক্ষা করে। প্রাদেশিক সরকার ও প্রাদেশিক কমিটি পৃথকভাবে কমিটির কাছে রিপোর্ট পেশ করে। কমিটি সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে প্রাদেশিক সরকার ও প্রাদেশিক কমিটির সঙ্গে রিপোর্ট নিয়ে আলোচনায় বসে। সাধারণ দায়িত্ব ছাড়াও লোথিয়ান কমিটির বিশেষ দায়িত্ব ছিল প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত কাজ। অন্ত্যজদের রাজনৈতিক দাবি বিষয়টি এতে ছিল, প্রধানমন্ত্রী সভাপতির কাছে চিঠিতে এ-সম্পর্কে বলছেন :

'সম্মেলনে বিভিন্ন আলোচনার সূত্রে পরিষ্কার যে, নতুন সংবিধানে অনুন্নত সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করতে হবে, এবং প্রতিনিধি মনোনয়নের প্রথা যথাযথ নয়। আপনারা অবগত আছেন, অনুন্নত সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী নিয়ে মতভেদ রয়েছে এবং এই প্রশ্নে সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে আপনার কমিটিকে পর্যালোচনা করে বলতে হবে সাধারণ নির্বাচকমণ্ডলীতে অনুন্নত সম্প্রদায়ের ভোটাধিকার নিশ্চিত করতে ভোটাধিকার কতটা প্রসারিত করতে হবে। অন্যদিকে শেষে যদি অনুন্নত সম্প্রদায়ের জন্য সাধারণভাবে বা যেসব প্রদেশে তাদের বিশিষ্ট ও পৃথক অস্তিত্ব আছে সেখানে পৃথক নির্বাচকমণ্ডলীর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, তখন আপনার কমিটিকে ভোটাধিকার বিস্তৃত করার সাধারণ সমস্যাদি পর্যালোচনা করে অনুন্নতদের পৃথক প্রতিনিধিত্ব সহজ করার পন্থা উদ্ভাবন করতে হবে।'

এইসব নির্দেশাবলী অনুসারে কমিটির দায়িত্ব হয়ে যায় ব্রিটিশ ভারতে অন্ত্যজদের সমগ্র জনসংখ্যার বিষয়ে উপসংহারে আসার। অন্ত্যজদের জনসংখ্যা কত, এই প্রশ্নের প্রাপ্ত উত্তর সবাইকে বিচলিত করে। একের পর এক সাক্ষী এসে বলেন, তাঁর প্রদেশে অন্ত্যজদের সংখ্যা নগণ্য। এমন সাক্ষীরও অভাব হয়নি যিনি বলেন যে, অন্ত্যজ কোথাও নেই-ই! হিন্দু সাক্ষীরা মিথ্যা হলফ করে অন্ত্যজদের অস্তিত্ব অস্বীকার বা সংখ্যা কমিয়ে বলছেন, এই দৃশ্য চমকপ্রদ ছিল। প্রাদেশিক ভোটাধিকার কমিটির সদস্যরাও এই পরিকল্পনার সহযোগী ছিলেন। বিস্ময়ের সঙ্গে বলতে হচ্ছে, লোথিয়ান

কমিটির হিন্দু সদস্যরা এই খেলায় ছিলেন। অন্ত্যজদের অস্তিত্ব অস্বীকার করা বা তাদের সংখ্যা কমিয়ে শূন্যের কাছাকাছি নিয়ে আসার প্রয়াস কয়েকটি প্রদেশে প্রবল ছিল। হিন্দুরা কীভাবে প্রকৃত সংখ্যা কমিয়ে প্রায় অদৃশ্য করে দেখান, তা প্রকট হবে নিম্নোক্ত তথ্যে। যুক্তপ্রদেশে ১৯৩১ সালে আদমশুমার মহাধ্যক্ষের হিসাবে অন্ত্যজদের মোট সংখ্যা ১.২৬ কোটি, প্রাদেশিক সরকারের মতে ৬৮ লক্ষ, কিন্তু প্রাদেশিক ভোটাধিকার কমিটির হিসাবে মাত্র ৬ লক্ষ! বাংলায় আদমশুমারের মতে ১.০৩ কোটি, প্রাদেশিক সরকার বলে ১.১২ কোটি, কিন্তু প্রাদেশিক ভোটাধিকার কমিটি বলে ৭ লক্ষ মাত্র!

'গোল টেবিল বৈঠকে'র আগে অন্ত্যজদের প্রকৃত জনসংখ্যা নিয়ে কোনও হিন্দু মাথা ঘামাত না, তারা আদমশুমারের প্রদত্ত সংখ্যা ৭-৮ কোটি সঠিক বলে মেনে নিত। লোথিয়ান কমিটি এই প্রশ্নটি গ্রহণ করার পর হিন্দুরা হঠাৎ এই সংখ্যা সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলল কেন? উত্তর সহজ। লোথিয়ান কমিটি হওয়ার আগে অন্ত্যজদের জনসংখ্যার কোনও গুরুত্ব ছিল না। কিন্তু 'গোল টেবিল বৈঠকে'র পর হিন্দুরা বুঝলেন যে, অন্ত্যজরা পৃথকভাবে প্রতিনিধিত্বের অংশ দাবি করছেন, এবং এই অংশটা এতদিন হিন্দুদের ভোগ করা অংশ থেকে কেটে দিতে হবে, এবং এই অংশ নির্ভর করবে অন্ত্যজদের জনসংখ্যার ওপর। হিন্দুরা বুঝেছেন যে, অন্ত্যজদের অস্তিত্ব স্বীকার করলে তাদের স্বার্থ বিপন্ন হবে। সত্য ও শালীনতা বিসর্জন দিতে কুণ্ঠিত না হয়ে তাঁরা সবচেয়ে নিরাপদ পন্থা নিলেন, ভারতে কোনও অন্ত্যজ আছে বলে স্বীকার-ই করলেন না, এবং অন্ত্যজদের রাজনৈতিক দাবির মূলে আঘাত করে যুক্তির অবকাশ রাখলেন না। এতেই স্পষ্ট, হিন্দুরা ঠাণ্ডা মাথায় হিসাব করে অন্ত্যজদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে অপ্রত্যক্ষভাবে যা করলেন তা সরাসরি করতে পারতেন না।

VII

পুরানো কথায় আসা যাক। 'গোল টেবিল বৈঠকে' বিরক্ত হয়ে গান্ধী প্রথম ভারতে ফেরেন, এইখানে তাঁর ভক্ত কেউ ছিলেন না, সমালোচক ছিলেন। রোমের সংবাদপত্রের এক প্রতিনিধিকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি আবার সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু করার হুমকি দেন, এই বিবৃতিদানের অভিযোগে ভারতে ফিরলেই তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। জেলেও তাঁর চিন্তায় স্বরাজের চেয়ে অন্ত্যজরাই ছিল। তাঁর আশঙ্কা, জীবন দিয়ে প্রতিরোধের হুমকি সত্ত্বেও হয়তো সালিসি হিসাবে প্রধানমন্ত্রী 'গোল টেবিল বৈঠকে' পেশ করা অন্ত্যজদের দাবি মেনে নেবেন। প্রধানমন্ত্রীর সিদ্ধান্ত গ্রহণের অনেক আগে ১১ মার্চ, ১৯৩২ শ্রী গান্ধী জেল থেকে ভারতের তদানীন্তন

ভারত সচিব স্যার স্যামুয়েল হোয়রকে অন্ত্যজদের দাবির প্রতি তাঁর বিরোধিতা স্মরণ করিয়ে এক চিঠি দেন। সেই চিঠির মর্মার্থ হল :

'প্রিয় স্যার স্যামুয়েল,

আপনার বোধহয় স্মরণ হয়েছে, 'গোল টেবিল বৈঠকে' আমার বিবৃতির শেষে সংখ্যালঘুদের দাবি যখন পেশ করা হয়, আমি বলেছিলাম, অন্ত্যজদের জন্য পৃথক নির্বাচকমণ্ডলীর দাবি আমি জীবন দিয়ে রোধ করব। এটা উত্তেজনার মুহূর্তে বা বাক্যালঙ্কার হিসাবে বলা হয়নি। অত্যন্ত আন্তরিক বিবৃতি ছিল এটা। ওই বিবৃতি অনুসারে, ভারতে প্রত্যাবর্তনের পর অন্ত্যজদের জন্য পৃথক নির্বাচকমণ্ডলীর বিরুদ্ধে জনমত সংগঠিত করব ভেবেছিলাম। কিন্তু এটা হওয়ার নয়।

'যেসব সংবাদপত্র পড়ার অনুমতি পাই তার থেকে জানলাম, যে-কোনও মুহূর্তে সম্রাটের সরকার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করতে পারেন। প্রথমে আমি ভেবেছিলাম, সিদ্ধান্তে যদি অন্ত্যজদের পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী দেওয়া হয়, আমার শপথ রক্ষায় যথাযথ করার চেষ্টা করব। কিন্তু আমি মনে করি, আগে না জানিয়ে কিছু করা ব্রিটিশ সরকারের প্রতি অন্যায় করা হবে। স্বভাবতই, তাঁরা আমার বিবৃতির গুরুত্ব দিতে পারবেন না।

'অন্ত্যজদের পৃথক নির্বাচকমণ্ডলীর বিরুদ্ধে আমার আপত্তির সব কারণ পুনরুক্তির দরকার নেই। আমি মনে করি, আমি ওদের-ই একজন। তাদের দাবি অন্যদের চেয়ে ভিন্ন অবস্থান থেকে উদ্ভূত। আইনসভায় তাদের প্রতিনিধিত্বের বিরুদ্ধে আমি নই। আমি চাই, তাদের সবাই, মহিলা-পুরুষ নির্বিশেষে, সম্পত্তি বা শিক্ষাগত যোগ্যতা নিরপেক্ষ শর্তে ভোটার হিসাবে নথিভুক্ত হোক, অন্যান্যদের ক্ষেত্রে ভোটাধিকার শর্ত কঠোর হলেও এদের ক্ষেত্রে তা হবে না। কিন্তু আমি মনে করি যে, পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী তাদের এবং হিন্দুদের পক্ষে ক্ষতিকর, কট্টর রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে যাই বলা হোক না কেন। পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী তাদের কী ক্ষতি করবে বুঝাবার জন্য বলি, সবাইকে বুঝতে হবে, তারা কীভাবে বর্ণহিন্দুদের মধ্যে বাস করছে ও নির্ভর করে আছে। হিন্দুবাদের ক্ষেত্রে বলা যায়, পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী হিন্দুদের অবিভক্ত করবে।'

'আমার কাছে এইসব শ্রেণীর প্রশ্ন মূলত নৈতিক ও ধর্মীয়। ধর্মীয় ও নৈতিক প্রশ্নের তুলনায় রাজনৈতিক দিকটা অকিঞ্চিৎকর।

'এ বিষয়ে আমার মনোভাব যথাযথভাবে মূল্যায়ন করতে হলে আপনাদের

স্মরণ করতে হবে যে, আমার বাল্যকাল থেকে এই সম্প্রদায়ের অবস্থার কথা ভেবেছি, একাধিকবার তাদের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করেছি। নিজের গর্ব জাহির করার জন্য এসব বলছি না। কারণ আমি মনে করি, যুগ যুগ ধরে হিন্দুরা অনুন্নত সম্প্রদায়ের ওপর যে নিপীড়ন, অত্যাচার করেছে, কোনও প্রায়শ্চিত্তই এর ক্ষতিপূরণ করবে না।

'কিন্তু আমি জানি যে, পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী তাদের অবমাননার পক্ষে কোনও প্রতিকার বা প্রায়শ্চিত্ত নয়। সেজন্য আমি, সম্রাটের সরকারের কাছে নিবেদন করতে চাই, অন্ত্যজদের জন্য পৃথক নির্বাচকমণ্ডলীর সিদ্ধান্ত হলে আমি আমরণ অনশন করতে বাধ্য হব।

'আমি বেদনাহতভাবে সচেতন যে, কারাবাসকালে এই পদক্ষেপ সম্রাটের সরকারের পক্ষে বিব্রতজনক হবে, আমার এই অবস্থায় রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এই পন্থাগ্রহণকে অনেকে অত্যন্ত আপত্তিকর ও মৃগীরোগগ্রস্ত বলে অভিহিত করবেন। আত্মপক্ষ সমর্থনে এটুকুই বলতে পারি যে, এই প্রস্তাবিত পদক্ষেপ কোনও পন্থা নয়, আমার সত্তার অংশ। এ আমার বিবেকের আহ্বান, একে আমি অমান্য করি না, এমনকী এতে আমার প্রকৃতিস্থতার মর্যাদাহানি হলেও, আমি এটা মানব। যতদূর দেখতে পাচ্ছি, জেল থেকে ছাড়া পেলেও অনশন সত্যাগ্রহের কর্তব্য পরিহার সম্ভব নয়। তবে এখনও আশা করছি, আমার সব আশঙ্কা অমূলক হয়তো, এবং ব্রিটিশ সরকার অনুন্নতদের জন্য পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী করতে ইচ্ছুক নন।'

এর উত্তরে ভারত সচিব গান্ধীকে চিঠি পাঠান :

ইন্ডিয়া অফিস, হোয়াইট হল
এপ্রিল ১৩, ১৯৩২

প্রিয় শ্রী গান্ধী,

আপনার ১১ মার্চ লেখা পত্রের উত্তরে এই চিঠি। এবং প্রথমেই বলি আমি অনুন্নত সম্প্রদায়ের পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী প্রশ্নে আপনার তীব্র অনুভূতির ব্যাপার বুঝি। শুধু এইটুকু বলতে পারি যে, আমরা বিশেষ সমস্যার গুরুত্ব এবং প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী সিদ্ধান্ত দিতে আগ্রহী। আপনি জানেন, লর্ড লোথিয়ান কমিটি এখনও ভ্রমণ সম্পূর্ণ করেননি, এর গৃহীত সিদ্ধান্ত পেতে আরও কয়েক সপ্তাহ সময় নেবে। আমরা ওই প্রতিবেদন পেলে তার সুপারিশগুলি পর্যালোচনা করব, এবং সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে কমিটির সুপারিশ ছাড়াও আপনি বা আপনার মতানুগামীরা যেসব

মত প্রকাশ করেছেন তা গণ্য করব। আমি নিশ্চিত জানি যে, আপনি আমার অবস্থানে থাকলে একই-ভাবে কাজ করতেন। কমিটির প্রতিবেদন পেয়ে আপনিও এর পুরো পর্যালোচনার পর এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে বিতর্কে উভয় পক্ষের মতকে গণ্য করতেন। এর বেশি আমি কিছু বলতে পারি না। বস্তুত আমি ভাবতে পারি না যে, এর থেকে বেশি কিছু আমি বলব, আপনি তা আশা করেন।'

এই সতর্কবাণী দেওয়ার পর গান্ধী এই বিষয়ে চুপ ছিলেন এই ভেবে যে, আবার আমরণ অনশনের হুমকি ব্রিটিশ সরকারকে পঙ্গু করতে যথেষ্ট এবং অন্ত্যজদের পৃথক নির্বাচকমণ্ডলীর দাবি গ্রহণ থেকে নিবৃত্ত করবে। ১৭ আগস্ট, ১৯৩২ সাম্প্রদায়িক প্রশ্নে প্রধানমন্ত্রীর সিদ্ধান্ত ঘোষিত হয়। সিদ্ধান্তের যে অংশ অনুন্নতদের সংশ্লিষ্ট, তার বয়ান হল :

মহামান্য সম্রাটের সরকারের সাম্প্রদায়িক প্রশ্ন বিষয়ক সিদ্ধান্ত, ১৯৩২ : 'গোল টেবিল বৈঠকে'র দ্বিতীয় অধিবেশনের শেষে ১ ডিসেম্বর মহামান্য সম্রাটের সরকারের পক্ষে প্রধানমন্ত্রী যে বক্তৃতা দেন এবং পরে হাউস অব কমন্স যা গ্রহণ করেন, তাতে পরিষ্কার বলা হয়েছে যে, সংশ্লিষ্ট সংখ্যালঘুরা সাম্প্রদায়িক প্রশ্নে সব পক্ষের গ্রহণযোগ্য কোনও মীমাংসায় আসতে না পারলে সম্রাটের সরকার দৃঢ়-সঙ্কল্প যে, এই কারণটি সংবিধান রচনার কাজে বাধা মানা হবে না এবং সরকার নিজের থেকে সাময়িক পরিকল্পনার দ্বারা এই বাধা দূর করবে।

২। গত ১৯ মার্চ মহামান্য সম্রাটের সরকার যখন অবগত হয় যে, সম্প্রদায়গুলি মীমাংসায় আসতে ব্যর্থ হওয়ায় সংবিধান রচনার কাজ বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে, সরকার জানায় যে, তারা উদ্ভূত পরিস্থিতির সমস্যা ও অসুবিধাগুলি পুনরায় পর্যালোচনা করছে। তারা এ বিষয়ে সন্তুষ্ট যে, নতুন সংবিধানে সংখ্যালঘুদের সমস্যাগুলি সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত না হলে সংবিধান রচনার কাজ এগোবে না।

৩। সম্রাটের সরকার সেজন্য ঠিক করেছে যে, তারা নিম্নে বর্ণিত পরিকল্পনা ভারতীয় সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করবে, এই সংবিধান যথাসময়ে পার্লামেন্টে পেশ করা হবে। এই পরিকল্পনার পরিধি সীমাবদ্ধ থাকবে প্রাদেশিক আইনসভায় বিভিন্ন ভারতীয় সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব দানের ব্যবস্থা, কেন্দ্রীয় আইনসভায় প্রতিনিধিত্বের প্রশ্নটি মুলতুবি রাখা হল নিচের অনুচ্ছেদ ২০-তে বর্ণিত বলে। পরিধি সীমাবদ্ধ করার অর্থ পরিকল্পনার ব্যর্থতা এমন নয়, সংবিধান রচনার কাজের সূত্রে সংখ্যালঘুদের নানা জটিল অথচ গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার প্রশ্ন এসে যায়, আশা করা হচ্ছে পদ্ধতির মৌলিক প্রশ্নে এবং প্রতিনিধিত্বের ব্যাপারেই সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠী নিজেরাই অন্যান্য

সাম্প্রদায়িক সমস্যার মীমাংসা পদ্ধতি বার করে ফেলবে।

৪। সম্রাটের সরকার এটা পরিষ্কার বুঝিয়ে দিতে চায় যে, সিদ্ধান্ত সংশোধনের ব্যাপারে সরকার আলোচনার কোনও পক্ষ হবে না, এবং সব রাজনৈতিক দল কর্তৃক গৃহীত কোনও প্রস্তাব ছাড়া অন্য সংশোধনের জন্য স্মারকপত্র বিচার করবে না। তবে কোনও সর্বসম্মত বুঝাপড়া হলে তার জন্য দরজা বন্ধ রাখা হবে না। যদি নতুন ভারত শাসন আইন কার্যকরী হওয়ার আগে সরকার বোঝে যে সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠী একটি বা তার বেশি প্রদেশে বা সমগ্র ব্রিটিশ ভারতে বিকল্প কোনও পরিকল্পনা নিয়ে বুঝাপড়ায় এসেছে, সরকার সেক্ষেত্রে এখনকার প্রস্তাবিত ধারার বদলে বিকল্প প্রস্তাব গ্রহণের জন্য পার্লামেন্টের কাছে সুপারিশ করবে।

৫। * * * * *

৬। * * * * *

৭। * * * * *

৮। * * * * *

৯। অবদমিত সম্প্রদায়ের যেসব সদস্য ভোটাধিকার-যোগ্য, তাঁরা সাধারণ কেন্দ্রে ভোট দেবেন। বেশ কিছুকাল এইভাবে তাঁরা আইনসভায় কোনও প্রতিনিধিত্ব অর্জন করতে পারবেন না, এই ঘটনা বিবেচনা করে তাদের জন্য কয়েকটি বিশেষ আসন রাখা হবে, এর বিবরণ তালিকায় রয়েছে। এই আসনগুলি বিশেষ কেন্দ্রের ভোটে পূরণ হবে, শুধুমাত্র অবদমিত সম্প্রদায়ের লোকেরাই সেখানে ভোট দেবেন। এই বিশেষ কেন্দ্রে যাঁরা ভোট দেবেন, তাঁরা সাধারণ কেন্দ্রেও ভোট দিতে পারবেন। অবদমিত সম্প্রদায়ের মানুষ যেখানে বহুসংখ্যক, সেসব জায়গায় বিশেষ কেন্দ্র করা হবে, এটাই লক্ষ্য এবং মাদ্রাজ ছাড়া অন্য প্রদেশে এইসব কেন্দ্র পুরো এলাকায় থাকবে না।

বাংলায় কিছু সাধারণ কেন্দ্রে ভোটারদের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ হবে অবদমিত সম্প্রদায়ের মানুষ। সেজন্য, আরও তদন্তসাপেক্ষে এই প্রদেশে বিশেষ অবদমিত শ্রেণীর কেন্দ্রের সংখ্যা নির্ধারিত করা হয়নি। এটা মনে করা হচ্ছে, বাংলার আইনসভায় অবদমিত সম্প্রদায়ের জন্য কম করে ১০টা আসন থাকবে।

ওইসব অবদমিত সম্প্রদায়ের কেন্দ্রে কারা ভোট দিতে পারবেন, তার সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা এখনও নির্ধারিত হয়নি। ভোটাধিকার কমিটির প্রতিবেদনে সুপারিশ-কৃত সাধারণ নীতির ভিত্তিতে এটা ঠিক হবে। উত্তর ভারতের কয়েকটি প্রদেশে হয়তো পরিমার্জনার

দরকার হবে, কারণ অস্পৃশ্যতার সাধারণ সংজ্ঞা ওই প্রদেশের বিশেষ পরিস্থিতিতে প্রাসঙ্গিক বলে গণ্য নাও হতে পারে।

মহামান্য সম্রাটের সরকার মনে করে না যে, অবদমিত সম্প্রদায়ের জন্য নির্দিষ্ট আসন সীমিত সময়ের পর দরকার হবে। তাদের ইচ্ছা, সংবিধানে এর স্থায়িত্বসীমা ২০ বছর ধার্য রাখা হবে, প্যারা ৬-এর সংশোধন অনুযায়ী আগেই সাধারণ ক্ষমতাবলে এর অবসান না হলে এই সীমাই কার্যকরী হবে।

VIII

শ্রী গান্ধী বুঝেছিলেন, তাঁর হুমকি কোনও কাজে আসেনি। তাঁর হুঁশ ছিল না যে, তিনি নিজে প্রধানমন্ত্রীকে সালিসি করার অনুরোধপত্রে স্বাক্ষর করেছিলেন। তিনি ভুলে গিয়েছিলেন, স্বাক্ষরকারী হিসাবে সালিসির রায় মানতে তিনি বাধ্য। প্রধানমন্ত্রীর কাজ ভেস্তে দেওয়ার চেষ্টা শুরু করলেন। প্রথমে তিনি, সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ সংশোধনের চেষ্টা করলেন। সেই অনুযায়ী, তিনি প্রধানমন্ত্রীকে এই চিঠি লেখেন :

যারবেদা কেন্দ্রীয় কারাগার
আগস্ট ১৮, ১৯৩২

প্রিয় বন্ধু,

'সন্দেহ নেই এর মধ্যে নিশ্চয়ই স্যার স্যামুয়েল হোয়র অনুন্নত সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব বিষয়ে আপনাকে এবং মন্ত্রিসভাকে লেখা আমার চিঠি দেখিয়েছেন। সেই চিঠিটি এই পত্রের অংশ হিসাবে বিবেচনা করে একত্রে পড়বেন।

'সংখ্যালঘুদের প্রতিনিধিত্ব নিয়ে ব্রিটিশ সরকারের সিদ্ধান্ত আমি পড়েছি এবং প্রশ্নটি ভবিষ্যতের জন্য তুলে রেখেছিলাম। স্যামুয়েল হোয়রকে লিখিত পত্র এবং ১৩ নভেম্বর ১৯৩১ সেন্ট জেমস প্যালেস-এ 'গোল টেবিল বৈঠকে'র সংখ্যালঘু কমিটির সভায় আমার ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে আমি জীবন দিয়ে আপনার সিদ্ধান্তের প্রতিরোধ করব। এর একমাত্র পথ হল আমরণ অনশন এবং শুধু লবণ বা সোডাযুক্ত জল ছাড়া কোনওরকম খাদ্যগ্রহণ বন্ধ করা। এই অনশন চলাকালে ব্রিটিশ সরকার নিজ সিদ্ধান্তে বা জনমতের চাপে যদি সিদ্ধান্ত বদল করে এবং অনুন্নত সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক নির্বাচকমণ্ডলীর পরিকল্পনা প্রত্যাহার করে এদের প্রতিনিধিত্ব সাধারণ নির্বাচকমণ্ডলী থেকে করা হয়, তাহলে আমি অনশন বন্ধ করব।

'ইতিমধ্যে এই ধারায় সিদ্ধান্ত বদল না হলে ২০ সেপ্টেম্বর দুপুর থেকে প্রস্তাবিত অনশন কার্যকরী হবে।

'এখানকার কর্তৃপক্ষকে আমি অনুরোধ করছি, আমার চিঠির বয়ান তারবার্তা করে আপনার কাছে পাঠাক। তবে যাই হোক, আমি যথেষ্ট সময় রাখছি যাতে সবচেয়ে ধীর লয়ে পত্র আপনার কাছে পৌঁছনোর অবকাশ পায়।'

'আমি আরও চাইছি, স্যামুয়েল হোয়েরকে দেওয়া চিঠি এবং এই চিঠি অবিলম্বে প্রকাশ করা হোক। আমি জেলের বিধি অনুসরণ করেছি এবং আমার ইচ্ছার কথা বা দুটি চিঠির বক্তব্য মাত্র দু'জন বন্ধুকে—বল্লভভাই প্যাটেল ও মহাদেব দেশাইকে জানিয়েছি। কিন্তু আমি চাই, আপনার পক্ষে যদি সম্ভব হয়, আমার চিঠির প্রভাব জনমতের ওপর আসুক। সেজন্যই এর সত্বর প্রকাশ চাই।

'সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য আমি দুঃখিত। কিন্তু ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি হিসাবে আমার কাছে অন্য পথ খোলা নেই। হোয়রকে চিঠিতে আমি বলেছি, ব্রিটিশ সরকার অস্বস্তি এড়াতে আমায় মুক্তি দিলেও আমার অনশন চলবে। কারণ, এখন অন্য কোনওভাবে এই সিদ্ধান্ত রোধ করার আশা দেখি না ; এবং আমার মুক্তি আদায়ের জন্য সম্মানীয় পন্থা ছাড়া অন্য পথ নেব না।

'হতে পারে যে, আমার বিচারবোধ ক্ষীণ হয়ে গেছে এবং পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী হিন্দু ও অনুন্নত সম্প্রদায় উভয়ের ক্ষেত্রেই খারাপ, আমার এই বিচার ভুল। তা যদি হয়, তাহলে আমার জীবন দর্শনের অন্যান্য অংশেও আমি ভ্রান্ত। সেক্ষেত্রে, অনশনে আমার মৃত্যু আমার ভ্রান্তির জন্য প্রায়শ্চিত্ত হবে এবং আমার প্রজ্ঞায় শিশুসুলভ বিশ্বাসী অসংখ্য নর-নারীর মাথা থেকে বোঝা নেমে যাবে। আর আমার বিচার যদি ঠিক হয়, আমার খুব কম সন্দেহ আছে এ বিষয়ে, তবে প্রস্তাবিত পদক্ষেপ গত ২৫ বছরের জীবনেই পরিপূর্ণ হবে।

আপনার অনুগত বন্ধু
এম. কে. গান্ধী'

প্রধানমন্ত্রী উত্তর দেন এইভাবে :

১০ ডাউনিং স্ট্রিট
সেপ্টেম্বর ৮, ১৯৩২

'প্রিয় শ্রী গান্ধী,

'আপনার চিঠি পেয়ে বিস্মিত, এবং আরও বলি, খুব দুঃখিত হয়েছি। এটা না বলে পারছি না যে, অনুন্নত সম্প্রদায়ের ব্যাপারে মহামান্য সম্রাটের সরকারের

সিদ্ধান্তের তাৎপর্য সম্পর্কে ভুল বুঝে আপনি এই চিঠি লিখেছেন। আমরা সব সময়েই বুঝেছি, আপনি হিন্দু সম্প্রদায়ের থেকে অবদমিত সম্প্রদায়কে চিরতরে পৃথক করার তীব্র বিরোধী। 'গোল টেবিল বৈঠকে'র সংখ্যালঘু কমিটিতে আপনি আপনার অবস্থান পরিষ্কার করেছেন, এবং হোয়রকে দেওয়া ১১ মার্চের চিঠিতে আবার তা বলেছেন। আমরা এটাও জানি, হিন্দুদের বৃহদাংশ আপনার মতামতের পক্ষে, সেজন্য অবদমিত সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্বের বিষয়টি আমরা অত্যন্ত সতর্কভাবে বিচার করি।

'অবদমিত সম্প্রদায়ের বিভিন্ন সংস্থার আবেদন এবং সাধারণভাবে অবদমিতরা সামাজিক বৈষম্য ও অক্ষমতার শিকার, এবং আপনিও প্রায়ই তা স্বীকার করেছেন, এই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা এটা দায়িত্ব বলে মনে করেছি যে, এদের জন্য আইনসভায় একটা আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব ঠিক করা দরকার, আমরা সঙ্গে সঙ্গে এটাও মনে করেছি যে, এমন কিছু করা ঠিক হবে না যাতে হিন্দুদের থেকে তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। আপনি নিজে ১১ মার্চের চিঠিতে বলেছেন, আইনসভায় এদের প্রতিনিধিত্ব দেওয়ার বিরোধী নন আপনি।

'সরকারের পরিকল্পনা অনুযায়ী অবদমিত সম্প্রদায় হিন্দু সম্প্রদায়ের অংশ হিসাবেই থাকবে এবং হিন্দু নির্বাচকদের সঙ্গে সমানভাবে ভোট দেবে, কিন্তু প্রথম ২০ বছর হিন্দু সম্প্রদায়ের অংশ হিসাবে থেকেও কয়েকটি বিশেষ কেন্দ্রের মাধ্যমে তাদের অধিকার ও স্বার্থ রক্ষা হবে। বর্তমান পরিস্থিতিতে এটা দরকার, সে বিষয়ে আমরা নিশ্চিত।

'যেসব জায়গায় এইসব কেন্দ্র করা হবে সেখানকার অবদমিত সম্প্রদায় সাধারণ হিন্দু কেন্দ্রে ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত হবে না, তাদের দুটি ভোট থাকবে, যাতে হিন্দু সম্প্রদায়ের সদস্যদের অধিকার খর্ব না হয়।

'আমরা ইচ্ছে করেই আপনার কথিত পৃথক সাম্প্রদায়িক কেন্দ্র সৃষ্টি করিনি এবং হিন্দু বা সাধারণ কেন্দ্রে সব অবদমিত গোষ্ঠীর ভোটাধিকার বহাল রেখেছি, এর ফলে উচ্চবর্ণ প্রার্থীরা অবদমিতদের ভোট এবং অবদমিত প্রার্থীরা উচ্চবর্ণদের ভোট চাইতে বাধ্য হবে। সুতরাং সব ভাবেই হিন্দু সমাজের ঐক্য রাখা হয়েছে।

'যাই হোক, আমরা মনে করি, দায়িত্বশীল সরকারের প্রাথমিক পর্বে যখন ক্ষমতা চলে যাবে আইনসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের হাতে, তখন অবদমিত সম্প্রদায়ের কিছু সদস্যকে নয়টার মধ্যে সাতটা প্রদেশে আইনসভায় নিজেদের মনোনীত সদস্য থাকা দরকার, স্যামুয়েল হোয়রের কাছে চিঠিতে আপনিই বলেছেন এরা যুগ যুগ ধরে

হিন্দুদের সুপরিকল্পিত অবমাননা ও লাঞ্ছনার বলি। নিজেদের ক্ষোভ, আদর্শ এবং বিরুদ্ধের সিদ্ধান্ত রদ করতে বক্তব্য তুলে ধরার জন্য আইনসভায় এদের প্রতিনিধিত্ব থাকা দরকার, একথা শুভবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিমাত্রই স্বীকার করবেন। বর্তমান অবস্থায় আমরা কেন্দ্র সংরক্ষণ করে কোনও বাস্তবমুখী ভোটাধিকার ব্যবস্থায় বিশেষ প্রতিনিধি নির্বাচনের পদ্ধতি দিয়ে তাদের প্রতিনিধিত্বকারী ও তাদের প্রতি দায়বদ্ধসম্পন্ন সদস্য করার আশা করি না। কারণ, সব ক্ষেত্রেই ওইসব সদস্যরা সংখ্যাগুরু উচ্চবর্ণ হিন্দুদের দ্বারা নির্বাচিত হবেন।

'আমাদের পরিকল্পনায় অবদমিত সম্প্রদায়ের জন্য সীমিত সংখ্যক বিশেষ কেন্দ্রের সুবিধা এবং তার সঙ্গে সাধারণ হিন্দু কেন্দ্রে তাদের ভোটাধিকার দান, চিন্তা ও কাজের দিক থেকে সংখ্যালঘু তথা মুসলমানদের পৃথক সাম্প্রদায়িক নির্বাচকমণ্ডলীর ব্যবস্থার চেয়ে একেবারে ভিন্ন। যেমন, কোনও মুসলমান সাধারণ কেন্দ্রে প্রার্থী বা ভোটার হতে পারবেন না, অন্যদিকে ভোটাধিকারসম্পন্ন অবদমিত সম্প্রদায়ের মানুষ মাত্রই সাধারণ কেন্দ্রে প্রার্থী হতে ও ভোট দিতে পারবেন।

'মুসলমানদের জন্য এলাকাগত আসনের সংখ্যা স্বাভাবিকভাবেই শর্তাধীন, কারণ তাদের পক্ষে আর বেশি এলাকাকেন্দ্রিক সংখ্যা পাওয়া অসম্ভব, এবং বেশিরভাগ প্রদেশেই তারা জনসংখ্যার তুলনায় বেশি অংশ ভোগ করে। অবদমিতদের জন্য বিশেষ কেন্দ্রের সংখ্যা খুবই কম মনে হবে, এই সংখ্যা অবদমিত সম্প্রদায়ের জনসংখ্যার অনুপাতে কোটা অনুযায়ী হবে না, তবে আইনসভায় তাদের মুখপত্র হিসাবে অবদমিত সম্প্রদায় কর্তৃক নির্বাচিত ন্যূনতম সদস্য রাখার ব্যবস্থা হবে। সর্বত্র বিশেষ আসনের সংখ্যা অবদমিত সম্প্রদায়ের জনসংখ্যার আনুপাতিক নয়।

'আপনার দৃষ্টিভঙ্গি আমি যতটা বুঝি, অবদমিত সম্প্রদায়ের জন্য হিন্দুদের সঙ্গে যুক্ত নির্বাচকমণ্ডলীর দাবিতে আপনি আমরণ অনশনের চরম সিদ্ধান্ত নেননি, কারণ এই ব্যবস্থা ইতিমধ্যেই গৃহীত। হিন্দুদের ঐক্য অক্ষুণ্ণ রাখার জন্যও আপনার এই সিদ্ধান্ত নয়, কারণ ঐক্য রয়েছে, মূলত নানা অত্যাচার ও বঞ্চনার শিকার অবদমিত সম্প্রদায়ের নিজেদের পছন্দের নির্দিষ্ট সংখ্যক প্রতিনিধির প্রবক্তা হওয়া রোধ করতেই আপনার এই সিদ্ধান্ত।

'এই নির্দোষ ও সতর্ক প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে আমি বুঝতে পারছি না কেন আপনি এই সিদ্ধান্ত নিলেন। এটুকুই মনে করছি যে, প্রকৃত ঘটনা ভুল বুঝে আপনি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

'নিজেরা বুঝাপড়ায় আসতে না পেরে ভারতীয়রা সাধারণভাবে যে অনুরোধ

করে, তাতে সাড়া দিয়েই সরকার অনিচ্ছা সত্ত্বেও সংখ্যালঘু প্রশ্নে সিদ্ধান্ত দেওয়ার জন্য রাজি হয়। সরকার সেই সিদ্ধান্ত নিয়েছে, এবং তাদের প্রদত্ত শর্ত ছাড়া তাদের পক্ষে এই সিদ্ধান্ত বদল সম্ভব নয়। সেজন্য আমার আশঙ্কা, আপনাকে উত্তরে এটুকুই বলতে পারি যে, সিদ্ধান্ত বহাল আছে, এবং সরকার বিভিন্ন গোষ্ঠীর দাবি পর্যালোচনা করে যে পন্থা উদ্ভাবন করেছে, সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠীরা নিজেদের মধ্যে চুক্তি করে এই নির্বাচনী ব্যবস্থার বিকল্প চাইতে পারে।

'আপনি এই পত্র-বিনিময় এবং হোয়রকে লেখা চিঠি প্রকাশ করার জন্য বলেছেন। কারাবাসে থাকার দরুন আপনি জনসাধারণের কাছে আপনার অনশনের কারণ ব্যাখ্যা করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত, এই কারণেই আপনার অনুরোধ মেনে নিচ্ছি, পুনরায় বিবেচনা করার পর আপনি যদি চান তাই করব। তবে, আবার আপনাকে সরকারের সিদ্ধান্ত বিস্তারিতভাবে বিচার করার অনুরোধ করি এবং নিজের কাছে প্রশ্ন করুন, আপনার পরিকল্পিত কর্মসূচি যথার্থ আপনার সততা প্রতিপাদন করছে কি না।

আমি, আপনার আন্তরিক
জে. র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড'

প্রধানমন্ত্রী অবস্থান ত্যাগ করবেন না, এটা বুঝে গান্ধী এক চিঠিতে তাঁর আমরণ অনশনের অটল সিদ্ধান্ত বহালের কথা জানান :

'প্রিয় বন্ধু,

'পুরো চিঠির 'তার' আজ পেয়েছি। আপনার অকপট বক্তব্যের জন্য ধন্যবাদ। আমি দুঃখিত, আপনি পরিকল্পিত পদক্ষেপের যে আরোপ করেছেন, তা আমার মনে আসেনি। আমি সেই সম্প্রদায়ের জন্য বক্তব্য প্রকাশের দাবি করছি, যাঁদের স্বার্থ জলাঞ্জলি দেওয়ার অভিযোগে আমার অনশন সিদ্ধান্তকে অভিযুক্ত করেছেন। আশা করি যে, এই চরম পদক্ষেপ অনুরূপ আত্মস্বার্থমুখী ব্যাখ্যার পক্ষে অন্তরায় হবে। যুক্তিতর্কে না গিয়ে বলছি, আমার কাছে ব্যাপারটা ধর্মের মতো। অবদমিত সম্প্রদায় দুটি ভোটাধিকার পেল, এই ঘটনা তাদের বা হিন্দু সমাজকে ভাঙন থেকে রক্ষা করবে না। অবদমিত সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী প্রতিষ্ঠার মধ্যে আমি বিষসুচ প্রয়োগের আভাস পাচ্ছি, এর উদ্দেশ্য সুচিন্তিতভাবে হিন্দুবাদ ধ্বংস করা, এবং এতে অবদমিত সম্প্রদায়ের ভাল কিছু হবে না। আপনি অনুমতি দিলে বলি, আপনি যতই সহানুভূতিশীল হোন না কেন, সংশ্লিষ্ট পক্ষদের ধর্মীয় গুরুত্ব ও মুখ্য প্রশ্নে আপনি সঠিক সিদ্ধান্তে আসতে পারেন না।

'অবদমিত সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব বেশি হলেও আমি এর বিরোধী হব না। আমি বিধিবদ্ধভাবে হিন্দুদের আশ্রয় থেকে তাদের পৃথক করার বিরুদ্ধে, তারা যতদিন হিন্দুদের সঙ্গে থাকতে চায় তার পূর্বে এই পৃথক করা ঠিক নয়। আপনি কি বুঝেন যে, আপনাদের সিদ্ধান্ত জারি থাকলে এবং সংবিধান কার্যকরী হলে হিন্দু সমাজ সংস্কারকরা তাদের নিপীড়িত ভাইদের উন্নতির জন্য যে আত্মত্যাগ, গৌরবজনক কাজ করেছেন তা রুদ্ধ হবে?

'সেজন্য আমি আমার সিদ্ধান্তে অটল থাকতে বাধ্য হচ্ছি।

'আপনার চিঠিতে ভুল ধারণা হতে পারে, সেজন্য আমি জানাতে চাই, অবদমিত সম্প্রদায়ের জন্য বিশেষ ব্যবস্থার থেকে আমি সরে থাকব—এর অর্থ এই নয় যে, আপনার যেসব সিদ্ধান্ত আমি অনুমোদন করি তা থেকে সরে আসব। আমার মতে, এর বহু অংশ সম্বন্ধে প্রবল আপত্তি আসতে পারে। অবদমিত সম্প্রদায়ের ব্যাপারে আমার বিবেকের আহ্বানে আত্মাহুতির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সতর্কবাণী হিসাবে এটা বিচার করব না।

আপনার বিশ্বস্ত বন্ধু
এম. কে. গান্ধী'

এই অনুসারে ২০ সেপ্টেম্বর ১৯৩২, শ্রী গান্ধী অন্ত্যজদের পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী দেওয়ার বিরুদ্ধে আমরণ অনশন শুরু করেন। এই ঘটনার চিত্রানুগ, বর্ণশোভিত কাহিনী প্যারেলাল তুলে ধরেছেন 'দি এপিক অব্ ইস্ট'-এ উৎসুক ব্যক্তিরা সেটা দেখতে পারেন। তবে আমি তাঁকে সতর্ক করে দিতে চাই এই বলে যে, এটা যেন বসওয়েল লিখেছেন এবং বসওয়েলবাদীর সব ত্রুটি এতে রয়েছে। এর আরেক দিক আছে, তবে তা আলোচনার সময়, জায়গা নেই। আমি যেটুকু করতে পারি তা হল, গান্ধীর অনশনের কৌশল উন্মোচন করে আমি যে বিবৃতি[১] দিয়েছিলাম তার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এটা বলা প্রয়োজন, শ্রী গান্ধী আমরণ অনশন ঘোষণা করলেও মরতে চাননি। বেশিভাবে বাঁচতে চেয়েছিলেন। অনশন অবশ্য সমস্যা সৃষ্টি করেছিল, সমস্যাটা ছিল কীভাবে গান্ধীর জীবন বাঁচানো যায়? তাঁকে বাঁচানোর একমাত্র উপায় সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা বদল। এই বাঁটোয়ারা তাঁর বিবেক দংশন করেছে বলে অভিহিত করেছেন গান্ধী। প্রধানমন্ত্রী পরিষ্কার বলেছেন যে, ব্রিটিশ সরকার এটা প্রত্যাহার বা বদল করবে না, উচ্চবর্ণ হিন্দু ও অন্ত্যজরা

১. পরিশিষ্ট - IV দ্রষ্টব্য।

একমত হয়ে বিকল্প সূত্র দিলে তাঁরা সেটা গ্রহণ করবেন। 'গোল টেবিল বৈঠকে' অন্ত্যজদের প্রতিনিধিত্ব করার সৌভাগ্য হয়েছিল আমার, সেজন্য এটা অনুমান করা হয়েছিল যে, আমি রাজি না হলে অন্ত্যজদের সম্মতি পাওয়া যাবে না। আশ্চর্যের ব্যাপার হল, অন্ত্যজদের নেতা হিসাবে আমার অবস্থান নিয়ে কংগ্রেস প্রশ্ন তোলেনি, এটা বাস্তব ঘটনা রূপে সবাই স্বীকার করে নিয়েছে। সেজন্য সবার দৃষ্টি আমার ওপর এসে পড়ে, অথবা নাটকের খলনায়ক হিসাবে আমার গুরুত্ব হয়।

আমার কথা বলতে গেলে এটা বলা বাহুল্য হবে না যে, তখন আমার মতো গভীর সঙ্কটে আর কেউ পড়েনি। সেটা একটা বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতি ছিল। দুটি ভিন্ন বিকল্পের মধ্যে আমাকে সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছিল। আমার সামনে তখন সমগ্র মানবতার অংশ হিসাবে গান্ধীর জীবনরক্ষার দায়িত্ব এসে পড়ে। প্রধানমন্ত্রী অন্ত্যজদের জন্য যে রাজনৈতিক অধিকার দেন তা রক্ষা করার সমস্যা আমার সামনে। মানবতার আহ্বানে সাড়া দিয়ে আমি 'সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা' গান্ধীর মনোমতো পরিবর্তনে রাজি হয়ে তাঁর জীবনরক্ষা করি। এই চুক্তি 'পুনা চুক্তি' হিসাবে পরিচিত।

পুনা চুক্তির মূল পাঠ

চুক্তির মূল পাঠ নিম্নোক্ত মর্মে বিবৃত :

১) অবদমিত সম্প্রদায়ের জন্য প্রাদেশিক আইনসভায় সাধারণ নির্বাচন কেন্দ্র থেকে আসন সংরক্ষিত থাকবে এইভাবে :

> মাদ্রাজ ৩০, বোম্বাই, সিন্ধু সহ ১৫, পঞ্জাব ৮, বিহার ও ওড়িশা ১৮, মধ্যপ্রদেশ ২০, অসম ৭, বাংলা ৩০, যুক্তপ্রদেশ ২০; মোট ১৪৮।

প্রধানমন্ত্রীর ঘোষিত সিদ্ধান্তমতে প্রাদেশিক পরিষদের মোট শক্তির ভিত্তিতে এই সংখ্যা।

২) এইসব আসনে নির্বাচন হবে যুক্ত নির্বাচকমণ্ডলী থেকে নিম্নোক্ত পদ্ধতি অনুসারে :

অবদমিত সম্প্রদায়ের সব সদস্য নির্বাচন কেন্দ্রে সাধারণ ভোটার তালিকায় নথিভুক্ত হয়ে নির্বাচক-মণ্ডল (Electoral College) গঠন করবেন, এই মণ্ডলে প্রতিটি সংরক্ষিত আসনের জন্য চারজন করে অবদমিত গোষ্ঠীর প্রার্থী ঠিক করবে এক ব্যক্তির এক ভোটের ভিত্তিতে। এই প্রাথমিক নির্বাচনে সবচেয়ে বেশি ভোটপ্রাপ্ত চারজন সাধারণ নির্বাচক-মণ্ডলে নির্বাচনে প্রার্থী হবেন।

৩) কেন্দ্রীয় আইনসভায় অবদমিত সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব সদৃশভাবে যুক্ত নির্বাচকমণ্ডলী ও সংরক্ষিত আসনে প্রাথমিক নির্বাচনের পদ্ধতিতে উপরোক্ত (২) অনুযায়ী কেন্দ্রীয় আইনসভায় প্রতিনিধি নির্বাচন হবে।

৪) কেন্দ্রীয় আইনসভায় ব্রিটিশ ভারতের সাধারণ নির্বাচন কেন্দ্রের জন্য প্রদত্ত আসনের ১৮% সংরক্ষিত থাকবে অবদমিত সম্প্রদায়ের জন্য।

৫) কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইনসভায় পূর্বোক্ত ধারার কয়েকজন সদস্যের নামসূচির (Panel) প্রাথমিক নির্বাচন প্রথা ১০ বছর পর রদ হবে, পরবর্তী (৬) অনুযায়ী এর আগে তা বাতিল করা হতে পারে।

৬) কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইনসভায় অবদমিত সম্প্রদায়ের জন্য সংরক্ষিত আসনগুলিকে প্রতিনিধিত্ব প্রথা ধারা (১) ও (৪) অনুযায়ী হবে, সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায়গুলি বুঝাপড়া করে চুক্তি সম্পন্ন না করা অবধি এটাই চলবে।

৭) কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইনসভায় অবদমিতদের ভোটাধিকার লোথিয়ান কমিটির প্রতিবেদন অনুসারে ঠিক হবে।

৮) স্থানীয় সংস্থার নির্বাচনে বা সরকারি চাকরিতে অবদমিত সম্প্রদায়ভুক্ত হওয়ার দরুন অযোগ্য করা চলবে না। এইসব ক্ষেত্রে, সরকারি চাকরিতে ঘোষিত যোগ্যতা থাকলে অবদমিত সম্প্রদায়ের সদস্যদের যথাযথ প্রতিনিধিত্ব অর্জনের যাবতীয় চেষ্টা করতে হবে।

৯) সব প্রদেশে শিক্ষা খাতে অনুদানের যথেষ্ট পরিমাণ টাকা অবদমিত সম্প্রদায়ের লোকদের শিক্ষায় বরাদ্দ করতে হবে।

চুক্তির শর্তাদি শ্রী গান্ধী মেনে নেন এবং সরকার তা কার্যকরী করে, ভারত শাসন আইনে অন্তর্ভুক্ত হয়। 'পুনা চুক্তি' বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। অন্ত্যজরা বিমর্ষ হয়, এর যথেষ্ট কারণ ছিল। অবশ্য অনেকে তা মানেন না। তাঁরা সব সময়েই বলেন, পুনা চুক্তিতে অন্ত্যজদের জন্য বেশি আসন দেওয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর সাম্প্রদায়িক পুরস্কারে এর চেয়ে কম আসন ছিল। এটা সত্যি যে, পুনা চুক্তি অন্ত্যজদের জন্য ১৪৮টি আসন নির্ধারিত করে, পুরস্কারে ছিল ৭৮টি। তবে এর চেয়ে উপসংহারে আসা ঠিক নয় যে, 'পুনা চুক্তি' সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার চেয়ে বেশি দিয়েছে, এটা বললে পুরস্কার অন্ত্যজদের জন্য যা দিয়েছে, তা অবজ্ঞা করা হবে।

সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা অন্ত্যজদের দুটি সুযোগ দিয়েছে : i) অবদমিতদের জন্য

পৃথক নির্বাচকমণ্ডলীর থেকে নির্দিষ্ট সংখ্যক আসন এবং সেই আসন অবদমিত সদস্যদের দিয়ে পূরণ; ii) দুটি ভোটাধিকার, একটা পৃথক নির্বাচকমণ্ডলীর, আরেকটা সাধারণ কেন্দ্রের। কাজেই, 'পুনা চুক্তিতে' আসনসংখ্যা বেড়েছে বটে, কিন্তু দুটো ভোটের অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছে। দুটো ভোটাধিকারের ক্ষতিপূরণ হিসাবে এই আসন- সংখ্যা যথেষ্ট নয়। দুটো ভোটের অধিকার ছিল অমূল্য সুযোগ। রাজনৈতিক অস্ত্র হিসাবে এর মূল্য অসীম। সব কেন্দ্রে অন্ত্যজদের ভোটের শক্তি ১০-এ ১। বর্ণহিন্দু প্রার্থীদের নির্বাচনে এই ভোটশক্তি স্বাধীনভাবে ব্যবহার করে অন্ত্যজদের সাধারণ নির্বাচনের প্রশ্নের নিয়ামক হতে না পারলেও প্রভাবিত করবে। অন্ত্যজদের ভোটের ওপর নির্ভরশীল করে দিলে কোনও বর্ণহিন্দু প্রার্থী তাঁর কেন্দ্রে অন্ত্যজদের স্বার্থ অবজ্ঞা বা বিরোধী হতে পারতেন না। বর্তমানে অন্ত্যজদের একটু বেশি আসন দেওয়া হয়েছে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা'র সিদ্ধান্তের চেয়ে। তবে এটাই তাদের সম্বল। অন্য সব সদস্য বিরুদ্ধে না হলেও অনীহ। সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারের ব্যবস্থামতো দুটো ভোটাধিকার থাকলে কম আসন সত্ত্বেও অন্য প্রতিটি সদস্যের মধ্যে অন্ত্যজরা থাকতেন। অন্ত্যজদের জন্য আসন বৃদ্ধি প্রকৃত অর্থে কোনও বৃদ্ধি নয়, পৃথক নির্বাচন কেন্দ্র ও দুই ভোটাধিকারের ক্ষতিপূরণ নয়। হিন্দুরা 'পুনা চুক্তি'র জয় না গাইলেও তাদের এটা পছন্দ নয়। শ্রী গান্ধীর জীবনরক্ষার জন্য আলোড়নের মধ্যে একটা চেতনাপ্রবাহ ছিল যে তাঁর জীবনরক্ষার মূল্য বেশি দিতে হবে। সুতরাং যখন তাঁরা চুক্তির শর্তাবলী দেখলেন, তখন খুবই অসন্তুষ্ট হন; অবশ্য এটা বাতিলের মতো সাহস তাঁদের ছিল না। হিন্দুদের অপছন্দ এবং অন্ত্যজদের অসন্তোষের মধ্যে 'পুনা চুক্তি' দু'পক্ষই স্বীকার করল এবং ভারত শাসন আইনে অন্তর্ভুক্ত হল।

IX

'পুনা চুক্তি' স্বাক্ষরিত হওয়ার পর হ্যামন্ড কমিটি নিযুক্ত হল কেন্দ্রসমূহের এলাকা নির্ধারণ, প্রতি কেন্দ্রের আসন সংখ্যা এবং নতুন সংবিধানে গঠিতব্য আইনসভার ভোটদান প্রথা নির্ধারণের জন্য।

কাজ করার সময়ে হ্যামন্ড কমিটিকে 'পুনা চুক্তি'র বিষয়সূচি পর্যালোচনা এবং অন্ত্যজদের চাহিদাপূরণে গৃহীত বিশেষ নির্বাচনী পরিকল্পনা বিচার করতে হয়। দুর্ভাগ্যবশত ত্বরিৎ কাজ শেষ করার জন্য 'পুনা চুক্তি'র মধ্যে অনেক কিছুর ব্যাখ্যা ছিল না। অস্পষ্ট বিষয়গুলির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল দুটি :

১) প্রাথমিক নির্বাচনের জন্য চারজন প্রার্থীর নামসূচিতে চারজন ন্যূনতম, না

বৃহত্তম হবে?

২) চূড়ান্ত নির্বাচনে ভোট দেওয়ার প্রথা কী হবে? হিন্দুদের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়, চারজন হবে ন্যূনতম। চারজন প্রার্থী না হলে কোনও প্রাথমিক নির্বাচন হবে না, সুতরাং সংরক্ষিত আসনের নির্বাচন হবে না, তাঁদের মতে সেই আসন শূন্য থাকবে এবং অন্ত্যজরা প্রতিনিধিত্বহীন থাকবে। অন্ত্যজদের পক্ষ থেকে আমাকে বিতর্কিত বিষয়ের ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য আহ্বান করা হয়। আমি বলি, 'পুনা চুক্তি'তে কথিত 'চার'-এর অর্থ 'চার-এর বেশি নয়', এর অর্থ 'চারের কম' নয়। ভোটদানের প্রশ্নে হিন্দুদের বক্তব্য, আবশ্যিক বন্টনমূলক ভোট সবচেয়ে উপযোগী। আমি বলি, আনুপাতিক (**Cumulative**) ভোটদান প্রথাই যথার্থ এবং প্রবর্তনযোগ্য। সৌভাগ্যবশত হ্যামন্ড কমিটি আমার বক্তব্য গ্রহণ করে এবং হিন্দুদের দাবি প্রত্যাখ্যান করে। বর্ণহিন্দুরা তাদের এই মত কেন দিয়েছিল, তা জানার কৌতূহল রয়েছে। এখানে অনেকে কিছুক্ষণ ভেবে প্রশ্ন করতে পারেন, হিন্দুরা হ্যামন্ড কমিটির কাছে এই বিশেষ মত ব্যক্ত করল কেন? এই বিশেষ অবস্থান নেওয়ার পেছনে কিছু মতলব ছিল? আমি যতটা বুঝেছি, বৈধ প্রাথমিক নির্বাচনের জন্য ন্যূনতম চারজন প্রার্থীর দাবি করার পেছনে হিন্দুদের উদ্দেশ্য ছিল এমন এক অবস্থা রাখা, যাতে অন্ত্যজদের মধ্যে থেকে এমন প্রার্থী হয় যিনি হিন্দুদের পছন্দের এবং হিন্দুদের হয়েই কাজ করবেন। সেরকম অন্ত্যজ প্রার্থীকে শেষ নির্বাচনে নির্বাচিত হতে হলে প্রথমে তাঁকে প্যানেলে আসতে হবে, এবং প্যানেল বড় হলে তবেই তিনি আসতে পারবেন। প্যানেলে নির্বাচন যেহেতু অনুন্নতদের জন্য পৃথক নির্বাচকমণ্ডলীর ভোটের মাধ্যমে, সেজন্য একজন মাত্র প্রার্থী হলে তিনি অবদমিত সম্প্রদায়ের কট্টর প্রতিনিধি হবেন এবং হিন্দুদের পক্ষে সবচেয়ে খারাপ প্রার্থী। যদি দু'জন প্রার্থী থাকেন, তবে দ্বিতীয় জন প্রথমজনের চেয়ে কম কট্টর, এবং হিন্দুদের পক্ষে একটু ভাল। তিনজন থাকলে, তৃতীয়জন দ্বিতীয় প্রার্থীর চেয়ে কম কট্টর হবেন এবং হিন্দুদের দৃষ্টিতে অপেক্ষাকৃত ভাল। চারজন প্রার্থী থাকলে চতুর্থজন তৃতীয়জনের চেয়ে কম কট্টর এবং হিন্দুদের পক্ষে শ্রেষ্ঠ প্রার্থী হবেন। কাজেই চারজনের নামসূচি হলে হিন্দুদের সবচেয়ে ভাল সুযোগ আসবে নামসূচিতে অন্ত্যজদের এমন এক প্রতিনিধি করা, যিনি হিন্দুদের পক্ষে উপযুক্ত। সেজন্যই হ্যামন্ড কমিটির সামনে তাঁরা জোর দিয়ে বলেন, বৈধ নামসূচির জন্য ন্যূনপক্ষে চারজন থাকা চাই।

আবশ্যিক বন্টনমূলক ভোটপ্রথার ওপর জোর দেওয়ার উদ্দেশ্যও এক, অন্ত্যজদের সংরক্ষিত আসন হিন্দুরা যাতে দখল করতে পারে। আনুপাতিক (Cumulative) ভোট ব্যবস্থায় নির্বাচকের ভোট আসনসংখ্যার সমান সংখ্যক। ভোটার একজন প্রার্থীকে

সবকটা ভোট দিতে পারে, অথবা ইচ্ছেমতো দুই বা ততোধিক প্রার্থীকে বন্টন করে দিতে পারে। বন্টনমূলক ব্যবস্থায় নির্বাচকের অনেক সংখ্যক ভোট থাকে, কিন্তু ভোট যে-কোনও একজনকে দিতে হবে। যদিও দুটি আপাতদৃশ্যে পৃথক, কিন্তু ফলের ক্ষেত্রে কোনও পার্থক্য নেই, কারণ আনুপাতিক ভোটেও ভোটার তার ভোট বিভিন্ন প্রার্থীর মধ্যে ভাগ করে দিতে পারে। একজনকে একটা ভোট দেওয়ার স্বাধীনতা রয়েছে। কিন্তু হিন্দুরা কোনও ঝুঁকি নিতে রাজি ছিল না। তাদের মূল লক্ষ্য ছিল যুক্ত নির্বাচকমণ্ডলীতে অন্ত্যজদের সংরক্ষিত আসনে হিন্দুদের উদ্বৃত্ত ভোট হিন্দুদের পছন্দ করা অন্ত্যজ প্রার্থীর পক্ষে দেওয়া। উদ্দেশ্য, অন্ত্যজ ভোটারদের সংখ্যা ছাপিয়ে অন্ত্যজদের মনোনীত প্রার্থীকে জিততে না দেওয়া। উদ্বৃত্ত ভোট হিন্দু প্রার্থীদের থেকে স্থানান্তর করে অন্ত্যজ প্রার্থীদের পক্ষে দেওয়ার ব্যবস্থা ছাড়া এটা করা সম্ভব নয়। আনুপাতিক ভোটদান প্রথার চেয়ে বন্টনমূলক ভোটদান প্রথায় উদ্বৃত্ত ভোট ভিন্ন দিকে স্থানান্তরের সুযোগ বেশি। বন্টনমূলক ভোটে হিন্দু ভোটার তাঁর একটা ভোট হিন্দু প্রার্থীকেই দিতে পারবেন। বাড়তি অন্য হিন্দু প্রার্থীকে দেওয়ার অবকাশ না থাকায় শুধু অন্ত্যজ প্রার্থীকে দেওয়া যেতে পারে। কাজেই এই ব্যবস্থায় অন্ত্যজদের জন্য সংরক্ষিত কেন্দ্রে ভোটের বন্যা হয়ে যেতে পারে, সেজন্যই হিন্দুরা আনুপাতিক ভোটের চেয়ে বন্টনমূলক ভোট চাইছে। তবে এ-ব্যাপারে তারা কোনও ঝুঁকি নিতে রাজি নয়। কারণ, তাদের দৃষ্টিতে এই প্রথাও পুরো প্রামাণিক নয়। এতে ভোটারকে সবক'টি ভোটদানে বাধ্য করা যায় না। ভোটার একটা ভোট বর্ণহিন্দু প্রার্থীকে দিয়ে বাকি ভোট নাও দিতে পারে। এটা হলে তাদের পছন্দের অন্ত্যজ প্রার্থী হেরে যেতে পারেন। এক্ষেত্রে সুযোগের অবকাশ না রেখে হিন্দুরা চাইছিল, বন্টনমূলক প্রথায় ভোটদান আবশ্যিক করতে যাতে বর্ণহিন্দু ভোটার চাক বা না চাক, একটা ভোট তাকে দিতেই হবে অন্ত্যজ প্রার্থীকে, এই প্রার্থী হিন্দুদের মনোনীত হবেন হয়তো এবং এভাবেই তার জয় নিশ্চিত করা যাবে। এইসব কিছুর বিচার পরিপ্রেক্ষিতে এটা স্পষ্ট যে, 'পুনা চুক্তি' অন্ত্যজদের ওপর প্রথম আঘাত এবং যেসব হিন্দু এই চুক্তি পছন্দ করেনি তারা এরপর সময় ও সুবিধামতো অন্ত্যজদের ওপর আরও আঘাত হানতে বদ্ধপরিকর। হ্যামন্ড কমিটির সামনে হিন্দুরা যে দুটি বিতর্ক রেখেছে, তাতেই হিন্দুদের ষড়যন্ত্রের সাক্ষ্য রয়েছে। এর লক্ষ্য, 'পুনা চুক্তি'কে বরবাদ করা যাবে না, সুতরাং অন্ত্যজদের যাতে কোনও সুবিধা না হয়, সেটা করা। অন্ত্যজদের রাজনৈতিক দাবি নিয়ে কংগ্রেস কী কাণ্ড করেছে, তার গল্প এখানেই শেষ নয়। এর পরের অংশ আগের ঘটনাগুলির চেয়ে আরও শিক্ষাপূর্ণ।

X

পরবর্তী কাহিনী হল, ভারত শাসন আইন, ১৯৩৫ অনুসারে ফেব্রুয়ারি ১৯৩৭-এর প্রাদেশিক আইনসভার নির্বাচন। কংগ্রেসের অস্তিত্বকালে এই প্রথম নির্বাচন

প্রতিদ্বন্দ্বিতা। অন্ত্যজরাও সেই প্রথম নিজেদের প্রতিনিধি নির্বাচনের সুযোগ পেল। প্রয়াত দেওয়ান বাহাদুর এম. সি. রাজা সহ অন্ত্যজদের কিছু নেতা 'পুনা চুক্তি'র সময়ে কংগ্রেসের সঙ্গে ছিলেন এই আশায় যে, অন্ত্যজদের সংরক্ষিত আসনে কংগ্রেস মাথা গলাবে না। কিন্তু সেই আশা চূর্ণ হয়েছিল। অন্ত্যজদের সংরক্ষিত আসনের নির্বাচনে কংগ্রেসের দ্বিমুখী কৌশল ছিল। প্রথমত, সরকার গড়ার লক্ষ্যে কংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়ার জন্য আইনসভা দখল করতে চেয়েছিল। দ্বিতীয় লক্ষ্য, কংগ্রেসকে গান্ধীর বক্তব্যের যথার্থতা প্রমাণ করতে হবে যে, কংগ্রেস অন্ত্যজদের প্রতিনিধিত্ব করে এবং অন্ত্যজরা কংগ্রেসকে বিশ্বাস করে। সুতরাং শক্তিশালী এবং আমার কথায় অন্ত্যজদের নির্বাচনে অমঙ্গলকারী শক্তি হিসাবে প্রতিপন্ন করতে কংগ্রেস অন্ত্যজদের সংরক্ষিত আসনে কংগ্রেস কর্মসূচিতে বিশ্বাসী প্রার্থীদের কংগ্রেস টিকিটে প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে দাঁড় করায়।

ভারত শাসন আইন, ১৯৩৫ অনুযায়ী অন্ত্যজদের জন্য মোট বরাদ্দ আসন-সংখ্যা ১৫১ (এই সংখ্যা ১৪৮ থেকে ১৫১ করা হয়েছে বিহার ও ওড়িশার আসন ভারসাম্যের জন্য)। নিচের সারণিতে কংগ্রেস প্রার্থী হিসাবে জয়ী অন্ত্যজ প্রার্থীদের সংখ্যা রয়েছে।

সারণি ৫

প্রদেশ	অন্ত্যজদের জন্য সংরক্ষিত আসনসংখ্যা	কংগ্রেস প্রার্থী হিসাবে বিজয়ী
যুক্তপ্রদেশ	২০	১৬
মাদ্রাজ	৩০	২৬
বাংলা	৩০	৬
মধ্যপ্রদেশ	২০	৭
বোম্বাই	১৫	৪
বিহার	১৫	১১
পঞ্জাব	৮	০
অসম	৭	৪
ওড়িশা	৬	৪
মোট	১৫১	৭৮

এতে দেখা যাচ্ছে, কংগ্রেস অন্ত্যজদের জন্য সংরক্ষিত আসনের ৫১ % পেয়েছে। ৭৮ আসন কংগ্রেস জেতার পর মাত্র ৭১ আসনে প্রকৃত অর্থে অন্ত্যজদের নির্দল প্রতিনিধি পেয়েছেন। প্রধানমন্ত্রীর সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার তুলনায় 'পুনা চুক্তি'তে অন্ত্যজদের অবস্থা শোচনীয় হয়েছে। কার্যকরী প্রতিনিধিত্বে অন্ত্যজরা প্রধানমন্ত্রী যা দিয়েছিলেন তার চেয়ে কম পেয়েছে। অন্যদিকে, 'পুনা চুক্তি'তে কংগ্রেস লাভবান হয়েছে। যদিও 'পুনা চুক্তি' অন্ত্যজদের জন্য ১৫১টি আসন রেখেছে, কিন্তু ৭৮টি আসন কেড়ে নিয়েছে এবং রাজনৈতিক লেনদেনে লাভবান হয়েছে।

১৯৩৭ সালের নির্বাচনে কংগ্রেস অন্ত্যজদের যে ক্ষতিসাধন করেছে, তা সব নয়। আর এক বড় আঘাত কংগ্রেস হেনেছে অন্ত্যজদের ওপর। শাসনকার্যে কংগ্রেস অন্ত্যজদের বঞ্চিত করেছে।

'গোল টেবিল বৈঠকে' শুরু থেকেই আমি জোর দিয়েছিলাম যে, শুধু আইনসভাতেই অন্ত্যজদের প্রতিনিধিত্ব যথেষ্ট নয়, মন্ত্রিসভাতেও তাদের প্রতিনিধিত্ব চাই। প্রতিকূল আইন-ই অন্ত্যজদের দুঃখের কারণ নয়, প্রশাসনের বিরুদ্ধতাও তাদের দুঃখের জন্য দায়ী, প্রশাসন নিয়ন্ত্রণ করে হিন্দুরা এবং তারা তাদের দীর্ঘযুগের কুসংস্কার অন্ত্যজদের বিরুদ্ধে কাজে লাগায়। অন্ত্যজরা পুলিশের কাছে কোনওদিন-ই নিরাপত্তা আশা করে না বা বিচারালয়ের কাছে ন্যায়বিচার অথবা যতদিন জন-কৃত্যক হিন্দুদের করতলগত ততদিন প্রশাসনের কাছে বিধিবদ্ধ আইনের সুবিধা আশা করে না। সরকারি প্রশাসনকে অন্ত্যজদের প্রতি কম ক্ষতিকারক ও দায়িত্বশীল করার আশা পূরণ হবে প্রশাসনের ওপরের স্তরে অন্ত্যজদের সদস্যপদ অর্জিত হলে। এইসব কারণে, আমি 'গোল টেবিল বৈঠকে' আইনসভায় প্রতিনিধিত্বের অধিকার স্বীকৃতির জন্য যেমন দাবি করেছিলাম, সমান জোর দিয়ে মন্ত্রিসভায় অন্ত্যজদের প্রতিনিধিত্ব দাবি করি। 'গোল টেবিল বৈঠক' এই দাবির যৌক্তিকতা স্বীকার করে এবং তা পূরণের পন্থা ও উপায় পর্যালোচনা করে। এই প্রস্তাব রূপায়ণের দুটি পথ ছিল। এক, একে বাধ্যতামূলক করে ভারত শাসন আইনের বিধিতে অন্তর্ভুক্ত করলে তা এড়ানো বা নস্যাৎ করা অসম্ভব হবে ; অন্য পথ হল বিধিবদ্ধ ব্যবস্থা না করে ভদ্রলোকের চুক্তি হিসাবে একটা রীতি অনুসরণ, ব্রিটিশ সংবিধানের ক্ষেত্রে যেমন হয়েছে। আমি ও সংখ্যালঘুদের অন্যান্য প্রতিনিধিরা নেতৃস্থানীয় ভারতীয়দের মত মেনে প্রথম পন্থা গ্রহণের পক্ষে ছিলাম না, দ্বিতীয় পথ মেনে নিতে প্রস্তুত ছিলাম না, এর রূপায়ণের কোনও কার্যকরী বিধি ছিল না। একটা মাঝামাঝিতে ঐকমত্য হয়। ছোটলাটদের বিধি-নির্দেশে একটা ধারা যুক্ত করে তাঁদের ওপর দায়িত্ব দেওয়া হয় মন্ত্রিসভা গঠনে সংখ্যালঘুদের প্রতিনিধি গ্রহণ নিশ্চিত করার। এই ধারায় বলা হয় :

'মন্ত্রিসভার সদস্য নিয়োগে ছোটলাট মন্ত্রিদের মনোনয়নে নিম্নোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণে সচেষ্ট হবেন, অর্থাৎ, নিয়োগ করবেন এমন ব্যক্তির পরামর্শ, যিনি তাঁর বিচারে আইনসভায় স্থায়ী সংখ্যাগরিষ্ঠ থাকতে পারবেন, এমন ব্যক্তিবর্গ (গুরুত্বপূর্ণ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের যথাযথভাবে অন্তর্ভুক্তি সহ) যাঁরা সমষ্টিগতভাবে আইনসভায় আস্থা অর্জন করে চলতে পারবেন। এইভাবে কাজ করে তিনি সবসময়ে মন্ত্রিদের মধ্যে সমষ্টিগত দায়িত্ববোধ সঞ্চারিত করার কথা মনে রাখবেন।'

এই ধারার পরিণতি কী হল, তা এক মজার কাহিনী। কংগ্রেস ঘোষণা করল, তারা নানা কারণে ভারত শাসন আইন, ১৯৩৫ গ্রহণে রাজি নয়, কারণ এখানে তুলে ধরার দরকার নেই। সবার কাছে, অনেক কংগ্রেসির কাছেও পরিষ্কার ছিল যে, এই ঘোষণার পেছনে আন্তরিকতা ছিল না। এর উদ্দেশ্য ছিল, জনসাধারণের সামনে প্রগতিশীল ও বিপ্লবী সংস্থা হিসাবে কংগ্রেসের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করে দেখানো যে, কংগ্রেস ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে ধ্বংস করতে উৎসাহী। এই রূপকথা কংগ্রেস সবসময়েই সৃষ্টি করতে চেষ্টা করেছে। এটা নেহাত-ই কৌশলের ব্যাপার। সংবিধান ছোটলাট বিশেষ দায়িত্ববলে বিভিন্ন বিষয়ে যে ক্ষমতা দিয়েছে, কংগ্রেস সেটা করতে চেয়েছে। সংবিধানকে বাতিল ঘোষণা করতে কংগ্রেস দ্বিধা করেনি, কারণ তাঁরা মনে করতেন, ব্রিটিশ সরকার কংগ্রেসের সঙ্গে বুঝাপড়ায় আসতে বাধ্য হবে যেহেতু একমাত্র কংগ্রেস-ই সংসদীয় ব্যবস্থা চালাতে সক্ষম। ব্রিটিশ সরকার কংগ্রেসকে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার ভয় দেখায়। ১ এপ্রিল, ১৯৩৭ প্রদেশে সংবিধান শুরু করার দিন ধার্য করেই ক্ষান্ত হয়নি, অকংগ্রেসিদের একটা অন্তর্বর্তীকালীন মন্ত্রিসভাও গঠন করে। ক্ষমতালিপ্সু কংগ্রেসি রাজনীতিবিদরা আশঙ্কিত হন এবং বুঝেন যে, তাঁরা এতদিনকার পরিশ্রমের ফল থেকে বঞ্চিত হবেন। ব্রিটিশ সরকার ও কংগ্রেস হাইকমান্ডের মধ্যে আলোচনা শুরু হয়। কংগ্রেস হাইকমান্ড দাবি করে, ব্রিটিশ সরকার যদি অঙ্গীকার দেন যে, ছোটলাটরা সংবিধানের বিশেষ দায়িত্ব বিষয়ক খণ্ড (Special Responsibility Clause) প্রদেশের দৈনন্দিন প্রশাসনে হস্তক্ষেপে প্রয়োগ করবেন না, তাহলে কংগ্রেস অঙ্গীকার করতে রাজি, কারণ কংগ্রেস নতুন সংবিধান যথাসত্বর সংখ্যাগরিষ্ঠের সদিচ্ছা নিয়ে কাজ শুরু করুক সেটা চায়। এর মধ্যে আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে যে, কংগ্রেস হাইকমান্ড এই অঙ্গীকারের পরিধি বাড়িয়ে দেন, যাতে প্রাদেশিক ছোটলাটরা বিধিনির্দেশবলে প্রাপ্ত ক্ষমতা প্রয়োগ না করেন, এই নির্দেশ অনুযায়ী ছোটলাটরা মন্ত্রিসভায় সংখ্যালঘুদের প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্তির বিষয় লক্ষ্য রাখতেন। ছোটলাটরা কংগ্রেসের স্বাচ্ছন্দ্যবিধানে নিজেদের অধিকার ছেড়ে দিয়ে সংবিধানের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ পদদলিত করতে দিয়েছেন, এর ফলে অন্ত্যজ ও অন্যান্য সংখ্যালঘুরা কংগ্রেসের

তৎপরতায় মন্ত্রিসভায় প্রতিনিধিত্ব থেকে বঞ্চিত হয়েছে।

মন্ত্রিসভার প্রতিনিধিত্ব থেকে অন্ত্যজদের বঞ্চিত করায় কংগ্রেসের বিদ্বেষপরায়ণতা ছিল বলে পরে প্রতিভাত হয়। সংখ্যালঘুদের মন্ত্রিসভায় নেওয়ার বিরুদ্ধে কংগ্রেসের একটা যুক্তি হচ্ছে, সমষ্টিগতভাবে দায়িত্ব পালন করতে হলে মন্ত্রিসভাকে দলের মন্ত্রিসভা হতে হবে এবং কংগ্রেস সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের থেকে মন্ত্রিসভায় সদস্য নিতে রাজি একমাত্র শর্তে যে, আগে তাদের কংগ্রেসে যোগ দিতে হবে এবং কংগ্রেসের প্রতিজ্ঞাপত্রে সই করতে হবে। অন্য সব সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে এই যুক্তির মূল্য যাই হোক, অন্ত্যজদের ক্ষেত্রে কোনও মূল্য নেই। অন্ত্যজদের মন্ত্রিসভা থেকে বাদ দেওয়ার এই যুক্তি কংগ্রেস কাজে লাগাতে পারেনি দুটি কারণে। প্রথমত, 'পুনা চুক্তি'র শর্ত অনুযায়ী মন্ত্রিসভায় অন্ত্যজদের প্রতিনিধিত্ব স্বীকার করতে কংগ্রেস বাধ্য। দ্বিতীয়ত, কংগ্রেস দাবি করতে পারে না যে, কংগ্রেস সদস্য ছাড়া অন্ত্যজদের কেউ কোনও আইনসভায় নেই। বরং, ৭৮ জন অন্ত্যজ কংগ্রেসের নীতিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ও কংগ্রেসের টিকিটে আইনসভার সদস্য হয়েছেন। কংগ্রেস এদের কাউকে মন্ত্রিসভায় নিল না কেন? এর একমাত্র উত্তর, কংগ্রেসের নীতিই হচ্ছে, মন্ত্রিসভায় অন্ত্যজদের প্রতিনিধিত্ব অস্বীকার করা, এবং এই নীতির পেছনে শ্রী গান্ধীর সমর্থন ছিল। যাঁরা এই বক্তব্যের সত্যতায় সন্দেহ করেন, তাঁরা নিচের দৃষ্টান্তগুলি বিচার করবেন।

প্রথম সাক্ষ্যপ্রমাণ মাননীয় ড. খারের কংগ্রেস থেকে বহিষ্কারের ঘটনায় নিহিত। সবাই জানেন, তিনি মধ্যপ্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রিসভায় প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। মন্ত্রিসভার সদস্যদের মধ্যে কোন্দলের জন্য ড: খারে ঝামেলা সৃষ্টিকারীদের অব্যাহতি দেওয়ার জন্য নিজে এবং মন্ত্রিসভার পদত্যাগ দাখিল করেন ছোটলাটের কাছে, এর লক্ষ্য ছিল নতুন মন্ত্রিসভা গঠন। তারপর, সাংবিধানিক বিধি অনুসারে ছোটলাট ড. খারেকে আহ্বান করেন এবং প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নতুন মন্ত্রিসভা গঠন করতে বলেন। ড. খারে এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন এবং পুরানো ঝামেলাবাজদের বাদ দিয়ে নতুন কিছু মুখ নিয়ে মন্ত্রিসভা গঠন করেন। তাঁর মন্ত্রিসভা আগের মন্ত্রিসভার থেকে একটা বিষয়ে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ছিল, এতে একজন অন্ত্যজ সদস্য শ্রী অগ্নিভোজকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। অগ্নিভোজ মধ্যপ্রদেশের সদস্য এবং কংগ্রেস পার্টির লোক ছিলেন, শিক্ষাদীক্ষায় মন্ত্রী হওয়ার উপযুক্ত। ২৬ জুলাই, ১৯৩৮ কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সভা হয় ওয়ার্ধায়, সভায় প্রস্তাবে ড. খারের নিন্দা করে বলা হয়, পুরানো মন্ত্রিসভার সদস্যদের পদত্যাগের সিদ্ধান্ত ভুল এবং তিনি ভুল বিচার করেছেন, নতুন মন্ত্রিসভা গঠন করে তিনি শৃঙ্খলাভঙ্গ করেছেন। এই শৃঙ্খলাভঙ্গের বিষয় ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ড. খারে বলেছেন, শ্রী গান্ধীর মতে অন্ত্যজ সদস্যকে মন্ত্রী করে তিনি শৃঙ্খলাভঙ্গ

করেছেন। ড. খারে আরও বলেন, গান্ধী তাঁকে বলেছেন যে, অন্ত্যজদের মধ্যে উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও চাহিদা বাড়িয়ে তিনি ভুল করেছেন, এবং এটা এত গর্হিত বিচারের সিদ্ধান্ত যে, এর জন্য তিনি কোনওদিন খারেকে মার্জনা করবেন না। শ্রী গান্ধী এই মন্তব্যের বিরোধিতা করেননি।

এছাড়া, আরও প্রত্যক্ষ প্রমাণ রয়েছে। ১৯৪২ সালে অন্ত্যজদের একটা সর্বভারতীয় সম্মেলন হয়, সেখানে অন্ত্যজদের রাজনৈতিক দাবিসমূহ ঘোষণা করা হয়। কংগ্রেস দল এক অন্ত্যজ সদস্য সম্মেলনে যোগদান করে শ্রী গান্ধীর কাছে জানতে চান, ওইসব দাবির বিষয়ে তাঁর মত কী, এবং তাঁকে নিম্নোক্ত প্রশ্ন করেন :

'১। ভবিষ্যতের সংবিধানে হরিজনদের অবস্থান কী হবে?

২। আপনি কি সরকার ও কংগ্রেসকে পঞ্চায়েত বোর্ড থেকে ওপরস্তরে প্রদেশ-পরিষদ্ পর্যন্ত অন্ত্যজদের জন্য পাঁচটি আসন জনসংখ্যার ভিত্তিতে নির্ধারিত করতে পরামর্শ দেবেন?

৩। কংগ্রেস এবং প্রাদেশিক আইনসভার বিভিন্ন সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাদের কি আপনি পরামর্শ দেবেন, তফসিলি জাতির বিধায়কদের থেকে মন্ত্রিসভায় সদস্য করার জন্য? এরাই তফসিলি সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের আস্থাভাজন।

৪। হরিজনদের অনগ্রসরতার পরিপ্রেক্ষিতে আপনি কি সরকারকে আইনে নতুন ধারা যুক্ত করে স্থানীয় বোর্ড ও পুরসভার পরিষদে সম্প্রদায়ভিত্তিতে প্রশাসনিক পদে নিযুক্তির জন্য পরামর্শ দেবেন যাতে হরিজনরা সভাপতি বা অধ্যক্ষ হতে পারেন?

৫। জেলা কংগ্রেস কমিটি থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ ওয়ার্কিং কমিটিতে হরিজনদের সদস্যপদের জন্য একটা অংশ নির্ধারিত করছেন না কেন?'

২ আগস্ট, ১৯৪২ 'হরিজন' পত্রিকায় গান্ধী এর উত্তর দেন। তিনি বলেন :

'১। যে সংবিধানে আমার প্রভাব থাকবে, তাতে অস্পৃশ্যতার জন্য শাস্তির বিধান থাকবে। তথাকথিত অন্ত্যজদের জন্য সব নির্বাচিত সংস্থায় নির্বাচন এলাকায় তাদের জনসংখ্যার অনুপাতে আসন সংরক্ষিত থাকবে।

২। আগের অংশেই এর উত্তর রয়েছে।

৩। না, আমি পারি না। এই নীতি বিপজ্জনক। অবহেলিত শ্রেণীর সংরক্ষণ এমন স্তরে নিয়ে যাওয়া উচিত হবে না, যার দরুন তাদের ও দেশের ক্ষতি হয়। মন্ত্রিসভার সদস্যকে উচ্চ স্তরের মানুষ ও সর্বজনীনভাবে আস্থাভাজন হতে হবে।

নির্বাচিত হওয়ার পর সদস্যের বিশিষ্ট গুণাবলী এবং জনপ্রিয়তার ওপর নির্ভর করবে লোভনীয় পদের জন্য যোগ্যতা এবং প্রাপ্তি।

৪। প্রথমত, বর্তমান আইনে আমার আগ্রহ নেই, কারণ কার্যত এটা মৃত। কিন্তু, আমি আপনার প্রস্তাবের বিপক্ষে, কারণ আগেই বলেছি।

৫। পূর্বোক্ত কারণেই আমি এর বিরোধী। তবে কংগ্রেসের নির্বাচিত বৃহৎ সংস্থাকে বাধ্য করব কংগ্রেসের সদস্যসংখ্যায় তাদের অংশের অনুপাতে হরিজন সদস্যদের মনোনীত করতে। হরিজনরা কংগ্রেসের চারআনা সদস্য হতে আগ্রহী না হলে নির্বাচিত সংস্থায় তাদের নাম থাকবে কীভাবে। তবে আমি কংগ্রেস কর্মীদের বলব, আরও বেশি হরিজনদের কাছে যান, তাদের কংগ্রেস সদস্য করুন।'

এরপর কি সন্দেহ থাকতে পারে যে, শ্রী গান্ধী ও কংগ্রেস মন্ত্রিসভায় হরিজনদের প্রতিনিধিত্বের অধিকার অস্বীকারে দৃঢ়সঙ্কল্প ছিলেন? যোগ্যতার প্রশ্নে বলা যায়, গান্ধী সব সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে এইসব শর্ত প্রয়োগ করলে একটা অর্থ ছিল। মুসলমানদের ক্ষেত্রে কি গান্ধী এসব বলতে সাহস করেছিলেন? শুধু অন্ত্যজদের ক্ষেত্রে এই বদ্ধ দরজার নীতি কেন? কেউ দাবি করেননি যে, অযোগ্য অন্ত্যজদের মন্ত্রী করতে হবে। গান্ধীর হৃদয়ের অন্তস্থলে এর বিরুদ্ধে যে বোধ রয়েছে, সেটাই প্রকাশ পেল।

'পুনা চুক্তি' বানচাল করায় কংগ্রেস যেসব কাজ করেছে তার মধ্যে আরও দুটি উল্লেখযোগ্য বিষয় আছে। প্রথম, নির্বাচনের প্রার্থী মনোনয়ন প্রশ্নে কংগ্রেস সংসদীয় বোর্ডের নীতি। দুর্ভাগ্যবশত এই বিষয়টির যথাযথ গুরুত্ব সহকারে বিচার হয়নি। এই প্রশ্ন অনুধ্যান করেছি, এবং এর ফল প্রকাশ করব পৃথক একটা প্রবন্ধে। এখানে এক কাজ করতে পারি, প্রার্থী মনোনয়নে পর্ষদ্ (board) যে মূলনীতি অনুসরণ করেছে তা তুলে ধরা যাক। এতে সাম্প্রদায়িক নীতি একটা মুখ্য ভূমিকা নিয়েছে। দু'জন প্রার্থীর মধ্যে একজনকে বাছার ক্ষেত্রে কংগ্রেস অপেক্ষাকৃত দক্ষ ব্যক্তিকে বেছে নেয়নি। এমন একজনকে বেছেছে, যিনি বহুসংখ্যা বিশিষ্ট জাত গোষ্ঠীর লোক। অর্থের প্রশ্নও প্রাধান্য পেয়েছে। অপেক্ষাকৃত যোগ্য গরিব প্রার্থীর বদলে ধনী ব্যক্তিকে প্রার্থী করা হয়েছে। এইসব বিচার অন্যায়। কিন্তু তাদের কাজ থেকে বুঝা যায়, উদ্দেশ্য এমন একজন নিরাপদ প্রার্থী বাছা, যিনি জিতবেন। তবে আরও অন্য সব শর্ত ছিল, যার মধ্যে গভীর ষড়যন্ত্রের গন্ধ রয়েছে। বিভিন্ন শ্রেণীর প্রার্থীর জন্য বিভিন্ন ধরনের যোগ্যতার শর্ত আরোপিত হয়। উচ্চবর্ণ হিন্দু প্রার্থীদের মধ্যে ব্রাহ্মণ ও সহমর্যাদার সম্প্রদায়ের উচ্চতম যোগ্য প্রার্থী মনোনীত হয়েছিল। অব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে কম যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া

হয়েছিল। এবং অন্ত্যজ প্রার্থীদের ক্ষেত্রে একেবারে নিরক্ষর প্রার্থীদের একটু শিক্ষিত বা যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থীদের চেয়ে অগ্রাধিকার ছিল। আমি বলছি না যে, সব ক্ষেত্রেই এটা সত্য। কিন্তু সাধারণ ফল ছিল, কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থীদের ক্ষেত্রে দেখা গেছে, ব্রাহ্মণ ও সমগোত্রীয় প্রার্থীরা উচ্চশিক্ষিত, অব্রাহ্মণ প্রার্থীরা ছিল মোটামুটি শিক্ষিত, অন্ত্যজ প্রার্থীরা সাক্ষর মাত্র। এই মনোনয়ন প্রথা অত্যন্ত চক্রান্তমূলক। এর পেছনে গভীর খেলা রয়েছে। যে কেউ এটা বিশ্লেষণ করলেই বুঝবেন যে, এর মূল অভিসন্ধি শুধুমাত্র ব্রাহ্মণ ও বর্ণহিন্দুদের মন্ত্রিসভা করে অন্যান্যদের বঞ্চিত করা এবং মন্ত্রিসভার সমর্থনে বোকা শান্ত অব্রাহ্মণকেও অন্ত্যজদের শামিল করা। এইসব গোষ্ঠী শিক্ষা-দীক্ষায় বুদ্ধিবৃত্তিতে মন্ত্রিদের প্রতিপক্ষ হওয়ার কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারে না। তাদের নেতৃত্ব অনুসরণ করায় আগ্রহী শুধুমাত্র আইনসভার সদস্যপদ মর্যাদার জন্য। শ্রী গান্ধী সমস্যার এই দিকটি না ভেবে বলেছেন যে, অন্ত্যজদের মন্ত্রী হতে হলে যোগ্যতাসম্পন্ন হতে হবে। অন্যথায় তিনি দেখেছেন যে, অন্ত্যজ কংগ্রেসিদের মধ্যে যোগ্য প্রার্থী না থাকলে এর জন্য দায়ী কংগ্রেস সংসদীয় বোর্ড, বোর্ড অন্ত্যজদের থেকে শিক্ষিত ব্যক্তিদের প্রার্থী করেনি।

নির্বাচনের বর্তমান ব্যবস্থা চালু থাকলে কংগ্রেস শিক্ষিত ভারতীয়দের আইনসভা সদস্য হতে বাধা দিতে পারবে, মন্ত্রিসভার সদস্য হতে হলে আইনসভার সদস্য হওয়া একটা শর্ত। এটা অত্যন্ত ভয়াবহ অবস্থা, এর নিরসনে কিছু ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। অগত্যা এটা বলা যথেষ্ট হবে যে, কংগ্রেসের এই প্রার্থী মনোনয়ন পদ্ধতি অন্ত্যজদের পক্ষে সাঙ্ঘাতিক হয়েছে, প্রশাসনিক ক্ষমতা থেকে তাদের বঞ্চিত করে রাখা হয়েছে শিক্ষিত প্রার্থীর অভাবের অজুহাতে, চোরাগোপ্তা এই পদ্ধতি দিয়ে কংগ্রেস ক্ষমতা কব্জায় রেখেছে।

কংগ্রেসের দ্বিতীয় অপকর্ম হল, দলীয় শৃঙ্খলার কঠোরতা দিয়ে অন্ত্যজ কংগ্রেসিদের আবদ্ধ রাখা। তাঁরা কংগ্রেস দলের কমিটির সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণের অধীন। তাঁরা কোনও অবাঞ্ছিত প্রশ্ন করতে পারেন না। কংগ্রেস কার্যকরী সমিতির অপছন্দ কোনও প্রস্তাব তাঁরা পেশ করতে সক্ষম নন। কোনও আইন প্রণয়নের প্রস্তাব আনতে অক্ষম। তাঁরা ইচ্ছামত ভোটদান বা বক্তব্য রাখতে পারেন না। তাঁরা তাঁদের খোয়ারে মূক সদস্যমাত্র। আইনসভায় প্রতিনিধিত্ব দানের অন্যতম মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল অন্ত্যজরা তাদের দাবি-দাওয়া আইনসভায় তুলে ধরে তাদের প্রতি অন্যায়ের অবসান করতে পারবে। কংগ্রেস অত্যন্ত দক্ষতাসহকারে এটা হতে দেয়নি।

এই দীর্ঘ করুণ কাহিনীর উপসংহার হল, কংগ্রেস 'পুনা চুক্তি'র নির্যাস শুষে নিয়ে তার ছিবড়েটা অন্ত্যজদের মুখে ছুঁড়ে দিয়েছে।

অধ্যায় ৪

একটি শোচনীয় আত্মসমর্পণ : কংগ্রেসের লজ্জাজনক পশ্চাদাপসরণ

'পুনা চুক্তি' স্বাক্ষরিত হয় ২৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৩২। ২৫ সেপ্টেম্বর বোম্বাইয়ে হিন্দুদের এক জনসভা করা হয় এই চুক্তির সমর্থনে। ওই সভায় নিম্নোক্ত মর্মে প্রস্তাব গৃহীত হয় :

'এই সম্মেলন উচ্চবর্ণ হিন্দু ও অবদমিত সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্পাদিত ২৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৩২ চুক্তি অনুমোদন করছে, এবং আস্থা প্রকাশ করছে যে, ব্রিটিশ সরকার হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে পৃথক নির্বাচনী কেন্দ্র গঠনের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করবে এবং চুক্তি পূর্ণভাবে গ্রহণ করবে। এই সম্মেলন সরকারকে অনুরোধ করছে, মহাত্মা গান্ধীর সঙ্কল্প পূরণ করে যাতে অনশন ভঙ্গ করেন তার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করুন। সম্মেলন সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায়ের নেতাদের কাছে আবেদন করছে এই চুক্তি এবং প্রস্তাবের তাৎপর্য অনুধাবন করে তা পূর্ণ করার চেষ্টা করুন।

'এই সম্মেলন প্রস্তাব করছে, এখন থেকে হিন্দুদের মধ্যে কেউ জন্মসূত্রে অন্ত্যজ বলে গণ্য হবেন না, এবং যাঁরা এতদিন অস্পৃশ্য হিসাবে গণ্য হতেন তাঁরা সবাই সাধারণ জলাধার, রাস্তা, বিদ্যালয়, সাধারণ সংস্থা, হিন্দুদের মতো সমানভাবে ব্যবহার করতে পারবেন। এই অধিকার প্রথম সুযোগেই বিধিবদ্ধ উপায়ে স্বীকৃত হবে এবং আগে স্বীকৃত না হলে স্বরাজ সংসদের প্রথম আইন হবে।

'আরও সিদ্ধান্ত হল যে, প্রত্যেক হিন্দু নেতার দায়িত্ব হবে, সব ধরনের আইনগত ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে সামাজিক প্রথা আরোপিত অবদমিতদের সামাজিক অক্ষমতা এবং মন্দিরে ঢোকার ওপর নিষেধাজ্ঞার অবসান।'

এই প্রস্তাবের পর হিন্দুরা আকস্মিক কার্যক্রম দিয়ে অন্ত্যজদের জন্য মন্দির উন্মুক্ত করা শুরু করে। এমন কোনও সপ্তাহ বাদ যায়নি, যে সপ্তাহে গান্ধী প্রতিষ্ঠিত 'হরিজন' পত্রিকায় উন্মুক্ত মন্দিরের সংখ্যা, জলাধার ও বিদ্যালয় অন্ত্যজদের জন্য উন্মুক্ত করার তালিকা থাকত না। প্রথম পাতায় সপ্তাহে সপ্তাহে নামকরণে এই তালিকা দেওয়া হত। 'হরিজন'-এর দুটি সংখ্যা থেকে কিছু নমুনা তুলে দিলাম।

'হরিজন', ১৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৩

সাপ্তাহিক

(৭ ফেব্রুয়ারি সপ্তাহান্তে)

উন্মুক্ত মন্দির

উত্তর কলকাতায় সম্প্রতি ১.৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মিত মন্দির। মাদ্রাজের গঞ্জাম জেলায় ভাপুর গ্রামের একটি মন্দির। পঞ্জাবের জলন্ধরে নৌরনিয়াতে ঠাকুরদ্বার মন্দির।

উন্মক্ত কুয়ো

জয়পুর শহরে গুরিয়াপুর-এ একটি পুরসভার কুয়ো, জেলা কটক, ওড়িশা। ওয়াজিরপুর ও নিকিগলি, (আগ্রা) দুটি কুয়ো।

ত্রিচিনাপলি (মাদ্রাজ)-তে এক কট্টর ব্রাহ্মণ হরিজন ও হিন্দুদের একত্র ব্যবহারের জন্য তিনটি কূপ খননের ব্যয় বহন করবেন।

বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা

বাচরোটা, জেলা মিরাট, যুক্তপ্রদেশ একটি অবৈতনিক বিদ্যালয়। মেটা জেলা, রাজপুতানায় একটি বিদ্যালয়।

জয়পুর রাজ্য, রাজপুতানার ফতেপুর, চেমাম, অভয়পুরে তিনটি বিদ্যালয়। ফতেগর, জেলা ফারুকাবাদ, যুক্তপ্রদেশ তিনটি নৈশ বিদ্যালয়।

গোরখপুর শহর, যুক্তপ্রদেশে তিনটি নৈশ বিদ্যালয়।

হাতা তহশিল, জেলা গোরখপুর, যুক্তপ্রদেশ, একটি নৈশ বিদ্যালয়, সাঙ্ঘোনিয়ায় একটি নৈশ বিদ্যালয়।

দেশীয় রাজ্যসমূহ

১। পালিটানা রাজ্য (কাথিয়াবার) বিধানসভা সংখ্যাগরিষ্ঠ ভাবে গৃহীত তিনটি প্রস্তাবে হরিজনদের সুযোগ দান।

২। সান্ধুর রাজ্য সরকার (মাদ্রাজ) একটি স্থায়ী সমিতি (Standing Committee) নিয়োগ করে রাজ্যের হরিজনদের উন্নতির জন্য ব্যবস্থা গ্রহণের পর্যালোচনা করতে বলেছে।

সাধারণ

১। গোরখপুর জেলার কাসিয়ার কাছে বিভিন্ন গ্রামে হরিজনরা মরা জন্তুর মাংস ভক্ষণ ছেড়েছেন।

২। মজঃফরপুর (বিহার) বসন্ত পঞ্চমীর দিন বসন্তোৎসব উদ্‌যাপন করা হয়েছে হরিজন সেবা সঙ্ঘের উদ্যোগে, শ্রী চতুর্ভুজনাথজি মন্দিরে। এতে সব হিন্দু জাতের মানুষ যোগ দেয়।

এ.ভি. ঠক্কর, সাধারণ সম্পাদক

শ্রী ভি. আর. সিন্ধে, সভাপতি, নিখিল ভারত অস্পৃশ্যতা বিরোধী লীগ, এবং প্রতিষ্ঠাতা অছি, ভারতের অনুন্নত সমাজ মিশন, রঙ্গ আয়ার উত্থাপিত অস্পৃশ্যতা

বিরোধী বিধেয়ক সমর্থনের জন্য বিধানসভার সদস্যদের প্রকাশ্য পত্র পাঠিয়েছেন।

বোম্বাই 'জি' ওয়ার্ডের তাইকালওয়াড়িতে সম্প্রতি অগ্নিসংযোগে ৪৮ টি মাহার পরিবারের কুটির ও জিনিসপত্র ক্ষতিগ্রস্ত হয়। 'অস্পৃশ্য সমাজ সেবক' (Servants of Untouchable Society)-এর সভাপতি, বোম্বাই, এইসব ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য ৫০০ টাকা মঞ্জুর করে এবং ত্রাণের কাজ করে 'জি' ওয়ার্ডের উপ-সমিতি। ৪৮ টি পরিবারের ১৬৩ জনকে ৪০২ টাকা ৮ আনা বন্টন করা হয়।

বোম্বাই সরকার এক নির্দেশ জারি করে বলেছে যে, পুকুর, কুয়ো, ধর্মশালা করার জন্য সরকারি জমি স্থানীয় প্রশাসনের কাছে চাইলে, তা দেওয়া হবে এই শর্তে যে, সব জাতের লোক এগুলি সমানভাবে ব্যবহার করতে পারবে।

'হরিজন', জুলাই ১৫, ১৯৩৩

সাপ্তাহিক

শিক্ষাগত সুযোগসুবিধা

উত্তর আরকট জেলায় এস. ইউ. এস. হরিজনদের জন্য তিনটি পাঠকক্ষ চালু করেছেন।

মাদুরা জেলায় এস. ইউ. এস কর্মীরা হরিজন শিশুদের বীরাগানুর তালুক বোর্ড স্কুলে ভর্তি করেছেন।

মাদুরা এস. ইউ. এস কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মেলাচিরি স্কুলের শিশুদের মধ্যে কলা, তোয়ালে, শ্লেট বিতরণ করা হয়েছে।

রামযশ কলেজ, দিল্লি, দুইজন হরিজন ছাত্রকে বিনামূল্যে খাদ্য ও ভাতা, অধ্যক্ষ থাদানি একজনকে অবৈতনিক ভাতা দিয়েছেন।

মোচি গেটের বাইরে লাহোর হরিজন সেবা সঙ্ঘের উদ্যোগে বয়স্ক হরিজনদের জন্য নৈশ বিদ্যালয় খোলা হয়েছে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেছেন শ্রীমতী ব্রিজলাল নেহরু।

ব্রাহ্মণ কোদুড় (গুন্টুর)-এ হরিজন ছাত্রদের জন্য আরেকটি আবাস শুরু করার সিদ্ধান্ত হয়েছে।

পূর্ব গোদাবরী জেলা হরিজন সেবা সঙ্ঘম কোকনদে হরিজন ছাত্রীদের একটা আবাস খুলবেন। ৬৩০ টাকা, ২০ বস্তা চাল, এক বছরের জ্বালানি ইতিমধ্যে ছাত্রাবাসের জন্য দান হিসাবে পাওয়া গেছে, ১৫ জন ছাত্র নিয়ে আবাস শুরু হবে।

অনন্তপুর জেলা হরিজন সঙ্ঘম উরাভাকোণ্ডায় অধ্যয়নরত হরিজন ছাত্রদের জন্য একটি ছাত্র নিবাস শুরু করবেন। কিছু জিনিসপত্র ও টাকা সংগৃহীত হয়েছে, ২০ জন ছাত্র নিয়ে এটা শুরু হবে।

গুন্টুর জেলা হরিজন সঙ্ঘমের অক্লান্ত চেষ্টায় হরিজন ছাত্ররা গ্রাম ও শহরের ধরনে সবর্ণ বিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ পাচ্ছে।

কূপ

কোয়েম্বাটুর জেলায় তিনটি জলের কুয়ো খারাপ অবস্থায় ছিল, সেগুলি পরিষ্কার করে ব্যবহারযোগ্য হয়েছে। ৩১-১১-৩৩ পর্যন্ত এক পক্ষকাল প্রায় ১২৫ টি কুয়ো হরিজনদের জন্য মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে, এবং অন্ধ্র এদেশে নতুন ৫টি কুয়ো করা হয়েছে।

দক্ষিণ আরকটের জেলা বোর্ডের সভাপতি এস.ইউ.এস নির্বাচিত স্থানে চারটি কুয়ো করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

সাধারণ

হগ মার্কেট (কলকাতা)-এর কাছে ডোমদের বস্তিতে একটি দোকান থেকে কম দামে খাদ্যদ্রব্য বিক্রির ব্যবস্থা হয়েছে। বাংলার এস. ইউ. এস ৬০ টাকা দিয়ে বিবিবাগান বস্তির এক হরিজন পরিবারের ধার শোধ করেছেন। অমৃত সমাজ (কলকাতা) কিছু হরিজনকে পরিষেবা দিয়েছেন।

বোলপুর (বীরভূম)-এর ৪৫০ জন হরিজন মদ্যপান ছেড়েছেন এবং ১২৭৫ মুচি গরুর মাংস ভক্ষণ ত্যাগের শপথ নিয়েছেন।

এক মাসে এস. ইউ. এস-এর তিনটি জেলা কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে বাঁকুড়া, মুর্শিদাবাদ ও ২৪ পরগনায়।

ত্রিচুনিপলি, তাঞ্জোর, তিন্নেভেলী, সালেম, ডিণ্ডিগুল, উত্তর আরকট ও মাদুরায় গান্ধী হরিজন সেবা কেন্দ্র হয়েছে।

কোইম্বাটুর থেকে ১২ মাইল দূরে হরিজন অধ্যুষিত আলানদুরাল গ্রামে অগ্নিসংযোগের পর ২৫ টাকার শস্য, ১০০ টাকার কাপড় এবং ৫ টাকার তেল ত্রাণ হিসাবে দেওয়া হয়েছে। চিদাম্বরম-এ একটি হরিজন যুব লীগ গঠিত হয়েছে। তেনালীতে হরিজনদের জন্য উৎপাদন-মূল্যে জিনিসপত্র সরবরাহের একটি দোকান খোলা হয়েছে।

হরিজন অধ্যুষিত ভালান্না পালেম (পূর্ব কৃষ্ণা) গ্রাম জ্বলে যাওয়ার পর বাড়ি পুনর্গঠনের জন্য ১১০ টাকা ব্যয় করা হয়েছে।

ইয়েল্লামানচিনি (ভিজাগাপট্টম) গ্রাম জ্বলে যাওয়ার পর হরিজনদের ত্রাণে ১০০ টাকা দেন প্রাদেশিক কমিটি। স্থানীয় হরিজন সেবা সঙ্ঘম একটু ভাল অঞ্চলে হরিজনদের বাড়ি তৈরির জন্য তহবিল ও উপাদান সংগ্রহ করার চেষ্টা করছে।

গোল্লাপালেম-এ একজন সবর্ণ হিন্দু তাঁর বাড়িতে একজন হরিজনকে ভৃত্যরূপে নিয়োগ করেছেন।

মন্দিরের অছি বা মালিকরা অন্ত্যজদের জন্য মন্দির মুক্ত করতে রাজি না থাকলে হিন্দুরা সত্যাগ্রহ করে তাদের বাধ্য করত রাজি করতে। গুরুবায়ুর-এর মন্দিরে অন্ত্যজদের প্রবেশাধিকারের জন্য শ্রী কেলাপ্পানের সত্যাগ্রহ এই অন্দোলনের অংশ ছিল। যেসব অছির বিরুদ্ধে দাঁড়াবার সাহস করতেন তাঁদের বিরুদ্ধে আইনসভার হিন্দু সদস্যরা বিধেয়ক আনতেন, গণভোটে যদি দেখা যেত যে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু ভক্ত মন্দির মুক্ত করার পক্ষে, তাহলে বিধেয়ক পেশের জন্য হুড়োহুড়ি পড়ে যেত। এই ধরনের বিধেয়কের পাহাড় জমে যেত, হিন্দু সদস্যরা প্রথমে বিধেয়ক পেশের জন্য প্রতিযোগিতা করতেন। মাদ্রাজ বিধান পরিষদের ডাঃ সুব্বারোয়ান এক মন্দির প্রবেশ বিধেয়ক (Temple Entry Bill) আনেন। কেন্দ্রীয় বিধানসভায় চারটি বিধেয়ক পেশ হয়, একটি পেশ করেন শ্রী সি. এস. রঙ্গ, আরেকটি হরবিলাস সারদা, তৃতীয় বিধেয়ক পেশ করেন লালচাঁদ নাভালরাই, চতুর্থটি পেশ করেন এম. আর. জয়কার। এই আন্দোলনে শ্রী গান্ধীও যোগ দেন। ১৯৩২ সালের আগে গান্ধী মন্দিরে অন্ত্যজদের প্রবেশাধিকারের বিরুদ্ধে ছিলেন। তাঁর নিজের কথায়[১]:

'অন্ত্যজদের মন্দিরে প্রবেশাধিকার সম্ভব হবে কীভাবে, হিন্দু ধর্মে যতদিন জাত ও আশ্রম সংক্রান্ত আইন মুখ্য স্থানে থাকবে, প্রত্যেক হিন্দু সব মন্দিরে ততদিন প্রবেশ করতে পারবে বলাটা বর্তমানে সম্ভব নয়।'

কাজেই মন্দিরে প্রবেশাধিকারের আন্দোলনে তাঁর যুক্ত হওয়া বিস্ময়ের ব্যাপার। গান্ধী কেন এই ভোল পালটালেন বলা শক্ত। হিন্দু মন্দিরে অন্ত্যজদের প্রবেশাধিকারের বিরুদ্ধতা করা অন্যায়, এই বিশ্বাস থেকেই কি তাঁর এই হৃদয় পরিবর্তন? 'পুনা চুক্তি'র পরিণামে হিন্দু ও অন্ত্যজদের মধ্যে রাজনৈতিক বিভক্তি সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় বন্ধনও ছিন্ন করতে পারে, এই বোধ থেকেই কি তিনি বুঝেছিলেন যে, মন্দিরে প্রবেশাধিকারের মতো কিছু ব্যবস্থা দিয়ে এই প্রবণতা রোধ করে বন্ধন অটুট রাখা যাবে? না কি, মন্দিরে প্রবেশ আন্দোলনে যুক্ত হওয়ার পেছনে তাঁর উদ্দেশ্য ছিল হিন্দু অন্ত্যজদের বেড়া ভেঙে দিয়ে অন্ত্যজদের রাজনৈতিক অধিকারের দাবি নস্যাৎ করা? অথবা তাঁর সামনে নাম-যশের সম্ভাবনা প্রতিভাত হওয়ার দরুনই তিনি স্বভাববশে এটা করতে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন? দ্বিতীয় বা তৃতীয় ব্যাখ্যাটাই সত্যের কাছাকাছি।

II

মন্দিরে প্রবেশাধিকার আন্দোলনের প্রতি অন্ত্যজদের দৃষ্টিভঙ্গি কী ছিল? শ্রী

---

১. গান্ধী শিক্ষণ, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৩২

গান্ধী আমাকে এই আন্দোলন সমর্থন করতে বলেন, আমি তা প্রত্যাখ্যান করি এবং একটা বিবৃতি দিই। পাঠকের বুঝার স্বার্থে আমার বিবৃতির পুরোটাই তুলে ধরছি।

মন্দিরে প্রবেশাধিকার বিধেয়ক সম্পর্কে বিবৃতি

মন্দিরে প্রবেশাধিকার সম্পর্কে বিতর্কটি যদিও সনাতনপন্থী ও মহাত্মা গান্ধীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, অস্পৃশ্য সম্প্রদায়ের ভূমিকা খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল, কারণ বিষয়টি চরম মীমাংসা স্তরে আসায় তাদের অবস্থিতি যে-কোনও দিকে মোড় নিতে পারে। সেজন্য, তাদের দৃষ্টিভঙ্গিটা ঠিকভাবে উপস্থাপিত করা দরকার, যাতে কোনও বিভ্রান্তির অবকাশ না থাকে।

শ্রী রঙ্গ আয়ার প্রস্তাবিত বিলে অনুন্নত সম্প্রদায় সমর্থন দিতে পারে না। এই বিলের নীতি হল, কোনও স্থানীয় বোর্ড বা পুরসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটার গণভোটে সংলগ্ন এলাকার মন্দিরে অস্পৃশ্য সম্প্রদায়ের প্রবেশের পক্ষে রায় দেন তবে মন্দিরের মালিক বা অছিকে এই সিদ্ধান্ত কার্যকরী করতে হবে। এই নীতি সংখ্যাগরিষ্ঠ শাসনের সাধারণ নীতি, এতে প্রগতিবাদী বা বৈপ্লবিক কিছু নেই, সনাতনপন্থীরা চালাক হলে বিনা দ্বিধায় এটা মেনে নেবে।

এই নীতির ভিত্তিতে আনীত বিধেয়ককে অস্পৃশ্য সম্প্রদায় সমর্থন করতে পারে না দুটি কারণে : প্রথমত, এই বিধেয়ক অস্পৃশ্যদের মন্দিরে প্রবেশ স্বাভাবিক-এর চেয়ে ত্বরান্বিত করবে না। এটা ঠিক, এই বিধেয়ক হলে সংখ্যালঘুরা অছির বিরুদ্ধে আসেধাজ্ঞা (injunction) পাওয়ার অধিকারী হবে না, অথবা সংখ্যাগরিষ্ঠ রায়ের বলে মন্দির মুক্ত করার জন্য পরিচালক (Manager) বিরুদ্ধে আসেধাজ্ঞা (injunction) পাওয়া যাবে না। কিন্তু এই খণ্ড (clause) সম্পর্কে সন্তুষ্ট হওয়ার আগে এবং বিধেয়কের প্রণেতাকে অভিনন্দিত করার আগে বুঝতে হবে, ভোটের ব্যাপার হলে দেখা যাবে বেশিরভাগ মন্দিরে প্রবেশের পক্ষে। কেউ যদি মোহাবিষ্ট না হন তবে স্বীকার করবেন যে, মন্দিরে প্রবেশাধিকারের পক্ষে বেশিরভাগ ভোটদানকারীদের আশা এই সিদ্ধান্ত রূপায়িত হবে না। নিঃসন্দেহে বেশিরভাগ-ই এই বিধেয়কের বিরুদ্ধে—বিধেয়কের রচয়িতা নিজে শঙ্করাচার্যের সঙ্গে পত্রালাপে একথা বলেছেন।

বিধেয়কটি গৃহীত হওয়ার পর কী পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে যার জন্য আশা করা যায় যে, সংখ্যাগরিষ্ঠ লোক পৃথক আচরণ করবে? আমি কিছু দেখি না। অবশ্য গুরুভায়ুর মন্দির বিষয়ক গণভোটের ফলাফলের বিষয় মনে করিয়ে দেওয়া হবে জানি। কিন্তু, মহাত্মা গান্ধীর জীবনের প্রশ্নে ভারাক্রান্ত এই সিদ্ধান্তকে আমি স্বাভাবিক বলে মানতে রাজি নই। এ-ধরনের মূল্যায়নে মহাত্মা গান্ধীর জীবনের বিষয়টি বিয়োগ করতে হবে।

দ্বিতীয়ত, এই বিধেয়ক মন্দিরে অস্পৃশ্যতাকে পাপজনক রীতি বলে মনে করে না। এতে অস্পৃশ্যতাকে অন্যান্য সামাজিক কু-প্রথার চেয়ে বেশি ক্ষতিকর বলে গণ্য করা হয়নি। কারণ, এই বিধেয়ক অস্পৃশ্যতাকে বেআইনি ঘোষণা করেনি। এর বাধ্যতামূলক প্রয়োগশক্তি কেড়ে নেওয়া হবে, যদি সংখ্যাগরিষ্ঠ সেই সিদ্ধান্ত নেয়। সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ পাপ ও অনৈতিকতা অনুসরণ করলে বা আসক্ত হলে তা সহনীয় বা গ্রহণযোগ্য হয় না। অস্পৃশ্যতা যদি পাপ বা অনৈতিক রীতি বলে গণ্য হয়, তবে অবদমিতদের মতে সেই সংখ্যাগরিষ্ঠদের কাছে স্বীকৃত হলেও অবিলম্বে তার উচ্ছেদ করতে হবে। এই ধরনের প্রথা বিচারালয়ের কাছে অনৈতিক ও সাধারণ নীতি- বিরোধী মনে হলে এইভাবেই তার অবসান করে।

প্রস্তাবিত বিধেয়কটি এটাই করেনি। সমাজ সংস্কারক মদ্যপানকে যে চোখে দেখেন, এই বিধেয়কের রচয়িতা অস্পৃশ্যতাকে সেভাবেই দেখেছেন। এমনকী, এই দুইয়ের মধ্যে তিনি এত সাদৃশ্য দেখেছেন যে, সমাজ সংস্কারক যে পদ্ধতিতে অর্থাৎ স্থানীয় মতের দ্বারা পানাভ্যাস বন্ধ করতে চান, এক-ই পদ্ধতি অস্পৃশ্যতার ক্ষেত্রে চাইছেন। অবদমিত সম্প্রদায়ের যে বন্ধু অস্পৃশ্যতাকে পানাভ্যাসের চেয়ে বেশি খারাপ মনে করেন না, তার প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়ার অবকাশ নেই। শ্রীরঙ্গ আয়ার যদি ভুলে না যান যে কয়েক মাস আগে মহাত্মা গান্ধী অস্পৃশ্যতার নিরসন না হলে আমরণ অনশনের কথা বলেছিলেন, তবে তিনি নিশ্চয়-ই এই পাপের ব্যাপারে আরও আন্তরিক হয়ে এর সমূল উৎপাটনে সচেষ্ট হতেন। কার্যকারিতার দিক থেকে এর দুর্বলতা যাই থাক, অবদমিত সম্প্রদায় এই বিধেয়ক সম্বন্ধে এটুকু মাত্র আশা করতে পারে যে, অস্পৃশ্যতাকে পাপ হিসাবে স্বীকার করা হোক।

মহাত্মা গান্ধী বরাবর অস্পৃশ্যতাকে পাপ হিসাবে অভিহিত করেও কেন এই বিধেয়ক-এ সন্তুষ্ট, তা আমি বুঝি না। এটা অবদমিত সম্প্রদায়কে সন্তুষ্ট করেনি। এই বিধেয়ক ভাল না মন্দ, যথেষ্ট না যথেষ্ট নয়, এসব গৌণ প্রশ্ন।

মূল প্রশ্ন হল : অবদমিত সম্প্রদায় কি মন্দিরে প্রবেশাধিকার চায়, অথবা চায় না? এই মূল প্রশ্ন দুইভাবে দেখছে অবদমিত সম্প্রদায়। একটা, বাস্তববাদী দৃষ্টি। এর থেকে শুরু করে অবদমিত সম্প্রদায় মনে করছে যে, উন্নতির পক্ষে নিশ্চিত পথ হল উচ্চশিক্ষা, ভাল চাকরি এবং ভাল রোজগারের উপায়। একবার সামাজিক মর্যাদার সিঁড়িতে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারলে, তারা মর্যাদাসম্পন্ন হবে এবং মর্যাদাসম্পন্ন হলে তাদের প্রতি কট্টরপন্থীদের ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি পালটাবে, এবং এটা না হলেও তাদের ব্যবহারিক স্বার্থের ক্ষতি হবে না। এই দিক থেকে ভেবেই অবদমিত সম্প্রদায়

বলে যে, মন্দিরে প্রবেশাধিকারের মতো শূন্যগর্ভ ব্যাপারে তারা শক্তি নষ্ট করবে না। আরেকটা কারণে তারা এর জন্য লড়াই করতে উৎসাহী নয়। সেই যুক্তি হচ্ছে আত্মসম্মানের যুক্তি।

কিছুদিন আগেই ভারতে বসবাসকারী ইউরোপীয়দের ক্লাব বা সামাজিক কেন্দ্রের দরজায় ফলক ঝুলত, তাতে লেখা থাকত, 'ভারতীয় ও কুকুরদের প্রবেশ নিষেধ।' হিন্দুদের মন্দিরেও একইরকম ফলক রয়েছে, একমাত্র পার্থক্য হচ্ছে হিন্দু মন্দিরের ফলকে লেখা থাকে 'সব হিন্দু এবং কুকুরসহ সব পশুর প্রবেশাধিকার আছে, শুধু অস্পৃশ্যদের প্রবেশ নিষেধ।' উভয় ক্ষেত্রে পরিস্থিতি সমান। কিন্তু হিন্দুরা ইউরোপীয়দের দাম্ভিকতাপূর্ণ ওইসব জায়গায় প্রবেশাধিকার চায়নি। অন্ত্যজরাই বা দাম্ভিক হিন্দুদের চাপানো নিষেধাজ্ঞা অবসান তথা ওইসব জায়গায় প্রবেশাধিকারের জন্য মিনতি করবে কেন? নিজের উন্নতিতে উৎসাহী অবদমিত সম্প্রদায়ের লোকের এই হচ্ছে মানসিকতা। হিন্দুদের কাছে সে বলতে রাজি, 'মন্দিরের দরজা খোলা বা না খোলা তোমাদের ব্যাপার, এর জন্য আমরা আন্দোলন করব না। তোমরা যদি মনে করো যে, মানুষের ব্যক্তিত্বের পবিত্রতাকে সম্মান না করা অত্যন্ত বাজে রীতি, তাহলে মন্দিরের দরজা মুক্ত করে দাও, এবং ভদ্রলোক হও। ভদ্রলোক না হয়ে হিন্দু হতেই যদি উৎসাহী থাকো, তবে দরজা বন্ধ করে রাখো এবং নিজেকে অভিসম্পাত দাও, কারণ আমি আসতে উৎসাহী নই।'

আমার যুক্তি এইভাবে উপস্থাপিত করা প্রয়োজন মনে করি, কারণ পণ্ডিত মদন মোহন মালব্যের মতো মানুষের ভুল ধারণা ভাঙতে চাই, তাঁরা মনে করেন যে, অবদমিত সম্প্রদায় তাদের পৃষ্ঠপোষকতা পাওয়ার জন্য ব্যাকুল। দ্বিতীয় দৃষ্টিভঙ্গিটা আধ্যাত্মিক। ধর্মীয় মনোভাবাপন্ন মানুষ হিসাবে অবদমিত সম্প্রদায়ের লোক কি মন্দিরে প্রবেশাধিকার চায়, না চায় না? সেটাই মূল প্রশ্ন। ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গির বিচারে, শুধু ব্যবহারিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রাধান্য পেলেও তারা মন্দিরে প্রবেশাধিকারের ব্যাপারে অনীহ নয়। কিন্তু তাদের চরম সিদ্ধান্ত নির্ভর করছে মহাত্মা গান্ধী ও হিন্দুরা এই প্রশ্নের উত্তর কী দেয় তার ওপর। প্রশ্নটা হল, মন্দিরে প্রবেশাধিকারের এই উদ্যোগের পেছনে অভিপ্রায়টা কী? মন্দিরে প্রবেশ প্রশ্নটি কি হিন্দু সামাজিক স্তরে অবদমিত সম্প্রদায়ের সামাজিক মর্যাদার উন্নতির চরম লক্ষ্য? না কি, এটা প্রথম পদক্ষেপ, এবং প্রথম পদক্ষেপ হলে চরম লক্ষ্য কী? চরম লক্ষ্য হিসাবে মন্দিরে প্রবেশাধিকার অবদমিত সম্প্রদায়ের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। এটা তারা প্রত্যাখ্যান করবে তো বটেই, মনে করবে যে, হিন্দু সমাজ তাদের প্রত্যাখ্যান করেছে, এবং তারা তাদের স্বাধীন পথ বেছে নেবে। অন্যদিকে, এটা যদি প্রথম পদক্ষেপ হয়, তারা তা সমর্থন

করতে পারে। তখন পরিস্থিতিটা ভারতের বর্তমান রাজনীতির মতো হবে। সব ভারতীয় ভারতের জন্য অধিরাজ্যের (Dominion) মর্যাদা চাইছে। সংবিধানে অধিরাজ্যের মর্যাদা পুরোপুরি দেওয়া হবে না, তবু সব ভারতীয় তা মেনে নেবে। কারণ? এর সোজা উত্তর, লক্ষ্যটা যদি সুনির্দিষ্ট হয় তবে একধাপে তা অর্জন করা, না ধীরে ধীরে, সেটা গৌণ ব্যাপার। কিন্তু ব্রিটিশরা অধিরাজ্যের (Dominion) মর্যাদা স্বীকার না করলে কেউ-ই আংশিক সংস্কারের প্রস্তাব গ্রহণ করত না, এখন সেটাই হচ্ছে। সদৃশভাবে, মহাত্মা গান্ধী ও সংস্কারকরা যদি হিন্দু সমাজে অবদমিতদের মর্যাদা উন্নত করার সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ঘোষণা করেন, তবে মন্দিরে প্রবেশাধিকারের প্রশ্নে অবদমিত সম্প্রদায়ের মনোভাব প্রকাশ করার সুবিধা হয়। অবদমিত সম্প্রদায়ের লক্ষ্য সবার বিচার ও অবগতির জন্য ঘোষণা করা যেতে পারে। অবদমিত সম্প্রদায় যেটা চায়, এমন এক ধর্ম, যা তাদের সমান সামাজিক মর্যাদা দেবে। কোনও ভুল বোঝাবুঝির অবকাশ না রাখার জন্য আমি বিষয়টির সবিস্তার ব্যাখ্যা করতে চাই ধর্মনিরপেক্ষ কারণজনিত সামাজিক কু-প্রথা ও ধর্মভিত্তিক কু-প্রথার মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করে। সভ্যসমাজে সামাজিক কু-প্রথা থাকার যৌক্তিকতা নেই। কিন্তু ধর্মের দোহাই দিয়ে কু-প্রথাকে যুক্তিবহ করার মতো জঘন্য নোংরা ব্যাপার নেই। অবদমিত সম্প্রদায় অসাম্যের অবসান করতে অক্ষম, কিন্তু যে ধর্ম এই অসাম্য বজায় রাখার পক্ষে, সেই ধর্ম বরদাস্ত না করার জন্য তারা দৃঢ়সঙ্কল্প।

হিন্দু ধর্ম যদি তাদের ধর্ম হতে হয়, তবে এই ধর্মকে সামাজিক সাম্যের ধর্ম হতে হবে। হিন্দু ধর্মীয় বিধির সংশোধন করে সবার মন্দিরে প্রবেশাধিকার যুক্ত করে একে সম-সামাজিক মর্যাদার ধর্ম করা যাবে না। যেটা করা যায়, রাজনীতিতে প্রচলিত ভাষা প্রয়োগ করেই বলি, তাদের জাত হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, তারা এমন অবস্থায় পৌঁছবে যেখানে কারও ওপরে বা নীচে না থেকে তারা সমান ও স্বাধীন হতে পারবে। এর সহজ কারণ হচ্ছে হিন্দু ধর্মে সামাজিক মর্যাদার ক্ষমতা স্বীকার করা হয় না ; বরং ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র হিসাবে বিন্যস্ত করে অসাম্য বজায় রাখে এবং একের বিরুদ্ধে অপরকে ঘৃণা ও অবমাননার অভিব্যক্তির শিকারে পরিণত করে। হিন্দু ধর্মকে সামাজিক সমতার ধর্ম হতে হলে মন্দিরে প্রবেশাধিকারের জন্য হিন্দু বিধি সংস্কার যথেষ্ট নয়। চাতুর্বর্ণের তত্ত্ব বরবাদ করতে হবে, এটাই যাবতীয় অসাম্যের মূল এবং জাতভেদ প্রথা ও অস্পৃশ্যতার জনক, এসব-ই অসাম্যের বিভিন্ন রূপ। এটা করা না হলে অবদমিত সম্প্রদায় মন্দিরে প্রবেশাধিকারই বাতিল করবে না, হিন্দু বিশ্বাসকে প্রত্যাখ্যান করবে। চাতুর্বর্ণ ও জাতপ্রথা অবদমিত সম্প্রদায়ের আত্মমর্যাদার সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ। যতদিন

এগুলি মূল তত্ত্ব থাকবে ততদিন অবদমিত সমাজ হেয় বলে পরিগণিত হবে। অবদমিত সম্প্রদায় বলতে পারে, হিন্দু শাস্ত্র থেকে চাতুর্বর্ণ ও জাতপ্রথা পরিত্যক্ত হলে তবেই তারা হিন্দু হবে। হিন্দু সংস্কারক ও মহাত্মা কি এই লক্ষ্য স্বীকারে এবং এর জন্য কাজ করতে রাজি আছেন? আমার সিদ্ধান্ত জানাবার আগে আমি তাঁদের ঘোষণার জন্য অপেক্ষা করব। মহাত্মা ও হিন্দু সংস্কারকরা এর জন্য প্রস্তুত থাকুন বা না থাকুন, এটা সবার জেনে রাখা দরকার যে, অবদমিত সম্প্রদায় এছাড়া কোনও প্রস্তাবে সন্তুষ্ট হবে না, এবং মন্দিরে প্রবেশাধিকারে উৎসাহী নয়। মন্দিরে প্রবেশাধিকার মেনে নিয়ে সন্তুষ্ট থাকার অর্থ কু-প্রথার সঙ্গে সমঝোতা করা এবং মানুষের ব্যক্তিত্বের পবিত্রতা বিকিয়ে দেওয়া।

অবশ্য মহাত্মা গান্ধী ও হিন্দু সংস্কারকরা আমার এই যুক্তির বিরুদ্ধে একথা বলতে পারেন : 'অবদমিত সম্প্রদায় এখন মন্দিরে প্রবেশাধিকার মেনে নিলে তাতে পরে চাতুর্বর্ণ ও জাতপ্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন করায় বাধা থাকবে না। এই যদি তাদের মত হয়, আমি এই স্তরেই তাদের এই যুক্তি খণ্ডন করে প্রশ্নটির মীমাংসা চাই এবং ভবিষ্যৎ উন্নয়নের পথ মুক্ত করতে চাই। আমার উত্তর হল, এটা ঠিক-ই যে এখন মন্দিরে প্রবেশাধিকার মেনে নিলে পরে চাতুর্বর্ণ ও জাতপ্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলনের অধিকার নষ্ট হবে না। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, এই বিষয় যখন আসবে তখন মহাত্মা গান্ধী কোন্ পক্ষ নেবেন? যদি তিনি আমার বিরোধী শিবিরে থাকেন, এখন-ই তাঁকে বলতে চাই, আমি এখন তাঁর শিবিরে থাকব না। তিনি যদি আমার শিবিরে থাকেন তাহলে এখন থেকেই থাকতে হবে।—বি. আর. আম্বেদকর

আমার সঙ্গে যিনি গোল টেবিল বৈঠকে অন্ত্যজদের প্রতিনিধি হিসাবে যোগ দিয়েছিলেন, দেওয়ান বাহাদুর আর. শ্রীনিবাসনও মন্দিরে প্রবেশাধিকার আন্দোলন সমর্থন করেননি। সংবাদপত্রে বিবৃতিতে তিনি বলেন :

'অবদমিত সম্প্রদায়ের কেউ উচ্চবর্ণের হিন্দু মন্দিরে প্রবেশের অনুমতি পেলে সে কখনও চার বর্ণের একজন রূপে গৃহীত হবে না, তাকে পঞ্চম বা শেষ বা নীচের বর্ণের একজন হিসাবে গণ্য করা হবে। এই কলঙ্কচিহ্ন অস্পৃশ্য বলে ডাকার চেয়েও খারাপ। একই সঙ্গে তাকে হাজারো বর্ণগত বিধি-নিষেধ ও অপমানের শিকার হতে হবে। অবদমিত সম্প্রদায় এভাবে মন্দিরে প্রবেশকারীকে পরিহার করে এবং তাকে বর্ণহিন্দুর লোক হিসাবে বিচ্ছিন্ন করে। অবদমিত সম্প্রদায়ের কোটি কোটি মানুষ এই

বর্ণগত বিধি-নিষেধের প্রতি নতিস্বীকার করবে না। এটা করলে তারা বহু অংশে বিভক্ত হয়ে পড়বে। আইন দিয়ে জোর করে মন্দিরে প্রবেশাধিকার হবে না। গ্রামের অবদমিত মানুষের কাছে এটা একটা কাগজের টুকরোমাত্র, যাতে 'চিনি' লিখে তাকে স্বাদ নিতে বলা হচ্ছে। দেশের মধ্যে বিভ্রান্তি ও বিশৃঙ্খলা এড়ানোর জন্য এইসব ঘটনা সর্বসমক্ষে তুলে ধরা হল।'

শ্রী গান্ধীর কাছে আমার বিবৃতির প্রশ্ন তুলে ধরাতে তিনি সরাসরি উত্তর দিয়ে বলেন, তিনি অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে হলেও জাতপ্রথার বিরুদ্ধে নন। এইভাবে জাতপ্রথার পক্ষে হলে তিনি কখনই তাঁর সংস্কার কর্মসূচিকে অস্পৃশ্যতা নিরসনের ঊর্ধ্বে বেশিদূর নিয়ে যাবেন না। আমার দৃষ্টিভঙ্গি ঠিক করার পক্ষে এটাই যথেষ্ট। আমি আর এতে যোগ দিইনি।

অন্ত্যজদের একমাত্র মুখ্য প্রতিনিধি ছিলেন প্রয়াত দেওয়ান বাহাদুর রাজা। এটা বলা ছাড়া উপায় নেই যে, তাঁর ভূমিকা দুঃখজনক ছিল। ১৯২৭ সাল থেকে তিনি কেন্দ্রীয় আইনসভার মনোনীত সদস্য। আইনসভার ভেতরে বা বাইরে কংগ্রেসের কোনও ব্যাপারে তিনি ছিলেন না। ভুলবশত বা দুর্ঘটনাক্রমে তিনি কংগ্রেসের পক্ষাবলম্বী ছিলেন না। তিনি কংগ্রেসের সমালোচক তো বটেই, কংগ্রেসের শত্রু ছিলেন। তিনি সরকারের জোরদার বন্ধু ছিলেন এবং সরকার পক্ষে দাঁড়াতে দ্বিধা করতেন না। অন্ত্যজদের জন্য পৃথক নির্বাচকমণ্ডলীর পক্ষে তিনি ছিলেন, কংগ্রেস এর বিরুদ্ধে ছিল। ১৯৩২-এর সঙ্কটে দেওয়ান বাহাদুর হঠাৎ সরকার পক্ষ ত্যাগ করে কংগ্রেসের পক্ষে চলে যান। যুক্ত নির্বাচকমণ্ডলী ও মন্দিরে প্রবেশাধিকারের কংগ্রেস আন্দোলনে তিনি অগ্রণী হয়ে যান। অন্য সাধারণ স্বার্থে এ-ধরনের নজির মেলা ভার। সবচেয়ে খারাপ দিক হল, এর পেছনে ব্যক্তিস্বার্থ ছাড়া কিছু ছিল না। দেওয়ান বাহাদুর দারুণভাবে খাটো হয়ে যান সরকার 'গোল টেবিল বৈঠকে' তাঁকে অন্ত্যজদের প্রতিনিধি না করে দেওয়ান বাহাদুর আর. শ্রীনিবাসনকে মনোনীত করায়। তাঁকে অমনোনয়নে ভারত সরকারের যুক্তি ছিল। এটা সিদ্ধান্ত হয়েছিল যে, কেন্দ্রীয় আইনসভার সদস্য বা সাইমন কমিশনের সদস্যকে 'গোল টেবিল বৈঠকে' স্থান দেওয়া হবে না। দেওয়ান বাহাদুর কেন্দ্রীয় আইনসভার সদস্য ছিলেন, সেজন্য বাদ পড়ে যান। এটা স্বাভাবিক ব্যাখ্যা। কিন্তু রাজার আহত অপমানবোধ এটা বরদাস্ত করতে পারেনি। মাদ্রাজে কংগ্রেস মন্ত্রিসভা গঠিত হলে যখন তিনি দেখেন কীভাবে 'পুনা চুক্তি' পদদলিত করা হল এবং কংগ্রেসের তাঁর অবদান সত্ত্বেও তাঁর প্রতিপক্ষ

একজনকে মন্ত্রী করা হল, তিনি অতীত কৃতকর্মের জন্য দুঃখিত হন। তবু এটা ঘটনা যে, ১৯৩২-এর সঙ্কটকালে রাজা দেওয়ান বাহাদুর কংগ্রেসকে সমর্থন করেছিলেন। শুধু কংগ্রেসের সঙ্গে ছিলেনই না, তিনি অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে আইন পেশের প্রতিযোগিতায় পুরো শামিল হন। তিনিও দুটি বিধেয়কের প্রবক্তা হন। এর একটার নাম অস্পৃশ্যতা নিরসন বিধেয়ক (Removal of Untouchability Bill), আরেকটি ফৌজদারি বিধি সংশোধন বিধেয়ক (Criminal Procedure Bill).

III

শ্রী গান্ধী কোনও বিরোধিতার তোয়াক্কা করতেন না, কট্টর হিন্দু বা অন্ত্যজ, যাদের থেকেই বিরোধিতা আসুক, তিনি নিস্পৃহ থাকতেন। তাঁর লক্ষ্যপূরণে তিনি উন্মত্তভাবে অগ্রসর হতেন। এটা প্রশ্ন করার কৌতূহল হয়, তাহলে আন্দোলনের কী হল? এই গ্রন্থের স্বল্প পরিসরে এর বিস্তারিত উত্তর দেওয়া সম্ভব নয় এবং আন্দোলনের সাফল্য প্রমাণে কী কী করা হয়েছিল তা বলা মুশকিল।

সংক্ষিপ্তভাবে বলা যায়, অস্পৃশ্যতার নিরসনে মন্দির ও কূপ মুক্ত করার জন্য স্বল্পকাল কাজ করে হিন্দু মন পুরনো অবস্থায় ফিরে আসে। 'হরিজন' পত্রিকার 'সাপ্তাহিক' স্তম্ভে প্রকাশিত ঘটনার বিবরণ ক্রমে কমতে কমতে অদৃশ্য হয়। আমার কাছে এটা বিস্ময়ের কিছু নয় যে, হিন্দু মানসিকতা অত শীঘ্র পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে গেল। কারণ আমি কখনও বিশ্বাস করি না যে, হরিজন-এর 'সাপ্তাহিক'-এ যেভাবে সবার কাছে বিশ্বাসযোগ্য করার চেষ্টা হয়, সেরকম কোনও মানবতা হিন্দুদের মধ্যে ছিল। বাস্তবত সাপ্তাহিক-এ যেসব সংবাদ বেরুত তার বেশিরভাগই মিথ্যা বানানো। বিশ্বের কাছে কংগ্রেস এইভাবে মিথ্যা প্রচার সংগঠিত করে বুঝাতে চেয়েছিল যে, হিন্দুরা অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে দৃঢ়সঙ্কল্প। খুব কম মন্দির-ই মুক্ত করা হয়েছিল, এবং আরও যেসব মন্দির মুক্ত বলে সংবাদ প্রকাশ করা হয় তার বেশিরভাগ ভাঙা এবং পরিত্যক্ত, কুকুর ও বাঁদরদের ব্যবহারস্থল। কংগ্রেস আন্দোলনের একটা অশুভ ফল হয়েছে এতে। রাজনৈতিক মনোভাবাপন্ন হিন্দুদের মিথ্যাচারী বাহিনী করে তুলেছে, কংগ্রেসকে সাহায্য করতে যে-কোনও মিথ্যাচারে এরা প্রস্তুত। এইভাবেই হিন্দু জনসাধারণের ভূমিকা পালন শেষ বা মন্দির প্রবেশাধিকার আন্দোলনে তাদের আপাতদৃশ্য ভূমিকার ইতি। গুরুভায়ুর মন্দির সত্যাগ্রহ এবং অন্ত্যজদের মন্দিরে প্রবেশাধিকারের এক-ই গতি হয়। যেহেতু শ্রী গান্ধী ও কংগ্রেসিরা এটি অনুসরণ করে, সেজন্য তার সব ইতিহাস বলা দরকার, যাতে অন্ত্যজদের প্রতি শ্রী গান্ধী ও কংগ্রেসিদের প্রকৃত দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করা যায়।

IV

গুরুভায়ুর মন্দির সত্যাগ্রহ দিয়ে শুরু করা যাক। মালাবারের পোন্নানি তালুকের গুরুভায়ুর-এ কৃষ্ণের মন্দির। কালিকটের জামোরিন[১] এই মন্দিরের অছি। জনৈক শ্রী কেলাপ্পান নামে এক হিন্দু মালাবারের অন্ত্যজদের স্বার্থে কাজ করছিলেন, তিনি অন্ত্যজদের মন্দিরে প্রবেশাধিকারের জন্য আন্দোলন শুরু করেন। অছি হিসাবে জামোরিন সেটা অগ্রাহ্য করেন এবং স্বীয় কাজের সমর্থনে হিন্দু ধর্মীয় অছি আইনের (Hindu Religious Endowments Act) ৪০ ধারার আশ্রয় নেন, এতে বলা হয়েছে, কোনও অছি মন্দিরের প্রচলিত রীতি ও আচারের বিরুদ্ধে কাজ করতে পারবে না। ২০ সেপ্টেম্বর, ১৯৩২ শ্রী কেলাপ্পান মন্দিরের সামনে শুয়ে অনশন শুরু করেন, জামোরিন যতদিন না তাঁর সিদ্ধান্ত পুনর্বিচার করবেন ততদিন সত্যাগ্রহ চালাবার কথা বলেন। বিক্ষোভ ও গোলমাল থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য জামোরিন শ্রী গান্ধীর কাছে আবেদন করেন তিনি যেন শ্রী কেলাপ্পানকে অনশন প্রত্যাহার করার অনুরোধ জানান। দশদিন অনশনের পর কেলাপ্পান গান্ধীর অনুরোধে তিন মাসের জন্য, ১ অক্টোবর, ১৯৩২ অবধি অনশন স্থগিত রাখেন। জামোরিন কিছুই করেননি। গান্ধী তাঁকে তারবার্তা করে বলেন, কিছু একটা করতেই হবে, আইনগত বা অন্যভাবে যাবতীয় সমস্যার নিরসন চাই। জামোরিনকে গান্ধী বলেন, যেহেতু তাঁর কথায় কেলাপ্পান অনশন স্থগিত রেখেছেন, সেজন্য অন্ত্যজদের মন্দিরে প্রবেশাধিকার অর্জনে তাঁর দায়িত্ব পড়ে গেছে, কেলাপ্পানের সঙ্গে প্রয়োজনে অনশনেও যোগ দেবেন। ৫ নভেম্বর, ১৯৩২, শ্রী গান্ধী সংবাদপত্রে বিবৃতিতে বলেন :

'আর একটা অনশনের সম্ভাবনা রয়েছে, গুরুভায়ুর মন্দিরে প্রবেশাধিকার নিয়ে। আমার-ই অনুরোধে কেলাপ্পান অনশন তিনমাসের জন্য প্রত্যাহার করেন। অনশনে তিনি মৃত্যুর দোরগোড়ায় উপনীত হয়েছিলেন। ১ জানুয়ারি, ১৯৩৩-এর আগে অন্ত্যজদের জন্য হিন্দুদের সমান শর্তে মন্দির উন্মুক্ত করা না হলে কেলাপ্পান যদি আবার অনশন করেন, তবে তাতে আমি যোগ দিয়ে সম্মানিত হব।'

জামোরিন নতিস্বীকার না করে সংবাদপত্রে এক পাল্টা বিবৃতিতে বলেন :

'অবর্ণদের জন্য মন্দিরের দরজা খুলে দেওয়ার জন্য বিভিন্ন সূত্রে যে আবেদন আসছে, তা নানা অসুবিধা সঠিক বুঝতে না পারার জন্য। এই পরিস্থিতিতে মন্দিরে

১. মালয়ালম শব্দ 'জামোরিন'-এর অর্থ 'সমুদ্রের রাজা'। কালিকটের হিন্দু সার্বভৌম কর্তাকে 'জামোরিন' বলা হত।—বাংলা সংস্করণের সম্পাদক।

প্রবেশাধিকার আন্দোলনকারীদের ইচ্ছামতো অবর্ণদের জন্য গুরুভায়ুর মন্দির মুক্ত করার দাবি পূরণে আমার ক্ষমতা আছে, এটা বলা অযৌক্তিক।'

এমতাবস্থায় শ্রী গান্ধীর পক্ষে অনশন করা অনিবার্য হয়ে ওঠে। কিন্তু গান্ধী অনশন করেননি। তিনি তাঁর অবস্থান সংশোধিত করে বলেন, পোন্নানি তালুকে গণভোট গ্রহণ করে যদি দেখা যায় যে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ মন্দির মুক্ত করার বিরুদ্ধে, সেক্ষেত্রে তিনি অনশন থেকে বিরত থাকবেন। সেইমতো, একটা গণভোট হয়। ভোট সীমিত থাকে মন্দিরে যাতায়াতকারীদের মধ্যে। যাঁদের মন্দিরে প্রবেশাধিকার ছিল না, এবং যাঁরা মন্দিরে প্রবেশ করে না, উভয়েই ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয় নি। সংবাদে বলা হয়, ৭৩% ভোট পড়েছে। ভোটের রায় ছিল, মন্দিরে প্রবেশাধিকারের পক্ষে ৫৩%, বিপক্ষে ৯%, + ৮% নিরপেক্ষ, ২৭% ভোটদানে বিরত। ভোটের ফলাফল অনুযায়ী গান্ধী অনশন করতে বাধ্য ছিলেন। কিন্তু তিনি তা করেননি। ২৯ ডিসেম্বর, ১৯৩২, গান্ধী সংবাদপত্রে এক বিবৃতির উপসংহারে বলেন :

'সরকারি ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে মাদ্রাজ বিধান পরিষদে ড. সুব্বারাজনের মন্দির প্রবেশাধিকার সংক্রান্ত বিধেয়ক উত্থাপনের সম্মতি ভাইসরয় ১৫ জানুয়ারির আগে ঘোষণা না করার সিদ্ধান্ত হওয়ার প্রস্তাবিত অনশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত রাখা হল, ভাইসরয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণের দিন অবধি তা স্থগিত থাকবে। এই স্থগিত সিদ্ধান্ত শ্রী কেলাপ্পানের সম্মতিক্রমে হয়।'

ভাইসরয়ের ঘোষণার যে উল্লেখ গান্ধী করেন, তা আদতে আইনসভায় মন্দির প্রবেশাধিকার বিধেয়ক উত্থাপনে ভাইসরয়ের অনুমতি বা অস্বীকৃতির সিদ্ধান্ত। ভাইসরয় এই অনুমতি দেন। তবু শ্রী গান্ধী অনশন করেননি। শুধু অনশন করেননি তা নয়, পুরো বিষয়টি বিস্মৃত হন, যেন কিছুই হয়নি। তদাবধি গুরুভায়ুর মন্দির সত্যাগ্রহ সম্বন্ধে কিছু শোনা যায়নি, যদিও অন্ত্যজদের জন্য মন্দিরটি এখনও বন্ধ।

V

এইভাবেই গুরুভায়ুর মন্দির পর্বের ইতি। অন্য পরিকল্পনা, বিশেষ করে মন্দিরে প্রবেশাধিকার সংক্রান্ত বিধেয়কের বিষয়ে আসা যাক। অনেক ক'টি বিধেয়কের মধ্যে কেন্দ্রীয় আইনসভায় শ্রী রঙ্গ আয়ার আনীত বিধেয়কটি নিয়ে চেষ্টা হয়। অন্যগুলি পরিত্যক্ত হয়। বিধেয়কের জন্মমুহূর্তেই বিতর্কের ঝড় ওঠে। তদানীন্তন ভারত শাসন আইন অনুযায়ী ধর্ম ও আচার, এবং ধর্মীয় রীতিসংশ্লিষ্ট বিষয়ে কোনও সংসদীয় ব্যবস্থা বড়লাটের পূর্বানুমতি ছাড়া উত্থাপন করা চলবে না। বিধেয়কটি যখন সম্মতির

জন্য পাঠানো হল, তখন সংবাদ রটে যায় যে, বড়লাট সম্মতি দেবেন না, এতে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। শ্রী গান্ধী ওইসব রিপোর্টে উত্তেজিত হন। ২১ জানুয়ারি, ১৯৩৩ সংবাদপত্রে এক বিবৃতিতে গান্ধী বলেন :

'ভাইসরয়ের সম্ভাব্য সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে সংবাদ যদি ঠিক হয়, শুধু এইটুকু বলতে সেটা অত্যন্ত বেদনাদায়ক হবে....... এর পেছনে কোনও রাজনৈতিক অভিসন্ধির বিষয় আমি জোরের সঙ্গে অস্বীকার করছি। আদালতের সিদ্ধান্ত যদি একটি সন্দেহজনক রীতিকে আইনে রূপান্তরিত না করে, তবে কোনও আইনের দরকার নেই। আমি নিজে ধর্মীয় ব্যাপারে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপকে অসহনীয় উপদ্রব বলে মনে করি। তবে এক্ষেত্রে আইনগত বাধা অপসারণে আইন প্রণয়ন অপরিহার্য হয়ে উঠেছে, এবং আমার ধারণা, জনমতের ভিত্তিতে এটা করলে প্রতিপক্ষ মতাদর্শের গোষ্ঠীগুলির মধ্যে সঙ্ঘাতের প্রশ্ন নেই।'

সরকারের সিদ্ধান্ত ঘোষিত হয় ২৩ জানুয়ারি, ১৯৩৩। লর্ড উইলিংডন মন্দিরে প্রবেশাধিকার সংক্রান্ত ডাঃ সুব্বারাজন কর্তৃক মাদ্রাজ পরিষদে উত্থাপিত করার অনুমতি দেননি, কিন্তু মহামান্য সম্রাট বিধানসভায় আনীত শ্রীরঙ্গ আয়ারের 'অস্পৃশ্যতা নিরসন আইন' (Untouchability Abolition Bill) উত্থাপনের অনুমতি দেন। সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণে কী দৃষ্টিভঙ্গি নেওয়া হবে ঠিক করার আগে হিন্দু মতামত বুঝার ওপর জোর দেয়। সরকার আরও ঘোষণা করে, ভারত সরকার ও বড়লাট পরিষ্কারভাবে জানাতে চান যে, এ-ধরনের কোনও ব্যবস্থা নেওয়ার আগে আইনসভায় ও আইনসভার বাইরে সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের দৃষ্টিভঙ্গি পর্যালোচনা করতে চান। জনমত যাচাই করার জন্য এই বিধেয়ক সর্বাধিক প্রচারের ব্যবস্থা করলে তবেই এটা বুঝা যাবে। এটাও বুঝিয়ে দেওয়া দরকার, বিধেয়ক উত্থাপনের অনুমতি দানের অর্থ এই নয় যে, সরকার বিধেয়ক গ্রহণ বা সমর্থনে দায়বদ্ধ। পরদিন শ্রী গান্ধী এক বিবৃতি প্রকাশ করে বলেন :

'এর মধ্যে আমি ঈশ্বরের হাত খুঁজে দেখতে চাই। তিনি আমায় সর্বাংশে পরীক্ষা করে নিতে চান। সর্বভারতীয় বিধেয়ক আনায় সম্মতিদান হিন্দুধর্মের ও সংস্কারকদের পক্ষে অনিচ্ছাকৃত প্রতিদ্বন্দ্বিতা স্বরূপ। সংস্কারকরা নিজের কাছে সৎ থাকলে হিন্দুধর্ম সতর্ক থাকবে। এভাবে বিচার করলে ভারত সরকারের সিদ্ধান্ত ঈশ্বর প্রেরিত বলে গণ্য হবে। এতে বিষয়টি পরিষ্কার হবে। এর ফলে ভারতের বর্তমান তীব্র নৈতিক সংগ্রামের গুরুত্ব ভারতে ও বিশ্বে সবাই বুঝবেন। তবে সনাতনপন্থীরা যে সিদ্ধান্ত নিক না কেন, মন্দিরে প্রবেশাধিকার আন্দোলন এখন দক্ষিণের গুরুভায়ুর থেকে

উত্তরে হরিদ্বার পর্যন্ত বিস্তৃত হবে। এবং আমার অনশন সত্যাগ্রহ আবার স্থগিত হলেও এখন শুধু গুরুভায়ুর নয়, সাধারণভাবে সব মন্দিরের ক্ষেত্রে প্রসারিত হবে।'

কত ঢক্কানিনাদের সঙ্গে এই বিধেয়ক আইনসভার জীবনে সূত্রপাত করেছিল, তা যে কেউ বুঝবেন। ২৯ মার্চ, ১৯৩৩, শ্রীরঙ্গ আয়ার এই বিধেয়ক বিধানসভায় আনেন। যেহেতু এই বিধেয়ক শ্রী গান্ধীর পক্ষে ছিল, কংগ্রেস সদস্যরা তা সমর্থনে প্রস্তুত ছিলেন। বিধেয়ক যাতে সহজে পাশ হয়ে যায়, সেজন্য শ্রী গান্ধী শ্রী রাজাগোপালাচারি ও জি. ডি. বিড়লাকে এর জন্য সমর্থন সংগ্রহে অ-কংগ্রেসি সদস্যদের মধ্যে প্রচারের দায়িত্ব দেন। তিনি বলেন, এঁরা ওঁর চেয়ে ভাল প্রচারক। কোলেঙ্গোড়-এর রাজা প্রস্তাব উত্থাপনের বিরোধিতা করেন, এবং শ্রী থাম্পান এক প্রাথমিক আপত্তি পেশ করে বলেন, বিধেয়কটি আইনসভার বৈধ ক্ষমতা বহির্ভূত। শেষের আপত্তিটি সভাধিপতি নাকচ করেন এবং সভা বিধেয়কটি উত্থাপনের অনুমতি দেয়। শ্রীরঙ্গ আয়ার পরে দাবি করেন, মন্দির প্রবেশাধিকার বিধেয়কটি ৩০ জুলাইয়ের মধ্যে জনমত যাচাইয়ের জন্য সর্বত্র প্রচারিত করা হোক। রাজা বাহাদুর কৃষ্ণমাচারি প্রচার সংক্রান্ত প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন এবং প্রস্তাবিত আইনের তীব্র সমালোচনা করেন। শেষে তিনি অনুরোধ জানান, ৩১ জুলাইয়ের পরিবর্তে ৩১ ডিসেম্বর প্রচারের দিন ধার্য করা হোক। শ্রী গুনজাল প্রচার প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন এবং বিধেয়কটি সমর্থন না করার জন্য সভাকে বলেন। তখন বিকেল ৫ টা বেজে গেছে এবং বেসরকারি বিষয় কাজকর্মের সেটা ছিল অধিবেশনের শেষ দিন। সভাধিপতি সভার মনোভাব জানার জন্য সভা আরও চালিয়ে যাওয়ার পক্ষে ছিলেন। কিন্তু এর পক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠতা না থাকায় সভা মুলতুবি করতে হয়। সুতরাং বিধেয়কটি শরৎকালীন অধিবেশন পর্যন্ত মুলতুবি থেকে যায়।

২৪ অগাস্ট, ১৯৩৩ কেন্দ্রীয় আইনসভার শরৎ অধিবেশনে বিধেয়কটি নিয়ে আলোচনা পুনরায় শুরু হয়। সরকারপক্ষে স্যার হ্যারি হেগ ব্যাখ্যা করে বলেন, বিধেয়ক প্রচারের পক্ষে তাঁদের সমর্থনের যেন এই ব্যাখ্যা না হয় যে, তাঁরা এর ধারাগুলির পক্ষে। এটা সত্যি যে, সরকার অবদমিত সম্প্রদায়ের প্রতি সহানুভূতিশীল এবং তাদের অর্থনৈতিক সামাজিক উন্নয়নের জন্য কিছু করতে উদ্‌গ্রীব। 'ক্যামিউনিকেই'-র জানুয়ারি সংখ্যা থেকে উদ্ধৃতি দেন, এতে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গির পুরো ব্যাখ্যা ছিল। তাঁর মতে, জুনের শেষ অবধি সর্বাধিক প্রচারের সুযোগ যুক্তিযুক্ত। মন্দিরে যাতায়াতকারী হিন্দুদের মধ্যে প্রচার সীমিত রাখা সম্বন্ধে স্যার হেগ বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বলেন যে, প্রস্তাবিত সীমাবদ্ধতা আরোপ সম্ভব হবে না। সরকার

চায়, সব শ্রেণীর হিন্দু এ নিয়ে পুরোপুরি আলোচনা করুক এবং সরকার শ্রী শর্মার সংশোধন প্রস্তাব সমর্থন করতে প্রস্তুত। সমাপ্তি প্রস্তাব উত্থাপিত হয় এবং সভা জুন ১৯৩৪ অবধি বিধেয়ক প্রচারের জন্য শ্রী শর্মার প্রস্তাব গ্রহণ করে। মতামত যথাযথ পাওয়া যায়, পুরো ১০০০ ফুলস্কেপ পাতা পূর্ণ। বিধেয়কটি পরবর্তী স্তরের জন্য অর্থাৎ 'প্রবর সমিতি' (Select Committee) নিয়োগের জন্য প্রস্তুত হয়। শ্রীরঙ্গ আয়ার এই মর্মে নোটিশ দেন। এক বিচিত্র কাণ্ড ঘটে যায়। ভারত শাসন বিধানসভা বাতিল করে নতুন নির্বাচন ঘোষণা করেন। এই ঘোষণার ফলে শ্রীরঙ্গর বিধেয়কের প্রতি কেন্দ্রীয় আইনসভায় কংগ্রেস সদস্যদের দৃষ্টিভঙ্গি বদলিয়ে যায়। সবাই এর বিরুদ্ধে দাঁড়ান এবং বিধেয়ককে সমর্থন করতে অস্বীকৃত হন। তাঁরা নির্বাচকমণ্ডলীর ভয়ে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। শ্রীরঙ্গ আয়ারের অবস্থা করুণ হয়ে ওঠে। অত্যন্ত কটু ভাষায় তিনি তা ব্যক্ত করেন, তাঁর ভাষার তীব্রতা কমানো যায়নি। এত সুন্দরভাবে তিনি বিবরণ দেন যে, আমি হুবহু তা তুলে ধরতে দ্বিধা করব না। তাঁর প্রস্তাব উত্থাপন করতে উঠে তিনি বলেন :

'মহোদয়, অবদমিত সম্প্রদায়ের প্রতি বৈষম্যের অবসানে আমি তথাকথিত মন্দির প্রবেশাধিকার বিধেয়ক উত্থাপন করছি। আমি বলছি :

'হিন্দু মন্দিরে অন্ত্যজদের প্রবেশের নিষেধ দূর করার জন্য এই বিধেয়ক প্রবর সমিতিতে প্রেরণ করা হোক, এই সমিতিতে থাকুন মাননীয় স্যার নৃপেন্দ্র সরকার, মাননীয় স্যার হেনরি ক্রেক, ভাই পরমানন্দ, রায়বাহাদুর এম. সি. রাজা, শ্রী টি. এন. রামকৃষ্ণ রেড্ডি, রায়বাহাদুর বি. এল. পাতিল, এবং উত্থাপক।

'আপনার অনুমতিসাপেক্ষে আমি 'এক পক্ষকালের মধ্যে প্রতিবেদন পেশ-এর নির্দেশ' বাক্যাংশ বাদ দিচ্ছি, এবং তারপর আমি বাকিটা রেখে উত্থাপন করছি :

'এবং কমিটির সভা করতে হলে প্রয়োজনীয় সদস্যের সংখ্যা হবে পাঁচ।

'মহোদয়, এই প্রস্তাবের বিজ্ঞপ্তি জারির সময়ে আমি ভাবতে পারিনি যে, আমরা এভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাব। সেজন্য, এই প্রস্তাবের সীমাবদ্ধতা আমি বুঝছি, কারণ প্রবর সমিতিতে পাঠাবার সময় হবে না। আমি বুঝি যে, এতে আমাদের মনোভাব ব্যক্ত করা যাবে।

'ইতিমধ্যে আমি সত্যমূর্তির কাছে মার্জনা চেয়েছি, কারণ শ্রী মুদালিয়ারের বক্তব্যের মাঝে বাধা দেওয়ার সময়ে আমি যথাযথ অবস্থায় ছিলাম না। তিনি আমার বক্তব্য ব্যাখ্যা ঝড়ের বেগে করায় আমি কথা বললে ওঁর অসুবিধা হত। আমি জানি, শ্রী

সত্যমূর্তি কোনওদিন মন্দির প্রবেশাধিকার বিধেয়কের পক্ষে ছিলেন না, তিনি কংগ্রেসকে এই বিধেয়ক প্রত্যাহারে রাজি করান। ১৬ আগস্ট, 'হিন্দু' পত্রিকায় সি. রাজাগোপালাচারির এক বিবৃতি পড়ে শোনাব। 'হিন্দু' অত্যন্ত দায়িত্বশীল পত্রিকা, এবং যেহেতু এটা তারবার্তা সাক্ষাৎকার নয়, লিখিত বিবৃতি, আমি বিশ্বাস করি রাজাগোপালাচারির বিবৃতি নিখুঁত। অন্ত্যজদের স্বার্থের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করার জন্য তিনি জনসাধারণের কাছে ক্ষমা চেয়েছেন। মহাত্মা গান্ধীর এই মুখ্য সেনাপতির এই বিশ্বাসঘাতকতা নথিভুক্ত করা হোক। তিনি বলেছেন :

'কিছু সনাতনপন্থী প্রশ্ন তুলেছেন, কংগ্রেস প্রার্থীরা কি এই মর্মে অঙ্গীকার দেবেন যে, ধর্মীয় আচারের ব্যাপারে কোনও সংসদীয় হস্তক্ষেপ তাঁরা সমর্থন করবেন না। অনুরূপ প্রশ্ন, বহু ব্যক্তি ও গোষ্ঠী বিভিন্ন প্রশ্নে তুলতে পারেন। এইসব প্রশ্ন কংগ্রেস প্রার্থীদের সম্বন্ধেই উঠছে, এবং প্রশ্ন অন্য দল বা নির্দল প্রার্থীদের সম্পর্কে উঠছে না, এটাই কংগ্রেসের প্রতি প্রশংসাসূচক হয়ে গেল।'

শ্রী রাজাগোপালাচারি এইভাবেই বললেন। এবং এই প্রশংসা অনুযায়ী এই অপ্রিয় প্রশ্ন জনমত উদ্বুদ্ধ করার পরিবর্তে, কংগ্রেসের এক মহান নেতারূপে তিনি জামাই দেবীদাস গান্ধীর সঙ্গে আমাদের বাড়ির সামনে ধরনায় বসলেন, যিনি দিল্লিতে আমার কাছে বারবার এসে বলেন, 'আমরা এই সংসদীয় ব্যবস্থার জন্য আপনার সমর্থন চাইছি'—শেক্সপিয়রের উক্তি প্রয়োগ করে বলা যায়, 'এই একজন মানুষ কর্কটের মতো পালিয়ে যাচ্ছে।' এই কূটবুদ্ধি দক্ষিণী ব্রাহ্মণ ব্যাখ্যা দিলেন, রাজনৈতিক দলের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নানা বিষয়ে বিশেষ নীতি থাকে।

'তবে এর সবক'টি কোনও সময়ে নির্বাচনী বিষয় করে তোলা হয় না।

'মহোদয়, এই কংগ্রেস নেতা স্ব-উদ্বোধিত জনমতের সম্মুখীন হতে ভয় পান।

'মহোদয়, কংগ্রেসের লোকেরা কি দাস?'

'They are slaves, who fear to speak,
For the fallen and the weak.'

কবি মিলটনের কথায়, 'To say and straight unsay argues no liar but a coward traced.' সাধারণ নির্বাচনের অনেক আগে থেকে শ্রী রাজাগোপালাচারি যা বলছিলেন, এখন তার উলটো কথা বলছেন।

'কংগ্রেস প্রার্থীরা এই নির্বাচকমণ্ডলীর কাছে সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক প্রশ্ন নিয়ে যাচ্ছেন।

'অর্থাৎ, তাঁরা নির্বাচকমণ্ডলীর সামনে যাচ্ছেন সাধারণ মানুষের প্রতিকূল ধারণা পাল্টাবার জন্য, আগে মানুষকে ভুল বুঝিয়ে এখন তাঁরা গাড্ডায় পড়েছেন। লর্ড উইলিঙডন তাঁদের উদ্ধার করেন, বিধানসভা বাতিল ঘোষণা করে, সাংবিধানিক ভাইসরয় হিসাবে তাদের সাংবিধানিক পথের আশ্রয়ে প্রত্যাবর্তনের সুযোগ দিয়ে তিনি তাদের পরিত্রাণ করেন। সুতরাং, নিজেদের বিশ্বাস থেকে পালিয়ে এসে তাঁরা এখন কায়দা করে যথাসম্ভব বেশিসংখ্যক সদস্য নিয়ে আইনসভায় ফিরে আসতে চাইছেন। মন্দিরে প্রবেশাধিকার বা অস্পৃশ্যতা প্রশ্ন নিয়ে থাকলে তাঁরা বহু ভোট থেকে বঞ্চিত হতেন, কারণ এটি জনপ্রিয় বিষয় নয়। আমি তাই বলেছিলাম যদিও মহাত্মা গান্ধী প্রকাশ্যে আমার বিরুদ্ধে বলেছিলেন, আমার ভাইয়ের পালঘাটের (মালাবার) বাড়িতে শঙ্করাচার্য থাকাকালে আমি এক-ই কথা বলি। আমার ভাই বিধেয়কের বিরুদ্ধে ভাইসরয়ের কাছে ডেপুটেশন দেওয়ার জন্য এসেছিলেন। আমি বলি, 'আমি জানি যে মালাবারে সংস্কারপন্থীরা সংখ্যাগরিষ্ঠ নয়।' কোনও জায়গায়-ই তারা সংখ্যাগুরু নয়, তবে সংস্কারপন্থীরা তাদের চিন্তাধারা সংখ্যাগরিষ্ঠদের বুঝাবার জন্য চেষ্টা করে যাবে। তারপর বলি—মালাবারের গুরুভায়ুর-এ কংগ্রেসের লোকেরা যে সিদ্ধান্তই নিয়ে থাকুন, গণভোটের ফল যাই হোক, আমি মুহূর্তের জন্যও বিশ্বাস করি না মালাবারের যে মন্দিরে যাতায়াতকারী লোকেরা অন্ত্যজদের মন্দিরে প্রবেশাধিকার দানের পক্ষে ; কিন্তু আমি তাদের সঙ্গে লড়াইয়ে প্রস্তুত ছিলাম, তাদের সঙ্গে যুক্তিতর্কে যেতে, অনুরুদ্ধ করতে এবং অন্ত্যজদের সমস্যা ও প্রশ্ন সম্পর্কে উৎসাহ সঞ্চারের চেষ্টা করতাম, কারণ আমি মনে করি, অন্ত্যজরা তো আমাদের সমাজেরই অংশ। মহোদয়, আমার সমাজের এক-তৃতীয়াংশ মানুষকে যদি ধর্মের নামে অচ্ছুত করে রাখা হয়, আমি আগেও সবসময়ে বলেছি এবং মনে করি যে, সেই সমাজের বেঁচে থাকার অধিকার নেই। হিন্দু সম্প্রদায়ের ঐক্যের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে, এই সম্প্রদায়ের মহান ভবিষ্যৎ গঠনের স্বার্থে, বিরাট অতীতের পরিপ্রেক্ষিতে, যখন বৈদিক যুগে অস্পৃশ্যতা অজ্ঞাত ছিল, আমি তাদের পক্ষ গ্রহণ করেছি। এবং এখন দেখছি কংগ্রেসের লোকরা গতকালও অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে উদ্যোগী থেকে এখন এই উদ্দেশ্য অনুসরণ করছেন না। শ্রী রাজাগোপালাচারি মন্দির প্রবেশাধিকার বিধেয়কের কফিনে শেষ পেরেকটি মেরে দিয়েছেন, একথা বলবেন কোল্লেনগোডের রাজা বাহাদুর কৃষ্ণমাচারি, বা স্যার সত্যচরণ মুখার্জি, এঁরা সবাই দেশের বিভিন্ন সনাতনপন্থী গোষ্ঠীর প্রতিনিধি ছিলেন।

'মহোদয়, শ্রী রাজাগোপালাচারি বলে যান যে, তাঁরা অন্য কোনও প্রশ্ন নয় অর্থাৎ মন্দিরে প্রবেশ প্রশ্ন দিয়ে জিতে আসার জন্য বলবেন না, ইংরেজ-বিদ্বেষের

রাজনৈতিক প্রশ্ন, ব্রিটিশ-বিরোধী বিষয়কে ভর করবেন। কারণ, সাধারণ মানুষের আবেগ কাজে লাগিয়ে, অহিংসার নামে নয়, আবেগে জাতিবিদ্বেষ যুক্ত করে ধর্মের নামে (কারণ অহিংসা অনেক সময়ে ধর্মীয় রঙ নেয়) সারা দেশে অবিশ্বাসের বাতাবরণ সৃষ্টি করে যখন দেখা গেল এই পরিস্থিতি ভোটে সাহায্য করবে না, বরং আরও বৃহত্তর বিষয়, যেমন অস্পৃশ্যতার নিরসন প্রশ্ন গুরুত্ব পাবে, তারা এই প্রশ্ন এড়িয়ে স্বকীয় বিশ্বাস থেকে পালিয়ে গেল :

'They are slaves who dare not be
In the right with two or three.'

'অতঃপর, মহাত্মা গান্ধীর মুখ্য সেনাধিপতি বলে চললেন : 'নির্বাচনে জিতলে আর কোনও প্রশ্নে তাঁরা নির্বাচকমণ্ডলীর সমর্থন পাবেন বলে আশা করেন না।'

'তার অর্থ হল, তাঁরা মন্দিরে প্রবেশাধিকারের রায় নির্বাচকমণ্ডলীর কাছ থেকে পাচ্ছেন না। এই লোকটি, যিনি আমাদের দরজায় ধর্ণা দিয়েছিলেন সমর্থন লাভের জন্য—এইসব কংগ্রেসের স্বার্থবাহী ভিক্ষুকরা—যাঁরা মন্দিরে প্রবেশাধিকার বিধেয়ককে আমাদের সমর্থন ভিক্ষা করেছিলেন, এঁরা অন্ত্যজদের স্বার্থের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করছেন। কারণ, আমরা জানি যে, অন্ত্যজদের উন্নতির জন্যই সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার সুযোগ দানের লক্ষ্যে মহাত্মার অনশন, কংগ্রেস স্বভাবতই এটার বিরোধিতায় দ্বিধাগ্রস্ত ছিল, এবং আমরা জানি, এর প্রভাব সরাসরি অস্পৃশ্যতার প্রশ্নে আসবে, যার সমাধানে মহাত্মা বিরাট মহাত্মা সারা দেশ পরিক্রমা করতে চেয়েছিলেন। যে কংগ্রেস পরিষদ বয়কট আহ্বানে বিশ্বাসঘাতকতা করে মহাত্মার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল পরিষদে যোগ দিয়ে, এখন তাঁরা তাঁর সম্বন্ধী রাজাগোপালাচারির সাহচর্যে আবার বিশ্বাসঘাতকতা করলেন। এবং এখন তাঁরা বলছেন, তাঁরা আর অস্পৃশ্যতা প্রশ্ন এবং মন্দিরে প্রবেশাধিকার বিধেয়ক নিয়ে গণভোট চাইবেন না।

'মহোদয়, আমার প্রশ্ন, রাজাবাহাদুর কৃষ্ণমাচারিয়ার ও রাজাগোপালাচারির মধ্যে পার্থক্যটা কী? রাজাবাহাদুর সবসময়ে বলেছেন, 'মানুষের রায় নিয়ে এসো, আইন করো।' মহোদয়, ইনি কাপুরুষ নন, নিজে সনাতনপন্থী হয়েও তিনি পরিণতির মুখোমুখি হতে প্রস্তুত। অন্যদিকে, এইসব লোক যাঁরা সনাতনপন্থীদের সর্বত্র তুলোধুনো করেন (ভুলে যান যে সনাতন ধর্ম শাশ্বত সত্য), তাঁরা এমন আচরণ করছেন, যা সনাতনপন্থীরা উপলব্ধি করবেন না, কারণ সনাতন ধর্ম হচ্ছে চিরন্তন সত্য এবং সত্যের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা মিথ্যেবাদীদের পক্ষে উপযুক্ত! জাতীয় লক্ষ্য সাধনকারী বহু নীতির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে, শুধু মুখরক্ষার জন্য অন্ত্যজদের প্রশ্ন বিশ্বাসহীন

মেজাজে গ্রহণ করে গান্ধী ছাড়া সব কংগ্রেস নেতা আশু নির্বাচনে কংগ্রেসের মুখ্য সংগঠক রাজাগোপালাচারির মুখ দিয়ে নিজেদের কথা বলেছেন :

'কংগ্রেসের সরকারি বিধেয়ক হওয়ার আগে এই বিধেয়ক কংগ্রেসের লোকদের বিচারের জন্য মুক্ত রাখা হবে।

'অন্ত্যজদের স্বার্থের প্রতি এই বিশ্বাসঘাতকতার জন্য আমি আশা করি সংবিধানপন্থীরা (মুসলমান বা হিন্দু যাই হোন) নিজেদের সংগঠিত করবেন। সাম্প্রদায়িক প্রশ্নে পরে তাঁরা ভিন্নমত হতে রাজি হতে পারেন কিন্তু তাঁরা ঐক্যবদ্ধ হবেন এবং কংগ্রেসকে এক বিরাট সংগ্রাম করার সুযোগ দেবেন এবং মুখোশধারীদের নতজানু হতে বাধ্য করবেন। মহোদয়, আমি মনে করি, অবদমিত সম্প্রদায় ও অস্পৃশ্যদের স্বার্থের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়েছে ; এবং এই আন্দোলনে আমি বিশ্বাসী না হলে, মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক গৃহীত হওয়ার আগে বা রাজাগোপালাচারির দিল্লির সর্বত্র প্রচারের আগে আমি এখানে এসে বিধেয়ক উত্থাপন করতাম না।'

VI

বিজয়গৌরব থেকে পশ্চাদাপসরণের এ এক চরম দৃষ্টান্ত। এবং কী অগৌরবের পশ্চাদাপসরণ? শ্রী গান্ধীর প্রতিক্রিয়া কী? ৪ নভেম্বর, ১৯৩২ এক বিবৃতিতে শ্রী গান্ধী বলেন :

'গ্রামের অন্ত্যজদের এই বোধ আনতে হবে যে, তাদের শৃঙ্খল ভেঙেছে, তারা গ্রামের প্রতিবেশীদের থেকে কোনওভাবেই নিকৃষ্ট নয়, অন্য গ্রামের অধিবাসীদের মতো এক-ই ঈশ্বরের পূজারী এবং তাদের মতো সব এক-ই সুযোগ ও অধিকার ভোগের হকদার।

'কিন্তু চুক্তির এইসব মুখ্য শর্তাবলী যদি বর্ণহিন্দুরা না মানে, তাহলে আমি কি ঈশ্বর ও মানুষের সম্মুখীন হওয়ার জন্য বাঁচব? এমনকী আমি অন্ত্যজদের লোক ড. আম্বেদকর, রায়বাহাদুর এম. সি. রাজা এবং অন্য বন্ধুদের সাহস করে বলেছি, চুক্তির শর্ত বর্ণহিন্দুদের দ্বারা পূরণ করাবার জন্য আমাকে জামিন হিসাবে রাখুন। অনশন যদি করতে হয় তা সংস্কার-বিরোধীদের বাধ্য করাবার জন্য করা হবে না, এর উদ্দেশ্য হবে আগে আমার যারা সতীর্থ ছিলেন বা অস্পৃশ্যতা দূর করার শপথ নিয়েছিলেন, তাঁদের কাজে নামানো। তাঁরা তাঁদের প্রতিজ্ঞাচ্যুত হলে অথবা এটা মানতে তাঁরা কোনওদিনই ইচ্ছুক না থাকলে, এবং তাঁদের হিন্দুধর্ম যদি ছলনামাত্র

হয়, সেক্ষেত্রে জীবনে আমার আর কোনও উৎসাহ থাকবে না।'

তিনি একবার পুনরুক্তি করতে ক্লান্ত হতেন না। হিন্দু মন্দিরগুলিতে অন্ত্যজদের প্রবেশাধিকার অস্বীকার করাকে তিনি আত্মার যন্ত্রণা হিসাবে অভিহিত করেছেন। এ ব্যাপারে শ্রী গান্ধী কী করেছেন? তিনি কি রাজাগোপালাচারি কর্তৃক এই ক্ষেত্রে বিশ্বাসঘাতকতায় ক্ষোভপ্রকাশ করেছেন, অথচ এই বিষয়টি ছাড়া জীবনের অর্থ নেই বলেছেন। শুধু ভোটে জেতার জন্য কংগ্রেসের এই বিশ্বাসঘাতকতাকে গান্ধী অভিযুক্ত করবেন বলে আশা করা হয়েছিল। এর উল্টোটাই হয়। রাজাগোপালাচারিকে দোষারোপ করার বদলে তিনি শ্রীরঙ্গ আয়ারকে অভিযুক্ত করেন। শ্রীরঙ্গ বিধেয়কের থেকে কংগ্রেসের সমর্থন প্রত্যাহারকে তীব্রভাবে নিন্দা করেছেন। হরিজন, আগস্ট ৩১, ১৯৩৪, সংখ্যায় গান্ধী বলেন :

'দুর্ভাগ্যগ্রস্ত মন্দির প্রবেশাধিকার বিধেয়কটি প্রস্তাবকের হাতে যেভাবে গৃহীত হয়েছে তার চেয়ে আরও ভালভাবে এর কবর দেওয়া উচিত ছিল। এই বিধেয়ক সংস্কারকদের দ্বারা পেশ বা উত্থাপিত হয়নি। প্রস্তাবকের উচিত ছিল সংস্কারকদের সঙ্গে আলোচনা করে তাদের কথামতো কাজ করা। আমি যতদূর জানি, প্রস্তাবক কংগ্রেসিদের বিরুদ্ধে যেভাবে ক্ষোভপ্রকাশ করেছেন, এবং তাঁর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়েছে বলে ক্রোধান্বিত হয়েছেন, তার কোনও কারণ ছিল না। বরং এটা ২৫ সেপ্টেম্বর ১৯৩২ বোম্বাইয়ে পণ্ডিত মালব্যজীর পৌরোহিত্যে হিন্দু প্রতিনিধিরা সভায় ধর্ম সংক্রান্ত এক ঘোষণাপত্র প্রকাশ করেন, সেই অনুসারে এই প্রস্তাব পরিকল্পিত হয়। হরিজন পত্রিকায় প্রতি সপ্তাহে প্রকাশিত ঘোষণাটি কৌতূহলীরা দেখতে পারেন। সুতরাং, প্রতিটি হিন্দু, বর্ণ বা হরিজন এই ব্যবস্থায় আগ্রহী ছিল। এই ব্যবস্থায় কংগ্রেসি হিন্দুরা অন্যান্য হিন্দুর চেয়ে বেশি আগ্রহী ছিলেন এমন নয়। কাজেই, কংগ্রেসকে এই বিতর্কে টেনে আনা দুর্ভাগ্যজনক। বিধেয়কটি আরও ভালভাবে পরিচালনা করা উচিত ছিল।'

মন্দিরে প্রবেশাধিকার ব্যাপারটিকে বিচিত্র রাজনৈতিক যুযুৎসু ছাড়া কী বলা যাবে! শ্রী গান্ধী এই বিধেয়কের বিরোধিতা করেন শুরুতে। অন্ত্যজরা যখন রাজনৈতিক অধিকারের দাবি করল, তখন উনি অবস্থান পরিবর্তন করে মন্দিরে প্রবেশাধিকারের সমর্থক হন। আর এই ব্যাপারটিতে জোর দিলে হিন্দুরা কংগ্রেসকে ভোটে হারিয়ে দেওয়ার ভয় দেখালে শ্রী গান্ধী রাজনৈতিক ক্ষমতা কংগ্রেসের কব্জায় রাখার জন্য মন্দিরে প্রবেশের দাবি তুলে নেন। এটা কি সততা, আদর্শনিষ্ঠার পরিচায়ক? শ্রী গান্ধী কথিত আত্মার যন্ত্রণা কি শুধু কথার কথা?

অধ্যায় ৫

একটি রাজনৈতিক দাক্ষিণ্য
অস্পৃশ্যদের হত্যা পরিকল্পনায় কংগ্রেস

I

৩০ সেপ্টেম্বর, ১৯৩২, পণ্ডিত মালব্যের সভাপতিত্বে হিন্দুদের এক বিশাল সভা হয় বোম্বাইয়ের জাহাঙ্গীর হল-এ। সভার উদ্দেশ্য ছিল সর্বভারতীয় অস্পৃশ্যতা বিরোধী একটি লীগ এবং বিভিন্ন রাজ্যে তার শাখা গঠন। লীগের কেন্দ্রীয় দপ্তর দিল্লিতে হওয়ার কথা। সভাপতি হিসাবে জি. ডি. বিড়লা ও সাধারণ সম্পাদক অমৃতলাল ভি. ঠক্কর মনোনীত হন। এই সংস্থা—'সারা ভারত অস্পৃশ্যতা লীগ' (All India Untouchability League) শ্রীগান্ধীর প্রকল্প। তিনিই এর প্রেরণাদাতা এবং এটা 'পুনা চুক্তি'র প্রত্যক্ষ পরিণাম। জন্ম মুহূর্ত থেকে গান্ধী একে নিজের শিশু হিসাবে গ্রহণ করেন। প্রথমেই গান্ধী এর নামটা পরিবর্তন করেন। ৯ ডিসেম্বর ১৯৩২, এক প্রেস বিবৃতিতে তিনি জানান, এখন থেকে এই সংগঠনের নাম 'অস্পৃশ্য সেবক সমাজ' (Servants of the Untouchable Society) রূপে অভিহিত হবে। এই নামও গান্ধীর কাছে ভাল মনে হয়নি, আর একটা নাম খুঁজতে থাকেন। পরিশেষে এর একটা নাম তিনি দেন। 'হরিজন সেবক সঙ্ঘ'। এর অর্থ, অন্ত্যজদের সেবায় নিযুক্ত একটি সংস্থা। গান্ধী অন্ত্যজদের হরিজন আখ্যায় ভূষিত করার পরিণতি এই নাম। এই পরিবর্তন শৈব ও শাক্তদের মধ্যে বিতর্ক সৃষ্টি করে। বিষ্ণুর একশত নামের অন্যতম শিব, এবং হর হচ্ছে শিবের একশ নামের একটি। হরিজন নামটি নির্বাচিত করে গান্ধী ধর্মীয় গোঁড়ামি তথা পক্ষপাতের দায়ে অভিযুক্ত হন। শৈবরা বলেন, অন্ত্যজদের হরিজন বলা উচিত। গান্ধী এতে বিচলিত হন নি। এবং এই নতুন সংস্থার প্রথম ফসলস্বরূপ অন্ত্যজদের সঙ্ঘ একটা নতুন নাম পায়। ৩ নভেম্বর ১৯৩২, বিড়লা ও ঠক্কর সংবাদপত্রে এক বিবৃতিতে এই সংস্থার কর্মসূচি তুলে ধরেন এবং তা রূপায়ণের জন্য সাংগঠনিক পরিকাঠামো তৈরি করেন। কর্মসূচির ব্যাপারে বিবৃতিতে বলা হয় :—

'লীগ মনে করে যে, সনাতনপন্থীদের মধ্যে অস্পৃশতা নিরসনের বিরোধীর সংখ্যা কম, অবর্ণদের সঙ্গে বিবাহ ও আহার গ্রহণে বিরোধিতা রয়েছে। যেহেতু নিজের আওতার বাইরে সংস্কার সাধনের উচ্চাকাঙ্ক্ষা লীগের নেই, এটা পরিষ্কার করা দরকার যে, অস্পৃশ্যতার যাবতীয় চিত্র মুছতে বর্ণহিন্দুদের প্রণোদিত করার কাজ লীগ করবে। তবে কাজের মুখ্য দিশা হবে রচনাত্মক—যেমন, শিক্ষা, সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে অন্ত্যজদের উন্নতি করা, এতেই পরিণামে অস্পৃশ্যতা দূর হবে। এই কাজে কট্টর সনাতনপন্থীরাও সহানুভূতিশীল। এসব কাজ করার জন্যই লীগের প্রতিষ্ঠা। জাত-প্রথার অবসান বা সবর্ণ-অবর্ণ একত্রে ভোজন, লীগের কর্মধারার বাইরে রাখা হয়েছে।'

কর্মসূচির যথাযথ রূপায়ণে প্রস্তাব ছিল, প্রত্যেক প্রদেশকে কয়েকটি ইউনিটে ভাগ করে প্রতি ইউনিটের হাতে বেতনভোগী কর্মচারীদের দায়িত্ব ন্যস্ত করা। এই ইউনিট জেলার সমধর্মী হতে পারে, বা নাও পারে। দুটি জেলা বা দুটি রাজ্যকে এক করেও এটা গঠিত হতে পারে। বিবৃতিতে বছরের সাধারণ বাজেট-এর রূপরেখা দেওয়া হয়। এটা নিম্নোক্ত মাত্রায় হতে পারে :

'খরচের দুই-তৃতীয়াংশ প্রকৃত উন্নয়নকর্মে বরাদ্দ হবে, বাকি এক-তৃতীয়াংশ হবে কর্মচারীদের বেতন ভাতা ইত্যাদি। দু'জন সবেতন কর্মচারীই যথেষ্ট বলে গণ্য করা হয় এবং তারা মাসের ১৫-২৯ দিন গ্রামে গ্রামে ঘুরবে।'

দু'জন ভ্রমণকারী কর্মচারীর ভরণ-পোষণ ভাতা ... ৩০+২০=৫০×১২=৬০০ টাকা

দু'জন ভ্রমণকারী কর্মচারীর ভ্রমণ ভাতা ... ২×১০=২০×১২=২৪০ টাকা

কর্মচারীদের দ্বারা বিবিধ খরচ ... ২×১০=২০×১২=২৪০ টাকা

উন্নয়নকর্ম অর্থাৎ বিদ্যালয় পুস্তকের দাম, পুরস্কার, ছাত্রবৃত্তি,

জলের জন্য খরচ, হরিজন পঞ্চায়েত গঠন, ইত্যাদি ২০০০টাকা

মোট — ৩০৮০ টাকা

সারা দেশের জন্য আয়-ব্যয়ক

সারা ভারতের জন্য যে খরচ হবে তার, একটা ন্যূনতম আয়-ব্যয়কের (Budget) আনুমানিক হিসাব নিচে দেওয়া হল। কাজের বিশাল পরিধির তুলনায় প্রকল্পটি খুবই ছোট এবং এর জন্য প্রয়োজনীয় তহবিল সংগ্রহ করা জনসাধারণের পক্ষে অসুবিধা হবে না। তহবিলে দেওয়া প্রতিটি পয়সার মূল্য অনেক এবং আমরা সবার কাছে আবেদন করছি এই উদ্দেশ্যে কিছু ত্যাগস্বীকার করুন। প্রতি রাজ্যের জন্য ইউনিটের সংখ্যা প্রস্তাব মাত্র, চরম সিদ্ধান্ত প্রাদেশিক বোর্ডগুলিই গ্রহণ করবে।

এটা হিসাব করে দেখা গেছে, বিভিন্ন প্রদেশে কাজের জন্য নিচে দেওয়া ইউনিট সংখ্যা লাগবে, জেলা ও রাজ্যের সংখ্যা প্রতি প্রদেশের পাশে দেওয়া আছে।

প্রদেশ	জেলা-সংখ্যা	ইউনিট-সংখ্যা
অসম	১১	৬
অন্ধ্র	—	৬
বাংলা	২৬	১৫
কলকাতা শহর	১	৩
বিহার	১৬	১৬
বোম্বাই, বোম্বাই শহর, ও মফস্বল জেলা	১	৩
মহারাষ্ট্র	১৩	৮
গুজরাট, বরোদা, কাথিওয়ার, কচ্ছ ও অন্যান্য রাজ্য ৫ ও রাজ্য ১০		
মধ্যপ্রদেশ ও বেরার (মারাঠি)	৯	৭
মধ্য ভারতীয় রাজ্যসমূহ	১১	৮
দিল্লি প্রদেশ	১	২
কাশ্মীর	১	১

প্রদেশ	জেলা-সংখ্যা	ইউনিট-সংখ্যা
মালাবার, কোচিন ও ত্রিবাঙ্কুর	৪	১০
মহীশূর ও বোম্বে ও মাদ্রাজের কর্নাটক জেলা	৮	১০
নিজামের প্রদেশ	১৪	৮
ওড়িশা করদ রাজ্যসমূহ ৫+২৬ রাজ্য	..	
পঞ্জাব ও উঃ পঃ ৩২+৭ = সীমান্ত প্রদেশ এবং পঞ্জাব রাজ্য	৩৯	১০
রাজপুতানা রাজ্য আজমের-মারোয়াড় রাজ্য	১৮	
বৃঃ জেলা ১	১৯	৯
সিন্ধু	৮	৫
তামিলনাড়ু	১৩	৮
যুক্তপ্রদেশ	৪৮	২৪
	মোট ...	১৮৪

১৮৪টি ইউনিটের জন্য খরচ ৩০০০×১৮৪=৫,৫২,০০০ টাকা

কেন্দ্রীয় প্রাদেশিক দপ্তর

কেন্দ্রীয় দপ্তর	১০০০×১২	= ১২০০০ টাকা
প্রাদেশিক দপ্তর	৪০০০×১২	= ৪৮০০০ টাকা
মোট		৬০,০০০ টাকা
যা ধরা যায়		৬,১২,০০০ টাকা
		৬,০০,০০০ টাকা

এই পরিমাণ টাকা কেন্দ্রীয় তহবিল এবং বিভিন্ন জেলা ও প্রদেশে সংগৃহীত টাকা থেকে আসবে। এর থেকে দেখা যাচ্ছে, ৬ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করে খরচ করতে হবে প্রতি বছর ; সারা দেশে অস্পৃশ্যতা নিরসন ও হরিজনদের জন্য উন্নতির কাজে এই টাকা খরচ হবে। এদের উন্নতি কার্যকরী করতে ন্যূনপক্ষে পাঁচ বছর এই কর্মসূচি চালাতে হবে। ২২টি প্রদেশের রাজ্যগুলিতে ৪ কোটি হরিজনের জন্য এই টাকা খুব-ই কম।

সঙ্ঘ-এর কাজে তহবিল সংগ্রহে শ্রীগান্ধী নভেম্বর ৭, ১৯৩৩ থেকে জুলাই ২৯, ১৯৩৪ পর্যন্ত সারা ভারত পরিক্রমা করেন। এতে মোট সংগ্রহ হয় ৮ লক্ষ টাকা (দ্রঃ হরিজন, আগস্ট ৩, ১৯৩৪)। এই টাকা ও গান্ধীর ধনী বন্ধুদের বার্ষিক অনুদান নিয়ে সঙ্ঘ কাজ শুরু করে।

সেপ্টেম্বর, ১৯৩২ থেকে 'হরিজন সেবক সঙ্ঘ' কাজ করে যাচ্ছে। অন্ত্যজদের অবস্থার জন্য গান্ধীর আত্মার কান্না ও তাদের উন্নতির জন্য তাঁর আবেগ-এর গৌরবজনক অভিব্যক্তি হিসাবে এই প্রয়াস চিহ্নিত। সঙ্ঘের সাধারণ সম্পাদক বহু মার্কিনকে এই সঙ্ঘ-এ নিমন্ত্রণ করে দেখিয়েছেন, অন্ত্যজদের উন্নতির জন্য শ্রী গান্ধী কী করেছেন, তার নজির হিসাবে এ-সব তথ্য তুলে ধরা হয়েছে।

নিপীড়িত মানুষের উন্নতির জন্য যে-কোনও উন্নয়নমূলক কাজ-ই প্রশংসনীয়। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, সেই কাজের সমালোচনা চলবে না। এই দৃষ্টিভঙ্গি মানা যায় না। সঙ্ঘ কী কাজ করছে তা অনুসন্ধান করা বিধিসম্মত, কারণ এদের কাজ নিয়ে অনেক বলা হচ্ছে। সঙ্ঘের বার্ষিক রিপোর্ট পড়লেই দেখা যাবে, এতে কিছু সুনির্দিষ্ট, বাঁধাধরা কথা আছে। শিক্ষার ক্ষেত্রে সঙ্ঘ কলা, প্রযুক্তি ও পেশাগত বিভাগে ছাত্রবৃত্তি দিয়ে অন্ত্যজদের উচ্চশিক্ষার উৎসাহ দিচ্ছে। উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রদের বৃত্তিও সঙ্ঘ দিচ্ছে। কলেজ ও উচ্চ বিদ্যালয়ে পাঠরত অন্ত্যজ ছাত্রদের জন্য সঙ্ঘ হোস্টেল চালাচ্ছে। সঙ্ঘের শিক্ষাসংক্রান্ত কার্যকলাপের বৃহত্তর অংশ হল প্রাথমিক স্তরে যেখানে কাছাকাছি সাধারণ বিদ্যালয় নেই বা বিদ্যালয় অন্ত্যজদের জন্য মুক্ত নয়, সেখানে পৃথক বিদ্যালয় পরিচালনা করা।

এরপর আসে সঙ্ঘের সমাজ পরিষেবামূলক কাজের কথা। অন্ত্যজদের জন্য চিকিৎসার সাহায্য এর মধ্যে পড়ে। এই কাজ করেন সঙ্ঘের ভ্রাম্যমাণ কর্মীরা, তাঁরা হরিজনদের এলাকায় গিয়ে অসুস্থ ও রোগীদের ওষুধ দেন। অন্ত্যজদের জন্য সঙ্ঘ কিছু ওষুধের দোকান চালাচ্ছে। এটা সঙ্ঘের অকিঞ্চিৎকর কার্যকলাপ।

সঙ্ঘের গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে জল সরবরাহ। এটা তারা করে :

১) পুকুর খুঁড়ে বা নলকূপ, পাম্প বসিয়ে অন্ত্যজদের ব্যবহারের জন্য জলের ব্যবস্থা।

২) পুরনোগুলির সংস্কার। এবং

৩) স্থানীয় প্রশাসনকে বলে কয়ে অন্ত্যজদের জন্য পুকুর সংস্কার বা নতুন পুকুর করানো।

সঙ্ঘের তৃতীয় ধারার কার্যকলাপ অর্থনৈতিক কয়েকটি কারিগরি বিদ্যালয় পরিচালনা করে, এটা দাবি করা হয় যে, এখান থেকে বহু কারিগর প্রশিক্ষণ পেয়ে স্বনির্ভর পেশাজীবী হয়েছেন। তবে প্রতিবেদন অনুযায়ী অন্ত্যজদের মধ্যে সমবায় সংগঠিত ও তত্ত্বাবধান করে সঙ্ঘে বেশি সফল ও কার্যকরী ভূমিকা নিয়েছে।

II

এইসব কার্যকলাপের সংক্ষিপ্তসার থেকে মনে হতে পারে যে, সঙ্ঘ অন্ত্যজদের উন্নতির জন্য প্রচুর অর্থব্যয় করছে। আসল ঘটনা কী? এটা স্মর্তব্য যে, সঙ্ঘ অন্ত্যজদের উন্নতির জন্য বাৎসরিক যে টাকা ব্যয় করে, তার পরিমাণ বাৎসরিক ৬,০০,০০০ টাকা। সঙ্ঘ আসলে কত খরচ করছে ? মে, ১৯৪১, সম্পাদক তাঁর প্রতিবেদনে বলছে :

‘গত ৮ বছরে সঙ্ঘের কেন্দ্রীয় দপ্তর ও শাখাগুলি অন্ত্যজদের কাজে আনুমানিক খরচ করে ২৪,২৫,৭০০ টাকা ও ৩,৪১,৬০৭ টাকা। সমস্যার গভীর প্রয়োজনীয়তা বিচারে ২৭,৬৭,৩০৭ টাকা খুব-ই নগণ্য।’

এই ভিত্তিতে সঙ্ঘের খরচ দাঁড়ায় বছরে ৩,৪৫,৮৮৮ টাকা। সঙ্ঘ যে টাকা সংগ্রহ করার আশা করে তার ৫০% কম। এটা বুঝা যায় যে, সঙ্ঘের বন্ধুরা যতটা বলেন সঙ্ঘ তত বড় নয়। সঙ্ঘ খুব-ই কষ্টে অস্তিত্ব বাঁচিয়ে রেখেছে। ৫ কোটি অন্ত্যজ মানুষের জন্য বছরে ৩ লক্ষ টাকার বাজেট নিয়ে উল্লাস করার কিছু নেই। এই প্রদর্শনও সঙ্ঘ করতে পারত না, গত ২ বছর ক্ষমতায় থাকাকালে বিভিন্ন প্রদেশের কংগ্রেস সরকার সঙ্ঘকে বিরাট পরিমাণ অর্থসাহায্য করে।

আর্থিক অসুবিধার জন্য সঙ্ঘকে দায়ী করা যায় না। দোষটা হিন্দুদের। সঙ্ঘের অচল পতনমুখী অবস্থাই প্রকাশ করে যে, হিন্দুরা অন্ত্যজদের উন্নতির জন্য আদৌ

উৎসাহী নয়। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে তাঁরা এক কোটি টাকা দেন, এটা দিয়েই 'তিলক স্বরাজ তহবিল' গড়ে ওঠে। সাধারণ উন্নয়নমূলক কাজের জন্য সম্প্রতি তাঁরা ১ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা দিয়ে 'কস্তুরবা স্মারক তহবিল' গড়েছেন। এইসব সাহায্যের তুলনায় 'হরিজন সেবক সঙ্ঘে' হিন্দুদের দানের পরিমাণ নগণ্য।

সঙ্ঘ যে ধরনের উন্নয়নমূলক কাজ করে, তার সম্পর্কে মতানৈক্য থাকতে পারে। সংঘ যেসব কাজ করে তার বেশিরভাগই যে-কোনও সভ্য দেশের সরকার রাজস্ব থেকেই করে থাকে। প্রশ্ন করা যায়—সঙ্ঘ সরকারকে এই কাজ করতে এবং যেসব প্রকল্পের কাজ সরকার করে না কিন্তু হওয়া উচিত তার জন্য সরকারের টাকা খরচ করার আর্জি করে কেন?

এর জন্য অবশ্য অন্ত্যজদের মধ্যে সঙ্ঘের প্রতি বিদ্বেষপূর্ণ মনোভাব আসতে পারে না। স্বীকার করে নেওয়া ভাল যে, এই বিদ্বেষ আছেই। 'ভারতীয় সমাজ সংস্কারক'[১]-এ ১৪ অক্টোবর, ১৯৪৪ এক লেখক এই পরিস্থিতির কারণ সম্বন্ধে বলেছেন :

'হরিজনদের এক প্রতিনিধিদল সেবাগ্রামে গান্ধীজির সঙ্গে দেখা করতে যান, তাঁদের অনুরোধ হরিজন সেবক সঙ্ঘ-এর পরিচালকবর্গে তফসিলি জাতিভুক্ত শ্রেণীর প্রতিনিধিকে রাখতে হবে। গান্ধীজি নাকি উত্তর দেন, হরিজন সেবক সঙ্ঘ হরিজনদের সাহায্যের জন্য গঠিত সংস্থা, হরিজন সংস্থা নয়, সুতরাং এই অনুরোধ গ্রহণযোগ্য নয়। 'গোল টেবিল বৈঠকে' গান্ধীজি হরিজনদের আসন সংরক্ষণের বিরোধিতা করেন এই যুক্তিতে যে, হরিজনরা হিন্দু এবং তাদের মূল সংস্থা থেকে পৃথক করা উচিত নয়। পরে 'যারবেদা চুক্তি'তে তিনি হরিজনদের জন্য আসন সংরক্ষণে রাজি হন এবং সেটা হিন্দুদের ভাগ থেকেই দেওয়া হয়। যখন এই প্রস্তাবিত পদ্ধতি বোম্বাইয়ে মদনমোহন মালব্যের সভাপতিত্বে সাধারণ সভায় মঞ্জুরের জন্য পেশ করা হয়, তখন একজন উঠে অস্থির শ্রোতাদের বলেন, পণ্ডিতজির প্রস্তাবমতো হিন্দু সমাজ থেকে অস্পৃশ্যতার কলঙ্ক মুছতে বড় তহবিল সংগ্রহের দরকার নেই। এখানে উপস্থিত ব্যক্তিদের (বহু মহিলা উপস্থিত ছিলেন) প্রত্যেকে যদি সিদ্ধান্ত নেন যে, তাঁরা তাঁদের বাড়িতে হিন্দুদের মতো হরিজনদের গ্রহণ করবেন, তবেই সমস্যা চুকে যায়। বোম্বাইয়ের এক ব্যবসায়ী বলেন, 'আপনি কঠোর সত্যটা বলেছেন, এঁরা কেউ-ই

১. তাঁর এই মন্তব্য সংবাদপত্রে (২৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৪) এক সংবাদে সমর্থিত হয়। কয়েকজন অন্ত্যজ শ্রী গান্ধীর কাছে যান এবং হরিজন সেবক সঙ্ঘের পরিচালকবর্গে (Governing Body) একজন অন্ত্যজ প্রতিনিধি নেওয়ার কথা বলেন। গান্ধী তা করতে অস্বীকৃত হন। এই লেখক আর কেউ নন, কে. নটরাজন।

তা করতে প্রস্তুত নন।' প্রথম থেকে আমার মনে হয়েছে, এখানেই 'হরিজন সেবক সঙ্ঘে'র মূল দুর্বলতা নিহিত। এর ফল কী হয়েছে? 'হরিজন সেবক সঙ্ঘে'র সব পৃষ্ঠপোষক ড. আম্বেদকরের অনুরাগী। এর কারণ আর কিছুই নয়, তাঁরা হিন্দুদের প্রতি আম্বেদকরের তীব্র বিদ্বেষের সঙ্গে একমত। এই বক্তব্যের সমর্থনে আমি উদাহরণসহ ঘটনা বলতে পারি। কিন্তু তাতে ব্যাপারটি আরও খারাপ হবে। আমি মনে করি, এটা এড়াতে হলে সাধারণ সংস্থায়, কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় সংগঠনগুলিতে হরিজন পুরুষ ও মহিলাদের হিন্দুদের সঙ্গে যোগ দেওয়ার সুযোগ করে দিলে নীতি রূপায়ণে তাঁদের মতামত গুরুত্ব পাবে। হরিজনদের সহযোগী না করে তাঁদের সাহায্যের কথা বলা সমাজ সংস্কারের মূল ভাবধারার বিরোধী। অতীতে হরিজন উন্নয়নের আন্দোলনে যুক্ত ছিলাম, তাদের সঙ্গে সংস্পর্শে আসায় এই বিদ্বেষের ভাব কোথাও লক্ষ্য করিনি। এর কারণ এই আন্দোলনের পৃষ্ঠপোষকরা [এখানে আমি 'ডিপ্রেসড্ ক্লাশ মিশন' (Depressed Class Mission]-এর কথা মনে রেখে বলছি) ধর্মীয় ও সামাজিক বিশ্বাস মতে অন্ত্যজ শ্রেণীর প্রতি বৈষম্যমূলক ব্যবহারের বিরুদ্ধে ছিলেন। আমার মতে, গান্ধীজি 'হরিজন সেবক সঙ্ঘে' তফসিলি জাতিভুক্ত সদস্যদের প্রবেশাধিকার দিতে অস্বীকার করে ভুল করেছেন। এক বন্ধু মনে করিয়ে দিলেন, সঙ্ঘ গঠনের সময়ে ড. আম্বেদকর এর সদস্য ছিলেন।'

আমি এই উদ্ধৃতি তুলে ধরলাম, কারণ এতে বিদ্বেষের কারণ ব্যাখ্যা ও সঙ্ঘের চরিত্র উন্মোচিত করা যায়।

II

'ভারতীয় সমাজ সংস্কার'-এর সংশ্লিষ্ট লেখক সঙ্ঘের ব্যবস্থাপনায় অস্পৃশ্যদের সহযোগী করার আর্জি করেছেন। তাঁর বিবৃতিতে লোকে মনে করতে পারে যে, সঙ্ঘের কেন্দ্রীয় পর্ষদে কোনওদিনই অন্ত্যজদের প্রতিনিধিত্ব ছিল না। এটা ভুল। ঘটনা হচ্ছে, সঙ্ঘ গঠনের সময়ে এর পর্ষদে সুপরিচিত অনেক অন্ত্যজ প্রতিনিধি ছিলেন।

৩ নভেম্বর, ১৯৩২ শ্রী বিড়লা ও শ্রী ঠক্কর এক বিবৃতিতে সঙ্ঘের কেন্দ্রীয় পর্ষদে সদস্যদের নাম ঘোষণা করেন। ঘোষণায় বলা হয় :

'নিম্নলিখিত সদস্যদের নিয়ে কেন্দ্রীয় পর্ষদ্ গঠিত হয়েছে :

শ্রীযুক্ত জি. ডি. বিড়লা, দিল্লি ও কলকাতা ; স্যার পুরুষোত্তম দাস ঠাকুরদাস,

বোম্বাই ; স্যার লাল্লুভাই সামালদাস, বোম্বাই ; ড. বি. আর. আম্বেদকর, বোম্বাই ; শেঠ আম্বালাল সরাভাই, আমেদাবাদ ; ডা: বি. সি. রায়, কলকাতা ; লালা শ্রীরাম, দিল্লি ; রাওবাহাদুর এম. সি. রাজা, মাদ্রাজ ; ডাঃ টি. এস. এস. রাজন, ত্রিচিনপলি ; রাওবাহাদুর শ্রীনিবাসন, মাদ্রাজ ; এ. ভি. ঠক্কর, সাধারণ সম্পাদক দিল্লি।'

এতে দেখা যাবে, ৮ জন সদস্যের মধ্যে ৩ জন অন্ত্যজ শ্রেণীর লোক। সংসদ থেকে আমার অবসর গ্রহণের পর, রাওবাহাদুর এম. সি. রাজা এবং রাওবাহাদুর শ্রীনিবাসনও অবসর গ্রহণ করেন। তাঁরা সঙ্ঘ থেকে সরে গেলেন কেন, আমি জানি না। আমি সঙ্ঘের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করলাম কেন, সেটা বলা যথার্থ। 'পুনা চুক্তি'র পর আমি ক্ষমা ও ভুলে যাওয়ার মনোভাব নিয়ে চলছিলাম। আমার অনেক বন্ধুর কথা অনুযায়ী আমি, শ্রী গান্ধীর আন্তরিকতা স্বীকার করে নিই। এই মনোভাব থেকেই আমি সঙ্ঘের কেন্দ্রীয় সংসদে থাকতে রাজি হই এবং এর কাজে স্বকীয় ভূমিকা রাখতে উৎসাহী হই। বাস্তবত, আমি সঙ্ঘের কাজকর্ম করা নিয়ে শ্রী গান্ধীর সঙ্গে আলোচনা করতে চাই। তা করার আগেই তৃতীয় 'গোল টেবিল বৈঠকে' যোগ দেওয়ার জন্য লন্ডন যাওয়ার ডাক আসে। তখন আমার পক্ষে করণীয় ছিল আমার মতামত সাধারণ সম্পাদক শ্রী ঠক্করকে জানানো। সেইমতো আমি স্টিমার থেকে তাঁকে একটা চিঠি লিখি :

এম. এন. 'ভিক্টোরিয়া'
পোর্ট সৈয়দ
নভেম্বর ১৪, ১৯৩২

প্রিয় শ্রী ঠক্কর,

লন্ডন যাত্রার আগে আপনার চিঠি পেয়েছি। আমার প্রস্তাবানুযায়ী রাওবাহাদুর শ্রীনিবাসনকে কেন্দ্রীয় সংসদে এবং শ্রী ডি. ভি. নায়েককে বোম্বাই প্রাদেশিক সংসদে মনোনীত করা হয়েছে। এই প্রশ্নটি বন্ধুত্বপূর্ণ ভাবে মিটে গেছে শুনে আমি আনন্দিত। 'অস্পৃশ্যতা বিরোধী লীগ'-এর (Anti-Untouchability League) কাজ আমরা যুক্তভাবে করতে পারব (পরে লীগের নাম হয় 'হরিজন সেবক সঙ্ঘ')। কর্মসূচি রচনায় লীগ কী নীতি নেবে, সে-বিষয়ে সদস্যদের সঙ্গে আলোচনার সুযোগ পেলে হত, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত অল্পদিনের মধ্যে লন্ডন আসার জন্য সেই সুযোগ ছাড়তে হয়। অগত্যা আমি বিকল্প শ্রেষ্ঠ উপায়, অর্থাৎ লিখিত ভাবে আমার মতামত জানাচ্ছি সংসদের বিবেচনার জন্য।

আমার মতে, অবদমিত সম্প্রদায়ের উন্নতির কাজে দুইটি বিশিষ্ট পদ্ধতি আছে। একদল মনে করেন, অবদমিত সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তির আচরণ-ই তার পরিস্থিতির জন্য দায়ী। সে দারিদ্র্য ও দুঃখের মধ্যে থাকে, কারণ সে পাপী ও অসৎ। এই অনুসিদ্ধান্ত থেকে এই মতাবলম্বী সমাজসেবীরা তাদের যাবতীয় শক্তি ও সম্পদ নিয়োগ করেন সদাচার, সমবায়, শারীরচর্চা, গ্রন্থাগার, বিদ্যালয় গঠন জাতীয় কাজে, যার লক্ষ্য ব্যক্তির নৈতিক উৎকর্ষ সাধন। আমার মতে, এই সমস্যার ব্যাপারে আরেকটি দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। এর এই অনুসিদ্ধান্তে, ব্যক্তির ভাগ্য, তার পরিবেশ ও জীবনযাপনের পরিস্থিতির দ্বারা নির্ধারিত হয়। কেউ অভাব ও দুঃখের মধ্যে থাকে, তার কারণ তাঁর পারিপার্শ্বিক অনুকূল নয়। আমি নিঃসন্দেহ, এই দুইয়ের মধ্যে শেষেরটিই সঠিক ; প্রথমটিতে কিছু বিক্ষিপ্ত ব্যক্তি স্বকীয় শ্রেণীর ঊর্ধ্বে উঠতে পারেন। 'অস্পৃশ্যতা বিরোধী লীগ'-এর উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আমার মত হচ্ছে, অবদমিত সম্প্রদায়ের কিছু ব্যক্তি বা নির্বাচিত কিছু ছেলেকে সাহায্যের জন্য নয়, সমগ্র সম্প্রদায়ের অগ্রগতি এর লক্ষ্য। ব্যক্তিগত গুণাবলী পরিচর্যার কর্মসূচিতে লীগ শক্তিক্ষয় করুক তা আমি চাই না। আমি চাই, সংসদ সর্বশক্তি নিয়োগ করুক এমন কার্যক্রমে, যা অবদমিত সম্প্রদায়ের সামাজিক পরিস্থিতি পরিবর্তনে সহায়ক হয়। সাধারণভাবে আমার বক্তব্য বলার পর আমি লীগের জন্য কিছু সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম পেশ করছি।

১. নাগরিকাধিকার অর্জনে প্রচার কর্মসূচি

আমার মতে, লীগের প্রথম কাজ হওয়া উচিত অবদমিত সম্প্রদায়ের নাগরিকাধিকার—যেমন, গ্রামের পুকুর ব্যবহার, গ্রামের বিদ্যালয়ে ভর্তি, পরিবহণ ব্যবহার, ইত্যাদির জন্য সারা ভারতে প্রচারাভিযান করা। এই ধরনের কর্মসূচি গ্রামস্তর পর্যন্ত হিন্দু সমাজে সামাজিক বিপ্লবের বার্তা বহন করে নিয়ে যাবে, এছাড়া অবদমিত সম্প্রদায় সমান সামাজিক মর্যাদা পাবে না। সংসদ অবশ্য জানে যে, নাগরিকাধিকারের এই বার্তা প্রচারে কী কী অসুবিধার সম্মুখীন হতে হবে। এ-ব্যাপারে আমার অভিজ্ঞতা থেকেই বলতে পারি, কারণ সভাপতি হিসাবে জানি বোম্বাই প্রেসিডেন্সির নাসিক জেলা ও কোলাবায় 'ডিপ্রেসড ক্লাস ইন্সটিটিউট' (Depressed Class Institute) এবং 'সামাজিক সমতা লীগ' (Social Equality League) এই প্রচার করতে গিয়ে কী অবস্থায় পড়েছিল। প্রথমত, অবদমিত সম্প্রদায় ও বর্ণহিন্দুদের মধ্যে দাঙ্গা হবে এবং মাথা ভাঙবে, পরিণতি মামলা-মোকদ্দমা। এই লড়াইয়ে অবদমিত সম্প্রদায় দুর্গতি ভোগ করবে। কারণ পুলিস ও জেলা-শাসকরা (Magistrate) সবসময়ে

এদের বিরুদ্ধে। এই দুই জেলায় সামাজিক সংগ্রামের পর্বে এমন একটা ঘটনা নেই যেখানে পুলিস ও শাসকবর্গ অবদমিত সম্প্রদায়ের সাহায্যে এসেছে, এমন কী যেক্ষেত্রে ন্যায়বিচার তাদের পক্ষে, সেখানেও নয়। পুলিস ও শাসকবর্গ চরম দুর্নীতিপরায়ণ, কিন্তু সবচেয়ে খারাপ ব্যাপার হল, তাঁরা এক অর্থে রাজনৈতিক, কারণ ন্যায়বিচার বহালের পক্ষে তাঁরা নন, অবদমিত সম্প্রদায়ের বিপক্ষে বর্ণ হিন্দুদের স্বার্থ ও মর্যাদা রক্ষা করতে কৃতসঙ্কল্প। দ্বিতীয়ত, পুরো গ্রাম যখন-ই দেখবে যে, অবদমিতরা তাদের সমান মর্যাদা অর্জনের চেষ্টা করছে, তৎক্ষণাৎ তারা সম্পূর্ণ বয়কট বহাল করবে। রাজ্য সমিতির-র সদস্য হিসাবে আপনি নিশ্চয়-ই তাদের হয়রানি, বেকারি ও অনাহারের ভয়াবহ কাহিনী শুনেছেন। কাজেই এই অস্ত্রের ভয়াবহতা ও ক্ষমতা সম্বন্ধে আর কিছু বলার প্রয়োজনীয়তা দেখি না, অবদমিত শ্রেণীর সম্মান হানিকর স্থিতি থেকে উদ্ধারের প্রচেষ্টা এর জন্যই স্তব্ধ।

নাগরিকাধিকারের প্রচার সফল করতে এবং গ্রামাঞ্চলে কর্মী সংগ্রহ করতে হলে লীগকে যে দুটি বাধার মুখে পড়তে হবে, তার উল্লেখ করেছি। কর্মীরা অবদমিতদের অধিকার আদায়ের লড়াই এবং মামলা-মোকদ্দমায় জিততে সহায়ক হতে পারে। এই কর্মসূচির কার্যকারিতা সম্পর্কে আমি এত বেশি নিশ্চিত যে, আমি মনে করি অন্য সব কাজের আগে এটাই লীগের প্রাথমিক কাজ হওয়া উচিত। এটা ঠিক, এই কর্মসূচি সামাজিক অস্থিরতা, এমনকী রক্তপাত ডেকে আনতে পারে। তবে আমি মনে করি না যে, এটা এড়ানো যাবে। বিকল্প নীতি নেওয়া মানে ন্যূনতম প্রতিরোধের নীতি অনুসরণ। অস্পৃশ্যতা নিরসনে এটা কাজের হবে না, এ বিষয়ে আমি দৃঢ়-নিশ্চিত। অজ্ঞ সরল বর্ণহিন্দুদের মধ্যে যুক্তিবাদী ভাবনার অনুপ্রবেশ হলেও অবদমিত সম্প্রদায়ের ঊর্দ্ধমুখী স্থিতি হবে কিনা আমি নিশ্চিত নই। প্রথমত, বর্ণহিন্দুরা সব মানুষের মতো অবদমিতদের প্রতি অস্পৃশ্যতা পালন করে আচার-রীতি অনুসরণ করে। কিছু লোক বিরুদ্ধে বলল বলে সাধারণ মানুষ তাদের চিরাচরিত আচার রীতি বর্জন করে না। কিন্তু প্রথাসিদ্ধ আচার-ব্যবহারে যখন ধর্মীয় বিশ্বাস, সমর্থন থাকে, এর প্রচারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ও প্রতিবাদ না থাকলে তা বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে। অবদমিত সম্প্রদায়ের মুক্তি আসবে তখনই, যখন বর্ণহিন্দুরা বুঝবে এবং ভাবতে বাধ্য হবে যে, তাদের পথপরিবর্তন করতে হবে। সেজন্য তার প্রথানুগ আচারবিধির বিরুদ্ধে সরাসরি লড়াই দিয়ে সঙ্কট সৃষ্টি করতে হবে। সঙ্কট হলেই সে ভাবতে বাধ্য হবে এবং একবার চিন্তা শুরু করলে পরিবর্তনের জন্য প্রস্তুত হবে, অন্যথায় সেটা হবে না। ন্যূনতম প্রতিরোধ ও যুক্তিবাদী ভাবধারার নীরব অনুপ্রবেশের নীতির বিরাট দুর্বলতা হচ্ছে, এর দ্বারা চিন্তা করতে বাধ্য করা যায় না। কারণ

এতে সঙ্কট সৃষ্টি হয় না। মাহাদ-এর চৌদা পুকুর, নাসিকের কালারাম মন্দির, এবং মালাবারের গুরুভায়ুর মন্দিরে সরাসরি লড়াই কয়েকদিনে যা করেছে, প্রচারকদের লক্ষ দিনের সংস্কার প্রচারে তা করতে পারেনি। সেজন্য অবদমিত সম্প্রদায়ের নাগরিকাধিকার অর্জনে 'অস্পৃশ্যতা বিরোধী লীগ' (Anti-Untouchability League) অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে সরাসরি লড়াই শুরু করুক, এটা আমি সুপারিশ করি। আমি জানি এই প্রচারের নানা অসুবিধা এবং এর অভিজ্ঞতা থেকেই আমি নিশ্চিত যে, সফল হতে হলে আইনশৃঙ্খলার শক্তিগুলিকে আমাদের পক্ষে রাখতে হবে।

এই কারণেই আমি ইচ্ছে করে মন্দিরগুলিকে এই পরিধির বাইরে রেখেছি, এবং নাগরিক অধিকারের মধ্যে একে সীমিত রেখেছি, যা সরকার প্রয়োগ করতে বাধ্য।

২. সুযোগের সমতা

দ্বিতীয় যে বিষয়টি 'অস্পৃশ্যতা বিরোধী লীগ' করতে পারে তা হল, অবদমিত সম্প্রদায়ের জন্য সমান সুযোগের ব্যবস্থা। অবদমিতদের দুঃখ দারিদ্রের বেশিটা সমান সুযোগের অভাব তথা অসাম্যের জন্য, এটি আবার অস্পৃশ্যতাজনিত। আমি নিশ্চিত আপনারা জানেন যে, গ্রামে ও শহরেও অন্ত্যজ শ্রেণীর লোকেরা সাবু, দুধ, মাখন বিক্রি করে জীবনধারণ করতে পারে না, অথচ অন্য সবাই এটা করে। একজন বর্ণহিন্দু এইসব জিনিস অ-হিন্দুর থেকে কিনবে, কিন্তু অন্ত্যজদের কাছ থেকে কিনবে না। সুবিধা ভোগের ক্ষেত্রে তার অবস্থা শোচনীয়। সরকারি দফতরগুলিতে বর্ণভেদের জন্য কনস্টেবল বা পিয়নের কাজও সে পায় না। শিল্পে এক-ই অবস্থা। আমেরিকায় নিগ্রোদের মতো ঐশ্বর্যের সময়ে সে সবার শেষে কাজ পাবে আর সংকটের সময়ে সবার প্রথমে তার চাকরি যাবে। এবং একটু পা রাখার জায়গা পেলেও তার ভবিষ্যৎ কী? বোম্বাই বা আমেদাবাদের সুতার মিলে সে সবচেয়ে কম মজুরির বিভাগে রয়েছে যেখানে রোজগার মাত্র ২৫ টাকা মাসে। বেশি টাকার জায়গা, যেমন বয়ন বিভাগ তার কাছে বন্ধ। এমনকী, কম মজুরির বিভাগেও সে সর্বোচ্চ পদে যেতে পারে না। কর্তৃত্বপদ বা উচ্চ কর্তার পদ সংরক্ষিত বর্ণহিন্দুদের জন্য। অবদমিত সম্প্রদায়ের শ্রমিক তার অধস্তন দাস হিসাবে কাজ করবে তা সে যতই যোগ্য বা প্রবীণ হোক। যেসব বিভাগে কাজের সংখ্যা ধরে মজুরি, সেখানেও সে বর্ণহিন্দুদের মতো রোজগার করতে পারে না সামাজিক বৈষম্যের জন্য। রিলিং ও উইন্ডিং বিভাগে কর্মরতা অবদমিত সম্প্রদায়ভুক্ত মহিলা শ্রমিকরা আমার কাছে অভিযোগ করে জানায়, নায়েকিনরা কাঁচামাল সব শ্রমিকদের মধ্যে বন্টন না করে শুধু হিন্দু মহিলা শ্রমিকদের দেয়, তাদের দেয় না। হিন্দুদের হাতে

অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষ কীভাবে নির্যাতিত হয়, আমি তার কয়েকটি মাত্র অসম সুযোগের দৃষ্টান্ত দিলাম। আমার মনে হয়, 'অস্পৃশ্যতা বিরোধী লীগ' এই প্রশ্নে জনমত সৃষ্টি করে এর নিন্দা করুক এবং অসাম্যের ঘটনাগুলি দেখার জন্য একটা ব্যুরো গঠন করুক। আমি বিশেষ করে চাইব, লীগ বয়ন বিভাগ সবার জন্য মুক্ত করার সমস্যা নিয়ে কাজ করুক, তাতে অবদমিত সম্প্রদায়ের অনেক লোক ভাল চাকরি পাবে। ব্যক্তি মালিকানা সংস্থার হিন্দু মালিকরা অবদমিতদের তাদের দফতরে যোগ্যতা অনুযায়ী চাকরি দিলে অনেক কিছু হতে পারে।

৩. সামাজিক লেনদেন

সবশেষে আমি মনে করি, লীগের উচিত অন্ত্যজদের প্রতি সবর্ণদের বীতরাগ অবসানের চেষ্টা করা। এর জন্যই এই দুই অংশ পৃথক ও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে চলছে। আমার মতে, এর জন্য দরকার এদের মধ্যে আরও বেশি সম্পর্ক স্থাপন। এক-ই বৃত্তের মধ্যে দুই অংশ সহযোগিতার সম্পর্ক স্থাপন করলে উভয়ের মধ্যেকার বিচ্ছিন্ন ও স্বতন্ত্র বোধ কমতে পারে। আমার মতে সবচেয়ে কার্যকরী উপায়, বর্ণহিন্দুদের গৃহে ভৃত্য বা অতিথি হিসাবে অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষদের আসতে দেওয়া। এইভাবে সজীব সম্পর্ক স্থাপিত হলে সহযোগিতার ও সমধারার জীবনযাপন সম্বন্ধে অন্তরঙ্গ হবে উভয়েই, এবং এতে আমাদের আকাঙ্ক্ষিত ঐক্যের পথ উন্মুক্ত হবে। আমি দুঃখিত, অনেক বর্ণহিন্দু উৎসাহ দেখালেও এর জন্য প্রস্তুত নন। মহাত্মার দশদিনব্যাপী অনশনকালে সারা ভারতে আলোড়ন সৃষ্টির সময়ে ভিলে পার্লে ও মাহাদে বর্ণহিন্দু ভৃত্যরা কাজ বন্ধ করেছিলেন, কারণ তাঁদের গৃহকর্তারা অন্ত্যজদের সঙ্গে মৈত্রী করে অস্পৃশতার রীতি লঙ্ঘন করেছিলেন। আমি আশা করেছিলাম তাঁরা ধর্মঘট তুলে নেবেন এবং তাঁদের স্থানে অন্ত্যজদের ভৃত্য হিসাবে নিয়োগ করে বিপথগামী জনতাকে শিক্ষা দেবেন। এটা না করে তাঁরা কট্টরপন্থী শক্তির কাছে আত্মসমর্পণ করলেন। আমি জানি না, অবদমিত শ্রেণীর মানুষ এইসব সুখের দিনের পায়রা বন্ধুদের দ্বারা কতটা উপকৃত হবেন। দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের পক্ষে প্রকৃত কাজ ছাড়া শুধু সমবেদনা জ্ঞাপনকারী পৃষ্ঠপোষক থাকার মধ্যে সান্ত্বনা নেই, এবং আমি লীগকে বলছি যে, অবদমিত সম্প্রদায়ের মানুষ বর্ণহিন্দু সমবেদনাকারীদের সদিচ্ছায় সন্তুষ্ট হবে না, এরা যদি আমেরিকার উত্তরাঞ্চলের শ্বেতাঙ্গদের মতো নিগ্রোদের মুক্তির জন্য দক্ষিণের সগোত্র শ্বেতাঙ্গদের বিরুদ্ধে লড়াই করার মতো নিজেদের গোত্রের বর্ণহিন্দুদের বিরুদ্ধে অন্ত্যজদের পক্ষে লড়াই করে, তখন-ই পৃষ্ঠপোষক

হওয়ার অর্থ হবে। তবে এছাড়াও আমি মনে করি, লীগকে সবর্ণ ও অন্ত্যজদের মধ্যে আদান-প্রদানের সম্পর্ক স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা হিন্দুদের বুঝাতে হবে।

৪. মাধ্যম প্রয়োগ

লীগকে তার কর্মসূচি রূপায়ণে বিশাল কর্মীবাহিনী নিয়োগ করতে হবে। সমাজসেবী নিয়োগ হয়তো নগণ্য সমস্যা মনে হবে, তবে আমি, যথার্থ মাধ্যম ঠিক করাকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করি। বিশেষ কাজের জন্য বা অন্য কাজের জন্য টাকা দিলে কর্মচারী পাওয়া যায়। আমি নিশ্চিত, এ ধরনের ভাড়াটে কর্মী লীগের উদ্দেশ্য হরণ করবে না। টলস্টয় বলেছিলেন, 'যারা ভালবাসে শুধু তারাই সেবা করতে পারে।' আমার মতে, অবদমিত সম্প্রদায়ের থেকে কর্মী সংগ্রহ করলে এই পরীক্ষা সফল হবে। কাকে নিযুক্ত করা হবে, কাকে হবে না, এই প্রশ্নে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় লীগকে এই দিকটি নিয়ে ভাবতে হবে। আমি বলছি না যে, অন্ত্যজদের মধ্যে বদ লোক নেই যাঁরা সমাজসেবাকে ব্রতরূপে গ্রহণ করছেন। তবে সাধারণভাবে বলা যায়, অবদমিত সম্প্রদায়ভুক্ত কর্মী এই কাজকে নিঃস্বার্থ সেবা হিসাবে গ্রহণ করবে। লীগের কাজের জন্য এটাই দরকার। দ্বিতীয়ত, অনেক সংস্থা আছে যারা এই ধরনের সমাজসেবামূলক কাজে যুক্ত। তারা 'অস্পৃশ্যতা বিরোধী লীগ'-এর কাজও করতে পারে অনুদান পাওয়ার আশায়। আমি নিশ্চিত, এ ধরনের কিস্তিতে কেনা ধরনের কাজে চিরস্থায়ী ভাল কাজ কিছু হয় না। সংস্থার কাছে যেটা আশা করা হয় তা হল একটিমাত্র দায়িত্ব পূরণে একাগ্রভাবে কাজ করে যাওয়া। আমরা এমন সংস্থা ও সংগঠন চাই লক্ষ্যপূরণের কাজে, যার দৃষ্টিভঙ্গি সীমিত। এমন সংস্থাকে কাজ দিতে হবে, যারা অবদমিত সম্প্রদায়ের কাজেই আত্মনিয়োগ করবে।

আমার সংশয় হচ্ছে, হয়তো আমি চিঠির সীমার বাইরে চলে যাচ্ছি, এবং আমার মনে হয় না যে, আমি আরও দীর্ঘ বক্তব্য রেখে ভুল করতে থাকব। আরও অনেক কিছু বলার রয়েছে, অন্য সময়ে তা বলার জন্য রাখলাম। শেষ করার আগে শুধু এইটুকু বলব, বোধহয় বেলফ্যুর বলেছিলেন, আইন নয়, ভালবাসা দিয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য রক্ষা করা সম্ভব। আমি মনে করি, হিন্দু সমাজের ক্ষেত্রেও এক-ই কথা প্রযোজ্য। সবর্ণ ও অন্ত্যজদের আইন দিয়ে একত্রে রাখা যাবে না। নিশ্চিতভাবেই পৃথক নির্বাচকমণ্ডলীর বিকল্পে যুক্ত নির্বাচকমণ্ডলীর জন্য নির্বাচনী আইন দিয়ে তা হবে না। শুধু ভালবাসাই তাদের এক করতে পারে। পরিবারের বাইরে ন্যায়বিচারই পারে ভালবাসার সম্ভাবনা উন্মুক্ত করতে এবং 'অস্পৃশ্যতা বিরোধী

লীগ'-এর দায়িত্ব হবে সবর্ণদের দিয়ে এটা করানো এবং অন্ত্যজদের জন্য ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা। আমার মতে, এছাড়া লীগের অস্তিত্ব বা কাজ অর্থবহ হবে না।

শুভেচ্ছা ও সম্মানসহ,

আপনার অন্তরঙ্গ

(স্বাঃ) বি. আর. আম্বেদকর

পুঃ— আমি এটা সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য দিচ্ছি, যাতে সাধারণ মানুষ আমার মত জানতে পারে।

প্রতি—

এ. ভি. ঠক্কর, সাধারণ সম্পাদক,

অস্পৃশ্যতা বিরোধী লীগ,

বিড়লা হাউস, নয়াদিল্লি।

IV

বিস্ময়ের সঙ্গে দেখলাম, আমার প্রস্তাবগুলিকে কোনও গুরুত্ব দেওয়া হল না। এমনকী, আমার পত্রের প্রাপ্তিস্বীকারও হল না! আমি বুঝলাম, সঙ্ঘে থাকার আর কোনও অর্থ হয় না। এর থেকে সরে এলাম। দেখলাম, আমার অনুপস্থিতিতে সঙ্ঘের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যও বদলে গেছে। ৩০ সেপ্টেম্বর, ১৯৩২, বোম্বাইয়ে কোয়াসজি জাহাঙ্গীর হল-এ সভায় সঙ্ঘের উদ্দেশ্য এইভাবে বিবৃত হয় :

'অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে প্রচার চালানো এবং যথাসত্বর সম্ভব সাধারণ পুকুর, ধর্মশালা, বিদ্যালয়, রাস্তা, শ্মশান, স্নানঘাট এবং সাধারণ মন্দির অবদমিত সম্প্রদায়ের জন্য মুক্ত করা, কোনও জবরদস্তি বা শক্তি প্রয়োগ না করা, এবং এই লক্ষ্যে শুধু শান্তিপূর্ণ প্ররোচনার পথ গৃহীত হবে।'

কিন্তু ৩ নভেম্বর, জি. ডি. বিড়লা ও এ. ভি. ঠক্কর উদ্বোধনের দু'মাস পরে যে বিবৃতি দেন তাতে বলা হয় :

'লীগ মনে করে সনাতনপন্থীদের মধ্যে যুক্তিবাদী ব্যক্তিরা স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য জাতের বিবাহ ও একত্র ভোজনের বিরোধিতা করলেও অস্পৃশ্যতার নিরসনের খুব বিরোধী নয়। যেহেতু লীগ সংস্কারকে এর পরিধির বাইরে নিয়ে যেতে উচ্চাভিলাষী নয়,

এটা পরিষ্কার করে দেওয়া ভাল যে, অস্পৃশ্যতার যাবতীয় চিহ্ন দূর করতে লীগ বর্ণহিন্দুদের মধ্যে সদিচ্ছার উদ্রেক করতে কাজ করবে, কাজের মূলধারা হবে সৃজনধর্মী। যেমন অবদমিত সম্প্রদায়কে শিক্ষাগত, আর্থিক ও সামাজিক ভাবে উন্নত করে তোলা। এই ধারা অস্পৃশ্যতার নিরসনের পথ প্রশস্ত করবে। এই কাজে কট্টর সনাতনপন্থীও সহানুভূতিশীল হবেন। এই ধরনের কাজের জন্যই লীগের প্রতিষ্ঠা। জাত-প্রথার অবসান ও একত্র ভোজনের মতো সামাজিক সংস্কার লীগের কাজের পরিধির বাইরে।'

এখানেই সংস্থার মূল ঘোষিত লক্ষ্য থেকে পুরো সরে আসা হয়েছে। কর্মসূচিতে অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ নগণ্য ছিল। সঙ্ঘের মূল কাজ হিসাবে গঠনমূলক কাজের কথা রয়েছে। এখানে প্রশ্ন প্রাসঙ্গিক, কেন এভাবে উদ্দেশ্য ও কর্মসূচির পরিবর্তন করা হল। উদ্দেশ্য ও কর্মসূচির এই পরিবর্তন শ্রী গান্ধীর অগোচরে বা সম্মতি ছাড়া হতে পারে না। এর একটা কারণ এই যে, মূল কর্মসূচি গান্ধীর কাছে অসুবিধাজনক ছিল। অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ মঞ্চ হিসাবে ভাল, কিন্তু কর্মসূচি রূপায়ণের ক্ষেত্রে হিন্দুদের কাছে গান্ধী অপ্রিয় হয়ে গেছেন। এই অপ্রিয় হতে তিনি প্রস্তুত ছিলেন না। সেজন্য তিনি গঠনমূলক কার্যক্রম বেশি পছন্দ করেছেন, কারণ এর অসুবিধা নেই, বরং সুবিধা অনেক। হিন্দুরা এতে কিছু মনে করেননি। হিন্দুদের অসন্তুষ্ট না করেই গান্ধী এটা নিয়ে এগোতে পেরেছেন। গঠনমূলক কর্মসূচির অসুবিধা নেই, বরং এটা সুপারিশ করার সুবিধা আছে। অন্ত্যজরা স্বাধীনভাবে যে আন্দোলন গড়ে তুলেছিল এবং ১৯৩২ সালে গান্ধীকে 'পুনা চুক্তি' স্বীকার করতে বাধ্য করেছিল, সেই আন্দোলন খর্ব করতে গঠনমূলক কর্মসূচি সহায়ক ছিল। এই চুক্তির আগে গান্ধী অন্ত্যজদের কাছে গঠনমূলক কর্মধারার সুবিধা নিয়ে অনেক বলেছিলেন, এবং কংগ্রেসিরাও এর পক্ষে ছিলেন। এর মাধ্যমে অন্ত্যজদের কংগ্রেসি করা সম্ভব ছিল এবং অত্যন্ত সম্মানজনক ভাবেই তা হত। গঠনমূলক কার্যক্রমে দয়ার মাধ্যমে অন্ত্যজদের হত্যা করার পরিকল্পনায় রূপান্তর হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। বাস্তবে তাই হয়েছে। 'হরিজন সেবক সঙ্ঘ' অন্ত্যজদের কোনও স্বাধীন আন্দোলন বা হিন্দু এবং কংগ্রেস বিরোধী আন্দোলন বরদাস্ত করতে রাজি ছিল না। উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের পরিবর্তনে এই পরিণতি হবে বুঝতে পেরেই আমি সঙ্ঘ ছেড়েছি। অন্ত্যজদের প্রথম একদল সঙ্ঘ ছেড়ে দেওয়ার পর শ্রী গান্ধী তাদের স্থানে অন্য অন্ত্যজদের নিয়োগ করার চেষ্টা করেননি। বরং সঙ্ঘের ব্যবস্থাপনা কংগ্রেস ঘেঁষা বর্ণহিন্দুদের হাতে চলে যেতে দেওয়া হয়। এখন সঙ্ঘের নীতিই হচ্ছে ব্যবস্থাপনায় ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্তরে অন্ত্যজদের বাদ রাখা। গান্ধীর কাছে অবদমিত সম্প্রদায়ের এক প্রতিনিধিদল সঙ্ঘের

পর্ষদে অন্ত্যজদের নেওয়ার অনুরোধ করলে তিনি বাতিল করেন।[১] প্রতিনিধিদলকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য গান্ধী এক নতুন তত্ত্ব দেন। তিনি বলেন, 'অন্ত্যজদের উন্নতিকল্পে কাজ একটা প্রায়শ্চিত্ত কর্ম, অস্পৃশ্যতার পাপের জন্য হিন্দুদের এটা করা উচিত। যে টাকা সংগ্রহ হয়েছে তা দিয়েছেন হিন্দুরা। উভয় দিক থেকেই হিন্দুদের সঙ্ঘ পরিচালনা করতে হবে। নৈতিকতা বা অধিকার কোনওটাই সঙ্ঘের পর্ষদে অন্ত্যজদের প্রতিনিধিত্ব যুক্তিবহ করে না।' শ্রী গান্ধী বুঝেন না, এই তত্ত্ব দিয়ে কীভাবে তিনি অবদমিত সম্প্রদায়কে অপমান করেছেন, এর অকপটতা তত্ত্বের রূঢ় চরিত্র তুলে ধরেছে। শ্রী গান্ধীর যুক্তি যদি এই হয় যে, হিন্দুরা যেহেতু টাকা সংগ্রহ করেছে সেহেতু অন্ত্যজদের অধিকার নেই সেই টাকা কীভাবে খরচ হবে তা বলা, তাহলে কোনও আত্মমর্যাদাসম্পন্ন অন্ত্যজ তাঁর কাছে যাবেন না, যেসব অন্ত্যজ গেছেন তাঁরা নেহাত-ই বেকার ও অবাঞ্ছিত, রাজনীতিকে জীবনযাপনের সম্বল করতে চায়। কিন্তু শ্রী গান্ধীকে বুঝতে হবে, তিনি যা বলছেন তা পরিবর্তনের পক্ষে অজুহাত মাত্র। সঙ্ঘের মূল ভাবধারা থেকে এই পরিবর্তন কেন করা হল, তা ব্যাখ্যা করা হয়নি। এটা প্রশ্ন করা প্রাসঙ্গিক : একটা সময়ে তিনি কেন সঙ্ঘের পরিচালকমণ্ডলীতে অন্ত্যজদের নেওয়ার পক্ষে ছিলেন। এখন তাদের বাদ দিতে তিনি বদ্ধপরিকর কেন?

V

'ভারতীয় সমাজ সংস্কার' (Indian Social Reformer)-এর 'পত্রলেখক ঠিক-ই বলেছেন। অন্ত্যজরা 'ডিপ্রেসড ক্লাশেস মিশন' (Depressed Classes Mission)-এর প্রতি বৈরীভাবাপন্ন নয়। এরা 'হরিজন সেবক সঙ্ঘে'র মতোই অন্ত্যজদের উন্নয়নে কাজ করেছেন। মিশনের কাজে হিন্দু ও অন্ত্যজরা একসঙ্গে কাজ করছেন। লেখক এটা ঠিক বলেননি যে, মিশনের কমিটিতে অন্ত্যজদের কিছু সদস্য নিয়েছে বলেই হয়েছে। সদস্য নিয়েছে, তা ঠিক। তবে মিশন ও অন্ত্যজদের মধ্যে বৈরীভাব নেই কেন এবং সঙ্ঘ ও অন্ত্যজদের মধ্যে কেন বৈরীভাব আছে? এই দুইয়ের কারণ ভিন্ন। মিশনের কাজের পেছনে কোনও রাজনৈতিক অভিসন্ধি নেই, সঙ্ঘের আছে।

---

১. অস্পৃশ্যদের যে প্রতিনিধিদল গান্ধীর সাক্ষাৎপ্রার্থী হয়েছিলেন, সেটাই প্রথম নয়। আরও অনেক দল গিয়ে এক-ই ফল পান।

এটা সত্যি, আগে মূল লক্ষ্য ছিল সঙ্ঘকে রাজনীতি থেকে দূরে রাখা। ৩ নভেম্বর, ১৯৩২, এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে :

'লীগ পার্টির বাইরে থেকে কাজ করতে পারবে, রাজনৈতিক দল বা ধর্মীয় প্রচারে যুক্ত না হওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় কার্যকরী সমিতির প্রধানদের সক্রিয় কর্মী নির্বাচনে সতর্ক হতে হবে। এই লক্ষ্য মাথায় রেখে সারাক্ষণের বেতনভুক্ত কর্মীদের রাজনীতি করা চলবে না বা কোনও ধর্মীয় বা গোষ্ঠীগত প্রচারে শরিক হওয়া চলবে না।'

কিন্তু এই ঘোষণা অনুসরণের চেয়ে ভঙ্গই হয়েছে। হতে পারে 'হরিজন সেবক সঙ্ঘ'কে ব্যবহার করে অন্ত্যজদের কংগ্রেসে আনার সুবিধার লোভ সংবরণ করা শক্ত ছিল। কাজের পরিবর্তে কৃতজ্ঞতাবোধে কংগ্রেসের রাজনীতি ও আদর্শে তাদের টেনে আনার সুযোগ ছিল। এটাও হয়তো ব্যাপার যে, অন্ত্যজদের সেবাকেন্দ্র ছাড়াও 'হরিজন সেবক সঙ্ঘ'কে রাজনৈতিক কারখানা করে তোলা প্রয়োজন ছিল। সংগ্রামের জন্য অন্ত্যজদের তৈরি করা এবং তাদের নিজের মতো রাজনীতি ঠিক করা বোধ হয় শুধু দয়া বিতরণ হয়ে যেত! হিন্দুরা এই দয়া কতদিন সমর্থন করত? বেশি-দিন নয়। অন্ত্যজদের প্রতি আচরণের জন্য হিন্দুদের কোনও পাপবোধ, অনুশোচনা বা প্রায়শ্চিত্তের মানসিকতা না থাকায় হিন্দুদের এই দয়া কিছুদিন পরই উবে যেত। এটা রোধ করতে সঙ্ঘ বুঝেছিল যে, অনুদান নিয়মিত পেতে হলে ফল দেখাতে হবে, অর্থাৎ হিন্দুদের কাছে প্রমাণ করতে হবে যে, অন্ত্যজরা ধর্ম বা রাজনীতির ক্ষেত্রে স্বাধীন নয় বা হিন্দুদের বিরোধী নয়। আমার এই কারণ বিশ্লেষণ ঠিক নাও হতে পারে। তবে এটা অস্বীকার করা যাবে না, যে 'হরিজন সেবক সঙ্ঘ' একটি রাজনৈতিক সংস্থা, এবং এর মূল উদ্দেশ্য হল অন্ত্যজদের কংগ্রেসে আনা।

কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিতে পারি, যা আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে। 'হরিজন সেবক সঙ্ঘ' কর্মীদের জন্য সম্মেলন করে। এইসব সম্মেলন সংগঠিত করা হয় মূলত 'বিভিন্ন ভাষাগত প্রদেশে কার্যকলাপ ও ভাবের আদানপ্রদান বিষয়ে কাজের অগ্রগতি মূল্যায়নের জন্য।' এরকম এক সম্মেলন হয় পুনায় ; জুন, ১৯৩৯-এ। এতে একটা প্রস্তাবের কথা ভাবা হয়, 'পুনা চুক্তি' অনুযায়ী বন্টনযোগ্য ভোট প্রথার স্থানে যত প্রার্থী তত ভোট প্রথা চালু করার জন্য সরকারকে অনুরোধ করা হয়। ইতিমধ্যেই আমি বলেছি, 'পুনা চুক্তি'র আত্মসমর্পণের পর কংগ্রেস কীভাবে বন্টনযোগ্য ভোট প্রথা গ্রহণের জন্য জোর দেন এবং অন্ত্যজদের পক্ষে এটা কত খারাপ এবং কীভাবে তা 'পুনা চুক্তি' নস্যাৎ করবে। কংগ্রেস ব্যর্থ হয়। কংগ্রেস

যেখানে ব্যর্থ, সঙ্ঘ সেটা গ্রহণ করে। যদিও তাঁরা জানতেন যে, অবদমিত সম্প্রদায় এর বিরুদ্ধে। একটা অরাজনৈতিক সংস্থার পক্ষে এক বিচিত্র প্রস্তাব! যেন একজন মাতাল লাল চোখ নিয়ে তার প্রতিবেশীকে বুঝাবার চেষ্টা করছে যে, সে মদ্যবর্জনকারী। অন্ত্যজরা এক বিক্ষোভ মিছিল করায় সঙ্ঘ এর থেকে বিরত হয়।

আমি এটা বলতে পারি যে, 'হরিজন সেবক সঙ্ঘে'র বোম্বাই শাখা বোম্বাইয়ের কিছু অন্ত্যজ গোষ্ঠীকে তাদের কংগ্রেস-বিরোধী মতের জন্য কালো তালিকাভুক্ত করেছে। এই তালিকাভুক্ত গোষ্ঠীর ছাত্রদের বৃত্তি ও শিক্ষা অনুদান প্রত্যাখ্যাত হয়। মাহার সম্প্রদায় চিরদিন অন্ত্যজদের রাজনৈতিক আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছে এবং কংগ্রেসের সঙ্গে থেকে লড়াই করেছে, তাদেরও কালো তালিকায় ফেলা হয় এবং মাহার ছাত্ররা কংগ্রেস-বিরোধী মনোভাব থেকে মুক্ত হওয়ার প্রমাণ না দিলে বৃত্তির ক্ষেত্রে বৈষম্যের শিকার হয়।

শেষ দৃষ্টান্ত দেব 'হরিজন সেবক সঙ্ঘে'র সাধারণ সম্পাদক এ. ভি. ঠক্করের। শ্রী ঠক্কর বোম্বাই সরকারের অনগ্রসর শ্রেণী সংসদের সদস্য। এটা স্থাপিত হয় ১৯২৯-এ। এটা পাক্ষিক একবার সভায় বসে এবং অস্পৃশ্য ও অন্যান্য অনগ্রসর গোষ্ঠীর বিষয়ে সরকারকে পরামর্শ দেয়। শ্রী ঠক্কর সংসদের সভায় এক প্রস্তাব পেশ করে সুপারিশ করেন, মাহার সম্প্রদায় শিক্ষায় এগিয়ে গেছে এবং তারা অন্য অনগ্রসরদের জন্য সংরক্ষিত সরকারি টাকা অপব্যবহার করছে। এই টাকা অন্ত্যজদের জন্য বরাদ্দ করা হোক। প্রস্তাবটি যেসব ঘটনার ভিত্তিতে, তার অনুসন্ধান করা হয়। দেখা যায়, তথ্যগুলি ভুল এবং অগ্রসর হওয়ার পরিবর্তে মাহাররা বরং অন্যান্য অন্ত্যজ গোষ্ঠীর চেয়ে শিক্ষায় অনগ্রসর। এই প্রস্তাব 'হরিজন সেবক সঙ্ঘে'র সাধারণ সম্পাদকের রাজনৈতিক কৌশল, কংগ্রেস বিরোধিতার জন্য তিনি মাহারদের শাস্তি দিতে চান।

এসব থেকে কী বুঝা যায়? এতে কী এটাই প্রকাশ হয় না যে, 'হরিজন সেবক সঙ্ঘ' নামে দাতব্য-প্রতিষ্ঠান। এর মূল লক্ষ্য হল, অন্ত্যজদের ফাঁদে ফেলে হিন্দুদের ও কংগ্রেসের অনুগামী করা, এবং হিন্দুদের সামাজিক, ধর্মীয়, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রাধান্য থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য অস্পৃশ্যদের যে, কোনও আন্দোলনকে বানচাল করা। অন্ত্যজদের যদি 'হরিজন সেবক সঙ্ঘ'কে ঘৃণ্য বলে মনে করে, যে সংস্থার উদ্দেশ্য সহৃদয়তা দিয়ে তাদের হত্যা করা, তাহলে আশ্চর্যের কিছু আছে কী?

অধ্যায় ৬

একটি মিথ্যা দাবি : কংগ্রেস কি সবার প্রতিনিধিত্ব করে?

I

কংগ্রেস সব সময়ে জোর গলায় দাবি, করে যে, ভারতের সব মানুষের প্রতিনিধিত্বকারী একমাত্র রাজনৈতিক সংস্থা। এক সময়ে তারা এও দাবি করত মুসলমানদেরও তারা প্রতিনিধিত্ব করে। এখন আর জোর গলায় এই দাবি করে না। কিন্তু অন্ত্যজদের ক্ষেত্রে কংগ্রেস জোরালো ভাবে তাদের প্রতিনিধিত্ব দাবি করে। অন্যদিকে, অকংগ্রেসি রাজনৈতিক দলগুলি সব সময়েই এই দাবি অস্বীকার করে। বিশেষ করে অন্ত্যজরা কখনই কংগ্রেসের এই দাবি অস্বীকার করতে দ্বিধা করে না।

এই প্রতিযোগিতায় কংগ্রেস, অন্ত্যজ ও অন্যান্য অকংগ্রেসি দলগুলির দাবি প্রচার ও প্রচারের ক্ষেত্রে টাকার জোরে নস্যাৎ করে দিতে সমর্থ হয়েছিল। এর ফলে ভারত সম্বন্ধে উৎসাহী বেশিরভাগ বিদেশি এই প্রচারের প্রভাবে কংগ্রেসের দাবির যৌক্তিকতা বিশ্বাস করেন। শুধু প্রচারের ওপর বিশ্বাস করে থাকা যতদিন চলবে ততদিন কংগ্রেস সহজেই বিদেশিদের বোকা বানাবে, কংগ্রেসের সবার প্রতিনিধিত্ব দাবি যারা স্বীকার করে না তাদের পক্ষে কিছু করা মুশকিল। পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাওয়াবার মতো অবস্থা তাদের নেই। কিন্তু ১৯৩৭-এ প্রাদেশিক আইনসভার নির্বাচনের পর অবস্থা বদলেছে। শুধু প্রচারকেন্দ্রিক সাধারণ বক্তব্যের ওপর নির্ভর না করে ভোটের সংখ্যা ও আসনসংখ্যা দিয়ে এখন বিচার করা যায়, প্রচারের চেয়ে এটা অনেক বেশি সুনির্দিষ্ট।

নির্বাচনের ফলে কী দেখা যায়? কংগ্রেস মোট কত আসন পেয়েছে? কত সংখ্যক ভোট পেয়েছে?

প্রথমে দেখা যাক, কংগ্রেসের প্রাপ্ত আসন সংখ্যা কত। নির্বাচন হওয়ার পর-ই কংগ্রেস প্রাদেশিক আইনসভায় নির্বাচিত প্রার্থীদের নিয়ে এক সম্মেলন করে নয়াদিল্লিতে মার্চ ১৯ ও ২০, ১৯৩৭। এই উপলক্ষে কংগ্রেস এক পুস্তিকা প্রকাশ করে তাদের নাম উল্লেখ করে। এই তথ্য নির্ভুল ধরে নিলে দেখা যাবে সব প্রদেশে কংগ্রেস কত আসন পেয়েছে।

সারণি - ৬

প্রাদেশিক বিধানসভায় কংগ্রেসের শক্তি

প্রদেশ	মোট আসনসংখ্যা	কংগ্রেসের আসন
অসম	১০৮	৩৫
বাংলা	২৫০	৬০
বিহার	১৫২	৯৫
বোম্বাই	১৭৫	৮৫
মধ্যপ্রদেশ ও বেরার	১১২	৭০
মাদ্রাজ	২১৫	১৫৯
ওড়িশা	৬০	৩৬
পঞ্জাব	১৭৫	১৮
সিন্ধু	৬০	৮
যুক্তপ্রদেশ	২২৮	১৩৪
উঃ পঃ সীমান্ত প্রঃ	৫০	১৯
মোট	১৫৮৫	৭১৯

সারণি - ৭

প্রাদেশিক বিধানপরিষদে কংগ্রেসের শক্তি

প্রদেশ	মোট আসনসংখ্যা	কংগ্রেসের আসন
অসম	১৮	০
বাংলা	৫৭	১০
বিহার	২৬	৮
বোম্বাই	২৬	১৪
মাদ্রাজ	৪৬	২৬
মোট	১৭৩	৫৮

ওপরের তালিকা থেকে দেখা যাচ্ছে, দুই কক্ষ মিলিয়ে ১,৭৫৮ আসনের মধ্যে কংগ্রেস ৭৭৭ আসন পেয়েছে। কংগ্রেস সংখ্যা গরিষ্ঠ দল নয়। এমনকী অর্ধেক আসনও পায়নি।

আসনসংখ্যার ক্ষেত্রে এই হচ্ছে কংগ্রেসের অবস্থা। প্রাপ্ত ভোটের ব্যাপারে কংগ্রেসের অবস্থা কী? পরের তালিকাতে দেখা যাবে, এক্ষেত্রেও কংগ্রেস সংখ্যা-লঘু দল।

সারণি - ৮

কংগ্রেস ও অ-কংগ্রেস দলগুলির প্রাপ্ত ভোটের বিবরণ

প্রদেশ		মোট প্রদত্ত ভোট	কংগ্রেসের প্রাপ্ত ভোট	অ-কংগ্রেস দলগুলির প্রাপ্ত ভোট
মাদ্রাজ	বিধানসভা	৪,৩২৭,৭৩৪	২,৬৫৮,৯৬৬	১,৬৬৮,৭৬৮
	বিধান পরিষদ	৩৩,৫১১	১৬,৯০৭	১৬,৬০৪
বোম্বাই	বিধানসভা	৩,৪০৮,৩০৮	১,৫৬৮,০৯৩	১,৮৪০,২১৫
	বিধান পরিষদ	২৩,৭৩০	৯,৪২০	১৪,৩১০
বাংলা	বিধানসভা	৩,৪৭৫,৭৩০	১,০৫৫,৯০০	২,৪১৯,৮৩০
	বিধান পরিষদ	৫,৫৯৩	১,৪৮৯	৪,১০৪
উত্তরপ্রদেশ	বিধানসভা	৩,৩৬২,৭৩৬	১,৮৯৯,৩২৫	১,৪৬৩,৪১১
	বিধান পরিষদ	৯,৭৯৫	১,৫৮০	৮,২১৫
বিহার	বিধানসভা	১,৪৭৭,৬৬৮	৯৯২,৬৪২	৪৮৫,০২৬
	বিধান পরিষদ	৪,৩১৮	৯৬	৪,২২২
পঞ্জাব	বিধানসভা	১,৭১০,৯৩৪	১৮১,২৬৫	১,৫২৯,৬৬৯
মধ্যপ্রদেশ	বিধানসভা	১,৩১৭,৪৬১	৬৭৮,২৬৫	৬৩৯,১৯৬
অসম	বিধানসভা	৫২২,৩৩২	১২৯,২১৮	৩৯৩,১১৪
	বিধান পরিষদ	২,৬২৩	০	১,৬২৮
উঃপঃসীমান্ত	বিধানসভা	১৭৯,৫২৯	৪৩,৮৪৫	১৩৫,৬৮৪
ওড়িশা	বিধানসভা	৩০৪,৭৪৯	১৯৮,৬৮০	১০৬,০৬৯
সিন্ধু	বিধানসভা	৩৩৩,৫৮৯	১৮,৯৪৪	৩১৪,৬৪৫
	মোট	২০,৫০০,৩৪০	৯,৪৫৪,৬৩৫	১১,৩৪৫,৭০৫

এইসব সংখ্যা জানাই যথেষ্ট নয়। অন্য পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে এটা দেখতে হবে। সেরকম প্রথম পরিস্থিতি হল ভোটাধিকারের স্তর। অন্য পরিস্থিতি হচ্ছে নির্বাচনে দুই দলের তুলনামূলক অবস্থা। এগুলি পর্যালোচনা না করলে নির্বাচনী ফলাফলের সম্পূর্ণ তাৎপর্য বুঝা সম্ভব নয়। ভোটাধিকার অনেক উঁচুতে, এবং নির্বাচকমণ্ডলী মোট জনসংখ্যার তুলনায় খুব কম। নিচের সারণিতে বুঝা যাবে জনসংখ্যার তুলনায় নির্বাচকমণ্ডলী কত ছোট।

সারণি - ৯

জনসংখ্যার তুলনায় নির্বাচকমণ্ডলী

প্রদেশ	জনসংখ্যা (১৯৩১)	নির্বাচকমণ্ডলী
মাদ্রাজ	৪৭,১৯৩,৬০২	৬,১৪৫,৪৫০
বোম্বাই ও সিন্ধু	২৬,৩৯৮,৯৯৭	৩,২৪৯,৫০০
বাংলা	৫১,০৮৭,৩৩৮	৬,৬৯৫,৪৮৩
যুক্তপ্রদেশ	৪৯,৬১৪,৮৩৩	৫,৩৩৫,৩০৯
পঞ্জাব	২৪,০১৮,৬৩৯	২,৬৮৬,০৯৪
বিহার ও ওড়িশা	৪২,৩২৯,৫৮৩	২,৯৩২,৪৫৪
মধ্যপ্রদেশ	১৭,৯৯০,৯৩৭	১,৭৪১,৩৬৪
অসম	৯,২৪৭,৮৫৭	৮১৫,৩৪১
উঃ পঃ সীমান্ত	৪,৬৮৪,৩৬৪	২৪৬,৬০৯
মোট	**২৭২,৫৬৬,১৫০**	**২৯,৮৪৭,৬০৪**

জনসংখ্যার মাত্র ১০% ভোটাধিকার পেয়েছে। ভোটাধিকারের এই ব্যবস্থায় নির্বাচকমন্ডলী মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর করতলগত হয় এরা, উভয়েই কংগ্রেসপন্থী। কংগ্রেস ও অ-কংগ্রেসি দলের মধ্যে তুলনামূলক অবস্থার ক্ষেত্রে কিছু বিষয় মনে রাখতে হবে। কংগ্রেসের পক্ষে যুদ্ধের সব শক্তি, অর্থ ও সংগঠন রয়েছে।

অ-কংগ্রেসি দলগুলির অর্থভাণ্ডার নেই, সংগঠনও নয়। কংগ্রেস প্রার্থীরা জনসাধারণের প্রিয়-পাত্র। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের শত্রু, দেশের স্বাধীনতা অর্জনে কৃতসঙ্কল্প। কারাজীবন কংগ্রেস প্রার্থীদের শহিদের মহিমা দিয়েছে। জেলে যাননি, এমন কাউকে কংগ্রেস প্রার্থী করা হয়নি। কংগ্রেস সংবাদপত্র অ-কংগ্রেসি প্রার্থীদের চিহ্নিত করেছে ব্রিটিশের সাজানো ব্যক্তি, দেশের জন্য বিনা সেবা বা ত্যাগ না করা দালাল রূপে, দেশের শত্রু, চাকরি অন্বেষণকারী, সামান্য স্বার্থের জন্য দেশের স্বার্থ বিসর্জনে নিযুক্ত সাম্রাজ্যবাদের দালাল। আর একটা ব্যাপার কংগ্রেস প্রার্থীদের পক্ষে, অ-কংগ্রেসিদের বিপক্ষে যায়। কংগ্রেস ১৯২০ সালের মন্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কার বর্জন করে, ফলে প্রশাসনে বা দেশ শাসনে ব্যর্থতার জন্য জবাবদিহি করতে হয় না। অন্যদিকে অ-কংগ্রেস প্রার্থী তাঁরাই ছিলেন যাঁরা সংস্কারের কাজে যুক্ত এবং যাবতীয় ব্যর্থতার দায় তাঁদের ঘাড়ে আসে। এহেন পরিস্থিতিতে যখন কংগ্রেসের পক্ষেই দাবার ঘুঁটি সাজানো ছিল, তবু কংগ্রেসের নির্বাচনী ব্যর্থতা সবাইকে বিস্মিত করে। যাবতীয় সম্পদ উৎস, মর্যাদা ও জন-সহানুভূতির মধ্যে কংগ্রেসের বিপুলভাবে জেতা উচিত ছিল। কিন্তু তারা ৫০% আসন বা ভোট পায়নি।

সব শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব করার কংগ্রেস দাবি যে শূন্যগর্ভ, সে-বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে?

II

অন্ত্যজদের প্রতিনিধিত্ব করার কংগ্রেসের দাবি পরীক্ষা করা যাক। এই দাবিও ১৯৩৭-এর ভোটের ফলাফলের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করা যায়। অন্ত্যজদের প্রতিনিধিত্ব দানের পরিকল্পনা সম্বন্ধে জানা না থাকলে কংগ্রেস ও অন্ত্যজদের মধ্যে নির্বাচনী লড়াই ও ফলাফল পর্যালোচনা করা সম্ভব নয়। সেজন্য আমি প্রথমে ভারতের নির্বাচনী ব্যবস্থা ব্যাখ্যা করতে চাই, বিশেষ করে বিদেশিদের বুঝাবার জন্য। নির্বাচনী ব্যবস্থার চারটি বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে এর বিবরণ দেওয়া যায়। যেমন—(১) নির্বাচকমণ্ডলী ভারতীয় সংজ্ঞায় 'কেন্দ্র' (২) ভোটদানের অধিকার, (৩) নির্বাচনে প্রার্থী হিসাবে দাঁড়াবার অধিকার, (৪) সফল প্রার্থী নির্ধারণ করার নিয়মাবলী।

১. ভারত শাসন আইন, ১৯৩৫ দুই ধরনের নির্বাচকমণ্ডলীকে স্বীকৃতি দেয় :

ক) অসীমানাগত ও (খ) সীমানাগত।

২. অসীমানাগত নির্বাচকমণ্ডলীর মাধ্যমে বিশেষ স্বার্থগোষ্ঠী, যেমন—জমিদার,

বাণিজ্যিক সংস্থা, শ্রমিক ইউনিয়ন ইত্যাদির জন্য প্রতিনিধিত্ব দেওয়া হয়।

৩. সীমানাগত নির্বাচকমণ্ডলীর তিনটি শ্রেণী রয়েছে :

i) পৃথক সীমানার নির্বাচকমণ্ডলী। সংক্ষিপ্ত ভাবে পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী হিসাবে আখ্যাত হয়।

ii) সাধারণ সীমানাগত নির্বাচকমণ্ডলী।

iii) সংরক্ষিত আসন সহ যুক্ত নির্বাচকমণ্ডলী, সাধারণ ভাবে যুক্ত নির্বাচকমণ্ডলী নামে পরিচিত।

৪. পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী হচ্ছে সম্প্রদায়ভিত্তিক নির্বাচকমণ্ডলী। বিশেষ সম্প্রদায়, যেমন মুসলমান, ভারতীয় খ্রিস্টান, ইউরোপীয় ও ইঙ্গ-ভারতীয় প্রতিনিধিত্ব দেওয়ার জন্য এর পরিকল্পনা। কোনও এলাকায় এইসব সম্প্রদায়ের ভোটারদের একটি নির্বাচকমণ্ডলীর মধ্যে আনা হয়, অন্য সবার থেকে পৃথক করে। তারা নিজেদের সম্প্রদায়ের একজনকে ভোট দিয়ে নির্বাচিত করে তাদের প্রতিনিধিরূপে। পৃথক নির্বাচকমণ্ডলীর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এর নির্বাচনে একটি সম্প্রদায়ের ভোটার নির্বাচনে দাঁড়াতে ও ভোট দিতে পারে। মুসলমান নির্বাচকমণ্ডলী বা কেন্দ্র হলে প্রার্থী বা ভোটারকে মুসলমান হতে হবে; অনুরূপ ভাবে খ্রিস্টান কেন্দ্রে ভোটার ও প্রার্থীকে খ্রিস্টান হতে হবে। বিশেষ সম্প্রদায়ের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটপ্রাপ্তি দিয়ে ফল নির্ধারিত হয়।

৫. কোনও এলাকার সর্ব সম্প্রদায়ের ভোটারদের নিয়ে গঠিত হয় সাধারণ নির্বাচকমণ্ডলী, কিন্তু তা পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী ব্যবস্থার বাইরে থাকে। একে সাধারণ নির্বাচন কেন্দ্র বলা হয়, কারণ এতে ধর্মীয় বা সম্প্রদায়গত পরিচয় স্বীকার করা হয় না। এটি বিবিধদের নির্বাচকমণ্ডলী, অর্থাৎ মুসলমান, ভারতীয় খ্রিস্টান, ইউরোপীয় এবং ইঙ্গ-ভারতীয় ছাড়া সবাই থাকে। সাধারণ নির্বাচন কেন্দ্রে :

i) পৃথক নির্বাচন কেন্দ্রের ভোটার প্রার্থী বা ভোটার হতে পারেন না।

ii) যেসব ভোটারের নাম ভোটার তালিকায় আছে, তারা সবাই জাত, সম্প্রদায় বা মতবাদ নির্বিশেষে ভোট দিতে ও প্রার্থী হতে পারে না।

iii) নির্বাচনের ফল নির্ধারিত হয় সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটের ভিত্তিতে।

৬. যুক্ত নির্বাচকমণ্ডলী পৃথক ও সাধারণ নির্বাচকমণ্ডলীর মিশ্রণ। সাধারণ

কেন্দ্র ও পৃথক নির্বাচন কেন্দ্র দুইয়ের কিছু কিছু বিষয় এক-ই আছে। তবে অন্য দুটির সঙ্গে অন্য বিষয়ে পার্থক্য রয়েছে। পার্থক্য ও মতৈক্যের বিষয়গুলি হল :

i) পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী ও যুক্ত নির্বাচন কেন্দ্রের তুলনা :

১) পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী পৃথক নির্বাচকমণ্ডলীর কাছাকছি। দুই ব্যবস্থায়-ই বিশেষ সম্প্রদায়ের জন্য আসন নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়।

২) ক) পৃথক নির্বাচন কেন্দ্রে নির্বাচনে যে সম্প্রদায়ের জন্য আসন সংরক্ষিত, তাদের জন্যই ভোটদানের অধিকার সীমাবদ্ধ থাকে। যুক্ত নির্বাচকমণ্ডলীর ক্ষেত্রে আসন যদিও বিশেষ সম্প্রদায়ের জন্য সংরক্ষিত অর্থাৎ প্রার্থী হওয়ার অধিকার বিশেষ সম্প্রদায়ের সদস্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, কিন্তু ভোটদানের অধিকার সব সম্প্রদায়ের লোকদের থাকে। সাধারণ নির্বাচকমণ্ডলী এদের নিয়েই গঠিত।

খ) উভয় ক্ষেত্রেই নির্বাচন নির্ধারিত হয় সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটের দ্বারা। কিন্তু পৃথক নির্বাচকমণ্ডলীর ক্ষেত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠ হতে হবে সংশ্লিষ্ট প্রার্থীর সম্প্রদায়ের ভোটারদের, যুক্ত নির্বাচন কেন্দ্রের ক্ষেত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠতা হতে হবে প্রার্থীর সম্প্রদায়ের-ই।

ii) সাধারণ নির্বাচন কেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত নির্বাচন কেন্দ্রের তুলনা :

১) যুক্ত নির্বাচকমণ্ডলী ও সাধারণ নির্বাচকমণ্ডলী এক-ই ধরনের, উভয় কেন্দ্রেই ভোটার সাধারণ নির্বাচন কেন্দ্রের যে কোনও প্রার্থীকে ভোট দিতে পারে।

২) যুক্ত নির্বাচন কেন্দ্র সাধারণ নির্বাচন কেন্দ্র থেকে দুটি বিষয়ে পৃথক :

ক) সাধারণ নির্বাচন কেন্দ্রে একজন সদস্য। কিন্তু যুক্ত নির্বাচন কেন্দ্র দুই সদস্য-বিশিষ্ট—একজন সাধারণ প্রার্থী, আরেক জন সংরক্ষিত প্রার্থী।

খ) সাধারণ নির্বাচন কেন্দ্রে কোনও আসন কোনও সম্প্রদায়ের জন্য সংরক্ষিত নয়। কিন্তু যুক্ত কেন্দ্রে একটি আসন সংরক্ষিত রাখতেই হবে।

৭. যুক্ত নির্বাচন কেন্দ্রের বৈশিষ্ট্য :

যুক্ত নির্বাচন কেন্দ্রে একটি সংরক্ষিত আসন সহ নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্য থাকবে :

১) সাধারণ নির্বাচন কেন্দ্র একজন সদস্যবিশিষ্ট হতে পারে, কিন্তু যুক্ত নির্বাচন

কেন্দ্র একাধিক সদস্যযুক্ত হতে হবে।

২) সাধারণ কেন্দ্রে আসন পূরণে নির্বাচন হয় মুক্ত, এবং পৃথক নির্বাচন কেন্দ্রে অন্তর্ভুক্ত নয় এমন সব সম্প্রদায়-ই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে এবং নির্বাচনের ফল নির্ধারিত হয় সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটপ্রাপ্তির ভিত্তিতে, ভোটার বা প্রার্থীর সম্প্রদায় বিবেচ্য নয়। কিন্তু যুক্ত নির্বাচন কেন্দ্রে অন্তত একটা আসন সংরক্ষিত থাকে বিশেষ সম্প্রদায়ের জন্য। অর্থাৎ সেই সংরক্ষিত আসনে প্রার্থী হতে হলে সেই সম্প্রদায়ের সদস্য হতে হবে।

৩) যুক্ত নির্বাচন কেন্দ্রে প্রার্থী হওয়ার অধিকার সীমাবদ্ধ। কিন্তু ভোটদানের অধিকার সীমাবদ্ধ নয়। সাধারণ কেন্দ্রের সব ভোটার, অর্থাৎ যে সম্প্রদায়ের জন্য আসন সংরক্ষিত সেই সম্প্রদায় ছাড়া অন্য সম্প্রদায়ের লোকও সংরক্ষিত আসনে ভোট দিতে পারে।

৪) সংরক্ষিত আসনে নির্বাচনের ফল ঘোষণায় সফল প্রার্থীকে সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায়ের নির্দিষ্ট সংখ্যক ভোট পেতে হবে এমন কোনও শর্ত নেই। নিয়ম হল, যে সম্প্রদায়ের প্রার্থীর জন্য আসন সংরক্ষিত, সেই সম্প্রদায়ের এক বা একাধিক প্রার্থী থাকলে যে বেশি ভোট পাবে সেই জিতবে, এমনকী সাধারণ সম্প্রদায়ের প্রার্থী তার চেয়ে বেশি ভোট পেলেও সে নির্বাচিত বলে ঘোষিত হবে।

ভারতে এই নির্বাচন ব্যবস্থাই চালু রয়েছে। অন্ত্যজদের জন্য প্রযোজ্য এই ব্যবস্থা সংরক্ষিত আসনসহ যুক্ত নির্বাচন কেন্দ্র বলে চিহ্নিত এবং ওপরের (৭)-এ তার বিবরণ দেওয়া হয়েছে। অন্ত্যজদের জন্য সংরক্ষণ নীতি প্রয়োগ করতে হলে যথাযথ সংখ্যক সাধারণ নির্বাচন কেন্দ্র বেছে তাকে বহু সদস্যবিশিষ্ট নির্বাচকমণ্ডলীতে রূপান্তরিত করতে হবে এবং প্রতিটি কেন্দ্রে এক বা দুটি আসন তফসিলি জাতের জন্য সংরক্ষিত করতে হবে। বিভিন্ন প্রদেশে এই যুক্ত নির্বাচন কেন্দ্রের সংখ্যা ভিন্ন। এর প্রকৃত সংখ্যা ঠিক হয় প্রাদেশিক আইনসভায় তফসিলি জাতের জন্য নির্ধারিত আসনসংখ্যা এবং প্রতিটি যুক্ত নির্বাচন কেন্দ্রে সংরক্ষিত আসনের সংখ্যা দিয়ে। এই পরিকল্পনার কয়েকটি বৈশিষ্ট্যও লক্ষ্য করতে হবে, ফলাফলের ক্ষেত্রে এটা গুরুত্বপূর্ণ।

যুক্ত নির্বাচন কেন্দ্র একটি সাধারণ নির্বাচকমণ্ডলী। কিন্তু তার জন্য এটা ভাবা যাবে না যে, এই কেন্দ্র সাধারণ ভোটারদের নিয়ে গঠিত। আগেই বলা হয়েছে, মুসলমান, খ্রিস্টান, ইঙ্গ-ভারতীয়, এবং ইউরোপীয়দের আলাদা নির্বাচন কেন্দ্র দেওয়া

হয়েছে এবং পরে মুসলমান, ভারতীয় খ্রিস্টান, অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান ও ইউরোপীয় ভোটারদের যুক্ত নির্বাচন কেন্দ্র থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। এর ফলে যুক্ত নির্বাচকমন্ডলী এমন একটি কেন্দ্র হয়েছে যেখানে অন্তর্ভুক্ত ভোটার হচ্ছে তফসিলি জাতি, হিন্দু, পারসি ও ইহুদিরা। যেহেতু পারসি ও ইহুদিরা বোম্বাই ছাড়া অন্যত্র নগণ্য, যুক্ত নির্বাচন কেন্দ্র হিন্দু ও তফসিলদের নিয়ে গঠিত।

অন্ত্যজদের সংরক্ষণের জন্য সাধারণ নির্বাচন কেন্দ্র যদিও দুই সদস্যযুক্ত কেন্দ্র থেকে বড় হতে পারে এবং যদিও একটা সাধারণ নির্বাচন কেন্দ্রে একাধিক আসন সংরক্ষিত থাকতে পারে, সব প্রদেশেই সাধারণ নীতি ছিল দুই সদস্য বিশিষ্ট সাধারণ নির্বাচন কেন্দ্র ঠিক করা এবং একটা আসন হিন্দুদের জন্য ও একটা আসন তফসিলদের জন্য সংরক্ষিত করা। শুধুমাত্র বাংলায় তিনটি কেন্দ্র রয়েছে যেখানে দুটি আসন তফসিলি জাতির জন্য সংরক্ষিত। কাজেই যুক্ত নির্বাচন কেন্দ্র আদতে একটি সংযুক্ত কেন্দ্র। এই যুক্ত কেন্দ্রের দুটি বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয় : (১) যুক্ত নির্বাচন কেন্দ্রে সর্বত্রই হিন্দুরা বিপুলভাবে না হলেও মোটামুটি সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং তফসিলিরা অসহায়ভাবে না হলেও সর্বত্রই সংখ্যালঘু, (২) তফসিলিদের জন্য সংরক্ষিত আসনে হিন্দুরা তফসিল প্রার্থীকে ভোট দিতে পারে এবং তফসিলি জাতের ভোটার হিন্দু আসনের জন্য হিন্দু প্রার্থীকে ভোট দিতে পারে।

এই ব্যবস্থা কী কী সম্ভাব্য ঘটনা হতে পারে? তফসিলিরা কি তফসিলিদের জন্য সংরক্ষিত আসনে তফসিলিকে নির্বাচিত করতে পারবে অথবা হিন্দুরা কি তাদের যন্ত্রবৎ তফসিলি প্রার্থীকে (যার প্রতি তফসিলিদের আস্থা নেই) নির্বাচিত করতে পারবে? সম্ভাবনাগুলি দুটি বিষয়ের ওপর নির্ধারিত হবে : (১) হিন্দুদের জন্য সংরক্ষিত আসনের সংখ্যা দ্বারা এবং (২) হিন্দুদের মধ্যে চালু রাজনৈতিক সংস্থার চরিত্রের দ্বারা। হিন্দুদের জন্য যদি একটা সংরক্ষিত আসন থাকে এবং হিন্দুরা সেই আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা এড়াবার মতো সুসংগঠিত এবং ভোট বিভাজন রোধ করতে পারলে তবে নিশ্চিতভাবে হিন্দুদের মনোনীত তফসিলি প্রার্থী জিতবেন। কারণ হচ্ছে, হিন্দুদের ভোটশক্তি বেশি থাকায় উদ্বৃত্ত ভোট হিন্দুদের প্রার্থীর পক্ষে অপ্রয়োজনীয়, এই উদ্বৃত্ত ভোট দিয়ে তাদের মনোনীত তফসিলি প্রার্থীকে সংরক্ষিত তফসিলি কেন্দ্র থেকেই জেতাতে পারবে। যুক্ত নির্বাচন কেন্দ্র এবং সংরক্ষিত আসনের ব্যবস্থা কার্যত দুই সদস্য বিশিষ্ট কেন্দ্র। কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন হিন্দুরা এত সংগঠিত যে, ভোটে প্রতিদ্বন্দ্বিতার অবকাশ ও ভোট নষ্টের সুযোগ নেই। এর ফলে এই ব্যবস্থায় সংরক্ষিত আসনে হিন্দুদের জয়ে সহায়ক এবং তফসিলিদের বিরুদ্ধে কার্যকরী। এক্ষেত্রে

হিন্দুদের সুবিধা হল, যুক্ত কেন্দ্রে তফসিলিদের সংরক্ষিত আসনে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটার তফসিলি হতে হবে এমন নয়।

কংগ্রেস কীভাবে এই যুক্ত নির্বাচন কেন্দ্র ব্যবস্থার দুর্বলতা ১৯৩৭-এর নির্বাচনে কাজে লাগিয়েছে, পরে সে বিষয়ে আলোচনা করব। এখন আমি শুধু তফসিলি জাতের প্রতিনিধিত্ব দানের নির্বাচনী পরিকল্পনা কীভাবে করা হয়েছিল এবং এর গলদ কোথায় তার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করব।

III

এখন নির্বাচনী ফলাফল পরীক্ষা করা যাক। একটা সরল প্রশ্ন দিয়ে শুরু করা যায় : ১৯৩৭-এর নির্বাচন প্রমাণ করেছে যে, কংগ্রেস অন্ত্যজদের প্রতিনিধিত্ব করে, একথা বলে কংগ্রেসিরা কী বুঝাতে চাইছেন? এর একটা ব্যাখ্যা দরকার, কারণ স্পষ্টত এই প্রশ্নের দুটি অর্থ হতে পারে। এক অর্থ, কংগ্রেসের টিকিটে যেসব অন্ত্যজ প্রার্থী তফসিলি সংরক্ষিত আসনে দাঁড়িয়েছিলেন, তাঁরা কংগ্রেস ছাড়া অন্যদের পক্ষের অন্ত্যজ প্রার্থীর বিরুদ্ধে নির্বাচিত। এর অর্থ এটাও হতে পারে যে, অন্ত্যজদের ভোট অন্য তফসিলি প্রার্থীদের চেয়ে কংগ্রেস মনোনীত তফসিলি প্রার্থীই বেশি পেয়েছেন। আমি ফলাফলটা দু'দিক থেকেই পর্যালোচনা করতে চাই।

আসনসংখ্যার ভিত্তিতে নির্বাচনে ফল আগেই দেওয়া হয়েছে। ওইসব সংখ্যা আবার দেওয়ার দরকার নেই। এতে দেখা গেছে ১৫১ আসনের মধ্যে কংগ্রেস ৭৮টি পেয়েছে। কেউ বলতে পারবে না যে, কংগ্রেস ও অন্ত্যজদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার এই ফল অন্ত্যজদের প্রতিনিধিত্ব করার কংগ্রেস দাবি প্রমাণ করেছে। কংগ্রেস ৭৮টি আসন পেয়েছে, অন্ত্যজরাও পেয়েছে ৭৮। একেবারে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই।

কংগ্রেসের তফসিলি প্রার্থীর সমর্থনে প্রাপ্ত ভোটের নিরিখে অন্ত্যজদের প্রতিনিধিত্ব করার কংগ্রেস দাবি পর্যালোচনা করা যাক। ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে মোট ১,৫৮৬,৪৫৬ অন্ত্যজ ভোট পড়েছে। পরের পৃষ্ঠার সারণিতে এই ভোটের বন্টন, কংগ্রেসি অন্ত্যজ প্রার্থীর পক্ষে ভোটসংখ্যা এবং অ-কংগ্রেস অন্ত্যজ প্রার্থীর প্রাপ্ত ভোটসংখ্যা রয়েছে।

সারণি - ১০

প্রদেশ	অন্ত্যজদের প্রদত্ত ভোট		
	কংগ্রেসের পক্ষে	কংগ্রেসের বিপক্ষে	অন্ত্যজদের মোট প্রদত্ত ভোট
যুক্তপ্রদেশ	৫২,৬০৯	৭৯,৫৭১	১৩২,১৮০
মাদ্রাজ	১২৬,১৫২	১৯৫,৪৬৪	৩২১,৬১৬
বাংলা	৫৯,৬৪৬	৬২৪,৭৯৭	৬৮৪,৪৪৩
মধ্যপ্রদেশ	১৯,৫০৭	১১৫,৩৫৪	১৩৪,৮৬১
বোম্বাই	১২,৯৭১	১৫৮,০৭৬	১৭১,০৪৭
বিহার	৮,৬৫৪	২২,১৮৭	৩০,৮৪১
পঞ্জাব	শূন্য	৬৯,১২৬	৬৯,১২৬
অসম	৫,৩২০	২২,৪৩৭	২৭,০৫৭
ওড়িশা	৫,৮৭৮	৮,৭০৭	১৪,৫৮৫
মোট	২৯০,৭৯৭	১,২৯৫,৭১৯	১,৫৮৬,৪৫৬

এটা জানা কথা যে, কোনও দলের প্রাপ্ত আসনসংখ্যা প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যা অনুপাতে হয় না, অনেক সময়ে সংখ্যালঘিষ্ঠ ভোট পেয়ে আসনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা হয়। এটা বিশেষ করে এক কেন্দ্রের ভোট ব্যবস্থায় বেশি হয়, ভারতে এই প্রথাই চালু। দলের প্রকৃত শক্তি বিচার হয় প্রাপ্ত ভোটসংখ্যা দিয়ে। এই পরীক্ষা প্রয়োগ করলে দেখা যাবে কংগ্রেস মোট ১,৫৮৬,৪৫৬ ভোটের মধ্যে ২৯০,৭৯৭ ভোট পেয়েছে, অর্থাৎ ১৮%। ৮২% ভোট কংগ্রেসের বিরুদ্ধে গেছে। অন্ত্যজদের প্রতিনিধিত্ব করার কংগ্রেস দাবির বিরুদ্ধে এর চেয়ে বড় প্রমাণ কী হতে পারে? কংগ্রেসের লোকেরা এই ভোটের শক্তিকে মানদণ্ড স্বীকার করতে না পারে। আসন-সংখ্যার ভিত্তিতে তারা অবদমিত সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব দাবি করতে পারে। কোনও স্থিরমস্তিষ্ক ব্যক্তি ১৫১ আসনের মধ্যে ৭৮ আসনে জয় অর্থাৎ ৫টির সংখ্যা-

গরিষ্ঠতাকে বিরাট জয় বলবেন না। বাস্তবত, আসনের ভিত্তিতে কংগ্রেসের দাবি অর্থহীন। কারণ, ভোটের ফলাফল বিচার করলে দেখা যাবে, কংগ্রেস সংরক্ষিত আসনের সংখ্যাগরিষ্ঠতা দূরে থাক, তফসিলি সংরক্ষিত আসনের সংখ্যালঘু আসন পেয়েছে।

কংগ্রেসের লাভের দিক মিথ্যা না হয়ে প্রকৃত হতে হলে জেতা ৭৮ আসনের থেকেই নিম্নোক্ত অনুসিদ্ধান্ত করা যেতে পারে :

১) হিন্দুদের সাহায্যে কংগ্রেসের জেতা আসন। এগুলি অন্ত্যজদের ভোটে নির্ধারিত হওয়ার অবকাশ থাকলে কংগ্রেস হেরে যেত।

২) একক সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট পেয়ে নয়, অন্ত্যজদের বহু অ-কংগ্রেসি প্রার্থীর ভোট ভাগাভাগি হওয়ার জন্য কংগ্রেসের অন্ত্যজ প্রার্থীর জেতা আসন।

৩) যেসব আসনে অন্ত্যজরা নিজেদের ভোট সংরক্ষিত আসনে প্রার্থীদের দিলে নিজেদের শক্তিতে জিততে পারত এবং সাধারণ কেন্দ্রে বা অসংরক্ষিত কেন্দ্রে প্রার্থীদের ভোট না দিয়ে সংরক্ষিত আসনে ভোট দিলে তা হতে পারত।

আমি বুঝি না, কোনও সদিচ্ছাপরায়ণ ব্যক্তি এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপত্তি করতে পারেন কীভাবে। যে প্রার্থীর সংখ্যাগরিষ্ঠতা অন্ত্যজদের বাদ দিয়ে অন্যদের ভোটে অর্জিত, তিনি অন্ত্যজদের প্রতিনিধিত্ব দাবি করতে পারেন না, এবং যেহেতু তিনি অন্ত্যজ ও কংগ্রেসের প্রার্থী, সেহেতু কংগ্রেস তার সূত্রে অন্ত্যজদের প্রতিনিধিত্ব করার দাবি করতে পারে না। কোনও অন্ত্যজ প্রার্থীর সংখ্যাগরিষ্ঠতা বিরোধীদের ভোটভাগের জন্য হলে এবং ভাগ না হলে তিনি হারতেন। এই অবস্থায় তাঁকে অন্ত্যজদের প্রকৃত প্রতিনিধি গণ্য করা যায় না এবং অন্ত্যজ সম্প্রদায়ের লোক এবং কংগ্রেসের প্রার্থী হয়ে জিতলেই কংগ্রেস অন্ত্যজদের প্রতিনিধিত্ব দাবি করতে পারে না। অন্ত্যজদের জন্য সংরক্ষিত আসনে সংখ্যা গরিষ্ঠ ভোটার স্বকীয় ভূমিকা পালন না করলে সফল প্রার্থী শুধু সংরক্ষিত আসনে জেতার জন্য অন্ত্যজদের প্রতিনিধি গণ্য হতে পারেন না। কংগ্রেসের মোট জেতা আসন থেকে এই ধরনের অন্ত্যজ জয়ী প্রার্থীদের বাদ দিতে হবে। কংগ্রেস সেইসব সংরক্ষিত আসনে জয়ী বলে দাবি করতে পারে, যেখানে শুধু অন্ত্যজদের ভোটেই কংগ্রেস জিতেছে। বাকি সব আসন বাদ দিতে হবে। পরের পৃষ্ঠার সারণিতে তফসিলিদের জন্য সংরক্ষিত আসনের বিভাজন, কংগ্রেসের জেতা আসন ও তার পেছনকার কারণ দেওয়া হল :

সারণি - ১১

যে পরিস্থিতির দরুন কংগ্রেস জয়ী হয়, তার বিশ্লেষণ

প্রদেশ	কংগ্রেসের জেতা আসনসংখ্যা				
	হিন্দু ভোটে (১)	বিনা হিন্দু ভোটে (২)	তফসিলি ভোট ভাগ হওয়ার জন্য (৩)	তফসিলি কেন্দ্রে নির্বাচনে তফসি-লিদের অনাগ্রহ (৪)	মোট (৫)
যুক্ত প্রদেশ	৩	৬	৩	৪	১৬
মাদ্রাজ	৫	১৫	৪	২	২৬
বাংলা	—	৪	—	২	৬
মধ্যপ্রদেশ	১	৫	—	১	৭
বোম্বাই	১	১	১	১	৪
বিহার	১	৩	—	৭	১১
পঞ্জাব	—	—	—	—	—
অসম	১	২	—	১	৪
ওড়িশা	১	২	—	১	৪
মোট	১৩	৩৮	৮	১৯	৭৮

ভোটের ফলাফল বিশ্লেষণ করলে এই হচ্ছে ঘটনা। এ-সবই অকাট্য এবং মেনে নিতে হবে। ভোটের বিশ্লেষণে দেখা যাবে, অন্ত্যজদের প্রতিনিধিত্ব দূরে থাক, কংগ্রেসকে অন্ত্যজরা প্রত্যাখ্যান করেছে। আসনের ক্ষেত্রে কংগ্রেস ১৫১ টির মধ্যে ৩৮ টি পেয়েছে। হিসাবে দেখা যাচ্ছে, ৭৩ টি আসনে কংগ্রেস জিততে পারেনি। ১৩ টি জিতেছে হিন্দু ভোটে, কংগ্রেসের অন্ত্যজ প্রার্থীদের বিরুদ্ধে বহু অন্ত্যজ প্রার্থী থাকায় ভোটভাগে কংগ্রেস জিতেছে ৮ টি, এবং ১৯ টি জিতেছে তফসিলিরা তফসিলি কেন্দ্রে নির্বাচন সম্পর্কে উৎসাহী না হওয়ার বোকামির জন্য।

নিচের সারণিতে এই ধরনের ঘটনার বিশদ বিবরণ দেওয়া হল। তিনটি নামে ভাগ করা প্রদেশ অনুযায়ী এবং সূচি অনুযায়ী বিবরণ পরিশিষ্টে রয়েছে।

সারণি - ১২

প্রদেশ	তফসিলি কেন্দ্রসমূহের বিশ্লেষণ		
	হিন্দু ভোটে জেতা কংগ্রেস আসনের ক্রমসূচি	তফসিলি ভোট ভাগের জন্য কংগ্রেসের জেতা আসনের ক্রমসূচি	তফসিলিদের উৎসাহের অভাবের জন্য কংগ্রেসের জেতা আসনের ক্রমসূচি
যুক্তপ্রদেশ	১,৩,৪	৮,৯,১০	১১,১৩,১৪,১৮
মাদ্রাজ	১,২২,২৩,২৪,২৫	৮,১২,১৫,১৭	৪,২১
বাংলা	শূন্য	শূন্য	৬,৭
মধ্যপ্রদেশ	৬	শূন্য	১৫
বোম্বাই	১	১৪	৩
বিহার	১১	শূন্য	২,৬,৭,৮,৯,১০,১৩
পঞ্জাব	শূন্য	শূন্য	শূন্য
অসম	১	শূন্য	৪
ওড়িশা	৬	শূন্য	২

কাজেই অন্ত্যজদের প্রতিনিধিত্ব করার কংগ্রেস দাবি প্রথম থেকে শেষ অবধি মিথ্যা দাবি। নির্বাচনের ফলাফলের পরিপ্রেক্ষিতে এই অতিকাহিনীর ফানুস ফেটে গেছে।

* বিস্তারিত তথ্যের জন্য পরিশিষ্ট - II দ্রষ্টব্য।

নির্বাচনের ফল থেকে আরও অনেক আকর্ষক তথ্য জানা যায়, নিচে দুইটি সংক্ষিপ্ত তালিকা দেওয়া হল :

সারণি - ১৩

তফসিলি কেন্দ্রগুলির নির্বাচন

প্রদেশ	প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়েছে	প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়নি	মোট
যুক্ত প্রদেশ	১৫	৫	২০
মাদ্রাজ	২৬	৪	৩০
বাংলা	২৮	২	৩০
মধ্যপ্রদেশ	১৯	১	২০
বোম্বাই	১৪	১	১৫
বিহার	৬	৯	১৫
পঞ্জাব	৬	২	৮
অসম	৬	১	৭
ওড়িশা	৪	২	৬
মোট	১২৪	২৭	১৫১

সারণি - ১৪

	কংগ্রেসের জেতা তফসিলি আসন		
প্রদেশ	প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়	বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়	মোট
যুক্ত প্রদেশ	১৪	২	১৬
মাদ্রাজ	২৪	২	২৬
বাংলা	৬	শূন্য	৬
মধ্যপ্রদেশ	৬	১	৭
বোম্বাই	৩	১	৪
বিহার	৪	৭	১১
পঞ্জাব	শূন্য	শূন্য	শূন্য
অসম	৩	১	৪
ওড়িশা	৪	শূন্য	৪
মোট	৬৪	১৪	৭৮

সারণি ১৩-তে দেখা যাচ্ছে, সংরক্ষিত আসনে অন্ত্যজদের উৎসাহ প্রবল। ১৫১ আসনের মধ্যে ১২৪-তে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়েছে। অন্ত্যজদের যেহেতু কোনও রাজনৈতিক শিক্ষা বা চেতনা নেই, সেজন্য তাদের রাজনৈতিক অধিকার দেওয়া অর্থহীন, এই অভিযোগ খণ্ডন হয়েছে। ১৪ নম্বর সারণিতে দেখা যাচ্ছে, অন্ত্যজরা কংগ্রেসকে মিত্র হিসাবে দূরে থাক, এক নম্বর রাজনৈতিক শত্রুরূপে গণ্য করেছে। যেসব অন্ত্যজদের সংরক্ষিত আসনে কংগ্রেস প্রার্থী দিয়েছে, বেশিরভাগ আসনেই অন্ত্যজরা আত্মসমর্পণ না করে নিজেরা অ-কংগ্রেস দলের হয়ে প্রার্থী দিয়েছে। সংরক্ষিত আসনের খুব কম ক্ষেত্রেই কংগ্রেসকে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ছেড়েছে। কংগ্রেস তফসিলি ৭৮ টি কেন্দ্রে প্রার্থী দেয়, এর মধ্যে ৬৪ টিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়।

IV

১৯৩৭-এর ভোটে কংগ্রেস অন্ত্যজদের জয় করতে পারেনি, এটা কম বলা হয়। প্রকৃত অর্থে অন্ত্যজরা কংগ্রেসের বিরুদ্ধে বিজয়াভিযান চালিয়েছে। এটা স্বীকার করতে রাজি না হলে বুঝতে হবে তারা কংগ্রেসের বিরুদ্ধে লড়তে অন্ত্যজদের সমস্যা সম্বন্ধে অজ্ঞ বা অক্ষম। এইসব অসুবিধা খুব-ই বাস্তব ও কঠিন ছিল। এ সম্বন্ধে বিশদ বলা দরকার যাতে লোকে বুঝে কত সাহস ও দৃঢ়তার সঙ্গে অন্ত্যজরা লড়াই করে প্রমাণ করেছে যে, তারা কংগ্রেসের থেকে পৃথক ও স্বাধীন এবং কংগ্রেস তাদের প্রতিনিধিত্ব করে না।

এই সমস্যাগুলি দুইভাবে ভাগ করা যায় : (১) সাংগঠনিক এবং (২) নির্বাচন বিষয়ক।

প্রথম ক্ষেত্রে দুটি বিষয়ে উল্লেখ্য : প্রথম, কংগ্রেস ও অন্ত্যজদের হাতে সম্পদের তুলনামূলক হার। কংগ্রেস যে সবচেয়ে ধনী রাজনৈতিক দল তা উল্লেখের অপেক্ষা রাখে না। ১৯৩৭-এর নির্বাচনে কংগ্রেস কত টাকা ব্যয় করছে, তার হিসাব নেই। এ বিষয়ে তদন্ত করলে দেখা যাবে, প্রার্থীদের পক্ষে প্রচার, যানবাহন ও বিজ্ঞাপনে কংগ্রেস যে টাকা খরচ করেছে তা বিশাল। এইসব টাকা কংগ্রেস তাদের অন্ত্যজ প্রার্থীদের জন্য খরচ করেছে। কংগ্রেসের বিরুদ্ধে যেসব অন্ত্যজ প্রার্থী দাঁড়িয়েছিলেন, তাঁদের জন্য লক্ষ ভাগের এক ভাগও জোটেনি। কারও কারও জামানতের টাকা ধার করে জমা করতে হয়েছিল। বিজ্ঞাপন, প্রচার, গাড়ি ছাড়াই তাঁরা নির্বাচন লড়েন।

দ্বিতীয় হচ্ছে, কংগ্রেসের পক্ষে একটা দল-যন্ত্রের অস্তিত্ব, অন্ত্যজদের এটা ছিল না। দল সংগঠন-ই কংগ্রেসের আসল শক্তি এটা সবাই জানেন। দল-যন্ত্র তৈরির কৃতিত্ব শ্রী গান্ধীর। গত ২০ বছর ধরে এই যন্ত্র রয়েছে এবং এর হাতে যা টাকা আছে, তা দিয়ে কংগ্রেস দল-যন্ত্রের তেল যোগাচ্ছে, বোতাম টিপলেই এই যন্ত্র চালু করা যায়। এই বিশাল যন্ত্র দেশের প্রতিটি শহর ও গ্রামে বিস্তৃত। এমন কোনও এলাকা নেই যেখানে কংগ্রেসের এই যন্ত্র কাজে লাগাবার মতো মাধ্যম নেই। যেসব অন্ত্যজ কংগ্রেসের প্রার্থী ছিলেন, তাঁদের নির্বাচনের কাজ এই যন্ত্রই কাজ করেছে। কংগ্রেস বিরোধী অন্ত্যজ প্রার্থীদের সাহায্যের জন্য এইরকম দল সংগঠন ছিল না। পৃথক প্রতিনিধিত্বের পরিকল্পনা প্রথম ভারতীয় রাজনীতিতে চালু হয় ১৯৩৯ সালে। এই পরিকল্পনার সুবিধা শুধু মুসলমানদের দেওয়া হয়। ১৯২০ সালে সংবিধান

সারণি - ১৫

প্রদেশ	প্রতি ১০০ সাধারণ অর্থাৎ হিন্দু ভোটারদের অনুপাতে তফসিলি জাতের ভোটারের সংখ্যানুপাতে কেন্দ্রের সংখ্যা										
	১০ এবং কম	১১-১৫	১৬-২০	২১-২৫	২৬-৩০	৩১-৩৫	৩৬-৪০	৪১-৪৫	৪৬-৫০	৫০-র ওপর	মোট
যুক্তপ্রদেশ	শূন্য	৭	৩	৬	২	১	শূন্য	১	শূন্য	শূন্য	২০
মাদ্রাজ	শূন্য	৫	৬	১০	৩	৩	১	১	১	শূন্য	৩০
বাংলা	শূন্য	শূন্য	শূন্য	৩	১	৩	১	৩	শূন্য	১৪	২৫*
মধ্যপ্রদেশ	৫	৫	১	২	১	শূন্য	১	১	১	৩	২০
বিহার	৪	৫	২	২	২	শূন্য	শূন্য	শূন্য	শূন্য	শূন্য	১৫
পঞ্জাব	১	১	শূন্য	১	২	শূন্য	শূন্য	১	শূন্য	শূন্য	৮
ওড়িশা	২	শূন্য	শূন্য	২	শূন্য	২	শূন্য	শূন্য	শূন্য	শূন্য	৬
অসম	৩	১	শূন্য	শূন্য	শূন্য	শূন্য	শূন্য	১	শূন্য	২	৭
বোম্বাই	৫	৩	৬	১	শূন্য	শূন্য	শূন্য	শূন্য	শূন্য	শূন্য	১৫
মোট	২০	২৭	১৮	২৭	১১	৯	৩	৮	২	২১	১৪৬

* বাংলায় পাঁচটি কেন্দ্রে তফসিলিদের দুটো করে আসন সংরক্ষিত, ফলে তফসিলি জাতের জন্য মোট সংরক্ষিত আসন দাঁড়ায় ৩০।

আবার পরিশোধন করা হয়। সংশোধিত সংবিধানে এই সুযোগ অ-ব্রাহ্মণদের জন্যও দেওয়া হয়। অন্ত্যজরা আবার বাদ পড়ে যান। বিভিন্ন প্রাদেশিক আইনসভায় দুই বা তিন জন মনোনীত সদস্য বা দু'টো আসন দিয়ে তাঁদের সান্ত্বনা দেওয়া হয়। ১৯৩৫ সালেই প্রথম তাঁরা ভোটাধিকার ও প্রতিনিধিত্ব পান। এটা স্পষ্ট, ভোটাধিকার না থাকায় অন্ত্যজরা নিজেদের দল-যন্ত্র গঠনে তৎপরতা বোধ করেনি যেহেতু কোনও নির্বাচনে লড়াইয়ের প্রশ্ন ছিল না। ১৯৩৭-এ যখন হঠাৎ তাদের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সুযোগ দেওয়া হল, তখন নিজেদের সংগঠিত করে দল সংগঠন তৈরির সময় অন্ত্যজদের হাতে ছিল না। কংগ্রেস এবং অন্ত্যজদের মধ্যে লড়াই কার্যত একটা সৈন্যবাহিনী ও বিক্ষিপ্ত জনতার মধ্যে যুদ্ধ ছিল।

অন্ত্যজদের পক্ষে নির্বাচনী বাধা-বিপত্তি ছিল অনেক। প্রথম নির্বাচনী অসুবিধা আসে সাধারণ কেন্দ্রে অন্ত্যজদের জন্য সংরক্ষিত আসনে হিন্দু ও অন্ত্যজদের অসম ভোটশক্তি। এই দুইয়ের আপেক্ষিক শক্তি ১৫নং সারণিতে দেখানো হয়েছে।

এই সারণিতে দেখা যাচ্ছে, কীভাবে সাধারণ কেন্দ্রে তফসিল ভোটাররা হিন্দু ভোটারদের সংখ্যাধিক্যে কোণঠাসা হয়ে গেছে। হিন্দুদের অনুপাতে সংখ্যালঘু হয়ে যাওয়ার ওপর বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া দরকার। দেখা যাচ্ছে, ২০ টি কেন্দ্রে তফসিলি জাতের ভোটার অনুপাত হিন্দুদের তুলনায় ১০ : ১০০, ২৭ টি কেন্দ্রে ১১-১৫ : ১০০, ১৮ টি কেন্দ্রে ১৬-২০ : ১০০, ১১ টি কেন্দ্রে ২৬-৩০ : ১০০। এর থেকে বুঝা যায় হিন্দুদের সংখ্যাধিক্য কত বিরাট এবং কত ব্যাপক হারে হিন্দুরা তফসিলি ভোটারদের ওপর আধিপত্য করতে পারে। এক্ষেত্রে মনে রাখা দরকার, প্রতিটি তফসিলি কেন্দ্রই যুক্ত নির্বাচন কেন্দ্রের অন্তর্ভুক্ত, এখানে তফসিলি ও হিন্দু দুই দলের ভোটার-ই তফসিলি কেন্দ্রে ভোট দিতে পারে এবং তা দখল করার জন্য লড়তে পারে। এই খেলায় দুই পক্ষের ভোটার শক্তির বিপুল পার্থক্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। কারণ, এই ধরনের যুক্ত কেন্দ্রে সাফল্য নির্ভর করে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী গোষ্ঠীর ভোটার শক্তির ওপর।

দ্বিতীয় নির্বাচনী অসুবিধা হয় সাধারণ কেন্দ্রগুলির আসনসংখ্যায়। এইসব কেন্দ্রেই অন্ত্যজদের জন্য আসন সংরক্ষিত হয়।

নিচের সারণিতে বিভিন্ন প্রদেশে প্রচলিত ব্যবস্থার বিবরণ দেওয়া হল :

সারণি - ১৬

সাধারণ কেন্দ্রের শ্রেণীবিভাগ ও অন্ত্যজদের জন্য সংরক্ষিত আসন

প্রদেশ	অন্ত্যজদের জন্য সংরক্ষিত আসন	দুই আসন বিশিষ্ট কেন্দ্র	তিন আসন বিশিষ্ট কেন্দ্র	চার আসন বিশিষ্ট কেন্দ্র
মাদ্রাজ	৩০	৩০	শূন্য	শূন্য
বোম্বাই	১৫	শূন্য	৬	৯
বাংলা	৩০	২০	৫	শূন্য
যুক্তপ্রদেশ	২০	২০	শূন্য	শূন্য
পঞ্জাব	৮	৮	শূন্য	শূন্য
বিহার	১৫	১৫	শূন্য	শূন্য
মধ্যপ্রদেশ	২০	২০	শূন্য	শূন্য
অসম	৭	৬	১	শূন্য
ওড়িশা	৬	৬	শূন্য	শূন্য
মোট	১৫১	১২৫	১২	৯

এই সারণিতে দেখা যাচ্ছে, ১৫১ টি সাধারণ কেন্দ্র অন্ত্যজদের জন্য সংরক্ষিত ঘোষণা করতে হয়। এর ১২৫ টি দুই আসন বিশিষ্ট। তার মধ্যে একটি অন্ত্যজদের জন্য সংরক্ষিত, অন্যটি সাধারণ আসন। এটা হতেই পারে যে, এই দুই আসন বিশিষ্ট কেন্দ্র ব্যবস্থায় অন্ত্যজদের কী বিপদ হতে পারে তা অনেকে বুঝবেন না। কিন্তু বিপদ ভয়াবহ। এই বিপদ কত বাস্তব তা বুঝা যাবে হিন্দু ও অন্ত্যজদের তুলনামূলক ভোটসংখ্যা বিচার করলে। যেসব কেন্দ্র দুই বা তিন-চার আসন বিশিষ্ট, তার মধ্যে একটি আসন সংরক্ষিত, বাকি দুটি বা তিনটি সাধারণ সম্প্রদায়ের জন্য মুক্ত, সেক্ষেত্রে হিন্দুদের ভোটশক্তি খুব বিপজ্জনক নয়। কিন্তু দুই আসন যুক্ত

কেন্দ্রে হিন্দুদের জন্য একটি আসন থাকলে তার বিপদ বেশি। বেশি প্রার্থী নির্বাচিত করার সুযোগ থাকলে হিন্দুদের ভোটশক্তি ভাগ হয়ে যায়। কারণ সাধারণ কেন্দ্রের প্রার্থীদের জয়ী করতে তাদের ভোট কাজে লাগাতে হয় এবং এরপরে উদ্বৃত্ত ভোট থাকে না, কাজেই সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রের বাড়তি ভোট তফসিলি প্রার্থীর পক্ষে বিপজ্জনক হয় না। কিন্তু হিন্দুদের একজন প্রার্থী নির্বাচিত হওয়ার সুযোগ থাকলে তাদের ভোট ভাগ হওয়ার অবকাশ থাকে না। কংগ্রেসের মতো সংগঠিত দল-ব্যবস্থায়, এই সম্ভাবনা নেই-ই প্রায়। বাড়তি অব্যবহৃত, অপ্রয়োজনীয় ভোট তারা সহজেই তাদের মনোনীত তফসিলি প্রার্থীর পক্ষে এবং নিরপেক্ষ অন্ত্যজ প্রার্থীর বিরুদ্ধে প্রয়োগ করতে পারে। এই উদ্বৃত্ত ভোট দিয়ে হিন্দুরা কী ব্যাপক ধ্বংস সাধন করেছে তা নির্বাচনের ফলাফলেই প্রকট।

সাধারণ কেন্দ্রে ভোটদানের পদ্ধতি, আসনসংখ্যা এবং ভোটশক্তি বন্টনের ব্যবস্থা পর্যালোচনা করলে বুঝা যাবে, অন্ত্যজদের বোকা বানাবার জন্য এর চেয়ে ভাল নির্বাচনী ব্যবস্থা থাকতে পারে না। যে যুক্ত নির্বাচন কেন্দ্রে তফসিলি জাতকে জুড়ে দেওয়া হয়েছে, তা ১৮৩২ সালের ইংলন্ডের সংস্কার আইনের (Reform Act) আগের রোট্টন ব্যোরো ব্যবস্থার মতো। ওই ব্যবস্থায় প্রার্থীকে মনোনীত করতেন বরো নিয়ন্ত্রণকারী কর্তা। সদৃশ ভাবে, যুক্ত নির্বাচন কেন্দ্র ব্যবস্থায় নির্বাচিত তফসিলি প্রার্থী কার্যত হিন্দুদের মনোনীত প্রার্থী। সেজন্য শ্রী গান্ধী যুক্ত নির্বাচন কেন্দ্র ব্যবস্থার কট্টর সমর্থক।

মুসলিম লীগ-এর ক্রমবর্ধমান শক্তি সম্বন্ধে অনেক কথা শোনা যাচ্ছে। কিন্তু লীগ পৃথক নির্বাচন কেন্দ্রের আওতায় কত সুরক্ষিত, এটা কম লোকই বুঝেন। মুসলমানরা কংগ্রেসের বদমায়েশি ও বিপদ থেকে সুরক্ষিত। অন্ত্যজরা তা নয়। তারা কংগ্রেসের অর্থশক্তি, ভোট ও কংগ্রেসি প্রচারের আক্রমণের শিকার। অন্ত্যজরা কোনও দল-যন্ত্র ছাড়া, নামমাত্র সম্পদ দিয়ে এবং যাবতীয় নির্বাচনী অসুবিধা সত্ত্বেও নিজেদের স্বাধীন অস্তিত্ব বজায় যে রাখতে পেরেছে, তাতেই কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তাদের জয় প্রমাণ করেছে।

অধ্যায় ৭

একটি মিথ্যা অভিযোগ
অস্পৃশ্যরা কি ব্রিটিশের সহায়?

I

আগেই বলেছি, শ্রী গান্ধীর আনুকূল্যে আসার পর থেকে কংগ্রেসের একটা রূপান্তর ঘটেছে। এর মধ্যে একটি রূপান্তর উল্লেখ্য। কারণ এর জন্যই কংগ্রেস বিখ্যাত এবং সাধারণ মানুষের মন অধিকার করে বসে। গান্ধীর আগে কংগ্রেস বছরে একবার ভারতের বিভিন্ন স্থানে সম্মেলনে কিছু প্রস্তাব গ্রহণ, অনেক ক্ষেত্রে এক-ই প্রস্তাবে ব্রিটিশ প্রশাসনের দুর্বলতা তুলে ধরত। ১৯১৯ সালে গান্ধী কংগ্রেসের হাল ধরার পর এই দল সক্রিয় হয় এবং কংগ্রেসিরা যেটা বলেন—কংগ্রেস আন্দোলন করে দাবি আদায় করত, যেটা আগে ভাবা যেত না। আন্দোলন-এর যে অস্ত্র বিভিন্ন সময়ে কংগ্রেসের হাতিয়ার হয় তার অন্যতম হল : (১) অসহযোগ, (২) বর্জন বা বয়কট, (৩) আইন অমান্য এবং (৪) অনশন সত্যাগ্রহ। অসহযোগের লক্ষ্য ছিল সরকারি স্কুল, কলেজ, আদালত, প্রশাসনকে অস্বীকার করে সরকারকে অকেজো করে দেওয়া এবং সরকারি দফতরে যোগ না দিয়ে কাজকর্ম অসম্ভব করে তোলা। বর্জন বা বয়কট এমন এক হাতিয়ার যার উদ্দেশ্য কংগ্রেসের নির্দেশ অনুসরণে অধিকৃত ব্যক্তিদের হুকুম মানতে বাধ্য করা। এর দুটি ফলা—অর্থনৈতিক বা সামাজিক। সামাজিক হাতিয়ার দিয়ে যাবতীয় সামাজিক পরিষেবা—ধোপা, নাপিত, মুদির দোকান, ব্যবসায়ীর পরিষেবা বন্ধ করা, অর্থাৎ দোষী ব্যক্তির জীবনযাপন অসম্ভব করে তোলা। অর্থনৈতিক বর্জন দিয়ে ব্যবসায়িক অর্থাৎ কেনাবেচা বন্ধ করা হয়। এর লক্ষ্য ছিল বিদেশি পণ্য বিক্রিকারী বণিক শ্রেণী। আইন অমান্যের উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশ সরকারকে সরাসরি আঘাত করা। ইচ্ছে করে আইন ভঙ্গ করে কারাবরণ। জেল ভর্তি করে সরকারকে হেনস্থা করা। গণ-সত্যাগ্রহ বা ব্যক্তিগত ভাবে আইন অমান্য করে এটা কার্যকরী হত। দুর্ভাগ্যবশত, গণ-অনশন-এর পথ কংগ্রেসিরা নেননি। অনশন ব্যক্তিগত স্তরেই অনুসৃত হয়েছে। দুর্ভাগ্যবশত, আমরণ অনশনও কংগ্রেসিরা

করেননি। একটা সময়সীমা ধরে অনশন করা হয়েছে। এই অস্ত্র শ্রী গান্ধীর নিজের ব্যবহারের জন্য রাখা হয়েছিল। তিনিও একটা সময়সীমার জন্য এটা ব্যবহার করতেন। এই চারটি অস্ত্র দিয়ে কংগ্রেস স্বাধীনতার দাবি আদায়ে তৎপর হয়।

এইসব দিয়ে কংগ্রেস আন্দোলনকে ব্যবহারিক রূপ দেয়। ১৯২০ ও ১৯৪২ সময়কালের মধ্যে, দেশবাসী কংগ্রেসের এইসব আন্দোলনের রূপ প্রত্যক্ষ করে। কংগ্রেস সৃষ্ট হাঙ্গামায় পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয় এবং জনতা কংগ্রেসের এইসব কাজের দর্শক হয়। এইসব কার্যকলাপকে 'স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ' বলে অভিহিত করা হয়। এইসব বিক্ষোভের উপযোগিতা কী, তা বিচার করা দরকার। কিন্তু এই স্থান তার উপযুক্ত নয়। এই পর্যালোচনায় সন্তুষ্ট থাকা যায় যে, পুরানো কংগ্রেস এর চেয়ে খারাপ কিছু করত না। আইন অমান্যের ব্যবহার অত্যন্ত মর্মান্তিক হয়েছে। স্বরাজের দাবি যেভাবে রয়েছে, কিন্তু আইন অমান্যের যদৃচ্ছা ব্যবহার দেশভাগকে সুনিশ্চিত, অদম্য ও অনিবার্য করে তুলেছে। আইন আমান্যের থেকে লাভ কী হয়েছে তা আলোচনা করা সম্ভব নয়, তবে 'স্বাধীনতার যুদ্ধ' মূলত হিন্দুদের দ্বারাই পরিচালিত হয়েছে এটা উল্লেখ করা আবশ্যক। একবার মাত্র মুসলমানরা এতে যোগ দিয়েছে, স্বল্পস্থায়ী খিলাফত আন্দোলনের সময়ে। শীঘ্রই তারা এর থেকে সরে যায়। অন্যান্য সম্প্রদায়, বিশেষ করে অন্ত্যজরা এতে কখনও যোগ দেয়নি। কিছু ব্যক্তি নিজেদের স্বার্থে হয়তো যোগ দিয়েছেন। কিন্তু সম্প্রদায়গত ভাবে তারা এর বাইরে ছিল! এটা বিশেষ করে পরিলক্ষিত হয় ১৯৪২-এর আগস্টে 'ভারত ছাড়ো' প্রস্তাব গ্রহণের পর 'স্বাধীনতার যুদ্ধে'।

ভারতে আগত বিদেশির কাছে বিশেষ করে এটা লক্ষণীয় ছিল যে, কীভাবে জনসংখ্যার অর্ধাংশে 'স্বাধীনতার যুদ্ধে' কংগ্রেসের সঙ্গে অসহযোগ করেছে। স্বাভাবিকভাবে তারা এই ঘটনায় হতবুদ্ধি হয়ে পড়েন। জিজ্ঞেস করবেন, মুসলমান, খ্রিস্টান ও অন্ত্যজরা স্বাধীনতার যুদ্ধে অংশ নিল না কেন? যুদ্ধকালে আসা বহু বিদেশির মনে এই কথার প্রতিধ্বনি শোনা গেছে এবং তাঁরা কংগ্রেসের কাছে এর ব্যাখ্যা চেয়েছেন। কংগ্রেসের একটা উত্তর-ই আছে। অন্ত্যজরা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সাধনযন্ত্রবৎ, সেজন্যই তারা স্বাধীনতার যুদ্ধে যোগ দেয়নি। সবচেয়ে মুশকিল হচ্ছে, বেশিরভাগ বিদেশিই এই অভিযোগ সত্য বলে মনে করেছেন। এই যুক্তির সহজ, ন্যায়সঙ্গত চরিত্রের জন্য এই মত গ্রহণযোগ্য হয়েছে বিদেশিদের কাছে। দুটি উদ্দেশ্য পূরণ হয়েছে। কংগ্রেস এক বিচিত্র ঘটনার কারণ ও ব্যাখ্যা দিতে পেরেছে, পরিস্থিতি একে ন্যায়সঙ্গত প্রতিপন্ন করেছে।

প্রভাবশালী বিদেশিরাও এই ধারণায় আকৃষ্ট না হলে এই অভিযোগকে বিদ্বেষ-প্রসূত প্রচার বলে নস্যাৎ করা যেত। স্বাধীনতার যুদ্ধে অন্ত্যজদের অংশ না নেওয়ার বিষয়ে কংগ্রেস যে ব্যাখ্যা দিয়েছে তা অবাস্তব। এই ব্যাখ্যা কেবল শঠ ব্যক্তি দিতে পারে এবং মূর্খ ছাড়া কেউ তা স্বীকার করবে না। কিন্তু এটা নিশ্চিত, যে পরিস্থিতি আসছে তাতে ভারতের সমস্যা সম্বন্ধে বিদেশি মত কিছুদিন স্থায়ী হবে। আমি প্রকৃত পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন বোধ করি এবং তাদের মধ্যে অন্ত্যজদের সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণার অবকাশ রাখতে চাই না। বিশেষ করে যখন অন্ত্যজদের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ মিথ্যা প্রতিপন্ন করা সহজ এবং সহজে দেখানো যায় যে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সমর্থক বলে স্বাধীনতার যুদ্ধে অন্ত্যজরা অংশ নেয়নি এই অভিযোগ মিথ্যা, বরং তাদের আশঙ্কা ভারতের স্বাধীনতা এলে হিন্দুদের আধিপত্য কায়েম হবে। তাতে তাদের সামনে থেকে যাবতীয় সুযোগ, স্বাধীনতা, সুখ, জীবনের উন্নতির পথ রুদ্ধ হবে এবং তারা শ্রমদাসে পর্যবসিত হবে। এই আশঙ্কায়-ই তারা স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশ নেয়নি। স্বাধীনতা যুদ্ধে কংগ্রেসের সঙ্গে যোগ দিতে অন্ত্যজদের অস্বীকৃতি প্রমাণ করেছে, কংগ্রেসের সঙ্গে অসহযোগের কারণ তুচ্ছ নয়। এটা বাস্তব এবং দৃঢ়প্রতিষ্ঠ ছিল। সেটা কি অন্ত্যজরা কংগ্রেসের সঙ্গে অসহযোগিতার যে কারণ অভিব্যক্ত করেছে তার সারমর্ম হল, তারা চায় না হিন্দুরাজ-এর অধীন হতে। এই রাজ-এ ব্রাহ্মণ ও বেনিয়ারা শাসক শ্রেণী হবে এবং তাদের পুলিশ হবে নিম্ন শ্রেণীর হিন্দু, এরা সবাই অন্ত্যজদের জাতশত্রু। এই ভাষা সুরুচিসম্পন্ন নয় বলে অভিযোগ হতে পারে। কিন্তু এটা যেন মনে করা না হয় যে, এই ধরনের প্রচারের সুর আক্রমণাত্মক বলে তার অর্থ নেই, বা যে ভাবধারা ও দৃষ্টিভঙ্গির এটা অভিব্যক্তি তার বাধ্যবাধকতা শক্তি নেই, বা তা কোনও বাস্তব মর্যাদাসম্পন্ন রাজনৈতিক দর্শনের রূপ পেতে পারে না।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পরিভাষায় এইসব প্রচারের অর্থ কী? এর অর্থ, অন্ত্যজরা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ থেকে স্বাধীন হওয়ার বিরোধী নয়। কিন্তু শুধু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ থেকে স্বাধীন হয়েই সন্তুষ্ট থাকার পক্ষপাতী নয়। তাদের বক্তব্য, স্বাধীন ভারত-ই যথেষ্ট নয়। স্বাধীন ভারতকে গণতন্ত্রের জন্য সুরক্ষিত করতে হবে। এই লক্ষ্য সামনে রেখে তাঁরা বলেন, ভারতের বিচিত্র সামাজিক গঠনের জন্য বহু সংখ্যালঘু গোষ্ঠী হিন্দু সাম্প্রদায়িক সংখ্যাগরিষ্ঠের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে রত, এবং হিন্দু সাম্প্রদায়িক সংখ্যা গরিষ্ঠের থাবা থেকে মুক্ত করার জন্য কোনও সাংবিধানিক ব্যবস্থা গৃহীত না হলে ভারতে গণতন্ত্র নিরাপদ হবে না। সেজন্য অন্ত্যজরা এমন সংবিধান চায় যেখানে ভারতের বিশেষ পরিস্থিতি বিবেচনা করে কিছু রক্ষাকবচের ব্যবস্থা থাকবে। এই

রক্ষাকবচ ভারতীয় সমাজ অন্ত্যজদের নিপীড়ণ ও অত্যাচার করা থেকে হিন্দু সাম্প্রদায়িকদের নিবৃত্ত করবে এবং অন্ত্যজদের হাতে রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্পণ করবে, যার সূত্রে তারা সাম্প্রদায়িক সংখ্যাগুরুদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারে। এক কথায় বলা যায়, অন্ত্যজরা যেটা চায় তা হল, সংবিধানেই এমন রক্ষাকবচ থাকবে যাতে হিন্দু সাম্প্রদায়িক সংখ্যাগুরুর স্বৈরাচার উদ্ভূত না হয়।

অন্যদিকে, কংগ্রেস ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ থেকে স্বাধীন ভারতীয় জাতীয়তাবাদের হওয়াকে লক্ষ্য ও পাথেয়সর্বস্ব করতে চায়। স্বাধীন ভারতের মানুষের কল্যাণের জন্য আর কিছু কংগ্রেস ভাবে না। স্বাধীন ভারতের সংবিধান প্রশ্নে কংগ্রেস কোনও সমস্যা বলে মনে করে না। স্বাধীন ভারতে সংবিধান কী হবে? এই প্রশ্নে কংগ্রেস বলে, সেটা গণতন্ত্র হবে। কোন্ ধরনের গণতন্ত্র হবে? কংগ্রেসের উত্তর, এর ভিত্তি হবে সর্বজননীন ভোটাধিকার। হিন্দু সাম্প্রদায়িক সংখ্যাগরিষ্ঠের স্বৈরাচার নিবৃত্ত করতে সর্বজনীন ভোটাধিকার ছাড়া আর কোনও রক্ষাকবচ থাকবে? কংগ্রেসের উত্তর নেতিবাচক। এই রক্ষাকবচের বিরোধিতা কেন? এই প্রশ্নে কংগ্রেস বলে, এতে জাতি বিভক্ত হবে—এই যুক্তির চিত্রকল্প দিয়ে এর মূর্খতা ঢাকা দেওয়া হয়, এবং এর উৎস শ্রী গান্ধীর প্রতিভা। উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুরা এই রক্ষাকবচে ক্ষতিগ্রস্ত হবে বলে তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ।

অন্ত্যজরা এই ছেঁদো যুক্তিবাদ স্বীকার করতে রাজি নন। তাঁরা বলেন, ভারতীয় সমাজ-জীবন বুঝতে হবে সম্প্রদায়ের নিরিখে। এর থেকে নিস্তার নেই। সম্প্রদায়-সমূহ ভারতীয় সমাজ-জীবনের এত বাস্তব যে, সাম্প্রদায়িক আবেগ ও সাম্প্রদায়িক কুসংস্কার বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্পর্কে মুখ্য ভূমিকা নেয়, এটা অস্বীকার করা ভুল। হিন্দু সাম্প্রদায়িক সংখ্যাগুরুর সামাজিক মানসিকতা এমন এক তত্ত্ব স্বীকার করে, যাতে শুধু অসাম্যই নয় স্তরবিন্যস্ত অসাম্যের ভিত্তিতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সম্পর্ক নির্ধারিত। এই স্তরবিন্যস্ত অসাম্যের তত্ত্ব স্বাধীনতা ও সৌভ্রাতৃত্বের পক্ষে অন্তরায়। এই অসাম্য উবে যাবে, বা হিন্দুরা এর অবসান করবে, এটা বিশ্বাস করা যায় না। এটা অসম্ভব ব্যাপার। এই স্তরবিন্যস্ত অসাম্য ঘটনাক্রমে বা দুর্ঘটনাজনিত নয়। এটা হিন্দুদের ধর্ম। এটা হিন্দু ধর্মের সরকারি তত্ত্ব। এটা পবিত্রও কোনও হিন্দু এটা ছাড়তে পারে না। কাজেই স্তরবিন্যস্ত অসাম্যের তত্ত্ব হিন্দু সাম্প্রদায়িক সংখ্যা গরিষ্ঠে কোনও ক্ষণস্থায়ী পর্ব নয়। এটা স্থায়ী ব্যাপার এবং সব সময়ের জন্য ক্ষতিকারক। ভারতের সংবিধান রচনাকালে এই স্থায়ী সাম্প্রদায়িক সংখ্যাগরিষ্ঠদের অস্তিত্বের কথা ভুললে চলবে না, এবং রাজনৈতিক গণতন্ত্রের সঙ্গে এই সমস্যার বিরুদ্ধে রক্ষাকবচের বিষয়টি যুক্ত করতে হবে। অন্ত্যজদের এটাই যুক্তি।

অন্ত্যজরা যেসব সাংবিধানিক রক্ষাকবচ দাবি করছে তা বিশদভাবে অখিল সর্বভারতীয় তফসিলি জাতিসঙ্ঘের ওয়ার্কিং কমিটির গৃহীত প্রস্তাবে রয়েছে এবং পরিশিষ্টে তা দেওয়া হল। যুক্তির খাতিরে আমি এর মধ্যে তিনটির কথা তুলে ধরছি : (i) আইনসভায় ন্যূনতম প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা ; (ii) শাসনকার্যে ন্যূনতম প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা ; (iii) জন-কৃত্যকে ন্যূনতম প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা।

কংগ্রেস এই দাবিগুলিকে সাম্প্রদায়িকতা বলে ঠাট্টা করে এবং অন্ত্যজদের নেতাদের চাকরিলোভী বলে চিহ্নিত করে। কংগ্রেস এইসব সুরক্ষার বিরোধিতা করে জাতীয়তাবাদের উচ্চাসন থেকে, কংগ্রেস জাতীয়তাবাদের দূত হিসাবে জাহির করে। বিদেশিরা রক্ষাকবচের বিরুদ্ধে কংগ্রেসের যুক্তির অবাস্তবতা বুঝতে অসুবিধা বোধ করতে পারেন। কিন্তু এইসব রক্ষাকবচের উদ্দেশ্য যদি তিনি বিচার করেন, দেখবেন এই প্রয়াসকে সাম্প্রদায়িকতা চিহ্নিত করার কংগ্রেসি প্রয়াস অর্থহীন।

এইসব রক্ষাকবচের উদ্দেশ্য আইনসভা, প্রশাসন অন্ত্যজদের প্রতিনিধি দিয়ে পূর্ণ করা নয়। আসলে রক্ষাকবচগুলি হিন্দু সাম্প্রদায়িক সংখ্যাগরিষ্ঠদের দুর্বহ চাপ প্রতিরোধ করার ভিত্তিভূমি। হিন্দু সাম্প্রদায়িক সংখ্যাগুরু নিয়ন্ত্রণে রাখাই এর উদ্দেশ্য। কারণ, অন্ত্যজদের জন্য এই রক্ষাকবচ না থাকলে হিন্দু সাম্প্রদায়িকরা আইনসভা, শাসনকার্য, প্রশাসন দখলই করবে না, প্রশাসন, শাসন পরিচালনা ও আইনসভা পদদলিত করবে, এবং রাষ্ট্রের এইসব শক্তিশালী হাতিয়ার সংখ্যালঘুদের রক্ষা করার পরিবর্তে হিন্দু সাম্প্রদায়িকদের অস্ত্র হয়ে দাঁড়াবে।

এই ব্যাখ্যার আলোকে দেখলে কোনও গড় বুদ্ধিসম্পন্ন বহিরাগতের আর বুঝতে অসুবিধা হবে না, কংগ্রেস ও অন্ত্যজদের সম্পর্ক কী। প্রথমত, বুঝতে হবে এদের সম্পর্ক সৃষ্টি হয়েছে, সাম্প্রদায়িক সংখ্যাগরিষ্ঠের উপস্থিতি যে রাজনৈতিক গণতন্ত্রের পক্ষে বিপদ তা কংগ্রেস কর্তৃক অস্বীকারে, এবং অন্ত্যজরা এর উল্টোটাই ধরে নিয়ে দাবি করেছে, সংবিধানে এই বিপদ রোধ করার ব্যবস্থা থাকা চাই। অর্থাৎ, অন্ত্যজরা ভারতকে গণতন্ত্রের পক্ষে নিরাপদ করতে ব্যগ্র আর কংগ্রেস গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে না হলেও গণতন্ত্রকে বাস্তব করার মতো পরিস্থিতি সৃষ্টির বিরোধী।

দ্বিতীয়ত, বিদেশিদেরকে দেখতে হবে যে, অন্ত্যজদের জন্য রক্ষাকবচের দাবি অভিনব নয়। তাঁদের বুঝার পরিসর সমৃদ্ধ হবে যদি তিনি এইসব রক্ষাকবচকে ভারসাম্য ও ক্ষমতার অপব্যবহার রোধের নামান্তর মাত্র দেখেন। এবং এমন কোনও সংবিধান নেই যেখানে রাজনৈতিক গণতন্ত্র রক্ষায় এই ভারসাম্য ও নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা থাকে না, এ প্রসঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সংবিধানে কীভাবে ভারসাম্য ও নিয়ন্ত্রণের

ব্যবস্থা মৌলিক অধিকার ও ক্ষমতার পৃথকীকরণের দ্বারা করা হয়েছে সেটা মনে রাখতে হবে। এটা করলে তিনি অন্ত্যজদের রক্ষাকবচের দাবি অন্যান্য দেশ থেকে ভিন্ন রূপ নিলেও সে সম্বন্ধে বিভ্রান্ত হবেন না। কারণ রক্ষাকবচের প্রকৃতি রাজনৈতিক গণতন্ত্রের পক্ষে ক্ষতিকর শক্তিসমূহের চরিত্র থেকে পৃথক এবং ভারতে এইসব শক্তির চরিত্র অন্য রকম হওয়ার জন্য রক্ষাকবচের রূপ ভিন্ন হতে হবে।

তৃতীয়ত, কোনও বিদেশির বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, কংগ্রেস-ই সাম্প্রদায়িক, অন্ত্যজরা নয়। এবং দার্শনিক যুক্তি যাই দেওয়া হোক, সাংবিধানিক রক্ষাকবচের বিরোধিতায় কংগ্রেসের আসল উদ্দেশ্য হল রাজনৈতিক ক্ষেত্রটিতে হিন্দু সংখ্যা-গরিষ্ঠদের মুক্ত বিচরণ সম্ভব করা। তিনি বুঝতে পারবেন, কংগ্রেস প্রকাশ্যে না বললেও সাম্প্রদায়িক হওয়াই কংগ্রেসের পক্ষে স্বাভাবিক। কংগ্রেসের মেরুদণ্ড হিন্দু সাম্প্রদায়িক সংখ্যাগরিষ্ঠরা। হিন্দুদের সমন্বয়ে এবং হিন্দুদের পৃষ্ঠপোষকতায় কংগ্রেস বেঁচে আছে। এই সংখ্যাগরিষ্ঠই কংগ্রেসের মক্কেল এবং সেজন্য এদের স্বার্থরক্ষায় কংগ্রেস বাধ্য। তিনি এটা বুঝলে আর জাতীয়তাবাদের নামেই বিরোধিতার কংগ্রেস যুক্তিতে তিনি বোকা বনবেন না। অন্যদিকে তিনি বুঝবেন যে, কট্টর সাম্প্রদায়িকতার মুক্ত ক্ষেত্র করার জন্য জাতীয়তাবাদকে খোলস হিসাবে ব্যবহার করে কংগ্রেস সারা পৃথিবীকে বোকা বানাচ্ছে।

সবশেষে, তিনি জানবেন কেন কংগ্রেসের প্রতিনিধিত্বমূলক চরিত্র ভারতের রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। স্বাধীন ভারতের সংবিধান কী হবে, সেটা বলে দেওয়ার মতো দম্ভ প্রকাশের জন্য কংগ্রেস তার প্রতিনিধিত্বমূলক চরিত্র জাহির করতে ব্যগ্র। কিন্তু পরিস্থিতি যা, তাতে দেশের নামে কংগ্রেসের কথা বলার অধিকার একটা মূল প্রশ্ন এবং যাঁরা এটা জানবেন না তাঁদের পক্ষে এর বিরুদ্ধে দাঁড়ানো ছাড়া বিকল্প নেই।

II

এসব সত্ত্বেও বিদেশিরা বলেন, 'স্বাধীনতার যুদ্ধে কংগ্রেসের সঙ্গে যোগ দিলে না কেন? কংগ্রেসের সঙ্গে সহযোগিতার জন্য সাংবিধানিক রক্ষাকবচ পূর্বশর্ত হিসাবে আরোপ করা কেন? যাই হোক, শেষে তো রক্ষাকবচ স্বাধীনতার পর হতে পারত।' যে বিদেশি কংগ্রেস ভাগের কারণ সম্বন্ধে আগের আলোচনা বুঝেছেন, তিনি বুঝবেন স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধে অন্ত্যজরা কেন কংগ্রেসের সহযোগী হয় নি। কিন্তু অনেকে হয়তো তা কল্পনা করতে অক্ষম এবং জানতে উৎসুক তাঁরা কী চান। বাজে যুক্তি

খুঁজে বার করার চেয়ে যথার্থ ব্যক্তির উপযুক্ত স্থান পাওয়ার জন্য তাদের ছেড়ে দেওয়া উচিত। এর নানা কারণ, শুধু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণগুলি নিচে দেওয়া হল :

প্রথম কারণটি সাধারণ জ্ঞানভিত্তিক। অন্ত্যজরা বলেন, কংগ্রেসের কাছে আগাম চুক্তির দাবি করায় অন্যায় কোথায়? কংগ্রেস আগাম রক্ষাকবচ দিলে ক্ষতি কী? এঁদের যুক্তি, কংগ্রেস আগে রক্ষাকবচের দাবি মেনে নিলে এর প্রভাব হবে দ্বিগুণ। প্রথম, হিন্দু সাম্প্রদায়িক সংখ্যাগরিষ্ঠের ভয়ে তটস্থ অন্ত্যজরা নিশ্চিন্ত হবে।

দ্বিতীয়, এই রক্ষাকবচ সূত্রে অন্ত্যজদের কংগ্রেসের সঙ্গে সহযোগিতার পথে অনেকদূর নিয়ে যাবে। অন্ত্যজরা অসহযোগী রয়েছে কেন? কারণ, এই স্বাধীনতা অর্জিত হলে হিন্দুরা আবার তাদের দাসত্বশৃঙ্খলে বাঁধবে। কাজেই এত কম মূল্যে এই আশঙ্কা নিরসন সম্ভব হলে তা না করার কী আছে?

দ্বিতীয় কারণ অভিজ্ঞতাভিত্তিক। অন্ত্যজরা বলেন, বিশ্বের অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, একবার স্বাধীনতার লড়াই শেষ হলে শক্তিশালীরা দুর্বলদের সুরক্ষা দানে সদয় হয়েছে, এমন দেখা যায় না।

এই বিশ্বাসঘাতকতার বহু দৃষ্টান্ত তুলে ধরা যায়। সবচেয়ে ভয়াবহ দৃষ্টান্ত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গৃহযুদ্ধের পর নিগ্রোদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা। গৃহযুদ্ধে নিগ্রোদের ভূমিকার কথা সম্বন্ধে হার্বার্ট আপটেকর [১] বলেন :

'দাস রাজ্যগুলির থেকে মোট ১.২৫ লক্ষ নিগ্রো প্রজাতান্ত্রিক বাহিনীর হয়ে লড়াই করেছে। উত্তরের ৮০ হাজারের সঙ্গে যুক্তভাবে তারা ৪৫০ টি যুদ্ধ লড়েছে অসমসাহসিক বীরত্ব সহকারে, ষড়যন্ত্র ও দাসত্বের অবসানে তাদের এই সাহস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে।'

'২ লক্ষের বেশি সশস্ত্র নিগ্রো এমন এক রাষ্ট্রের জন্য লড়াই করেছে, যে রাষ্ট্রের ভিত্তি এবং গৃহীত সিদ্ধান্ত হল নিগ্রোরা মানুষ হলেও নিকৃষ্ট এবং দাস হওয়ার উপযুক্ত।'

* * * * *

'এবং নিগ্রো সৈন্যরা লজ্জাজনক বৈষম্যের শিকার হওয়া সত্ত্বেও প্রজাতন্ত্রের জন্য লড়েছে। শ্বেতাঙ্গ সৈন্যরা মাসে ১৩ ডলার পেত। নিগ্রোরা পেত ৭ ডলার

১. 'দি নিগ্রো ইন দি সিভিল ওয়ার', পৃ: ৩৫-৪০

(জুলাই ১৪, ১৮৬৪ পর্যন্ত, পরে এটা সমান করা হয় ১ জানুয়ারি, ১৮৬৪ থেকে)। শ্বেতাঙ্গদের জন্য নিয়োগকালীন ভাতা ছিল, নিগ্রোদের জন্য ছিল না (জুন ১৫, ১৮৬৪ পর্যন্ত); নিগ্রোদের জন্য বিশেষিত আধিকারিক (Commissioned Officer) পদে ওঠার সুযোগ ছিল না... মিত্রসঙ্ঘ যেসব নিগ্রো সৈন্য দাস হিসাবে যুদ্ধবন্দী ছিল তাদের স্বীকার করেনি। অক্টোবর ১৮৬৪ অবধি অধিকৃত নিগ্রো সৈন্যদের 'মুক্ত' এই মর্যাদা দেয়নি। নিগ্রোদের হত্যা করা হয়েছিল, বা দাস হিসাবে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছিল, অথবা কঠোর পরিশ্রমে আটক করা হয়েছিল।'

* * * * *

'এই সহস্র সহস্র নির্যাতিত ও ক্রীতদাসকে সশস্ত্র করে পাঠানো হয় তাদের দেশে (যার প্রতিটি খাড়ি ও টিলা এদের নখদর্পণে) স্বকীয় অর্জিত স্বাধীনতা রক্ষার জন্য। তাদের মনুষ্যত্ব প্রমাণ ও সগোত্র মানুষদের মুক্তি, তাদের মা-বাবা, শিশু-স্ত্রীদের দাসত্ব থেকে মুক্ত করার জন্য ... এবং সবসময়ে এটা মনে রাখা দরকার যে, প্রজাতন্ত্র রক্ষার যুদ্ধে ৩৭,০০০ নিগ্রো সৈন্য রণক্ষেত্রে প্রাণ দেয়।'

গৃহযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর নিগ্রো সৈন্যদের অবস্থা কী হয়েছিল? বিজয়ের প্রথম উচ্ছ্বাসে, যে রিপাবলিকানরা প্রজাতন্ত্র রক্ষা ও জয়লাভের জন্য নিগ্রোদের সাহায্য নেয়, তারা সংবিধানের ১৯তম সংবিধান আনে। এতে আইনগত অর্থে নিগ্রোদের দাসত্ব শেষ হয়। কিন্তু নিগ্রোরা কি ভোটার বা আধিকারিক হিসাবে সরকারে অংশ গ্রহণের অধিকার পায়? দক্ষিণে নিগ্রোরা যাতে শ্বেতাঙ্গদের সঙ্গে রাজনৈতিক ভাবে সমান হিসাবে গৃহীত হয় তার জন্য রিপাবলিকানরা কিছু ব্যবস্থা নেয়। সংবিধানে চতুর্দশ সংশোধনী দিয়ে এটা করা হয়, এতে রাজ্য ও প্রজাতন্ত্র দুই স্তরেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জন্ম বা অঙ্গীকৃত নিগ্রোসহ সবার জন্য নাগরিকাধিকার দেওয়া হয়, এবং সেই আইনগত অধিকার অনুসারে কোনও রাজ্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকের সুযোগ বা অব্যাহতি খর্বে আইন করতে পারবে না, এবং কোনও রাজ্যের নাগরিকদের ভোটাধিকার বাদ দিয়ে কংগ্রেসে আনুপাতিক হারে সদস্য কমতে পারবে না। দক্ষিণের রাজ্যগুলি চতুর্দশ সংশোধন কার্যকরী করতে ইচ্ছুক ছিল না। টেনিসি ছাড়া সব রাজ্যই এই সংশোধন বাতিল করে এবং শ্বেতাঙ্গ অধিবাসীদের সরকার গঠন করে। তখন রিপাবলিকানরা তথাকথিত 'পুনর্নির্মাণ বিধেয়ক' (বিদ্রোহী রাজ্যগুলির জন্য দক্ষ সরকার করার জন্য একটি বিধেয়ক) দিয়ে রাজ্যগুলিকে বৈধ সরকার গঠন করে সেগুলিকে প্রজাতন্ত্রে পুনরায় নিয়ে আসার কাজ করে। শ্বেতাঙ্গদের সরকার

অবজ্ঞা করে এদের অন্তর্ভুক্তির পরিস্থিতি সৃষ্টি করা হয়। এই আইন দিয়ে টেনিসি ছাড়া দক্ষিণের বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া রাজ্যগুলিকে পাঁচটি সামরিক জেলায় ভাগ করে যুক্তরাষ্ট্রীয় সৈন্যবাহিনীর ব্রিগেডিয়ার জেনারেল-এর শাসনাধীনে আনা হয় যতদিন না—(১) রাজ্য সম্মেলনে নতুন সংবিধান রচিত না হয়, (২) চতুর্দশ সংশোধন গৃহীত না হয়, (৩) রাজ্যগুলি পুনরায় অন্তর্ভুক্ত না হয়। রিপাবলিকানরা আর একটি সংশোধনী, পঞ্চদশ সংশোধন পেশ করে, এতে জাতি, বর্ণ বা দাসত্বের পূর্বতম অবস্থা নির্বিশেষে নাগরিকদের ভোটাধিকার খর্ব বা হরণ নিষিদ্ধ করা হয়। এটি সংবিধানের অংশ হয়ে যায় এবং রাজ্যগুলির ওপর আবশ্যিক হয়।

দক্ষিণের শ্বেতাঙ্গরা নিগ্রোদের নাগরিকত্বের সমানাধিকার দিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। নিগ্রোদের ভোটাধিকার হরণ ক্ষিপ্রগতিতে চলে। দক্ষিণের রাজ্য সরকারগুলি এবং শ্বেতাঙ্গদের কাছে এটা ছিল পবিত্র দায়িত্ব। পঞ্চদশ সংশোধনীর পাপ কাটাবার জন্য রাজ্য সরকারগুলি জাতি বা বর্ণ ছাড়া অন্য অজুহাতে নিগ্রোদের ভোটাধিকার হরণের জন্য ভোটাধিকার আইন প্রণয়ন করে। 'পিতামহ খণ্ড'[১] (Grand Father Clause) চালু করে বেশিরভাগ নিগ্রোকে বাদ দেয়, এবং সব শ্বেতাঙ্গকে নেয়। জনগণের স্তরে অপারেশন চালায় কিউ-ক্লাক্স-ক্ল্যান (Ku Klux Klan)[২]। এটি আদিতে টেনিসির যুবকদের মজার জন্য গোপনে গঠিত সংস্থা ছিল। এরা নিগ্রোদের ওপর অত্যাচার দিয়ে কাজ শুরু করে এবং (মাঝেমধ্যে) নিগ্রোদের প্রতি সহানুভূতিশীল শ্বেতাঙ্গদের ওপর অত্যাচার চালায় দক্ষিণের গ্রামাঞ্চলে। এইসব গুণ্ডাদের খুঁজে পাওয়া যায়নি। এর থেকে বুঝা যায়, দক্ষিণের সমগ্র শ্বেতাঙ্গ মানুষ এই গুপ্ত সমিতির সমর্থক ছিল। যুক্তরাষ্ট্রীয় সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে প্রতিরোধ দেখা যায়নি, কিন্তু তাদের কার্যকলাপ বা গৃহে অগ্নিসংযোগ, হত্যা, বেত্রাঘাত বন্ধে কংগ্রেসের পাশ করা ফৌজদারি আইন কার্যকর হয়নি, কয়েকটি জেলায় এই কয় বছরে অবাধে এই কাণ্ড চলেছে। দক্ষিণ রাজ্যগুলির ও দক্ষিণের শ্বেতাঙ্গদের উদ্দেশ্যপূরণ সহজ হয় উচ্চতম ন্যায়ালয়ের সিদ্ধান্তে। উচ্চতম ন্যায়ালয়ের রায়ে নিগ্রোদের ভোটাধিকার হরণকারী রাজ্য আইন চতুর্দশ সংশোধনী থাকা সত্ত্বেও বৈধ কারণে বর্ণ বা জাতির ভিত্তিতে ভোটাধিকার হরণ করা হয়নি। অনুরূপ ভাবে উচ্চতম ন্যায়ালয়ের বলে দেন যে 'কিউ-ক্লাকস-

---

১. 'পিতামহ খণ্ড' (Grand Father Clause) বলা হয় এই কারণে যে, যার পিতামহ ভোটাধিকার ভোগ করেছেন, তার ভোটাধিকার সীমিত।

২. আমেরিকার নির্গো-বিরোধী গুপ্ত সমিতি বিশেষ। পরে বিজাতীয়দের বিতারণের জন্য গঠিত সমিতিকে এই নামে আখ্যাত করা হতে থাকে। ইহুদি বা ক্যাথলিকদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য গঠিত গুপ্ত সমিতিও এই নামের দ্বারা চিহ্নিত হতে থাকে।—বাংলা সংস্করণের সম্পাদক।

ক্ল্যান' নিগ্রোদের ভোটাধিকার প্রয়োগে বাধা দিলে করার কিছু নেই ; কারণ পঞ্চদশ সংশোধনী রাজ্যগুলিকে ভোটাধিকারের ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা রেখেছে, কিন্তু ব্যক্তিগত সংস্থা কর্তৃক হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেই।

রিপাবলিকানরা কী করেছিলেন? নিগ্রোদের আরও কার্যকর রক্ষাকবচ দিতে সংবিধান সংশোধন করার পরিবর্তে তারা দক্ষিণের রাজ্যগুলিকে স্বীকৃতি দিতে রাজি হন এবং ইউনিয়নে অন্তর্ভুক্ত করেন, বিদ্রোহীদের মার্জনা এবং সৈন্যবাহিনী তুলে নিয়ে নিগ্রোদের তাদের প্রভুদের কৃপার ওপর ছেড়ে দেন। আপটেকার বলেন [১] :

'কিন্তু দক্ষিণে গণতন্ত্র, দেশভূমি ও নাগরিকাধিকার রক্ষার জন্য নিগ্রো ও তাদের সহযোগীদের বীরত্বপূর্ণ যুদ্ধ ব্যর্থ হয় মূলত উত্তরের ব্যবসায়িক ও শিল্প বুর্জোয়াদের নির্লজ্জ বিশ্বাসঘাতকতার জন্য। ১৮৭৭-এ এরা দক্ষিণের প্রতিক্রিয়াশীল ধোঁকাবাজদের সঙ্গে বুঝাপড়ায় আসে। রিপাবলিকান দলের প্রতিক্রিয়াশীল অংশের মাধ্যমে কাজ করে উত্তরের বৃহৎ বুর্জোয়ারা পুরনো দাসতন্ত্রকে দক্ষিণে ইচ্ছামতো কাজ করার স্বাধীনতা দিয়ে বিপ্লব বিক্রি করে দেন। এই ভদ্রলোকের চুক্তির অর্থ নিগ্রোদের ভোটাধিকার হরণ, বিনা বিচারে মৃত্যুদণ্ডের সন্ত্রাস, ভাগচাষে ঋণাবদ্ধ ক্ষেতমজুর প্রথা, নাগরিকাধিকার ও শিক্ষার সুযোগ হরণ।'

বিশ্বাসঘাতকতার কাহিনী সম্পূর্ণ নয়। এর সঙ্গে যোগ করা চাই, রিপাবলিকানরা দক্ষিণে ডেমোক্রাটদের বিরোধিতা চালিয়ে গেলেও নিগ্রোরা নরক ভোগের থেকে রক্ষা পেত। কারণ, যারা এ বিষয়ে জানেন তাঁদের মত হল, উত্তরের মতো দক্ষিণে রিপাবলিকান ও ডেমোক্রাটরা পরস্পরের বিরোধী থাকলে দক্ষিণের বেশিরভাগ রাজ্যেই নিগ্রো ভোটারদের নিয়ন্ত্রণে চলে আসত এমনকী রিপাবলিকানরাও এটা রোধ করতে পারত না। রিপাবলিকানরা ডেমোক্রাটদের বুঝাপড়া করে নিগ্রোদের ভোটের জন্য প্রচার করেনি। দক্ষিণে রিপাবলিকান দলের অস্তিত্ব নেই। অস্তিত্ব নেই কারণ তারা নিগ্রোদের পক্ষাবলম্বী হতে ভয় পায়।

অন্ত্যজরা নিগ্রোদের পরিণতির কথা ভুলতে পারে না। এই ধরনের বিশ্বাস-ঘাতকতা আটকাবার জন্যই অন্ত্যজরা 'স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ'-এর প্রতি এই দৃষ্টিভঙ্গি নেয়। এতে অন্যায় কী আছে? তারা বার্কের পরামর্শ অনুসরণ করেছে, বার্ক বলেছিলেন, 'অতিপ্রত্যয়ী নিরাপত্তার চেয়ে বরং ভীরুতার অপরাধ মেনে নেওয়া শ্রেয়।'

---

১. 'দি নিগ্রো ইন দ্য সিভিল ওয়ার', পৃ: ৪৫-৪৬

তৃতীয় যুক্তি, স্বাধীনতার যুদ্ধকে অগ্রাধিকার দিতে হবে, সাংবিধানিক রক্ষাকবচ সম্বন্ধে চুক্তি পরে, কংগ্রেসের এই বক্তব্যের যৌক্তিকতা নেই। অন্ত্যজদের ধারণা, ভারতের স্বাধীনতার অধিকার সম্বন্ধে ব্রিটিশ সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি বিচার করলে কংগ্রেসের প্রিয় এই যুদ্ধ অনভিপ্রেত, ঘোড়ার গাড়িকে ঘোড়ার আগে রাখার মতো ব্যাপার। ১৮৫৭-র বিদ্রোহের পর ভারতের স্বাধীনতার দাবির প্রতি ব্রিটিশের দৃষ্টিভঙ্গির আমূল পরিবর্তন হয়েছে। একটা সময় ছিল যখন ব্রিটিশ সরকার ভারতের স্বাধীনতার দাবির প্রতি নেতিবাচক মনোভাব নিতেন। কলকাতায় যাঁর মূর্তি রয়েছে, সেই লরেন্স ঘোষণা করেছিলেন : 'ব্রিটিশ ভারত জয় করেছিল তলোয়াল দিয়ে, এটা রাখবেও তলোয়ার দিয়ে।' এই দৃষ্টিভঙ্গি আর নেই, কবরস্থ, এবং এটা বললে অতিরঞ্জন হবে না যে, ব্রিটিশরা এই উক্তির জন্য লজ্জিত। এই পর্বের পর আসে এই যুক্তি যে, ব্রিটিশ সরকার ভারতের স্বাধীনতার বিরোধী, কারণ সংসদীয় সংস্থা পরিচালনায় ভারতীয়দের অক্ষমতা। লর্ড রিপণের কার্যকাল থেকেই এর শুরু। এর পর-ই ভারতীয় রাজনৈতিক প্রশিক্ষণ দেওয়ার চেষ্টা হয়, প্রথমে স্থানীয় স্বায়ত্ত সরকারে, তারপর মন্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কার আইনের মাধ্যমে প্রাদেশিক সরকার পরিচালনায়। এখন আমরা তৃতীয় পর্ব বা বর্তমান পর্বে এসেছি। ব্রিটিশ সরকার এখন বলতে লজ্জাবোধ করে যে তারা তলোয়ার দিয়ে ভারতকে অধীন রাখবে। এখন আর তারা বলে না যে, ভারতীয়রা সংসদীয় সংস্থা চালনার অনুপযোগী। ব্রিটিশ সরকার এখন ভারতের স্বাধীনতার অধিকার, এমনকী পূর্ণ স্বাধীনতায় সম্মত। ক্রিপস মিশনের প্রস্তাব এই নতুন দৃষ্টিভঙ্গির বড় পরিচায়ক। ভারতের স্বাধীনতার পূর্বশর্ত হিসাবে ব্রিটিশ সরকার বলেন, ভারতীয়দের এমন একটা সংবিধান রচনা করতে হবে, যার প্রতি ভারতীয় জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অংশের সমর্থন আছে। এই স্তরে আমরা পৌঁছেছি। সেজন্য অন্ত্যজরা বুঝতে পারে না, কংগ্রেস ভারতীয়দের মধ্যে সহমত না করে শুধু স্বাধীনতার জন্য লড়াই-এর কথা বলে অন্ত্যজদের অপমান করতে চায় কেন।

III

কংগ্রেস ব্রিটিশ সরকারের প্রস্তাবের বিরোধী কেন? এই বিরোধিতার পক্ষে দুটি কারণ দেখাচ্ছে। এর মতে, ব্রিটিশ সরকারের প্রস্তাব অন্ত্যজদের হাতে ভারতের স্বাধীনতার ওপর ভেটো ক্ষমতা দিয়েছে। এই যুক্তি মূর্খতার পরিচায়ক দুটি কারণে। প্রথমত, ভারতের অন্ত্যজরা কখনই অসম্ভব দাবি করেনি। এমনকী তারা অযৌক্তিক দাবিও করেনি। কার্সন যেমন রেডমন্ডকে বলেছিলেন, 'আপনার সুরক্ষা চুলোয় যাক।

আমরা আপনার শাসনে থাকতে চাইনি।' সেরকম কিছুও বলে না। হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠের অসামাজিক ও অ-গণতান্ত্রিক চরিত্র সত্ত্বেও অন্ত্যজরা তাদের অধীনে থাকতে প্রস্তুত কিন্তু সাংবিধানিক রক্ষাকবচের ব্যবস্থা করতে হবে। কাজেই, অন্ত্যজরা অসম্ভব দাবি তুলে ভারতের স্বাধীনতার ওপর প্রতিষেধক (Veto) প্রয়োগ করছেন বলাটা অবমাননাকর, এই কথার বিন্দুমাত্র যৌক্তিকতা নেই। এই আশঙ্কার সারবস্তু আছে ধরে নিলেও কংগ্রেসের কাছে প্রতিকার রয়েছে। কারণ কংগ্রেস মনে হলে বলতে পারে যে, হিন্দু ও অন্ত্যজদের মধ্যে মতৈক্য নেই, কাজেই বিরোধটার নিষ্পত্তির ভার আন্তর্জাতিক কোনও সংস্থার হাতে দেওয়া হোক। কংগ্রেস এই অবস্থান নিলে আমি নিশ্চিত যে, ব্রিটিশ সরকার বা অন্ত্যজরা কেউ-ই আপত্তি করবে না। কিন্তু সর্বসম্মত সংবিধান রচনার ঐকান্তিক প্রয়াস না করে কংগ্রেস যখন স্বাধীনতা অর্জনের পক্ষে নিরন্তর প্রচার করতে থাকল, তাতে একটা কথাই অন্ত্যজরা ধরে নেয় যে কংগ্রেস ব্রিটিশ সরকারকে 'চাবিটা কংগ্রেসের হাতে সমর্পণে' বাধ্য করতে চায়, অন্ত্যজদের জন্য সাংবিধানিক রক্ষাকবচের ব্যবস্থা না করেই কংগ্রেস এটা চায়। মোট কথা, কংগ্রেস এমন এক স্বাধীন ভারত চায়, যেখানে অন্ত্যজদের ইচ্ছামতো ব্যবহারে হিন্দুদের অবাধ স্বাধীনতা থাকে। অন্ত্যজরা এই ধরনের অসৎ আন্দোলনে অংশ নিতে চায় না বলে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই, যদিও 'স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ' বলে অভিহিত করে একে মহিমান্বিত করা হচ্ছে।

আরও যে কারণে কংগ্রেস চুক্তির প্রশ্ন করতে রাজি নয় তা হল, ব্রিটিশ সরকার সৎ নয় এবং ভারতীয়রা সংবিধানে রাজি হলেও তারা ক্ষমতা হস্তান্তর করবে না এবং শেষমেশ ভারতীয়দের ব্রিটিশের হাত থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য লড়াই করতে হবে। অন্ত্যজদের যুক্তি হল, ব্রিটিশের সদিচ্ছা সম্বন্ধে এত অবিশ্বাস করার কারণ নেই। ব্রিটিশ সরকার তো ভারতীয় দাবি পূরণের পথে কাজ করছে। ভারত বিজয় থেকে শুরু থেকে ১৮৮৬ পর্যন্ত ভারতীয়রা চিন্তাই করত না কে তাদের শাসক, কীভাবেই বা শাসন চলছে। এইসব প্রশ্নে মাথা না ঘামিয়েই তারা জীবনযাপন করত। ১৮৮৬ সালে কংগ্রেস সংগঠিত হয় এবং ভারতীয়রা ভারত সরকার সম্বন্ধে উৎসাহী হয়। কংগ্রেসও ১৯১০ পর্যন্ত ভাল সরকারের জন্য বিক্ষোভ করেই ক্ষান্ত ছিল। ১৯১০-এ কংগ্রেস প্রথম স্বায়ত্তশাসনের দাবি করে। ১৯১৯ সালে মন্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কার আসার সময়ে ভারতীয়রা স্বায়ত্তশাসনের দাবি পেশ করার সুযোগ পায়, এটি ১৯১৭-তে উনিশের স্মারকলিপি (**Memorandum of**

Nineteen) বলে অভিহিত ছিল। এ বিষয়ে ওয়াকিবহাল ব্যক্তিমাত্রেই জানেন, প্রগতিশীল ভারতীয়রা প্রদেশে দ্বৈতশাসনেই তুষ্ট ছিলেন। স্যর দিনশ ই ওয়াচা ও শ্রী সামারথের [১] মতো ভারতীয় নেতার কাছে এটাও ছিল বিরাট অগ্রগতি। ১৯৩০-এর কংগ্রেসের স্বাধীনতার প্রস্তাব সত্ত্বেও গান্ধী 'গোল টেবিল বৈঠকে'[২] প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন মেনে নিতে প্রস্তুত ছিলেন। ব্রিটিশ সরকার এর চেয়ে অনেক বেশি মঞ্জুর করে। ১৯৩৯-এর পর যদি কিছুটা স্তিমিত ভাব আসে, তার কারণ ভারতীয়রা সংবিধানের রূপ সম্বন্ধে মতৈক্যে আসতে পারেনি।

অস্পৃশ্যরা মনে করে ব্রিটিশরা যখন ভারতের স্বাধীনতা প্রস্তাব নিয়ে চুপচাপ বসে ছিল, উপকথার গল্পের সাপের তহবিলের ওপর বসে কাউকে আসতে বাধা দেওয়ার মতো অবস্থা, এখন আর নেই। ভারতের স্বাধীনতা এখন তত্ত্বাবধায়কের হাতে গচ্ছিত সম্পত্তির মতো। ব্রিটিশ সরকার নিজে তত্ত্বাবধায়কের (Receiver) পদে বসে আছে। ঝগড়ার নিষ্পত্তি হলেই এবং যথাযথ সংবিধান ঠিক হয়ে গেলেই তারা সম্পত্তি হস্তান্তরিত করবে মালিক ভারতীয়দের হাতে। অন্ত্যজদের প্রশ্ন : এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করা হবে না কেন! দেশের গুরুত্বপূর্ণ অংশের মধ্যে সহমতে আসার ঐকান্তিক চেষ্টা করে তারপর যুক্ত আবেদন করা হোক সম্পত্তি হস্তান্তরের জন্য। কংগ্রেস এই পন্থা অনুসরণ করতে চায় না। তার থেকেই বুঝা যায় কংগ্রেসের স্বাধীনতার দাবি একটা কৌশল মাত্র। অন্ত্যজদের সর্বসম্মত সংবিধানের দাবি এড়িয়ে স্বাধীনতার দাবি পূরণকে পূর্বশর্ত হিসাবে ব্রিটিশ সরকারকে চাপ দেওয়ার জন্যই কংগ্রেসের এটা কৌশল বলে মনে করে অন্ত্যজরা।

অন্ত্যজরা বলে যে, ব্রিটিশ সরকারের ঘোষণা অহেতুক পরিগণিত করতে তারা ব্যগ্র, তারা বলে না যে ভারতীয়রা রাজি হলে এটা এমন হওয়া দরকার যাতে 'দরজায় ঘা মারলেই খুলে যাবে, দাবি করো, তাহলেই তোমাকে দেবে।' তারা স্বীকার করে যে, ব্রিটিশরা ঘোষণামতো কাজ নাও করতে পারে। এমনকী সর্বসম্মত

---

১. মন্টেগু ভারতের ডায়েরিতে লিখেছেন, তাঁরা রাজনৈতিক সংস্কার নিয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বলার সময়ে বলেন, 'সরকারকে প্রভাবিত করার জন্য প্রস্তাব গ্রহণের ক্ষমতা দিন, আমরা অত্যন্ত সংযত ভাবে তা প্রয়োগ করব, তবে দায়িত্বশীল সরকারের পক্ষে আমরা উপযুক্ত নই।'

২. 'গোল টেবিল বৈঠকে'র এই পর্ব সম্বন্ধে বলা হয়নি। কিন্তু উপস্থিত সবাই জানেন কীভাবে গান্ধীকে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনে রাজি করানো হয়েছিল। ১৯৩৫-এর ভারত শাসন আইনে কেন্দ্রে সামান্য যে দায়িত্ব অর্পণ করা হয়, তার কৃতিত্ব 'গোল টেবিল বৈঠকে' অ-কংগ্রেসি দলগুলির।

সংবিধান রচিত হলেও তারা প্রতিশ্রুতিমতো কাজ না করতে পারে, এবং স্বাধীনতার জন্য লড়াই অপরিহার্য হতে পারে। অন্ত্যজরা এইসব সম্ভাবনা উড়িয়ে দিতে চায় না। তারা যেটা বলতে চায় তা হল, ভারতীয়রা ব্রিটিশদের পরীক্ষার মধ্যে ফেলে দিতে পারেনি। সর্বসম্মত সংবিধান না হলে ব্রিটিশদের পরীক্ষার মধ্যে আনা যাবে না। কংগ্রেস প্রথম পন্থা হিসাবে এটা বেছে না নিলে, অন্ত্যজদের ধারণা, কংগ্রেস ব্রিটিশদের সঙ্গে আলোচনা প্রচেষ্টায় ঐকান্তিক নয়। এমনকী দেশের কাছে কংগ্রেস সৎ নয়। কংগ্রেসের সঙ্গে স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধে অংশ নিতে অস্বীকার করার অন্ত্যজদের যথেষ্ট যুক্তি নেই একথা কে বলবে?

অধ্যায় ৮

আসল প্রশ্ন
অস্পৃশ্যরা কী চায়?

I

কংগ্রেস এবং অন্ত্যজদের মধ্যে বিতর্কে মূল প্রশ্নটা কী? আমি যেটা বুঝি, মূল প্রশ্ন হল : অন্ত্যজরা ভারতের জাতীয় জীবনের থেকে পৃথক অংশ হিসাবে আছে, কি নেই?

বিতর্কে এটাই আসল প্রশ্ন এবং এই প্রশ্নেই কংগ্রেস ও অন্ত্যজরা একেবারে বিপরীত পক্ষ নিয়েছে। অন্ত্যজদের পক্ষ থেকে উত্তর 'হ্যাঁ'। তারা বলে যে, তারা হিন্দুদের থেকে আলাদা এবং বিশিষ্ট। অন্যদিকে কংগ্রেস বলে 'না', এবং দাবি করে অন্ত্যজরা হিন্দুদের-ই অংশ। সংশ্লিষ্টদের এটাই হচ্ছে দৃষ্টিভঙ্গি। ব্রিটিশ সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি পরিষ্কার করেছেন ভারতের বড়লাট এবং ভাইসরয় লর্ড লিনলিথগো[১]। তাঁর বিবৃতিতে পরিষ্কার বলেছেন যে, অন্ত্যজরা ভারতের জাতীয় জীবন থেকে পৃথক। সাংবিধানিক রক্ষাকবচের প্রশ্নটি মৌলিক বলে মনে করেন এমন অনেকে বিস্মিত হবেন যে, আমি যে বিষয়টি মৌলিক মনে করি তা তাদের থেকে ভিন্ন। আমি অকপটেই বলছি, কোনও পার্থক্য নেই। এটা নির্ভর করে একজন কোনটিকে অব্যবহিত ও কোনটিকে চরম লক্ষ্য বলে মনে করছেন। অন্যেরা সাংবিধানিক রক্ষাকবচকে চরম লক্ষ্য মনে করেন। আমি একে অব্যবহিত লক্ষ্য মনে করি। আমি যেটা মৌলিক মনে করি সেটাই চরম, এর থেকে অব্যবহিত লক্ষ্য আসে, ন্যায়শাস্ত্রের যুক্তিধারায় যেমন সূত্র থেকে উপসংহার আসে। আমি এই পার্থক্য করছি কেন তার ব্যাখ্যা প্রয়োজন। আমার কাছে ভারতের সংবিধান ন্যায়- শাস্ত্রের যুক্তিধারার মতোই বিবর্তনের মধ্য দিয়ে এসেছে। এই যুক্তি ধারায় মুখ্য অনুসিদ্ধান্ত হল, ভারতের জাতীয় জীবনে এমন এক উপাদানের অস্তিত্ব আছে যাকে পৃথক বলে চিহ্নিত করা যায় এবং বিশিষ্টতার জন্য সাংবিধানিক রক্ষাকবচ পাওয়ার অধিকারী। যে উপাদানের সাংবিধানিক রক্ষাকবচের দাবি তার বৈশিষ্ট্য ও পার্থক্যের

১. পরিশিষ্ট - VI-এর ক্রমসংখ্যা ৯ ও ১২ দ্রষ্টব্য।

সঠিক সংজ্ঞা নির্ধারণ করার অবকাশ থাকা চাই। যদি দেখা যায় এটা পৃথক ও বিশিষ্ট, এর সাংবিধানিক রক্ষাকবচ গ্রহণযোগ্য।

এইভাবেই মুসলমান, শিখ, ভারতীয় খ্রিস্টান ও ইউরোপীয়দের জন্য সাংবিধানিক রক্ষাকবচ দেওয়া হয়। এটা সত্যি, ভারতের সংবিধান নীতির ভিত্তিতে রচিত হয়নি। একটা বিক্ষিপ্ত ধারায় এর বিকাশ ঘটেছে, নীতির চেয়ে প্রয়োজনের তাগিদেই বেশি। তবু, নীতি নয় এই অকথিত প্রয়োজনীয় শর্ত সবসময়েই কার্যকরী হয়েছে। একটি বিশেষ গোষ্ঠীর সাংবিধানিক রক্ষাকবচের অধিকার পরিণতি হিসাবেই স্বীকৃত হয়েছে। যখন মৌলিক শর্ত পূরণ হয়েছে, অর্থাৎ ভারতের জাতীয় জীবনে তাদের পৃথক বৈশিষ্ট্য স্বীকৃত, স্বাভাবিক পরিণতি হিসাবেই এটা স্বীকৃত হয়েছে। এই বিতর্ক বিচার করার সময়ে যুক্তিশাস্ত্রের রীতি অনুসরণ করতে হবে। নীতিশাস্ত্রের যুক্তি- ধারায় অনুমান ও উপসংহার, উভয়েই মৌলিক, এবং যুক্তি শেষ করার স্বার্থে অনুসিদ্ধান্ত বাদ দিয়ে উপসংহার টানা যথেষ্ট নয়। এই দৃষ্টিকোণ থেকে প্রশ্নটি বিচার করে আমার ধারণা, শুধু সাংবিধানিক রক্ষাকবচের প্রশ্ন আলোচনা করে অন্ত্যজদের বিষয়ে ইতি টানা ঠিক নয়। আমি মনে করি, অনুসিদ্ধান্ত সহ, চরম লক্ষ্য বা মৌলিক অনুমান নিয়ে পর্যালোচনা করা উচিত, এর থেকেই সাংবিধানিক রক্ষাকবচের প্রশ্ন আসে; ক্রমধারা হিসাবে না হলেও পূর্ববর্তী হিসাবে আসে।

এর থেকে বুঝা যাবে, চরমকে অব্যবহিত লক্ষ্যের পরিণতি হিসাবে না বিচার করে পৃথক ভাবে বিচারের সিদ্ধান্ত অযৌক্তিক নয়। সেজন্য একে পৃথক ভাবে ও বিশেষ ভাবে পর্যালোচনার প্রয়োজন। কারণ কংগ্রেস সচেতন যে, এটি মৌলিক প্রশ্ন। কংগ্রেস বুঝেছে যে, অন্ত্যজদের একবার পৃথক অংশ হিসাবে মেনে নিলে তাদের সাংবিধানিক রক্ষাকবচের দাবি মানা ছাড়া উপায় থাকবে না। কংগ্রেস এই যুক্তির বিরুদ্ধে হওয়ার কারণ তারা বুঝে এটা প্রথম পরীক্ষা, এবং এটা রক্ষা করা না গেলে পরিস্থিতি রক্ষা করা যাবে না।

II

ভারতের পরিস্থিতি সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল ব্যক্তিমাত্রেই জানেন যে, অন্ত্যজরা হিন্দুদের থেকে পৃথক এই অকাট্য বাস্তবতার বিরোধিতা কংগ্রেসকে করতেই হবে। কিন্তু কংগ্রেস যেহেতু এটা করছে, সেজন্য আমাকে যতটা সম্ভব এই প্রশ্ন পর্যালোচনা করতে হবে।

অন্ত্যজরা হিন্দুদের থেকে পৃথক, এই যুক্তি বুঝা শক্ত নয়। এর জন্য বিস্তারিত

ও দীর্ঘ বক্তব্যের প্রয়োজনীয়তা নেই। তাদের পক্ষে বক্তব্য একটা সহজ প্রশ্নেই পেশ করা যায়। কোন্ অর্থে তাঁরা হিন্দু? প্রথমত, হিন্দু শব্দটি বহু অর্থে ব্যবহৃত হয় এবং এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার আগে জানতে হবে কোন্ অর্থে এটা ব্যবহৃত হয়েছে। এটা ভৌগোলিক সীমানাগত অর্থে ব্যবহৃত হয়। হিন্দুস্থানের অধিবাসী সবাই হিন্দু। সেই অর্থে দাবি করা যায় যে, অন্ত্যজরা হিন্দু। মুসলমান, খ্রিস্টান, শিখ, ইহুদি, পারসিরা হিন্দু। দ্বিতীয়ত, হিন্দু শব্দ ব্যবহৃত হয় ধর্মীয় অর্থে। উপসংহারে আসার আগে হিন্দু তত্ত্ব ও হিন্দু ধর্মবিশ্বাসের মধ্যে পার্থক্য করতে হবে। অন্ত্যজরা ধর্মীয় অর্থে হিন্দু কিনা নির্ভর করবে তত্ত্ব বা ধর্মবিশ্বাস অনুসরণ করার ওপর। জাতপ্রথা ও অচ্ছুতবাদের নিরিখে হিন্দু ধর্ম বিচার করলে সব অন্ত্যজই হিন্দু ধর্ম বাতিল করবে এবং নিজেদের হিন্দু বলে স্বীকার করবে না। আর রাম, কৃষ্ণ, বিষ্ণু, শিব ও অন্যান্য দেব-দেবীকে পূজা করার ভিত্তিতে বিচার হলে অন্ত্যজরা নিজেদের হিন্দু বলে দাবি করবে। কংগ্রেস যথারীতি অন্ত্যজদের কিছু লোককে দালাল রেখেছে যারা দাবি করে যে, তারা হিন্দু এবং হিন্দু হিসাবেই তারা প্রয়াত হবে। কিন্তু তবু হিন্দু ধর্ম বলতে যদি জাতপাত ও অচ্ছুত্‌বাদ বুঝায়, সেক্ষেত্রে এই বেতনভুক দালালরাও নিজেদের হিন্দু বলে স্বীকার করবে না।

আর একটা বিষয়ের ওপর জোর দেওয়া দরকার। আগের আলোচনা অনুযায়ী ধর্মীয় বিশ্বাস অর্থে হিন্দু গণ্য হলে ধর্মবিশ্বাসের অনুসারী অর্থে অন্ত্যজদের হিন্দু বলা যায়। এক্ষেত্রেও হিন্দু ও অন্ত্যজদের এক-ই ধর্ম গণ্য করার বিরুদ্ধে সতর্ক হওয়া দরকার। ঘটনা হলে স্বীকৃত ধর্মবিশ্বাসের অনুসারী হয়েও তাদের একই ধর্ম বলা যায় না। যথার্থ এবং সঠিক ভাবপ্রকাশের জন্য বলা উচিত, তাদের ধর্ম সদৃশ। এক ধর্ম হওয়ার অর্থ এক-ই চক্রে অংশগ্রহণ। ধর্মবিশ্বাসের আচার অনুসরণে এ-ধরনের একই চক্র নেই। হিন্দু এবং অন্ত্যজরা তাদের ধর্মাচার পৃথকভাবে পালন করে, কাজেই ধর্মবিশ্বাস এক-ই ধরনের হলেও তারা পৃথক ও পরস্পর বিচ্ছিন্ন। হিন্দু শব্দের এই দুই অর্থের কোনওটাই রাজনৈতিক প্রশ্ন মীমাংসার সহায়ক নয়। রাজনৈতিক প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতেই আলোচনা যুক্তিবহ হতে পারে।

একমাত্র সামাজিক অর্থের পরীক্ষার সূত্রেই হিন্দু সমাজের সদস্যপদ নির্ধারণ অর্থপূর্ণ হতে পারে। কোনও অন্ত্যজ কি হিন্দু সমাজের অংশ হতে পারে? এমন কোনও বন্ধনসূত্র আছে, যা দিয়ে হিন্দুদের সঙ্গে তাদের যুক্ত করা যায়? নেই। কোনও বৈবাহিক সম্পর্ক হয় না, একসঙ্গে ভোজন নয়। পরস্পর সহযোগ দূরের কথা, স্পর্শ করার অধিকার-ই নেই। বরং শুধু স্পর্শদোষই হিন্দুর পক্ষে দূষণের কারণ হয়। হিন্দুদের সামগ্রিক ঐতিহ্য হল অন্ত্যজদের পৃথক অংশ হিসাবে গণ্য করা এবং তা

বাস্তব হিসাবে বজায় রাখা। হিন্দু ও অন্ত্যজদের পৃথক করতে হিন্দুদের প্রাচীন সংজ্ঞা অন্ত্যজদের বক্তব্যের পক্ষে মূল দৃষ্টান্ত। এই সংজ্ঞা অনুযায়ী হিন্দুদের সবর্ণ ও অন্ত্যজদের অবর্ণ বলা হয়। এতে হিন্দুদের বলা হয় চতুর্বর্ণিক, অন্ত্যজদের পঞ্চম। পৃথকত্বের অস্তিত্ব না থাকলে এমন সব সংজ্ঞার দরকার হত না, এবং পৃথকত্ব অনুসরণ করার স্বার্থে বিশেষ শব্দের ব্যবহার থাকত না।

কাজেই অন্ত্যজরা হিন্দু এবং মুসলমান ও অন্যান্যদের মতো তারা বিশেষ রাজনৈতিক অধিকার দাবি করতে পারে না, কংগ্রেসের এই যুক্তির সারবত্তা নেই। ঐতিহ্যের থেকে এই যুক্তি ভাল ও প্রামাণিক যে, অন্ত্যজরা হিন্দু নয়। অনেকে এটাকে দুর্বল যুক্তি মনে করতে পারে। কংগ্রেসের যুক্তিতে না গিয়ে আমি একে ছেড়ে দেওয়ার পক্ষপাতী নই। এই উদ্দেশ্যে আমি মানছি যে, অন্ত্যজরা ধর্মবিশ্বাসে হিন্দু। তাদের সীমিত অর্থে হিন্দু বলা যাবে। এর ভিত্তিতে তারা কীভাবে হিন্দু সমাজের অংশ প্রতিপন্ন হতে পারে, সেটা বুঝা শক্ত।

যুক্তির খাতিরে যদি মেনে নেওয়া যায় যে তারা ধর্মে হিন্দু, তাতে আমি যা বলেছি তার চেয়ে বেশি কিছু বুঝা যায়। আমি বলেছি তারা সব হিন্দুর মতো এক-ই দেব-দেবীর পূজা করে, এক-ই পুণ্যতীর্থে যায়। এক-ই অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাসী, এক-ই পাথরের মূর্তি, বৃক্ষদেবতা, পর্বতকে পবিত্র মনে করে। এর থেকে কি উপসংহারে আসা যায় যে, হিন্দু ও অন্ত্যজরা এক-ই সম্প্রদায়ের অংশ? কংগ্রেসের বক্তব্যের পেছনে এই যুক্তি হলে বেলজিয়ান, ওলন্দাজ, নরওয়েবাসী, সুইডিশ, জর্মন, ফরাসি, ইতালীয়দের কী হবে? এরা সবাই খ্রিস্টান নয় কী? একই ঈশ্বরের পূজারী নয় কী? যিশুকে পবিত্রাতা মনে করে তো? তাদের ধর্মবিশ্বাস এক-ই নয় কী? স্পষ্টতই, সবার চিন্তাধারা, বিশ্বাস ও উপাসনায় ধর্মীয় ঐক্য রয়েছে। তবু এটা কে অস্বীকার করবে যে, জর্মন, ফরাসি, ইতালীয়রা এক-ই সম্প্রদায়ভুক্ত নয়? আর একটা দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক, আমেরিকার নিগ্রো ও শ্বেতাঙ্গদের। তাদেরও ধর্ম এক। উভয়েই খ্রিস্টান। এর জন্য কেউ কি বলছেন এরা এক-ই সম্প্রদায়ভুক্ত? তৃতীয় উদাহরণ, ভারতীয় খ্রিস্টান, ইউরোপীয় ও ইন্দো-ভারতীয়দের কথা ধরা যাক। তারা কেই ধর্মে বিশ্বাসী ও অনুসারী। তবু এটা সবাই স্বীকার করে যে, তারা এক খ্রিস্টান সম্প্রদায়ভুক্ত নয়। শিখদের কথা ধরা যাক। সবাই শিখ ধর্মের কথা বলে, কিন্তু এটা স্বীকৃত যে, শিখরা একটি সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত নয়। এইসব দৃষ্টান্তের থেকে বলা যায় যে কংগ্রেসের যুক্তি অসঙ্গতিপূর্ণ।

কংগ্রেসের মিথ্যার প্রথম ফাঁকি হচ্ছে, সাংবিধানিক রক্ষাকবচ মঞ্জুর বা নামঞ্জুরের

প্রশ্নে জনসংখ্যার একটি সামাজিক গোষ্ঠীর সঙ্গে সংযুক্তি বা বিচ্ছেদ। এই মৌলিক বিষয় অনুধাবনে কংগ্রেসের ব্যর্থতা। ধর্ম একটি পরিস্থিতিবিশেষ, যার থেকে ঐক্য বা বিভেদের সূত্র আসে। কংগ্রেস বোধহয় বুঝতেই পারেনি যে, মুসলমান ও খ্রিস্টানদের পৃথক রাজনৈতিক অধিকার দেওয়া হয়েছে তারা খ্রিস্টান বা মুসলমান বলে নয়। আসলে তারা হিন্দুদের থেকে আলাদা অংশ, এই যুক্তিতে।

কংগ্রেসের যুক্তির দ্বিতীয় দুর্বলতা, এক ধর্ম থাকলে সামাজিক সংহতি আছে ধরে নেওয়া যাবে। এই যুক্তি দিয়ে কংগ্রেস ভোটে জিতবার আশা করে। দুর্ভাগ্যবশত কংগ্রেস তা পারবে না। কারণ ঘটনা এই উপসংহার টানার বিপক্ষে। ধর্ম এক হলেই যদি সামাজিক সংহতি হত তবে, সেই যুক্তিতে ইউরোপে ফরাসি, জর্মন, ইটালি, শ্লাভ, আমেরিকার নিগ্রো ও শ্বেতাঙ্গ, ভারতে খ্রিস্টান, ইন্দ-ভারতীয়রা এক-ই সম্প্রদায়ভুক্ত হত। এরা সবাই এক-ই ধর্মের হওয়া সত্ত্বেও পৃথক সম্প্রদায় গঠন করেছে। এই ঘটনাই উপরোক্ত যুক্তি নাকচ করে। সবচেয়ে করুণ ব্যাপার হল কংগ্রেস ধর্মভিত্তিক ঐক্যের যুক্তিতে এতই বিভোর যে, তারা বুঝতে পারে না এই দুইয়ের মধ্যে সমন্বয় নেই এবং অনেক ক্ষেত্রে ধর্ম আলাদা হওয়া সত্ত্বেও পৃথকত্ব নেই। আবার এক-ই ধর্ম সত্ত্বেও বিভেদ আছে এবং সবচেয়ে জঘন্য ব্যাপার, ধর্মের বিধির জন্য বিভেদের অস্তিত্ব আছে।

কংগ্রেসের যুক্তির খণ্ডনে প্রতিটি ক্ষেত্রের জন্য এক-একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। প্রথম ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় এবং সোজা উদাহরণ হিন্দু ও শিখ। এদের ধর্ম পৃথক, কিন্তু সামাজিক ভাবে তারা আলাদা নয়। তারা একত্রে আহার করে, বিবাহ হয় পরস্পরের মধ্যে ; তারা একত্রে বসবাস করে। হিন্দু পরিবারে এক সন্তান শিখ হতে পারে, আরেক সন্তান হিন্দু। ধর্মীয় পার্থক্য সামাজিক সূত্র ছিন্ন করে না। দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত, ইউরোপে ইতালীয়, ফরাসি, জর্মন এবং আমেরিকায় নিগ্রো ও শ্বেতাঙ্গ। এটা হচ্ছে যেখানে ধর্ম ঐক্যবন্ধনের শক্তি। কিন্তু জাতিগত আবেগসূত্রে বিভেদ রুখতে জোরদার নয়। হিন্দু এবং হিন্দু ধর্ম সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ নিদর্শন তৃতীয় ক্ষেত্রে, ধর্ম এখানে বিভেদ সৃষ্টি করেছে। এরকম হতে পারে তা হিন্দুদের কাছে বুঝাবার প্রয়োজন নেই। কারণ, এটা ভালভাবে জানা আছে, হিন্দু ধর্ম ঐক্যের বদলে বিভেদ প্রচার করে। হিন্দু হওয়া মানে মেলামেশা নয়, সব কিছুতে আলাদা থাকা। সাধারণ ভাবে বলা হয়, হিন্দু ধর্ম জাতব্যবস্থা সমর্থন করে এবং অস্পৃশ্যতা বোধহয় এর মহত্ত্ব লুকিয়ে আড়াল করে। হিন্দু ধর্মের প্রকৃত গুণ হচ্ছে বিভেদ সৃষ্টি। এটি সন্দেহাতীত। কারণ, জাত ও অস্পৃশ্যতা কিসের দ্যোতক? স্পষ্টতই বিভেদ সৃষ্টির। পৃথকত্বের আরেক নাম জাত এবং অস্পৃশ্যতা, এক সম্প্রদায়কে অন্য সম্প্রদায়ের

থেকে পৃথক করার চরম প্রতীক। এটাও বিতর্কের ঊর্ধ্বে যে, জাত এবং অস্পৃশ্যতা মৃত্যুর পর আত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধীয় কোনও তত্ত্বের তুল্যমূল্য তত্ত্ব নয়। ইহজীবনে সব হিন্দু আচারবিধির অনুসরণ করতে বাধ্য। জাতব্যবস্থা ও অস্পৃশ্যতা মতবাদ নয়, হিন্দু ধর্মে এর অনুসরণ আবশ্যক বলে গণ্য। জাত ও অস্পৃশ্যতার মতবাদে বিশ্বাস রাখাই হিন্দুর পক্ষে যথেষ্ট নয়।.দৈনন্দিন জীবনেও জাতপ্রথা ও অস্পৃশ্যতা মেনে কাজ করতে হবে।

হিন্দু ও অন্ত্যজদের মধ্যে ভাগ করতে অস্পৃশ্যতার যে মতবাদ হিন্দু ধর্ম উদ্ভাবন করেছে তা শুধু কাল্পনিক ভেদরেখা নয়, পর্তুগিজ ও প্রতিদ্বন্দ্বীদের উপনিবেশ দখলের ঝগড়া মেটাবার জন্য পোপ এরকম একটা রেখা টেনে দিয়েছিলেন; এটা কোনও রঙ দিয়ে রেখা টানাও নয়, যার দৈর্ঘ্য আছে কিন্তু প্রস্থ নেই ; জাতিগত ভেদ রেখাও এটা নয়, যাতে পার্থক্য থাকে কিন্তু বৈষম্য নয়। এর দৈর্ঘ্য প্রস্থ দুই-ই আছে। বাস্তবিক ভাবে হিন্দু ও অন্ত্যজদের একটা কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে পৃথক করা হয়েছে। ভাবনাগত ভাবে এটা একটা স্বাস্থ্যগত সীমানার বেষ্টনী, অন্ত্যজদের কোনওদিনই এই বেষ্টনী অতিক্রম করতে দেওয়া হবে না, এটা করার আশাও নেই।

বাস্তব ঘটনা সাধারণ বোধগম্য করার জন্য বলা যায়, হিন্দু ধর্ম ও সামাজিক ঐক্য অসঙ্গতিপূর্ণ। আপন বৈশিষ্ট্যে হিন্দু ধর্ম সামাজিক বিভেদে বিশ্বাস করে। এটা সামাজিক অনৈক্যের নামান্তর মাত্র এবং সামাজিক বিভাগ সৃষ্টিকারী। হিন্দুরা এক হতে ইচ্ছা করলে হিন্দু ধর্ম ত্যাগ করতে হবে। হিন্দু ধর্ম ভগ্ন না করে তারা এক হতে পারে না। হিন্দু ঐক্যের পক্ষে প্রধান অন্তরায় হিন্দু ধর্ম। সামাজিক সংহতির ভিত্তির জন্য যে অঙ্গীভূত হওয়ার জন্য আকাঙ্ক্ষা দরকার, হিন্দু ধর্ম তা সৃষ্টি করতে পারে না। বরং হিন্দু ধর্ম বিভক্ত হওয়ার ইচ্ছা প্রবল করে।

কংগ্রেস অবশ্য বুঝে না যে, তার যুক্তি তাদের বিপক্ষেই যাচ্ছে। কংগ্রেসের বক্তব্য সমর্থন করার প্রশ্নই নেই, অন্ত্যজদের বক্তব্য প্রমাণ করার পক্ষে সবচেয়ে জোরালো যুক্তি দেওয়া যেতে পারে। অন্ত্যজরা হিন্দু, এই অনুসিদ্ধান্ত থেকে উপসংহার করলে বলা যায়, হিন্দু ধর্ম বরাবর-ই নীতিগত ভাবে ও প্রয়োগে অন্ত্যজদের হিন্দু সমাজের অংশ না মেনে তাদের পৃথক ও বিচ্ছিন্ন করার জন্য সচেষ্ট।

কাজেই অন্ত্যজরা যদি বলে যে, তারা পৃথক সত্তা, কেউ তাদের এই বলে দোষারোপ করতে পারবে না যে, রাজনৈতিক সুবিধার জন্য তারা নতুন তত্ত্ব উদ্ভাবন করছে। তারা শুধু ঘটনার প্রতি এবং কীভাবে তা হিন্দু ধর্মের উত্তরাধিকার হয়ে

উঠেছে তার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। কংগ্রেস দৃঢ় ও সত্যনিষ্ঠ হয়ে অন্ত্যজদের পৃথক হিসাবে স্বীকৃতির দাবি নস্যাৎ করতে হিন্দু ধর্মকে কাজে লাগাতে পারে না। সেটা করলে নেহাত ব্যক্তিস্বার্থের মতলবে করবে। কংগ্রেস জানে যে, ভারতের জাতীয় জীবনে অন্ত্যজদের হিন্দুর থেকে পৃথক ও বিশিষ্ট হিসাবে স্বীকার করার অর্থ প্রশাসন, আইনসভা ও সরকারি চাকরি হিন্দু ও অন্ত্যজদের অংশ মধ্যে ভাগ এবং হিন্দুদের অংশ হ্রাস। কংগ্রেস অন্ত্যজদের অংশ ভোগ করা থেকে হিন্দুদের বঞ্চিত করতে ইচ্ছুক নয়। কংগ্রেস যে অন্ত্যজদের ভারতের জাতীয় জীবন থেকে পৃথক হিসাবে মানতে রাজি নয়, তার মূল কারণ এটাই। কংগ্রেসের দ্বিতীয় যুক্তি, ভারতের জাতীয় জীবন থেকে অন্ত্যজদের পৃথক হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া উচিত নয়, কারণ এতে হিন্দু ও অন্ত্যজদের মধ্যে বিভেদ স্থায়ী হবে। এটা কোনও যুক্তিই নয়। একেবারে দুর্বল এই যুক্তি ছাড়া কংগ্রেসের বক্তব্য কিছু নেই। আগের যুক্তির বিপরীত এই যুক্তি অত্যন্ত খেলো।

হিন্দু ও অন্ত্যজদের মধ্যে প্রকৃত বিভেদ যদি থাকে, এবং যদি অন্ত্যজদের বিরুদ্ধে হিন্দুরা বৈষম্য করতে থাকে, তাহলে অন্ত্যজদের রাজনৈতিক স্বীকৃতি আবশ্যক এবং হিন্দুদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক রক্ষাকবচ দেওয়া দরকার। আরও সুন্দর ভবিষ্যতের সম্ভাবনা দেখিয়ে বর্তমান অত্যাচারের বিরুদ্ধে অন্ত্যজদের সুরক্ষার বিষয় অবজ্ঞা করা চলবে না।

দ্বিতীয়ত, হিন্দু ও অন্ত্যজদের মধ্যে মিলনে বিশ্বাসী ও তার পন্থা উদ্ভাবনে সক্রিয় ব্যক্তিরাই এই যুক্তি দেন। কংগ্রেসিদের অনেক সময়ে বলতে শোনা যায় যে, অন্ত্যজদের সমস্যাটি সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যা। কিন্তু প্রশ্ন হল, একে সামাজিক সমস্যা বলার সময়ে কংগ্রেসিরা কি সত্যনিষ্ঠ? না কি, অন্ত্যজদের সঙ্গে রাজনৈতিক ক্ষমতা ভাগ করে নেওয়ার ভয়ে তারা এসব যুক্তি দিচ্ছে? আর তাঁরা যদি সত্যিই মনে করে থাকেন যে, এটা একটা সামাজিক সমস্যা, সেক্ষেত্রে তাঁদের সততার প্রমাণ কী? কংগ্রেসিরা কি হিন্দুদের মধ্যে সমাজ সংস্কারে কিছু করেছেন? উভয়ের মধ্যে বিবাহ সম্পর্ক বা একত্র ভোজনের জন্য কি প্রচার যুদ্ধ চালিয়েছেন? সমাজ সংস্কারে কংগ্রেসিদের কাজের নজির কী?

III

অন্ত্যজরা নিজেদের সমস্যা নিয়ে কী ভাবেন, এটা বলা ভাল। ব্রিটিশদের আগে অন্ত্যজরা অস্পৃশ্য হিসাবে থাকা মেনে নিয়েছিলেন। হিন্দু দেবতা কর্তৃক পূর্ব নির্ধারিত

ও হিন্দু রাষ্ট্র কর্তৃক রূপায়িত বিধি হিসাবে তাদের ভাগ্যের পরিণাম। এর থেকে পরিত্রাণের কোনও পথ যেন নেই। সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্যবশত ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সৈন্য- সামন্ত দরকার ছিল এবং এর জন্য অন্ত্যজরা ছাড়া কেউ ছিল না। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সেনা-বাহিনী ইতিহাসের প্রথম পর্বে মূলত অন্ত্যজদের নিয়ে গঠিত ছিল এবং যদিও অন্ত্যজরা এখন অসামরিক গোষ্ঠী হিসাবে অন্তর্ভুক্ত এবং সামরিক বাহিনী থেকে বর্জিত, অন্ত্যজদের নিয়ে গঠিত সৈন্য নিয়েই ব্রিটিশরা ভারত জয় করে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সৈন্যবাহিনীতে ভারতীয় সৈন্য ও তাদের ছেলে-মেয়েদের জন্য শিক্ষা আবশ্যক ছিল। সৈন্যবাহিনীতে শিক্ষা পাওয়ার সূত্রে অন্ত্যজরা এমন এক সুবিধা পেয়েছিল, যা আগে ছিল না। শিক্ষা তাদের মধ্যে নতুন দিশা ও নতুন মূল্যবোধের সঞ্চার করে। তারা সচেতন হয়ে বুঝে যে নিম্ন মর্যাদার তারা শিকার সেটা অলঙ্ঘ্য কোনও বিধি নয়, পুরোহিতদের খল চক্রান্তের দ্বারা তাদের ওপর এই কলঙ্কচিহ্ন পড়েছে। তারা এর লজ্জা বুঝে এবং এর থেকে নিষ্কৃতির জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়। তারাও প্রথমে এটাকে সামাজিক সমস্যা বলে মনে করে সামাজিক পথেই সমস্যা নিরসনের চেষ্টা করে। এটাই স্বাভাবিক ছিল। কারণ, তারা দেখে যে, হিন্দু ও অন্ত্যজদের মধ্যে বিয়ে বা একত্র ভোজনে নিষেধাজ্ঞা তাদের নিকৃষ্টতার প্রকাশ্য চিহ্ন। স্বাভাবিক ভাবেই তারা ধরে নেয়, এই কলঙ্কচিহ্ন মোচনের জন্য দরকার হিন্দুদের সঙ্গে সমানভাবে সামাজিক সম্পর্ক স্থাপন, যার পরিণামে বিবাহ সম্পর্ক ও একত্র ভোজনের ওপর নিষেধাজ্ঞার বিলোপ। অন্য কথায় অন্ত্যজরা তাদের দাসত্ব মোচনের প্রথম কর্মসূচিতে হিন্দু জাতপ্রথার শিকার সব গোষ্ঠীর মধ্যে জাতপ্রথা অবসানের চেষ্টা করে।

এ-ব্যাপারে অন্ত্যজরা হিন্দুদের একাংশের সমর্থন পায়। অন্ত্যজদের মতো হিন্দুরাও ব্রিটিশদের সংস্পর্শে এসে বুঝতে পারে যে, তাদের সামাজিক ব্যবস্থা খুব ত্রুটিপূর্ণ এবং বহু সামাজিক কু-ফলের জনক। তারাও সমাজ সংস্কারের আন্দোলন শুরু করতে চায়। বাংলায় রাজা রামমোহন রায় থেকে এর শুরু, সেখান থেকে এটা সারা ভারতে ব্যাপৃত হয় এবং শেষে পরিণতি পায় 'ইণ্ডিয়ান সোসাল রিফর্ম কনফারেন্স' -এ, যার আহ্বান ছিল রাজনৈতিক সংস্কারের আগে সামাজিক সংস্কার। অন্ত্যজরা সমাজ সংস্কার সম্মেলনের সমর্থনে দাঁড়ায়। সবাই জানেন, এই সংস্থা মৃত, কবরস্থ ও বিস্মৃত। কে একে হত্যা করল? কংগ্রেস। 'রাজনীতি প্রথম, রাজনীতিই সব', 'সবার দ্বারা প্রত্যেকের দ্বারা রাজনীতি' এই প্রচার দিয়ে কংগ্রেস সমাজ সংস্কার সম্মেলনকে তার প্রতিপক্ষ গণ্য করল। সম্মেলনের মতাদর্শ রাজনৈতিক সংস্কারের পূর্বসুরি হচ্ছে সমাজ সংস্কার, এটা কংগ্রেস অস্বীকার করে। কংগ্রেসের

মঞ্চ ও কংগ্রেস নেতাদের অবিরাম ইন্ধনে সমাজ সংস্কার সম্মেলন দগ্ধ ও ভস্মীভূত হয়। সমাজ সংস্কারের মাধ্যমে মুক্তির আশা লোপ পেলে অন্ত্যজরা নিজেদের রক্ষার জন্য রাজনৈতিক পন্থার আশ্রয় নেয়। এখন কংগ্রেসিরা মত পাল্টালে এবং এই সমস্যাকে সামাজিক বললে ভণ্ডামি করা হবে।

অন্ত্যজদের সমস্যাদি একটা সামাজিক সমস্যা, এটা বলা ভুল। কারণ, যৌতুক, বিধবার পুনর্বিবাহ, বিবাহে সম্মতির বয়স, ইত্যাদি সামাজিক সমস্যার মতো এটা নয়। মূলগত ভাবে এটা ভিন্ন প্রকৃতির সমস্যা, সংখ্যালঘুর স্বাধীনতা ও সুযোগের সমতা সংক্রান্ত সমস্যা। শত্রুভাবাপন্ন সংখ্যাগুরু সংখ্যালঘুদের স্বাধীনতা ও সমতার বিরোধী, এবং তারা এই নীতি জোর করে চালাতে চায়। এইদিক থেকে অন্ত্যজদের সমস্যা একটা রাজনৈতিক সমস্যা। যুক্তির খাতিরে যদি ধরে নেওয়া যায় যে, এটা একটা সামাজিক সমস্যা, তাহলে বুঝা শক্ত অন্ত্যজদের নিরাপত্তার জন্য রাজনৈতিক স্বীকৃতি ও রক্ষাকবচ দিলে হিন্দুদের সঙ্গে সামাজিক মিলনের পক্ষে বাধা হবে কেন? এই মিলনের প্রক্রিয়া চালু করার ইচ্ছা যদি থাকে তবে এই স্বীকৃতি বাধা হবে কেন! রাজনৈতিক ও সামাজিক বিষয়গুলির পারস্পরিক সম্পর্ক বিষয়ে তাদের ধারণা আছে বলে মনে হয় না। যুক্ত নির্বাচকমণ্ডলীর প্রতি পক্ষপাত ও পৃথক নির্বাচকমণ্ডলীর বিরোধিতা থেকেই এটা বুঝা যায়। যুক্তির ধারাও খুব মজার। যুক্ত নির্বাচন কেন্দ্রে হিন্দু অন্ত্যজ প্রার্থীকে ভোট দেবে এবং অন্ত্যজও অন্ত্যজ প্রার্থীকে ভোট দেবে। এতে সামাজিক সংহতি গড়ে ওঠে। পৃথক নির্বাচকমণ্ডলীতে হিন্দু হিন্দু প্রার্থীকে, অন্ত্যজ অন্ত্যজ প্রার্থীকে ভোট দেয়। এটা সামাজিক সংহতির প্রতিবন্ধক। এই দৃষ্টিকোণ থেকে অন্ত্যজরা নির্বাচকমণ্ডলীর বিষয়টি বিচার করে না। তাদের চিন্তা, এই দুইয়ের কোনটি দিয়ে অন্ত্যজরা পছন্দমতো অন্ত্যজ প্রার্থীকে নির্বাচিত করতে পারবে। কিন্তু আমি কংগ্রেসের যুক্তি পরীক্ষা করতে চাই। যুক্তি বেশি বা ঘোরালো করতে চাই না। কংগ্রেসের যুক্তি সঠিক বলে মনে হয়, কিন্তু এটা ওপর ওপর দেখা। এই সব নির্বাচন পাঁচ বছরে একবার হয়। এখন প্রশ্ন করা যেতে পারে, মাত্র একদিন যুক্তভাবে ভোট দিয়ে হিন্দু ও অন্ত্যজদের সংহতি হতে পারে, যদি পাঁচ বছরের বাকি দিনগুলি কাটে পৃথক জীবনযাত্রায়। অনুরূপ ভাবে প্রশ্ন আসে, পাঁচ বছরে একদিন পৃথক ভোট দিয়ে প্রচলিত পৃথকত্বের গভীরতা কত বাড়বে? বিপরীত ভাবে, পাঁচ বছরে একদিন পৃথক ভোটদান কীভাবে সংহতিসাধনে সক্রিয়দের কাজে বাধা দিতে পারে। একে সুনির্দিষ্ট করতে বলা যায়, অন্ত্যজদের জন্য পৃথক নির্বাচন কেন্দ্র হিন্দুদের সঙ্গে তাদের বিবাহ সম্পর্ক বা একত্র ভোজন-এ বাধা হতে পারে কীভাবে? আজন্ম মূর্খ ছাড়া একথা কে বলবে! কাজেই এটা

বলা অর্থহীন যে, অন্ত্যজদের পৃথক অংশ হিসাবে রাজনৈতিক স্বীকৃতি এবং সাংবিধানিক রক্ষাকবচ দিলে তাদের সঙ্গে হিন্দুদের বিভেদ চিরস্থায়ী হবে।

IV

অন্ত্যজদের রাজনৈতিক রক্ষাকবচের বিরুদ্ধে আরও বিক্ষিপ্ত যুক্তি আছে, এগুলি পরীক্ষা করা দরকার। এরকম এক যুক্তি হল, শুধু ভারতে নয়, অনেক দেশেই, ইউরোপেও সামাজিক বিভাগ রয়েছে। কিন্তু ইউরোপের মানুষ সংবিধান রচনার সময়ে এটা গণ্য করে না। ভারতে এসব বিবেচনা করা হবে কেন? তত্ত্বটা সাধারণ। কিন্তু এটা এমনভাবে বিস্তৃত করা হয় যে, অন্ত্যজদের দাবিও ঢাকা পড়ে যায়। সেজন্য আমি বলতে চাই, এই যুক্তি কেন ভিত্তিহীন।

মন্তব্য করতে গিয়ে আমি বক্তব্য এবং সেই বক্তব্যভিত্তিক যুক্তির মধ্যে পার্থক্য করতে চাই। বক্তব্যটা কিছুদূর পর্যন্ত ভাল। এতে যে বলা হচ্ছে, সব সমাজেই গোষ্ঠীসমূহ রয়েছে, সেটা খণ্ডন করা যায় না। কারণ ইউরোপে বা আমেরিকার সমাজে নানা গোষ্ঠী বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন উদ্দেশ্যে সহযোগী। কয়েকটি রক্তসম্পর্কে বা ভাষার সূত্রে জ্ঞাতির মতো একতাবদ্ধ। কয়েকটি সামাজিক শ্রেণী চরিত্রের, মর্যাদা ও অবস্থানের নিরিখে পৃথক। অন্যগুলি ধর্মীয় সংস্থা বিশেষ মতবাদে বিশ্বাসী। রাজনৈতিক দল, শিল্পপতিদের সংগঠন, অপরাধীদের দল ও নানা ধরনের উদ্দেশ্য নিয়ে সঙ্ঘবদ্ধ। কয়েকটি খুব সুদৃঢ়ভাবে কয়েকটি শিথিল ভাবে নানা ধরনের সাদৃশ্যমূলক সম্পর্কে জোটবদ্ধ। কিন্তু এই বক্তব্য আর একটু এগিয়ে যখন বলে বসে যে ভারতের জাতপ্রথা ইউরোপ ও আমেরিকার গোষ্ঠী ও শ্রেণীর মতো, তা মূর্খের মতো শোনায়। ইউরোপ, আমেরিকার শ্রেণী ও গোষ্ঠী আপাতদৃশ্যে জাত-এর মতো। কিন্তু মৌলিক ভাবে তা পৃথক। মুখ্য পার্থক্য হচ্ছে, ভারতের জাত-প্রথায় নিহিত বিচ্ছিন্ন ও বর্জনকারী চরিত্র, এটি নিয়মমাফিক ভাবে রক্ষিত হয় না, বিশ্বাস হিসাবে অনুসৃত হয়। ইউরোপ বা আমেরিকার গোষ্ঠী বা শ্রেণীর মধ্যে এই বৈশিষ্ট্য নেই।

তত্ত্বের কথায় এলে দেখা যাবে ভারতের সমাজ সংগঠন ইউরোপ আমেরিকার থেকে ভিন্ন, সেজন্য ওই দুই দেশে সংবিধান রচনায় সমাজ সংগঠনের পরিস্থিতি ও ঘটনা বিবেচ্য হয় না, কিন্তু ভারতে জাতপ্রথা ও অন্ত্যজদের বিষয় বাদ দেওয়া যায় না। বিষয়টি ভালভাবে বুঝবার জন্য আমি ব্যাখ্যা করছি কেন ইউরোপ আমেরিকার এটার দরকার নেই এবং কেন ভারতে দরকার আছে। গোষ্ঠী সংগঠিত

সমাজে বিপদ হচ্ছে, প্রতিটি গোষ্ঠী 'নিজের স্বার্থ' গড়ে তোলে এবং সাংবিধানিক রক্ষাকবচের প্রশ্ন ওঠে এই স্বার্থ চরিতার্থে অন্যের স্বার্থের ক্ষতি যাতে না হয় তার জন্য। যেখানে এই বিপদ অরাজনৈতিক উপায়ে মোকাবিলা করা যায় সেখানে সাংবিধানিক রক্ষাকবচের দরকার নেই। অন্যদিকে অরাজনৈতিক ভাবে এই ক্ষতি-রোধের ব্যবস্থা না থাকলে সাংবিধানিক রক্ষাকবচ জরুরি। ইউরোপে কোনও গোষ্ঠীর 'নিজের স্বার্থ' চরিতার্থে অন্যের ক্ষতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা রয়েছে। এটা আছে কারণ বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে বিচ্ছিন্নতা ও বর্জনমূলক ব্যবস্থা নেই, মুক্ত সামাজিক সম্পর্ক থাকার ফলে বিশেষ কোনও গোষ্ঠীর স্বার্থ মুখ্য হয় এবং তা পবিত্র ও অলঙ্ঘনীয় পরিগণিত মনে করে রক্ষা করে, এতে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সামাজিকরণ ও ব্যাপ্তি হয়। ইউরোপে বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক সমাজের প্রবণতায় প্রভাব ফেলে এবং চিন্তার সমন্বয়, লক্ষের অভিন্নতা ও কাজের ঐক্য সমন্বিত সমাজ গঠন করে। কিন্তু ভারতের ব্যাপার সম্পূর্ণ আলাদা। ভারতের জাতপ্রথা বিচ্ছিন্ন ও বর্জনকর। সামাজিক আন্তঃসম্পর্কের অবকাশ নেই। লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাধন নেই। কোনও জাত গোষ্ঠী বা জাত সমষ্টি নিজের স্বার্থ অন্যের স্বার্থের বিরুদ্ধে পবিত্র ও চরম বলে মনে করে। তারা পারস্পরিক মেলামেশা বা সহযোগিতা করে বলে চরিত্র পাল্টায় না। সহযোগিতার এই কাজ যান্ত্রিক, সামাজিক নয়। ব্যক্তি একে অপরের বিরুদ্ধে কাজ করে নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য। তার আবেগগত বা বৌদ্ধিক মেজাজ কোনও ব্যাপার নয়। তারা নির্দেশ দেয় ও নেয়। এই ঘটনা কাজ ও ফলাফল পরিমার্জিত করে। কিন্তু এতে তাদের অবস্থায় প্রভাব ফেলে না। এই যেখানে ঘটনা, ভারতীয় সংবিধানে রক্ষাকবচ রাখতে হবে যাতে জাত গোষ্ঠীরা অন্যের স্বার্থ বিপন্ন করে নিজের স্বার্থ পূরণ করতে না পারে।

ভারতীয় জাতপ্রথার আর এক বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যার জন্য ভারতের সংবিধান রচনার সময়ে এটা বিবেচনা করে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে হবে। সব সমাজ-ই গোষ্ঠীর সমন্বয়ে গঠিত। কিন্তু এটা বুঝতে হবে যে, সব সমাজে গোষ্ঠীসম্পর্ক একই ধরনের নয়। কোনও সমাজে গোষ্ঠীসমূহ অন্যের ক্ষেত্রে দৃষ্টিভঙ্গিতে অসামাজিক হতে পারে। অন্য সমাজে সেটা সমাজবিরোধী হতে পারে। যেখানে বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীর মনোভাব অসামাজিক সেক্ষেত্রে সংবিধান রচনায় তা গ্রাহ্য না করলেও চলে। অসামাজিক হলে গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে বিপদের আশঙ্কা থাকে না। কিন্তু কোনও গোষ্ঠী সমাজবিরোধী প্রবণতা থেকে অন্যের বিরুদ্ধে শত্রুর কাজ করলে সংবিধান রচনায় তা গ্রাহ্য করতে হবে এবং সমাজবিরোধী গোষ্ঠীর শিকার গোষ্ঠীকে সাংবিধানিক রক্ষাকবচ দিতে হবে। ভারতে জাতগুলি শুধু অসামাজিক নয়, সমাজবিরোধীও।

কয়েকটি ঘটনা বললেই বুঝা যাবে হিন্দুরা অন্ত্যজদের বিরুদ্ধে কত সমাজবিরোধী। যেমন, হিন্দুরা কখনই জলাধার থেকে অন্ত্যজদের জল নিতে দেবে না। বিদ্যালয়ে তাদের প্রবেশাধিকার দেবে না। বাসে যাতায়াত করতে দেবে না। রেলে এক-ই বগিতে ভ্রমণ করতে দেবে না। হিন্দুরা অন্ত্যজদের পরিষ্কার জামাকাপড়ও পরতে দেবে না। অলঙ্কার পরতে দেবে না। তাদের বাড়ির ছাদে টালি দিতে দেবে না। অন্ত্যজদের নিজের জমির মালিক হলে বরদাস্ত করবে না। হিন্দুরা অন্ত্যজদের নিজের গরু রাখতে দেবে না। কোনও হিন্দু দাঁড়িয়ে থাকলে অন্ত্যজদের বসার অনুমতি মিলবে না। এ সবকিছু খারাপ হিন্দুর বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। অন্ত্যজদের বিরুদ্ধে হিন্দু সমাজের চিরন্তন ঘৃণা ও সমাজবিরোধী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এসব এসেছে[১]।

এ বিষয়ে আর বিস্তারিত যাওয়ার দরকার নেই। এটাই বলা যথেষ্ট যে, এই তত্ত্ব অসঙ্গতিতে ভরা এবং সাংবিধানিক রক্ষাকবচের বিরুদ্ধে এই যুক্তি ব্যবহৃত হলে তা লজ্জাজনক নীচতার পর্যায়ে পড়বে।

V

আর একটা যুক্তি অনেক সময়ে ওঠে। এর ভিত্তি হল, অস্পৃশ্যতা এখন বিলীয়মান। সেজন্য ভারতের জাতীয় জীবনে তাদের পৃথক হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়ার দরকার নেই। সবকিছুই বিলুপ্ত হয় এবং মানব ইতিহাসে কোনও কিছুই স্থায়ী নয়। এই বিষয়টি বিবেচ্য হতে পারে যখন অস্পৃশ্যতা দৃঢ়ভাবে গ্রথিত ও বিস্তৃত হবে। সেই অবস্থা না আসা অবধি এ বিষয়ে দৃষ্টি দেওয়া অপ্রয়োজনীয়। অস্পৃশ্যতার বিলুপ্তি আমরা সবাই আশা করব নিশ্চয়ই। কিন্তু যারা সংশোধনাতীত ভাবে আশাবাদী হিসাবে নিজেদের জাহির করে, তাদের কথায় আমরা যেন ভুল পথে না যাই। কেউ বিমর্ষ থাকলে তাকে চাঙ্গা করার জন্য আশাবাদী সঙ্গীর দরকার আছে। কিন্তু সবসময়ে সে ঘটনার প্রকৃত সাক্ষী নয়।

এই যুক্তি কোনও যুক্তিই নয়। কিন্তু যেহেতু অনেকেই এর দ্বারা আকৃষ্ট হতে পারেন, সেজন্য আমি এটা প্রকাশ করতে চাই এবং এর নিরর্থকতা তুলে ধরতে চাই। যাঁরা এই বিষয়টি তুলে ধরছেন তাঁরা 'আমাকে স্পর্শ কোরোনা' মতবাদ হিসাবে অস্পৃশ্যতা এবং মানসিক দৃষ্টিভঙ্গির অভিব্যক্তি সামাজিক বৈষম্যরূপে অস্পৃশ্যতার মধ্যে পার্থক্য করেন না। এই দুটি একেবারে ভিন্ন। শহরাঞ্চলে হয়তো

---

১. বিস্তারিত বিবরণের জন্য আমার লেখা 'হোয়াট দি হিন্দুজ হ্যাভ ডান টু-আস্' দ্রষ্টব্য।

'আমাকে ছুঁয়ো না' মতবাদ কমে থাকতে পারে, তবে তেমন হারে অস্পৃশ্যতা কমেছে কিনা আমার সন্দেহ আছে। তবে আমি নিশ্চিত, অন্ত্যজদের বিরুদ্ধে বৈষম্য করার হিন্দু প্রবণতা শহর বা গ্রামে অদূর ভবিষ্যতে কমবে না। বৈষম্য করার প্রবণত-স্বরূপ অস্পৃশ্যতাই শুধু নয়, 'আমায় স্পর্শ কোরো না' মতবাদ হিসাবে অস্পৃশ্যতা হিন্দুদের বহু গ্রামেই অনতিদূর সময়ের মধ্যে নিশ্চিহ্ন হবে বলে মনে হয় না। মানব মনের ২০০০ বছরের কুটিলতা একেবারে বিপরীতমুখী করা যায় না।

আমি জানি, হিন্দু ধর্মের বহু প্রবক্তা বলেন, হিন্দু ধর্ম খুব মানানসই ধর্ম, সব কিছুকে সহজেই মানিয়ে নিতে পারে। আমার মনে হয় না, বেশি লোক ধর্মের এই ধরনের উপযোগিতাকে গৌরব বলে মনে করবে, যেমন কোনও শিশু যদি ছাইভস্ম গোবর খেতে ও হজমে অভ্যস্ত হয়, তার সম্বন্ধে কেউ উচ্চ ধারণা পোষণ করবে। তবে সেটা অন্য ব্যাপার। এটা ঠিকই, হিন্দু ধর্ম বেশ মানিয়ে নিতে পারে। এর মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন 'আল্লাহ্-উপনিষদ' নামের সাহিত্য পুস্তক। আকবরের সময়ে ব্রাহ্মণরা আকবরের 'দীন ইলাহি'-কে হিন্দু ধর্মের মধ্যে স্থান দেওয়ার জন্য গ্রন্থটি রচনা করে এবং হিন্দু দর্শনের সপ্তম ব্যবস্থা হিসাবে স্বীকৃতি দেয়। এটা সত্যি, হিন্দু ধর্ম অনেক কিছু আত্মগত করে। গো-ভক্ষণকারী হিন্দু মতবাদ (অথবা হিন্দু ধর্মের প্রথম পর্বের প্রকৃত নাম ব্রাহ্মণবাদ) বৌদ্ধ ধর্মের অহিংসার তত্ত্ব সাঙ্গীকরণ ও নিরামিষ মতবাদের ধর্ম পরিগণিত হয়। কিন্তু একটা ব্যাপার হিন্দু মতবাদ কোনওদিন করতে পারেনি। অন্ত্যজদের আত্মীকরণ ও অস্পৃশ্যতার বাধা নিরসন। গান্ধীর আগে বহু সমাজ সংস্কারক অস্পৃশ্যতা উচ্ছেদের চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তাঁরা সবাই ব্যর্থ হয়েছেন। তাঁদের ব্যর্থতার কারণ আমার কাছে অত্যন্ত সহজ। অন্ত্যজদের থেকে হিন্দুদের ভয়ের কিছু নেই, অস্পৃশ্যতার নিরসনে তাদের লাভও কিছু নেই। হিন্দুরা গো-মাংস ভক্ষণ ত্যাগ করে, কারণ তাদের ভয় ছিল নতুবা বৌদ্ধ ধর্ম হিন্দু ধর্মকে হটিয়ে দেবে। হিন্দুরা 'আল্লাহ্-উপনিষদ' লিখেছিল, কারণ আকবরকে একটা নতুন ধর্ম প্রতিষ্ঠার সাহায্য করায় অনেক লাভ ছিল। সম্রাটকে খুশি করে লেখক অর্থ পান এবং ইসলামের চেয়ে কম অত্যাচারী ও হিন্দুদের ওপর কম নিপীড়নকারী নতুন ধর্ম প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করে লাভবান হন। অন্ত্যজদের মধ্যে বেশি নিশ্চিত ব্যক্তি কারও কাছে এইসব বিবেচ্য নয়। হিন্দুরা সহজেই অস্পৃশ্যতার নিরসন করবে এটা তারা আশা করে না।

হিন্দুদের পক্ষে ভয় ও লাভের কিছু নেই এমন নয়, কারণ অস্পৃশ্যতা দূর হলে তাদের অনেক ক্ষতি। হিন্দুদের কাছে অস্পৃশ্যতার প্রথা স্বর্ণখনির মতো। এতে ২৪

কোটি হিন্দুর ৬ কোটি অন্ত্যজ সেবক আছে যারা হিন্দুদের জাঁক-জমক ও ঐশ্বর্য রক্ষণাবেক্ষণে সহায়ক, এদের ছাড়া প্রভু শ্রেণী হিসাবে হিন্দুদের গৌরব ও মর্যাদাবোধ অক্ষুণ্ণ থাকে না। এতেই ২৪ কোটি হিন্দুর ৬ কোটি অন্ত্যজ আছে যাদের জোর করে খাটানো যায় এবং সম্পূর্ণ দুঃস্থ অসহায় অবস্থার জন্য প্রায় কোনও কিছুর বিনিময় ছাড়া তারা শ্রম দিতে বাধ্য। এই প্রথার জন্য ২৪ কোটি হিন্দুর নোংরা কাজগুলি—জমাদার, ঝাড়ুদারের কাজ অন্ত্যজরা করে, ধর্ম অনুযায়ী হিন্দুদের জন্য এই কাজ নিষিদ্ধ এবং হিন্দুদের এই কাজ অ-হিন্দু অন্ত্যজদের করার বিধি। এতে ২৪ কোটি হিন্দুর মধ্যে ৬ কোটি অন্ত্যজ নগণ্য পেশার কাজ করে, বড় কাজগুলি হিন্দুদের জন্য সংরক্ষিত। এই ব্যবস্থায় ২৪ কোটি হিন্দুর জন্য ৬ কোটি অন্ত্যজ আছে যারা মন্দার সময়ে আঘাত ও সমৃদ্ধির সময়ে বোঝাস্বরূপ, কারণ মন্দার সময়ে প্রথম আঘাত আসে অন্ত্যজদের ওপর এবং শেষে হিন্দুর ওপর, আর সমৃদ্ধির প্রথম কাজ জোটে হিন্দুর, শেষ অন্ত্যজদের।

বেশিরভাগ লোক বিশ্বাস করে যে, অস্পৃশ্যতা একটা ধর্মীয় ব্যবস্থা। এটা শুধু ধর্মীয় ব্যবস্থা মনে করা ভুল। অস্পৃশ্যতা ধর্মীয় ব্যবস্থার চেয়ে অনেক বেশি কিছু। এটা একটা অর্থনৈতিক ব্যবস্থাও বটে, এবং সেটা দাসপ্রথার চেয়ে নিকৃষ্ট। দাসত্ব প্রথায় প্রভুর দায়িত্ব থাকে দাসের খাদ্য, পোশাক, আশ্রয় দানের এবং তাকে সুস্থ অবস্থায় রাখা, যাতে তার বাজার-মূল্য না কমে। কিন্তু অস্পৃশ্যতা ব্যবস্থায় হিন্দুরা অন্ত্যজদের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব নেয় না। অর্থনৈতিক ব্যবস্থা হিসাবে এতে দায়-দায়িত্ব ছাড়া অবাধ শোষণের ব্যবস্থা রয়েছে। অস্পৃশ্যতা চরম অর্থনৈতিক শোষণ-ই নয়, নিয়ন্ত্রণহীন শোষণের ব্যবস্থা। কারণ এর বিরুদ্ধে কোনও স্বাধীন জনমত নেই। প্রশাসনে কোনও নিরপেক্ষ যন্ত্র নেই একে সংযত করায়। জনমতের কাছে কোনও আবেদন নেই, কারণ জনমত যেটুকু রয়েছে তা হিন্দুদের, এরাই শোষক শ্রেণী এবং সেজন্য শোষণের সমর্থক। পুলিশ বা বিচার বিভাগ থেকে কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই, সহজ কারণ হিন্দুরাই এর মধ্যে আছে এবং তারা শোষকদের দলের পক্ষে।

যাঁরা মনে করেন যে অস্পৃশ্যতা শীঘ্রই অন্তর্হিত হবে, এর থেকে হিন্দুদের জন্য অর্থনৈতিক সুবিধার প্রতি তাঁরা নজর দেননি। অন্ত্যজরা নিজেদের অস্পৃশ্যতা মোচনে কিছু করার অধিকারী নয়। তাদের নিজেদের কোনও দোষের জন্য এই ব্যবস্থার উদ্ভব হয়নি। অস্পৃশ্যতা হিন্দুদের একটা দৃষ্টিভঙ্গি। অস্পৃশ্যতা নিরসনে হিন্দুদের পরিবর্তন চাই। হিন্দুরা কি তা হবেন?

হিন্দুর কি বিবেক আছে? নৈতিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে অবিমিশ্র ঘৃণার জন্য কোনও

হিন্দু কোনওদিন উদ্দীপ্ত হয়েছে? ধরে নেওয়া যাক, অস্পৃশ্যতাকে নৈতিক অন্যায় মনে করার মতো তার পরিবর্তন হল, ধরে নেওয়া গেল মানুষও ঈশ্বরের মধ্যে নিজেকে যথাযথ স্থানে রাখার মতো সচেতন হল, সে কি অস্পৃশ্যতা থেকে লব্ধ অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুবিধা ছেড়ে দেবে? ইতিহাস বোধহয় এটা, এই উপসংহার স্বীকার করবে না যে, হিন্দুর বিবেক জোরদার অথবা বিবেক থাকলে তা এত সক্রিয়, যাতে সে নৈতিক ক্রোধে উদ্দীপ্ত হয়ে অন্যায়ের নিরসনে যুদ্ধ ঘোষণা করবে। ইতিহাস-ই দেখিয়েছে, যেখানে নৈতিকতার সঙ্গে অর্থনীতির সঙ্ঘাত, সব সময়েই জয় অর্থনীতির। কায়েমি স্বার্থ কখনও নিজের সুবিধা ছাড়ে না। শক্তি প্রয়োগে বাধ্য হয় ছাড়তে, অন্ত্যজরা সেরকম শক্তি প্রয়োগের আশা করতে পারে না। তারা গরিব এবং বিক্ষিপ্ত। একটু মাথাচাড়া দিলেই তাদের দমন করা যায়।

এই বিশ্লেষণ অনুযায়ী স্বরাজ হিন্দুদের আরও ক্ষমতাশালী করবে, অন্ত্যজদের আরও অসহায় করবে, এবং এটা সম্ভব যে, স্বরাজ হিন্দুদের জন্য যে আর্থিক সুবিধা দেবে তা অস্পৃশ্যতা নিরসনের বদলে প্রসারিত করবে। কাজেই অস্পৃশ্যতা বিলুপ্ত হচ্ছে একথা আজব কল্পনা এবং পরিকল্পিত মিথ্যা। অন্ত্যজদের সাংবিধানিক রক্ষাকবচের প্রশ্নে বর্তমান বাস্তব অবজ্ঞা করে এই যুক্তি বিবেচনা করা মূর্খতা হবে।

অধ্যায় ৯

বিদেশিদের কাছে আর্জি
স্বৈরাচারীর ক্রীতদাস রাখার স্বাধীনতা যেন না থাকে

I

এটা সাধারণ অভিজ্ঞতা, কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া ভারতের রাজনীতিতে উৎসাহী বেশিরভাগ বিদেশিই কংগ্রেসের পক্ষে। এতে স্বাভাবিক ভাবেই দেশের অন্য রাজনৈতিক দলগুলি ক্ষুব্ধ ও বিভ্রান্ত, যেমন মুসলমানদের প্রতিনিধি বলে দাবিদার মুসলিম লীগ, বর্তমানে স্তিমিত উৎসাহ তবু অ-ব্রাহ্মণদের মুখপত্র হিসাবে দাবিদার 'জাস্টিস পার্টি', অন্ত্যজদের প্রতিনিধিত্ব দাবিদার সর্বভারতীয় 'তফসিলি জাত মহাসঙ্ঘ', এরা সবাই বিদেশিদের কাছে সমর্থনের জন্য আবেদন করছে কিন্তু বিদেশিরা এদের কথা শুনতেই প্রস্তুত নয়। বিদেশিরা কংগ্রেসকে সমর্থন করে কেন, অন্য দলদের করে না কেন? এর পক্ষে দুটি যুক্তি দেন বিদেশিরা। একটা যুক্তি হল, তাঁরা কংগ্রেসকে সমর্থন করেন, কারণ তাঁরা মনে করেন, কংগ্রেসই ভারতীয়দের প্রতিনিধিত্বমূলক একমাত্র সংস্থা এবং কংগ্রেস ভারতের পক্ষে এমনকী অন্ত্যজদের হয়েও কথা বলতে পারে। এই বিশ্বাস কি ঠিক? দুটি পরিস্থিতির জন্য এই বিশ্বাস এসেছে।

এই মতামত প্রসারের প্রথম ও মুখ্য. কারণ, কংগ্রেসের পক্ষে ভারতের সংবাদ মাধ্যমগুলির প্রচার। ভারতের সংবাদপত্র কংগ্রেসের দুষ্কর্মের সহযোগী। এরা এই মতে বিশ্বাসী যে, কংগ্রেস কোনও সময়ে ভুল করে না এবং কংগ্রেসের মর্যাদা ও আদর্শের পরিপন্থী কোনও সংবাদ প্রচার না করার নীতি অনুসরণ করে। ভারতের সংবাদ মাধ্যমের জন্যই সবার প্রতিনিধিত্ব দাবিকারী কংগ্রেসের চিৎকার অবিরাম প্রচারিত হয়। এর ফলে ইংলন্ড ও আমেরিকার মানুষ একটা কথাই জানে ও বুঝে যে, ভারতের কংগ্রেস-ই একমাত্র প্রতিনিধিত্বমূলক সংস্থা।

কংগ্রেস ভারতের অন্ত্যজ সহ একমাত্র সবার প্রতিনিধিত্ব করে এই বিশ্বাসের দ্বিতীয় কারণ, কংগ্রেসের এই দাবির বিরুদ্ধে অন্ত্যজদের প্রচারের অভাব। অন্ত্যজদের পক্ষে এই ব্যর্থতার নানা কারণ দেওয়া হয়। তাদের কোনও সংবাদপত্র নেই, এবং তাদের কাছে সংবাদপত্র বন্ধ। এরা অন্ত্যজদের সামান্যতম প্রচারও দেয় না।

অন্ত্যজদের নিজেদের সংবাদপত্র নেই। এটা পরিষ্কার যে, বিজ্ঞাপন ছাড়া কোনও সংবাদপত্র টেকে না। বিজ্ঞাপনের টাকা আসে ব্যবসায়ীদের থেকে, ভারতে ছোট ও বড় সব ব্যবসায়ীই কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত, অকংগ্রেস কোনও মুখপত্র তারা বরদাস্ত করবে না। ভারতে এসোসিয়েটেড প্রেস-এর কর্মচারির বেশিরভাগই মাদ্রাজের ব্রাহ্মণ, ভারতের সব সংবাদপত্রেই এদের দাপট এবং এরা স্বাভাবিক কারণেই কংগ্রেসের সমর্থক, কংগ্রেসের বিরুদ্ধে কোনও সংবাদ প্রচার পায় না। তবে প্রচারে ব্যর্থতার জন্য অন্ত্যজদের প্রচার করার ইচ্ছার অভাবও দায়ী। ইচ্ছার অভাব মূলত দেশপ্রেমের জন্য, বিশ্বের কাছে হেয় হয় এমন কোনও বিষয় তারা বলতে চায় না। ভারতে রাজনীতির দুটি দিক রয়েছে, বৈদেশিক রাজনীতি ও সাংবিধানিক রাজনীতি। ভারতের বৈদেশিক রাজনীতি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ থেকে স্বাধীনতার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, সাংবিধানিক রাজনীতি স্বাধীন ভারতের সংবিধানের চরিত্র বিষয়ক। এই দুই রাজনীতি পৃথক। কিন্তু অন্ত্যজদের আশঙ্কা, ভারতের দুই রাজনীতি যদিও পৃথক, এ ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ যারা, অর্থাৎ বিদেশিরা, এই দুইকে পৃথক করতে অক্ষমই নয়, তারা সাংবিধানিক রাজনীতির ওপর বিতর্ককে ভারতের বৈদেশিক রাজনীতির চরম লক্ষ্য সম্বন্ধে মতভেদ হিসাবে মনে করে। সেজন্যই অন্ত্যজরা নীরব থাকে এবং কংগ্রেসের প্রচার অপ্রতিহত থাকে। অন্ত্যজদের এই নীরবতার পেছনে দেশপ্রেম কংগ্রেস স্বীকার করবে না। কংগ্রেসের প্রচার অনেক সময়েই অন্ত্যজদের বিরুদ্ধে হয়। বাস্তব ঘটনা হল, তাদের নীরবতা এবং প্রকাশ্য বিরোধিতা এড়ানোর ইচ্ছার কারণেই সাধারণ বিশ্বাস জন্মেছে যে, কংগ্রেস সবার, এমনকী অন্ত্যজদেরও প্রতিনিধিত্ব করে।

দুঃখের হলেও বিদেশিদের এই প্রচারে প্রভাবিত হওয়া মার্জনীয়। কংগ্রেসের প্রতিনিধিত্বমূলক চরিত্র নির্বাচনে পরীক্ষিত না হওয়ার জন্যই এটা হয়েছে। কিন্তু ১৯৩৭ সালের নির্বাচন হলে এই পরীক্ষা হয়। নির্বাচনের যেটুকু ফলাফল পরীক্ষা করা গেছে, তাতে কংগ্রেসের প্রতিনিধিত্বমূলক চরিত্র সম্বন্ধে প্রচারের যৌক্তিকতায় আস্থা রাখা মুশকিল। নির্বাচনের ফলাফলে কী বুঝা গেছে সেটা গ্রন্থের পূর্বাংশে আলোচিত হয়েছে, সাধারণ ভাবে ও অন্ত্যজদের বিষয়ে। সুতরাং এখন হয়তো সব তথ্য জেনে বিদেশিরা আগের মতো কংগ্রেসের দাবি স্বীকার করবেন না এবং বুঝবেন যে কংগ্রেস ছাড়া অন্যান্য দল, বিশেষ করে অন্ত্যজরা ভারতের রাজনৈতিক সমস্যা নিয়ে ভিন্ন মত পোষণ করে। বিদেশিদের কংগ্রেসকে সমর্থনের দ্বিতীয় কারণ, তাদের বিশ্বাস, কংগ্রেস ভারতের স্বাধীনতার জন্য লড়ছে। বিদেশি দেখছেন কংগ্রেস কর্মীরা ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে সঙ্ঘাত করছে, সত্যাগ্রহ করছে, বিদেশি সরকারের আইন ভঙ্গ করছে, সরকারের সঙ্গে অসহযোগ প্রচার করছে, কর বর্জনের আন্দোলন,

কারাবরণ, পদ গ্রহণে অসম্মতি এবং নানাভাবে দেশের স্বাধীনতার জন্য আত্মত্যাগকারী হিসাবে প্রতিপন্ন করছে। বিদেশিরা দেখছেন, অন্য দলগুলি নিস্পৃহ। এসব থেকে তিনি উপসংহার করছেন যে, কংগ্রেস দেশের স্বাধীনতার জন্য লড়াই করছে এবং স্বাধীনতা প্রেমিক হিসাবে তিনি স্বাধীনতার সংগ্রাম সমর্থন করছেন। এখানে আমি সমস্যার আরেক দিক নিয়ে বলতে চাইছি, কংগ্রেস কার স্বাধীনতার জন্য লড়ছে?

II

স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামরত সংস্থা হিসাবে কংগ্রেসের পক্ষ নিয়ে বিদেশিরা দেশের স্বাধীনতা ও দেশের মানুষের স্বাধীনতার মধ্যে পার্থক্য করেন না। এই পার্থক্য না করায় বিদেশিরা বিষয়টা বুঝা দূরে থাক, দিকভ্রান্ত ও বোকা বনে যান। কারণ, সমাজ, জাতি, দেশ এসব কথা দ্ব্যর্থবোধক না হলেও, আকারহীন। এটা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, 'জাতি' শব্দের অর্থ অনেক ধরনের হতে পারে। দার্শনিক ভাবে জাতিকে একটি একক রূপে গণ্য করা যেতে পারে, তবে সমাজতত্ত্বগত ভাবে একে বহু শ্রেণীর সমন্বয় বলে মনে করা হয় এবং জাতির স্বাধীনতা কথাটি বাস্তব করতে হলে এর বিভিন্ন শ্রেণীর স্বাধীনতার কথা বলতে হবে, বিশেষ করে যারা ক্রীতদাস শ্রেণীরূপে পরিগণিত, তাদের কথা থাকা চাই। কাজেই কংগ্রেস ভারতের স্বাধীনতার জন্য লড়ছে সুতরাং ভারতের জনসাধারণ এবং সর্বনিম্ন স্তরের মানুষের স্বাধীনতার জন্য লড়ছে মনে করে খুশি হওয়া মূর্খামি।

কংগ্রেস স্বাধীনতার জন্য লড়ছে কিনা, এই প্রশ্নের সঙ্গে কংগ্রেস কার স্বাধীনতার জন্য লড়ছে, তুলনা করার গুরুত্ব নগণ্য। এটা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক ও জরুরি প্রশ্ন, এবং স্বাধীনতাপ্রেমী ব্যক্তির পক্ষে এই প্রশ্নে সত্য যাচাই না করে কংগ্রেসকে সমর্থন করা ভুল হবে। কিন্তু কংগ্রেসকে সমর্থনকারী বিদেশিরা এই প্রশ্ন তোলার প্রয়োজন বোধ করেন না। এহেন গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে বিদেশিরা নিস্পৃহ কেন? আমি যতদূর বুঝি, এই নিস্পৃহতার কারণ পশ্চিমে গণতন্ত্র ও স্বায়ত্ত শাসনসম্বন্ধে ভুল ধারণা এবং এই দিয়েই বিদেশিরা ভারতীয় রাজনীতির বিচার করেন।

রাজনীতি সম্বন্ধে পশ্চিমী লেখকরা মনে করেন, স্বায়ত্তশাসনের জন্য দরকার, গ্রোট যাকে বলেছেন সাংবিধানিক নৈতিকতা। সাংবিধানিক নৈতিকতার অর্থ*. :

---

* 'হিস্ট্রি অব্ গ্রীস্', গ্রোটে, খণ্ড ৩, পৃ : ৩৪৭

'সংবিধানের প্রতি সার্বভৌম মর্যাদা অনুযায়ী সাংবিধানিক কর্তৃপক্ষের প্রতি আনুগত্য এবং তার মধ্যেই বাক্ স্বাধীনতা, আইন নির্দিষ্ট নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত কাজের অধিকার এবং সেইসব কর্তৃপক্ষের সাধারণ কাজে বিধি-নিষেধের সঙ্গে নাগরিকদের মধ্যে আস্থা, দলীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতা স্বীকার, সংবিধানের ভাবধারা নিজের মতো অপরের কাছেও পবিত্র বলে গণ্য করা।' কোনও জনসমষ্টির মধ্যে এইসব অভ্যাস সক্রিয় থাকলে স্বায়ত্তশাসন কার্যকরী হতে পারে। এর চেয়ে বেশি কিছু দেখার দরকার নেই। এটাই পশ্চিমী লেখকদের অভিমত। সদৃশভাবে, গণতন্ত্র বিশেষজ্ঞ পশ্চিমী লেখকরা মনে করেন, গণতন্ত্রের আদর্শ রূপায়ণে, 'জনসাধারণের জন্য, জনসাধারণের দ্বারা এবং জনসাধারণের' সরকারের জন্য দরকার সর্বজনীন ভোটাধিকার। এছাড়া যেসব পন্থা রয়েছে, ভোট দিয়ে জনপ্রতিনিধিকে পদচ্যুত করা, গণভোট, স্বল্পমেয়াদি লোকসভা, অনেকে দেশে এগুলি কার্যকরী রয়েছে। কিন্তু বেশিরভাগ দেশে সর্বজনীন ভোটাধিকার ছাড়া আর কিছু নেই।

আমি নির্দ্বিধায় বলতে পারি, এই দুটি ধারণাই ভ্রান্ত ও বিভ্রান্তিকর। গণতন্ত্র ও স্বায়ত্তশাসন সর্বত্র ব্যর্থ হওয়ার কারণ এই ভ্রান্ত ধারণা। সাংবিধানিক রূপের সরকারের রক্ষায় সাংবিধানিক নৈতিকতার দরকার আছে। কিন্তু সাংবিধান সরকার চালানো এবং স্বায়ত্তশাসন এক জিনিস নয়। তেমন-ই এটা স্বীকার করা যায় যে, সর্বজনীন ভোটাধিকার যৌক্তিকভাবে জনসাধারণের সরকার সৃষ্টি করতে পারে। কিন্তু এটা সেই অর্থে গণতান্ত্রিক সরকার করতে পারে না, যে অর্থে গণতন্ত্রকে জনসাধারণের দ্বারা ও জনসাধারণের জন্য সরকার বুঝায়।

প্রতীচ্যের রাজনৈতিক ভাষ্যকাররা গণতন্ত্র ও স্বায়ত্তশাসন সম্বন্ধে যে ধারণা পোষণ করেন, নানা কারণে তা ভ্রান্ত। প্রথমত, তাঁরা এই অকাট্য ঘটনা গণ্য করেননি যে, সব দেশেই ঐতিহাসিক পরিস্থিতির জন্য এক শাসক শ্রেণী রয়েছে, তারা শাসন করে এবং তাদের কাছে সর্বজনীন ভোটাধিকার এবং সংবিধানিক নৈতিকতা ক্ষমতায় পৌছনোর পক্ষে অন্তরায় নয়, শাসিত শ্রেণী যাদের মনে করে স্বাভাবিক নেতা এবং যাদের তারা স্বেচ্ছাকৃত হয়েই নির্বাচিত করে। দ্বিতীয়ত, বিদেশিরা বুঝতে অক্ষম যে, গণতন্ত্র ও স্বায়ত্তশাসনের পক্ষে শাসক শ্রেণীর অস্তিত্ব বেমানান এবং শাসক শ্রেণী যেখানে শাসন ক্ষমতা করায়ত্ত করে সেখানে গণতন্ত্র ও স্বায়ত্তশাসন আছে বলা ভুল, এগুলি শুধু আকারগত হলে অবশ্য পৃথক কথা। তৃতীয়ত, বিদেশিরা সচেতন বলে মনে হয় না যে, সর্বজনীন ভোটাধিকার-এর গণতন্ত্র ও স্বায়ত্তশাসন বাস্তব হয় না, শাসক শ্রেণী যখন শাসনক্ষমতা কব্জা করার ক্ষমতা হারায় তখন-ই গণতন্ত্র বাস্তব হতে পারে। চতুর্থ, এঁরা ভুলে যান যে কিছু দেশে শাসিত শ্রেণী শাসক

শ্রেণীকে ক্ষমতা থেকে উৎখাত করতে সফল হতে পারে শুধুমাত্র ভোটাধিকার প্রয়োগ করে, কিন্তু অনেক দেশের শাসক শ্রেণী এমন ভাবে নিজেদের সুরক্ষিত রাখে যাতে শাসিত শ্রেণীর হাতে সর্বজনীন ভোটাধিকার ছাড়াও অন্যান্য রক্ষাকবচ থাকা দরকার। সর্বোপরি, এইসব বিদেশিরা লক্ষ্য করেন না যে, শাসক শ্রেণীর উপস্থিতির ফলে গণতন্ত্র ও স্বায়ত্তশাসনের পরিকল্পনায় যেটি দরকার তা হল শাসক শ্রেণীর সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং সমাজ-দর্শন। কারণ শাসক শ্রেণী যতদিন শাসন করার ক্ষমতা অটুট রাখে, শাসিত শ্রেণীর স্বাধীনতা ও উন্নতি নির্ভর করে শাসক শ্রেণীর সামাজিক বিবেক এবং জীবন-দর্শনের ওপর।

গণতন্ত্র ও স্বায়ত্তশাসনের সঠিক রূপায়ণে যাঁরা বিশ্বাসী, তাঁদের পক্ষে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি হবে গণতন্ত্রের পথে অন্তরায়স্বরূপ মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হিসাবে শাসক শ্রেণীর অস্তিত্ব মেনে নেওয়া। কোনও স্বাধীন দেশে স্বাধীনতা শুধুমাত্র শাসক শ্রেণীর বিশেষ অধিকার হবে, না সবার স্বাধীনতার সুযোগ থাকবে, এটা গণ্য না করা মারাত্মক ভুল হবে। সেজন্য, আমার মতে, যে বিদেশি কংগ্রেসের পক্ষে থাকার সিদ্ধান্ত নেবেন তাঁর কাছে এই প্রশ্ন মুখ্য নয় কংগ্রেস স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করছে কিনা। তাঁর প্রশ্ন হওয়া উচিত, কার স্বাধীনতার জন্য কংগ্রেস লড়ছে? ভারতের শাসক শ্রেণীর স্বাধীনতার জন্য, না ভারতের সাধারণ মানুষের স্বাধীনতার জন্য কংগ্রেস লড়ছে? বিদেশি যদি দেখেন যে, কংগ্রেস শাসক শ্রেণীর স্বাধীনতার জন্য লড়ছে, কংগ্রেস কর্মীদের তাঁর জিজ্ঞাসা করা উচিত : ভারতের শাসক শ্রেণী কি শাসন করার উপযুক্ত? কংগ্রেসের পক্ষ নেওয়ার আগে এইটুকু তিনি করতে পারেন।

এইসব প্রশ্নের উত্তর দেবেন কি কংগ্রেসিরা? আমি জানি না। তবে আমি মনে করি, আমার উত্তর এইসব প্রশ্নের যথার্থ উত্তর।

III

শুরুতে জানা ভাল, ভারতে কারা শাসক শ্রেণী? ভারতের শাসক শ্রেণী মূলত ব্রাহ্মণরা। এটা আশ্চর্য ব্যাপার যে, বর্তমান ব্রাহ্মণরা এই অভিযোগ অস্বীকার করেন যে তাঁরা শাসক শ্রেণী। যদিও একটা সময়ে তাঁরা নিজেদের ভূদেব অর্থাৎ পৃথিবীর দেবতা বলতেন। রাতারাতি এই মতটা পালটে গেল কেন? এটা কি তাঁদের এই পাপবোধ থেকে যে, তাঁরা সব সমাজের বুদ্ধিজীবী অংশের প্রতি মানবতার পবিত্র আইন যে আস্থা দেয়, তা ভঙ্গ করেছেন বলে বিশ্বের আদালতে, সম্মুখীন হতে পারছেন না? নিজের শ্রেণীর স্বার্থরক্ষা না করে সবার স্বার্থ দেখা উচিত, মানবতার

পবিত্র আইন একথাই বলে। না কি এটা তাঁদের নম্রতা বোধের জন্য? কোনটা সত্য তা নিয়ে জল্পনা বন্ধ করার দরকার নেই।

ব্রাহ্মণরা কি শাসক শ্রেণী, এই নিয়ে প্রশ্ন নেই। যে কেউ দুটি পরীক্ষা করতে পারেন। প্রথম, সাধারণ মানুষের আবেগ, এবং দ্বিতীয়, প্রশাসন নিয়ন্ত্রণ। আমি নিশ্চিত, এই দুটি ছাড়া আর কোনও ভাল ও সুনির্ধারক পরীক্ষা থাকতে পারে না। প্রথমটার ক্ষেত্রে কোনও সন্দেহ থাকতে পারে না। মানুষের দৃষ্টিভঙ্গির কথা ধরলে, ব্রাহ্মণমাত্রই পবিত্র। প্রাচীন যুগে শত অপরাধের জন্যও তাঁকে ফাঁসি দেওয়া যেত না। পবিত্র ব্যক্তি হিসাবে যাবতীয় সুযোগ ও শর্তমুক্তি তাঁর ছিল, দাস শ্রেণীর পক্ষে এসব লভ্য ছিল না। প্রথম ফসলে ছিল তাঁর অধিকার। মালাবারে সম্বন্ধম বিবাহ প্রথায় নায়ার জাতীয় নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা তাদের নারীদের ব্রাহ্মণদের রক্ষিতা রাখতে সম্মান বোধ করত। এমনকী রাজারাও রানীর কুমারীত্ব নাশ করার জন্য ব্রাহ্মণদের[১] আমন্ত্রণ করতেন। একটা সময় ছিল যখন নীচু শ্রেণীর লোকেরা ব্রাহ্মণদের পা ধোয়া জল খেয়ে তবে অন্নগ্রহণ করত। স্যার পি. সি. রায় বিবরণ দিয়ে বলেছিলেন কীভাবে নীচু শ্রেণীর শিশুরা কলকাতার রাস্তার ধারে সকালে লাইন দিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা হাতে জলের বাটি নিয়ে অপেক্ষা করত ব্রাহ্মণদের পা ধোয়ার জন্য। সেই জল বাড়ি নিয়ে গেলে বাড়ির লোকেরা অন্নগ্রহণের আগে খেতেন। ব্রিটিশ সরকারের অধীনে সমানাধিকারের বিচারযোগ্য আইনের ফলে ব্রাহ্মণদের বিশেষ অধিকার ও আইন-বহির্ভূত সুযোগ রহিত হয়। তবু সুযোগ থেকে যায় এবং ব্রাহ্মণরা নীচু শ্রেণীর চোখে এখনও পবিত্র ও সম্মাননীয় এবং তারা এখনও ব্রাহ্মণদের 'স্বামী' অর্থাৎ প্রভু হিসাবে ডাকে।

---

১. পরিব্রাজক লুডোভিকো ডি ভারথেমা ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে ভারতে আসেন এবং মালাবার সফর করে বলেন :

'এইসব ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে জানা যথার্থ এবং আনন্দদায়ক। একথা জানতে হবে যে, তারা মতাদর্শের মুখ্য ব্যক্তি, পুরোহিতরা যেমন আমাদের মধ্যে মুখ্য ব্যক্তি। এবং রাজা পত্নী গ্রহণ করার সময়ে সবচেয়ে মহার্ঘ্য ও সম্মাননীয় ব্রাহ্মণদের মধ্য থেকে মনোনীত করেন এবং প্রথম রাতে পত্নীর কুমারীত্ব হরণে ব্রাহ্মণের সঙ্গে সহবাস করতে দেন। এটা ভাবার কারণ নেই যে, ব্রাহ্মণরা স্বেচ্ছায় এই কাজ করতে যেতেন। রাজা ব্রাহ্মণকে এর জন্য ৪০০-৫০০ ডাক্যাট (প্রাচীন ইউরোপের স্বর্ণমুদ্রা বিশেষ—বা.স. সম্পাদক কতৃক সংযোজিত) মুদ্রা দিতে বাধ্য ছিলেন। শুধুমাত্র রাজা ছাড়া অন্য কেউ কালিকটে এই প্রথা অনুসরণ করত না।'—'ভয়েজ অব্ ভারসামা', হাকলুয়াত সোসাইটি, খণ্ড ১, পৃ : ১৪১)

দ্বিতীয় পরীক্ষায় একই সদর্থক ফল মেলে। শুধু মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির নিদর্শন নেওয়া যায়। সারণি, ১৭ দেখুন, এতে ১৯৪৩ সালে ঘোষিত (gazetted) পদগুলিতে ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য গোষ্ঠীর সংখ্যা রয়েছে। অন্যান্য প্রদেশ থেকে এর সমর্থনে তথ্য দেওয়া যায়। কিন্তু এত কষ্ট করার দরকার নেই। ব্রাহ্মণরা নিজেদের শাসক শ্রেণী মনে করে কিনা সেটা গৌণ, ঘটনা হল প্রশাসন তারা নিয়ন্ত্রণ করে এবং নীচু শ্রেণী তাদের প্রাধান্য মেনে নিয়েছে, এটাই যথেষ্ট।

অন্য ভ্রমণকারীদের মতে এই প্রথা ব্যাপক ছিল। পূর্ব ভারতের বিবরণে হ্যামিলটন লিখেছেন :

'জামোরিন বিয়ে করার পর প্রথম নাম্বুদ্রি বামুন বা প্রধান পুরোহিত তার স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস করবেন। ইচ্ছে করলে পুরোহিত নাম্বুদ্রি তিন রাত তাকে ভোগ করবেন, কারণ স্ত্রীর সঙ্গমের প্রথম ফল তার ঈশ্বরের কাছে পবিত্র অর্ঘ্য স্বরূপ। কিছু রাজপুরুষ এত-ই আত্মপ্রসাদপূর্ণ ছিলেন যে, তাঁরা একে পুরোহিতদের কাছে অর্ঘ্য হিসাবে গণ্য করতেন। কিন্তু সাধারণ মানুষের এত শ্রদ্ধা ছিল না, তারা বাধ্য হয়েই পুরোহিতদের এই প্রসাদ দিত।' খণ্ড ১, পৃ: ৩০৮।

বুকানন এই প্রথা সম্বন্ধে বিবরণে বলেছেন :

'তামুরি পরিবারের নারীরা নাম্বুদ্রিদের দ্বারা গর্ভবতী হত, তেমন হলে উচ্চস্তরের নায়ারদের দ্বারা গর্ভবতী হত; তবে নাম্বুদ্রিদের পবিত্র মর্যাদার জন্য প্রথম সুযোগ তাদের-ই ছিল।' 'প্রিঙ্কার্টন ভয়েজেস্', খণ্ড ৮, পৃ: ৭৩৪।

সি. এ. ইনেস., আই. সি. এস, 'মালাবার গেজেটিয়ার'-এর সম্পাদক বলেছেন :

'মারুক্কী কট্টায়ম প্রথা অনুসরণকারী সব শ্রেণীর মধ্যে আরেকটি প্রথা দেখা যায়, যা মাক্কুক্ক-কোট্টায়াম প্রথা অনুসারীদের টালি বাঁধা বিবাহের মতো, এই বিবাহ প্রথাকে মালয়ালী বিবাহের মধ্যে সবচেয়ে উদ্ভট, বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ও অতুলনীয় বলা হয়। কন্যা ঋতুমতী হওয়া মাত্র তার কণ্ঠে সোনা বা অন্য ধাতুর একটা টালি লকেটের মতো পরিয়ে দেওয়া হয়। এটা করত এক-ই বর্ণের বা উচ্চ জাতের কোনও পুরুষ (বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে ব্যবহারের পার্থক্য রয়েছে)। এটা করার পর তবেই কন্যার সম্বন্ধ হতে পারে। সাধারণত এই উৎসবের উদ্দেশ্য টালির সূত্র বা মনডালন (স্বামী) দিয়ে মেয়েটির সঙ্গে সহবাস করার অধিকার, এবং কেউ কেউ এর মূলে ভূ-দেব বা ভূমির ঈশ্বর অর্থাৎ ব্রাহ্মণের দাবি এবং নীচের স্তরে ক্ষত্রিয় বা শাসক শ্রেণীর নীচ জাতির মেয়েদের প্রথম ভোগ করার দাবি বলে মনে করেন।' খণ্ড ১, পৃ: ১০১।

সারণি - ১৭

গোষ্ঠী	আনুমানিক জনসংখ্যা (লক্ষ)	মোট জনসংখ্যার শতকরা	মোট ঘোষিত (gazetted) পদের সংখ্যা ২,২০০	চাকরির শতকরা অংশ	অঘোষিত পদ (Non-gazetted Posts) ১০০ টাকার বেশি মোট ৭,৫০০		৩৫ টাকার বেশি মোট ২,০৭৮২	
					চাকুরি	পদে %	চাকুরিরত	পদে %
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)
ব্রাহ্মণ	১৫	৩	৮২০	৩৭	৩,২৮০	৪৩.৭৩	৮৮১২	৪২.৪
খ্রিস্টান	২০	৪	১৯০	৯	৭৫০	১০.০	১,৬৫৫	৮.০
মুসলমান	৩৭	৭	১৫০	৭	৪৯৭	৬.৬৩	১,৬২৪	৭.৮
শোষিত শ্রেণী	৭০	১৪	২৫	১.৫	৩৯	.৫২	১৪৪	.৬৯
অব্রাহ্মণ — অগ্রসর	১১৩	২২	৬২০	২৭	২,৫৪৩	৩৩.৯	৮,৪৪০	৪০.৬
অব্রাহ্মণ — অনগ্রসর	২৪৫	৫০	৫০	২				
অ-এশীয় ও ইঙ্গ-ভারতীয়	—	—	—	—	৩৭২	৫.০	৮৩	.৪
অন্যান্য	—	—	—	—	১৯	.৫	২৪	.১১

ইতিহাসে দেখা গেছে, ব্রাহ্মণ সবসময়ে অন্যান্য শ্রেণীর সঙ্গে সহযোগী হয়েছে এবং তাদের শাসক শ্রেণীর মর্যাদা দিয়েছে তখন-ই, যখন তারা তার অধীনে থেকে সহযোগিতা করতে রাজি হয়েছে। প্রাচীন ও মধ্যযুগে যে ক্ষত্রিয় বা বিজয়ী শ্রেণীর সঙ্গে জোট করে সাধারণ জনতাকে শাসন করেছে, ব্রাহ্মণ তার কলম দিয়ে, ক্ষত্রিয় তার তলোয়ার দিয়ে, মানুষকে পদানত রেখেছে। বর্তমানে ব্রাহ্মণরা বৈশ্য অর্থাৎ বেনিয়াদের সঙ্গে জোট বেঁধেছে। ক্ষত্রিয়দের ছেড়ে বৈশ্যদের সাথে জোট খুব-ই স্বাভাবিক। এখনকার ব্যবসা বাণিজ্যের যুগে অর্থ তলোয়ারের চেয়ে শক্তিশালী। পক্ষ বদলের এটা একটা কারণ। দ্বিতীয় কারণ, রাজনৈতিক যন্ত্র চালানোর জন্য টাকার দরকার। বেনিয়ারা টাকা দিতে পারে। বেনিয়ারা কংগ্রেসকে অর্থ দেয়, কারণ গান্ধী একজন বেনিয়া এবং তিনি বুঝেন যে রাজনীতিতে অর্থ বিনিয়োগে লাভ অনেক। যাঁদের মনে সন্দেহ আছে তাঁরা ৬ জুন, ১৯৪২ লুই ফিশারকে বলা গান্ধীর কথা পড়ে নিন। ফিশার বলেছেন[১] :

১. 'এ উইক উইদ্ গান্ধী', লুই ফিশার (১৯৪৩), পৃ : ৪১

'কংগ্রেস দল সম্বন্ধে আমার অনেক প্রশ্ন আছে, বলেছিলাম। খুব উচ্চ আসনে আছেন এমন অনেক ব্রিটিশ আমায় বলেছেন যে, কংগ্রেস বড় ব্যবসায়ীদের হাতে এবং বোম্বাইয়ের মিল মালিকরা গান্ধীকে সমর্থন করেন, তিনি যত টাকা চান, দেন। এ কথায় সত্যতা কতটা, আমি জিজ্ঞাসা করি।'

দুর্ভাগ্যবশত, 'তাঁরা সত্যই বলেন', তিনি সহজভাবে বললেন, 'কাজ চালাবার মতো টাকা কংগ্রেসের নেই।' প্রথমে আমরা ভেবেছিলাম, প্রত্যেক সদস্যের কাছ থেকে বছরে চার আনা সংগ্রহ করে কাজ চালাব। কিন্তু এটা করা যায়নি।'

'ধনী ভারতীয়রা কংগ্রেসের আয়-ব্যয়কের কত অংশ যোগান', আমি প্রশ্ন করি। 'বাস্তবে সবটাই', তিনি বলেন। 'যেমন এই আশ্রমে আমরা অনেক দরিদ্রভাবে কম খরচে চালাতে পারি। কিন্তু তা হয় না এবং টাকা আসে আমাদের ধনী বন্ধুদের থেকে।'

এই কারণেই, ব্রাহ্মণদের পক্ষে বেনিয়াদের শাসক শ্রেণীর থেকে বাদ দেওয়া সম্ভব নয়। বাস্তবে, সে বেনিয়াদের সঙ্গে শুধু কাজ চলার মতো নয়, একটা বন্ধুত্বপূর্ণ জোট গড়ে তুলেছে। এর ফলে বর্তমান ভারতে শাসক শ্রেণী হিসাবে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়দের স্থানে ব্রাহ্মণ-বেনিয়া জোট। শাসক শ্রেণীর অস্তিত্ব সমগ্র কাহিনী নয়, গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হচ্ছে ভারতে শাসক শ্রেণীর সদস্যরা সচেতন যে, তারা শাসক শ্রেণী এবং তারাই শাসন করার একমাত্র অধিকারী। প্রয়াত শ্রী তিলক কখনও ভুলতে পারেননি যে, তিনি ব্রাহ্মণ এবং শাসক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু[১] এবং তাঁর বোন বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতের ক্ষেত্রে এক-ই ব্যাপার। বল্লভভাই প্যাটেলও ভুলতে পারেন না যে তিনি শাসক শ্রেণীর লোক। শ্রী তিলক স্বরাজ আন্দোলনের জনক হিসাবে গণ্য। নেহরু ও বিজয়লক্ষ্মী কংগ্রেস হাইকমান্ডের নেতৃস্থানীয়। তাঁরা শাসক শ্রেণীর লোক এই চেতনা ছাড়াও এঁদের অনেকে মনে

১. ওয়াই. জি. কৃষ্ণমূর্তির নেহরুর জীবনীগ্রন্থের ভূমিকায় পট্টভি সীতারামাইয়া বলেন, পণ্ডিত নেহরু একজন ব্রাহ্মণ হিসাবে অত্যন্ত সচেতন। যাঁরা ভাবেন পণ্ডিত নেহরু সমাজবাদী ও জাতপাতে বিশ্বাসী নন, তাঁদের কাছে এটা বিরাট আঘাত। কিন্তু পট্টভির জানা উচিত, তিনি কী বলছেন। শুধু পণ্ডিত নেহরু নিজে ব্রাহ্মণ বলে সচেতন তা নয়, তাঁর বোন বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত ব্রাহ্মণ হিসাবে সচেতন। দিল্লিতে সর্বভারতীয় মহিলা সম্মেলনে (১৯৪০), আদমশুমারে ব্যক্তির জাত ঘোষণা না করার প্রশ্নটি আলোচিত হয়। শ্রীমতী পণ্ডিত এই ধারণাটি বাতিল করে বলেন, নিজের ব্রাহ্মণ রক্তের গর্ব এবং ব্রাহ্মণ হিসাবে ঘোষণা করা থেকে কেন বিরত হবেন তা তিনি বুঝতে পারছেন না।

দ্রঃ— জে. ই. সঞ্জনা, 'সেন্স অ্যান্ড ননসেন্স ইন পলিটিক্স', 'রাস বাহাদুর' (গুজরাটি সাপ্তাহিক), ১৪ জানুয়ারি, ১৯৪৫, উদ্ধৃতি।

করেন নীচু শ্রেণীর লোকেরা ঘৃণ্য। তাদের পদানত রাখাই দরকার এবং তারা যেন কখনও শাসক হওয়ার আকাঙ্ক্ষা না করে। এ ধরনের মত প্রকাশ্যে ব্যক্ত করতে এঁরা লজ্জাবোধ করেন না। ১৯১৮ সালে অব্রাহ্মণ ও অনগ্রসর শ্রেণীর লোকেরা যখন আইনসভায় পৃথক প্রতিনিধিত্বের দাবিতে আন্দোলন করে, শ্রী তিলক শোলাপুরে এক জনসভায় বলেন, তৈল পেষাকারী, তামাক বিক্রেতা, ধোপারা (অনগ্রসর ও অ-ব্রাহ্মণদের সম্বন্ধে তিলকের ভাষ্য) আইনসভায় যেতে চাইছে কেন, তা তিনি বুঝতে পারছেন না। তাঁর মতে, এদের কাজ হল আইন মেনে চলা এবং আইন প্রণেতা হওয়ার ক্ষমতা লাভে আকাঙ্ক্ষা না করা। ১৯৪২ সালে লর্ড লিনলিথগো বিভিন্ন অংশের ৫২ জন ভারতীয় প্রতিনিধিকে আমন্ত্রণ জানান, যুদ্ধ প্রচেষ্টায় ভারতীয়দের সহযোগিতা ও সমর্থন সংগ্রহের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে জনপ্রিয় করার জন্য কী করা যায় সে বিষয়ে আলোচনার জন্য এই বৈঠক। অন্যান্য আমন্ত্রিতদের মধ্যে তফসিলি জাত-গোষ্ঠীর প্রতিনিধিও আমন্ত্রিত হন। শ্রী বল্লভভাই প্যাটেল ভাইসরয়ের এই নিকৃষ্ট জনতাকে আহ্বানের ব্যাপারটা বরদাস্ত করতে পারেননি। ঘটনার পর-ই বল্লভভাই বলেন [১] : ভাইসরয় হিন্দু মহাসভার নেতাদের ডেকেছেন, মুসলিম লীগ নেতাদের ডেকেছেন, এবং ডেকেছেন মুচি, ঘানচি (তেল পেষক) ও অন্যান্যদের।'

বল্লভভাই প্যাটেল শুধু ঘানচি ও মুচিদের কথা উল্লেখ করেছেন, তবে তাঁর বক্তৃতায় দেশের নীচু শ্রেণীর লোকেদের প্রতি শাসক শ্রেণী ও কংগ্রেস হাইকমান্ড নেতাদের বিদ্বেষপরায়ণ মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে। শাসক শ্রেণী ও হাইকমান্ড নেতাদের এই দৃষ্টিভঙ্গির আরও পরিচয় মিলেছে নির্বাচনী প্রচারে। এগুলি এত প্রাসঙ্গিক ও গুরুত্বপূর্ণ যে, এ সম্বন্ধে বিশেষ উল্লেখ দরকার।

১৯১৯ থেকে গান্ধী যখন কংগ্রেস দখল করলেন, কংগ্রেসিরা আইনসভা বর্জন আন্দোলন করে ব্রিটিশ সরকারকে স্বরাজের দাবি মানতে চাপ দেয়। এই নীতি অনুযায়ী, প্রতিবার-ই যখন নির্বাচনে কংগ্রেস অংশ না নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়, তখন কংগ্রেস শুধু নিজেদের প্রার্থী দিতে অস্বীকার করে তা নয়, কোনও হিন্দু নির্দল হিসাবে প্রার্থী হতে চাইলে তার বিরুদ্ধে প্রচার করে। এই নীতির গুণ সম্বন্ধে বিতর্ক করার দরকার নেই। কিন্তু হিন্দুদের নির্দল প্রার্থী হতে বাধা দেওয়ার জন্য

১. উদ্ধৃতি, সঞ্জনা রচিত, 'সেন্স অ্যান্ড ননসেন্স ইন পলিটিক্স্'।

কংগ্রেস কী পন্থা নিত? পন্থাটা ছিল বিধায়কদের ঘৃণার বস্তু হিসাবে প্রতিপন্ন করা। সেইমতো কংগ্রেস বিভিন্ন প্রদেশে মিছিল করে প্রাচীরপত্রে (placard) লেখে—'আইনসভায় কারা যাবে? শুধু নাপিত, মুচি, জমাদার ও কুমোররা।' মিছিলে স্লোগানের অংশ হিসাবে একজন প্রশ্নটা বলে, সারা মিছিলের লোক স্লোগানের দ্বিতীয় অংশে উত্তরটা বলে। কংগ্রেসিরা যখন এটা করেও নির্বাচনে প্রার্থী হওয়া বন্ধ করতে না পারে, তখন আরও কঠোর পন্থা নেওয়া হয়। কংগ্রেসের বিশ্বাস, মর্যাদাসম্পন্ন লোকেরা যদি বুঝেন যে, আইনসভায় তাঁদের বসতে হবে মুচি, মেথর, নাপিতদের সঙ্গে, তাহলে তাঁরা ভোটে দাঁড়াতে চাইবেন না। কংগ্রেস বাস্তবে এইসব ঘৃণিত গোষ্ঠীর থেকেই কংগ্রেস প্রার্থী করে নির্বাচিত করে। কংগ্রেসের এই ন্যক্কারজনক কাজের বেশকটি নিদর্শন রয়েছে। ১৯২০-এর নির্বাচনে মধ্যপ্রদেশে একজন মুচিকে[১] মধ্যপ্রদেশের আইনসভায় নির্বাচিত করে। ১৯৩০-এর নির্বাচনে কংগ্রেস মধ্যপ্রদেশ আইনসভায় দু'জন মুচি[২], একজন গোয়ালা[৩] এবং একজন নাপিত[৪] এবং পঞ্জাবে একজন মেথরকে[৫] নির্বাচিত করে। ১৯৩৪ সালে কেন্দ্রীয় আইনসভায় কংগ্রেস একজন কুমোরকে[৬] নির্বাচিত করে। বলা যেতে পারে, এসব পুরনো ইতিহাস। এই ধারণা পালটাবার জন্য ১৯৪৩-এ বোম্বাইয়ের মফস্বল আনধেরীর ঘটনা উল্লেখ্য। পুরসভা ভোটে কংগ্রেস এক নাপিতকে প্রার্থী করে পুরসভাকে হেয় করার জন্য।

কী নিদারুণ অবিচার? আয়ারল্যান্ডে সিন ফিয়েন ব্রিটিশ পার্লামেন্ট বয়কট করেছিল। কিন্তু তারা কি নিজেদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য দেশের মানুষকে এভাবে ব্যবহার করেছিল? ১৯৩০-এ অনুষ্ঠিত আইনসভা বর্জনের প্রচার বিশেষ স্বার্থবাহী ছিল। ১৯৩০-এর বিভিন্ন আইনসভা নির্বাচনকালে এইসব ঘটনা ও গান্ধীর লবণ সত্যাগ্রহ একই সঙ্গে হয়। আশা করি কংগ্রেসের ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিকরা (সরকারি ঐতিহাসিক পট্টভি সীতারামাইয়া এটা করতে ব্যর্থ) ভাইসরয় লর্ড আরউইনকে শ্রী গান্ধীর নোটিস দেওয়ার সিদ্ধান্ত এবং তাতে কয়েক দফা দাবি পেশ করে নির্দিষ্ট দিনের ভেতর ভাইসরয় তা পূরণ না করলে শ্রী গান্ধী কীভাবে লবণ আইনকে আক্রমণ, কেন্দ্র করে আন্দোলন করেন এবং ডাণ্ডিকে যুদ্ধের ক্ষেত্র বেছে নেন, কীভাবে তিনি

১. ফাগুয়া রোহিদাস

২. গুরু গোঁসাই আগমদাস এবং বলরাজ জয়সওয়ার

৩. ছুন্নু

৪. অর্জুনলাল

৫. বংশীলাল চৌধুরি

৬. ভগত চণ্ডীমাল গোলা

প্রচারের মুখ্য প্রবক্তা হন এবং আহমেদাবাদের আশ্রম থেকে আড়ম্বরপূর্ণ ভাবে যাত্রা শুরু করেন, কীভাবে আহমেদাবাদের মহিলারা আরতি সহকারে তাঁর কপালে তিলক দিয়ে জয়লাভ কামনা করেন, গান্ধী কীভাবে তাদের এই কথায় আশ্বস্ত করেন যে একা গুজরাট-ই ভারতের জন্য স্বরাজ অর্জন করবে, কীভাবে গান্ধী দৃঢ়তা সহ বলেন স্বরাজ অর্জন না করা পর্যন্ত তিনি গুজরাটে ফিরবেন না, ঐতিহাসিকরা নিশ্চয়-ই লক্ষ করবেন একদিকে কংগ্রেসিরা স্বরাজের জন্য লড়াই করছেন এবং তাঁরা বলেন জনতার জন্যই তাঁরা স্বরাজ অর্জন করতে চান, অন্যদিকে কিন্তু তাঁরা এই জনতাকে প্রকাশে ঘৃণা ও অবমাননা করে জঘন্য অত্যাচার করছেন।

শাসিত শ্রেণীর প্রতি ভারতের শাসক শ্রেণীর মানসিকতা এই।

এই শাসক শ্রেণীর অধীনে ভারতের সাধারণ শোষিত শ্রেণীর মানুষের অবস্থা কী হবে?

IV

কংগ্রেস এই শ্রেণীর জন্য প্রতিশ্রুতির ফুলঝুরি দেখায়—কংগ্রেস আমজনতার কথা বলে, কিন্তু স্বরাজ এলে এই শ্রেণী কীভাবে শাসকদের হাতে নির্যাতিত হবে তা কংগ্রেসের বলা উচিত। কংগ্রেস বলে, তারা বৈপ্লবিক পরিবর্তন করতে চায়। কিন্তু তা করার ক্ষমতা এবং স্বরাজ না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। এইসব ছেঁদো কথায় বিদেশিরা প্রভাবিত হন। এসব বড় বড় কথার ফুলঝুরি বাদ দিলে প্রশ্ন করা যায় ভারত স্বাধীন ও সার্বভৌম হলে কী হবে? একটা বিষয় নিশ্চিত। স্বরাজের যাদুদণ্ডে শাসক শ্রেণী উধাও হবে না। এরা এক-ইভাবে থাকবে এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের কবলমুক্ত হয়ে তারা আরও শক্তিশালী হবে। সব দেশের শাসক শ্রেণীর মতো তারা ক্ষমতা কব্জা করবে। মোদ্দা কথায়, স্বরাজ এলে জনতার দ্বারা সরকার হবে না, শাসক শ্রেণীর দ্বারা পরিচালিত সরকার হবে এবং জনতার সরকারের অনুপস্থিতিতে শাসক শ্রেণী যা চাইবে সরকার সেইভাবে চলবে।

ভারত স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হলে শাসক শ্রেণী কী করবে? একদল আশা করে তারা ভূমিস্বত্ব আইন বদল করবে, কারখানা বিধি প্রসার করবে, প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তার, মাদক নিষিদ্ধ এবং লোককে চরকা চালাতে শেখাবে, রাস্তাঘাট খাল তৈরি করবে, মুদ্রার সংস্কার, ওজন নিয়ন্ত্রণ, চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপন ও নির্যাতিত শ্রেণীর দুঃখ মোচনে কাজ করবে। নির্যাতিত শ্রেণীর কেউ-ই এই কর্মসূচি নিয়ে উৎসাহ বোধ করে না। প্রথমত, এতে মহত্ত্ব কিছু নেই। বর্তমান বিশ্বে কোনও সভ্য সমাজই এইসব ন্যূনতম কর্মসূচি অবজ্ঞা করতে পারে না, ব্যক্তিগত ভাবে আমার

সন্দেহ, ভারতের শাসক শ্রেণী এই ন্যূনতম কর্মসূচিও গ্রহণ করবে কিনা। বেশিরভাগ লোক ভুলে যায় যে, কংগ্রেস ব্রিটিশ আমলাতন্ত্রের চেয়ে শ্রেষ্ঠত্ব দেখাবার জন্য এইসব কাজের কথা বলছে। কিন্তু আমলাতন্ত্র একবার চলে গেলে সাধারণ মানুষের উন্নতির এই উৎসাহ কি থাকবে? আমার সন্দেহ আছে। তাছাড়া স্বরাজের একমাত্র উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য কি সামাজিক দুঃখমোচন? নির্যাতিত শ্রেণীর কথা বলতে পারি, স্বাধীন ও সার্বভৌম ভারতে তারা চায় সামাজিক দর্শন ও সামাজিক ব্যবস্থা হিসাবে ব্রাহ্মণ্যবাদের অবসান। তাদের দুঃখ ও দারিদ্র্য সামাজিক ব্যবস্থাজনিত অত্যাচার অবমাননার কাছে কিছুই নয়। রুচি নয়, তারা চায় মর্যাদা। সেজন্য প্রশ্ন : ভারতের শাসক শ্রেণী রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে সামাজিক ব্যবস্থার সংস্কারে কী কর্মসূচি গ্রহণ করবে?

ভারত স্বাধীন ও সার্বভৌম হলে কংগ্রেস যাদু দেখাতে পারে, কংগ্রেসের এই বক্তব্য শুধু প্রচার না বলে যথার্থ মেনে নিলেও এর অনুমানভিত্তি হচ্ছে, মানুষকে ইচ্ছে অনুযায়ী কাজ করতে হলে ক্ষমতা চাই। এ ধরনের বিশ্বাস দুঃখজনক তো বটেই, বিপজ্জনক মোহও। যাঁরা এই মোহে আবিষ্ট তাঁরা ভুলে যান যে, সার্বভৌমত্বেরও সীমাবদ্ধতা রয়েছে। এই মোহ সম্বন্ধে ডাইসি সুন্দর ভাবে বলেছেন তাঁর 'সংবিধানের নিয়ম' (Law of Constitution) নামক গ্রন্থে।

'কোনও সার্বভৌম কর্তৃত্ব, বিশেষ করে সংসদের ক্ষমতা প্রয়োগও দুটি সীমাবদ্ধতার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। একটা বাইরের, আরেকটা ভেতরের সীমাবদ্ধতা।

'সার্বভৌমের প্রকৃত ক্ষমতার বাইরের সীমাবদ্ধতা হচ্ছে, অধীন প্রজা বা তাদের বৃহদাংশ তার আইন অমান্য বা প্রতিরোধ করবে এই সম্ভাবনা বা নিশ্চয়তা রয়েছে।

'এই সীমাবদ্ধতা সবচেয়ে স্বৈরাচারী সম্রাটের ক্ষেত্রেও থাকে। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে একজন রোম সম্রাট বা ফরাসি রাজা (যেমন বর্তমান রূপ জার) আইনগত সংজ্ঞায় সার্বভৌম। তাঁর চরম আইনগত কর্তৃত্ব ছিল। তাঁর আইন বাধ্যতামূলক ছিল, সাম্রাজ্যের বা রাজ্যের কোনও ক্ষমতা আইন বাতিল করতে পারত না... কিন্তু এটা মনে করা ভুল হবে যে, কোনও সর্বোচ্চ ক্ষমতাবান শাসক ছিল, যিনি বাস্তবে সেই আইন ইচ্ছেমতো বদল বা রদ করতে পারতেন।

'এমনকী স্বৈরাচারীর কর্তৃত্ব নির্ভরশীল প্রজাদের বা একাংশ প্রজার তাঁর কর্তৃত্ব মেনে চলার ওপর। এই মেনে চলার প্রবণতা বাস্তবে সীমাবদ্ধ। ইতিহাসের জঘন্যতম ঘটনাবলী এর প্রমাণ। পুরাতন যুগের কোনও সিজার ইচ্ছেমতো রোম সাম্রাজ্যের মূল সংস্থা বানচাল করতে পারতেন না...সুলতান ইসলাম বাতিল করতে পারতেন

না। চতুর্দশ লুই ক্ষমতার শীর্ষে থাকাকালে নালটে-এর অনুশাসন প্রত্যাহার করতে পারতেন, কিন্তু প্রটেস্টান্ট ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিল, দ্বিতীয় জেমস যে কারণে রোমান ক্যাথলিক ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারেন নি, সেই কারণেই লুই তা পারেননি...স্বৈরাচারীর ক্ষমতার পক্ষে বা সংবিধান পরিষদের কর্তৃত্বের পক্ষে যা প্রযোজ্য, সংসদের সার্বভৌমত্বের ক্ষেত্রেও তা সত্য। এর ক্ষমতা চতুর্দিক থেকে জনতার প্রতিরোধের দ্বারা সীমাবদ্ধ। পার্লামেন্ট স্কটল্যান্ডে বৈধভাবে বিশপশাসিত গির্জা প্রতিষ্ঠা করতে পারে, উপনিবেশে কর আরোপ করতে পারে; কোনও আইন ভঙ্গ না করে পার্লামেন্ট সিংহাসনে উত্তরাধিকারী আইন বদল বা রাজতন্ত্র বাতিল করতে পারে ; কিন্তু সবাই জানে, বর্তমান অবস্থায় ব্রিটিশ পার্লামেন্ট এর কোনওটাই করবে না। প্রতি ক্ষেত্রে এরকম আইন ব্যাপক প্রতিরোধ ডেকে আনবে, সেই আইন বৈধ হলেও সংসদীয় ক্ষমতার আওতার বাইরে।'

* * * * *

'সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগের অভ্যন্তরীণ সীমাবদ্ধতা সার্বভৌম ক্ষমতার চরিত্রেই নিহিত। একজন স্বৈরাচারীও ক্ষমতা প্রয়োগ করে তার চরিত্র অনুযায়ী, তার সময়ের পরিস্থিতি এই চরিত্র প্রভাবিত করে, তার সমাজের ও সময়ের নৈতিক আবেগও এই চরিত্র ঠিক করে। সুলতান মুসলিম বিশ্বের ধর্ম পরিবর্তন করতে পারেন না, পারলেও মুসলমান ধর্মের প্রধান মহম্মদের ধর্ম বাতিল করবেন এটা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। সুলতানের ক্ষমতা প্রয়োগে অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ বাইরের সীমাবদ্ধতার মতোই জোরদার। লোকে অনেক সময় প্রশ্ন তোলে, পোপ সংস্কার আনছেন না কেন? বাস্তব উত্তর হল, বিপ্লবী ধরনের মানুষ পোপ হন না, এবং যিনি পোপ হন তাঁর বিপ্লবী হওয়ার ইচ্ছা থাকে না।'

ডাইসি (Dicey) যা বলেছেন তার সত্যতায় কেউ সন্দেহ প্রকাশ করবে না। শাসক শ্রেণী কী করবে তা তার সার্বভৌম ক্ষমতার ওপর যতটা না নির্ভর করে, অভ্যন্তরীণ ও বাইরের সীমাবদ্ধতার ওপর তার চেয়ে বেশি নির্ভর করে। এই দুইয়ের মধ্যে যদি বাইরের সীমাবদ্ধতার দরুন ভাল কাজ করায় ব্যর্থতা আসে, তাতে শাসক শ্রেণীকে দোষ দিয়ে লাভ হয় না। প্রগতির পক্ষে বাইরের সীমাবদ্ধতা অন্তরায় হলে ভয়ের কিছু নেই। প্রগতি বেশি নির্ভর করে শাসক শ্রেণীর অভ্যন্তরীণ সীমাবদ্ধতার ওপর। এইসব অভ্যন্তরীণ সীমাবদ্ধতা কিসের দ্বারা নির্ধারিত হয়? অভ্যন্তরীণ সীমাবদ্ধতার জনক শাসক শ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গি, ঐতিহ্য, কায়েমি স্বার্থ ও সমাজ-দর্শন। এই আলোচনার উদ্দেশ্য, কংগ্রেস শোষিত শ্রেণীর জন্য কী করতে চায় তা বিশ্বাস করার আগে বিদেশিদের সতর্ক করে প্রশ্ন করতে বলা : শাসক

শ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গি কী? তার ঐতিহ্য কী, সমাজদর্শন কী?

প্রথমেই ব্রাহ্মণদের কথা ধরা যাক। ঐতিহাসিক ভাবে, তারা শোষিত শ্রেণী (শূদ্র ও অন্ত্যজদের) চিরকালের শত্রু, এরাই হিন্দু জনসংখ্যার ৮০%। শাসিত শ্রেণীর সাধারণ মানুষ আজ যেভাবে পতিত, অবদমিত, আশা-আকাঙ্ক্ষাহীন, তার দায় ব্রাহ্মণ ও তাদের দর্শন। ব্রাহ্মণ্যবাদের দর্শনের মূল কথা পাঁচটি : (১) বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে স্তরগত অসাম্য ; (২) শূদ্র ও অন্ত্যজদের সম্পূর্ণভাবে শক্তিহরণ ; (৩) শূদ্র ও অন্ত্যজদের জন্য শিক্ষা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধকরণ ; (৪) ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের স্থানে শূদ্র ও অন্ত্যজদের বসার ওপর বিধি-নিষেধ ; (৫) সম্পত্তি অর্জনে নিষেধাজ্ঞা ; (৬) মহিলাদের সম্পূর্ণভাবে বশ্যতাধীন করা। অসাম্য ব্রাহ্মণ্যবাদের সরকারি আদর্শ। অসাম্য এবং সাম্যের জন্য নিম্ন শ্রেণীর আকাঙ্ক্ষা নিষ্ঠুরভাবে দমন করা হয়। অনেক দেশ আছে যেখানে শিক্ষা কয়েকজনের মধ্যে সীমিত। কিন্তু ভারত একমাত্র দেশ যেখানে বুদ্ধিজীবী শ্রেণী, অর্থাৎ ব্রাহ্মণরা শিক্ষা একচেটিয়াই করেনি, নিম্ন শ্রেণী শিক্ষা অর্জন করলে জিভ কেটে বা কানে গরম সিসা ঢেলে শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে ঘোষণা করেছে। কংগ্রেসি রাজনীতিবিদরা অভিযোগ করেন যে, ব্রিটিশরা ভারতের মানুষের শক্তিহরণ করে দেশশাসন করছে। কিন্তু তাঁরা ভুলে যান যে, ব্রাহ্মণরা আইন করে শূদ্র ও অন্ত্যজদের শক্তিহরণ করেছেন। ব্রাহ্মণরা এই শক্তিহরণে এত দৃঢ়বিশ্বাসী যে, যখন তাঁরা নিজেদের অধিকার সুরক্ষার জন্য আইন সংস্কার করলেন, তখনও শূদ্র ও অন্ত্যজদের ওপর নিষেধাজ্ঞা আগের মতোই কঠোর ভাবে বলবৎ রাখলেন। বর্তমানে ভারতের এক বিরাট সংখ্যক মানুষ যে নির্বীর্য, বলহীন, পুরুষত্বহীন, এর কারণ ব্রাহ্মণ্যবাদের সামগ্রিক শক্তিহরণ নীতি। যুগ যুগ ধরে তারা এই নীতি চালিয়েছে। এমন কোনও সামাজিক পাপ বা অন্যায় নেই যার প্রতি ব্রাহ্মণদের সমর্থন নেই। মানুষের প্রতি মানুষের অমানবিকতা—যেমন জাতপাতের সংস্কার, অস্পৃশ্যতা, ছুঁৎমার্গ এবং ছায়া না মাড়ানোর অভিশাপ ব্রাহ্মণের কাছে ধর্ম। এটা মনে করলে ভুল হবে যে, শুধু মানুষের প্রতি অন্যায় তার কাছে ধর্ম। কারণ, ব্রাহ্মণরা নারীর প্রতি বিশ্বের জঘন্যতম অবিচার সমর্থন করেছে। বিধবাদের জীবিত দহন করা হয় সতী হিসাবে। ব্রাহ্মণরা সতীদাহের প্রতি পূর্ণ সমর্থন দিয়েছে। বিধবাদের পুনর্বিবাহে অনুমতি ছিল না। ব্রাহ্মণরা এই তত্ত্ব সমর্থন করতেন। মেয়েদের ৮ বছর হলেই বিবাহ দেওয়া হত এবং স্বামী যে কোনও সময়ে যৌন মিলন করে বিবাহ সিদ্ধ করত। স্ত্রী ঋতুমতী হল কিনা সেটা গণ্য ছিল না। ব্রাহ্মণ এই তত্ত্ব জোরালো ভাবে সমর্থন করতেন। বিশ্বের অন্যান্য দেশের বুদ্ধিজীবীর তুলনায় মহিলা,

শূদ্র ও অন্ত্যজদের আইন প্রণেতা হিসাবে ব্রাহ্মণদের ভূমিকা ছিল সবচেয়ে ন্যক্কারজনক। কারণ, ব্রাহ্মণদের মতো কোনও বুদ্ধিজীবী শ্রেণী অশিক্ষিত দেশবাসীকে চিরদিন অজ্ঞ ও দরিদ্র রাখার দর্শন দিয়ে বুদ্ধির বেশ্যাবৃত্তি করেনি। এখনকার সব ব্রাহ্মণ পিতামহদের এই ব্রাহ্মণ্যবাদী দর্শন সমর্থন করে। হিন্দু সমাজে সে বহিরাগত, শূদ্র ও অন্ত্যজদের সঙ্গে সম্পর্কে ব্রাহ্মণ একজন জর্মনের কাছে ফরাসি, শ্বেতাঙ্গের কাছে নিগ্রোর মতোই বিদেশি। নিম্ন শ্রেণীর শূদ্র ও অন্ত্যজদের সঙ্গে ব্রাহ্মণের বিরাট ব্যবধান। তাদের কাছে সে বিদেশিই নয়, শত্রুপরায়ণ। তাদের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে, বিবেক ও ন্যায়বিচারের কোনও স্থান নেই।

বেনিয়া ইতিহাসে সবচেয়ে পরভৃত শ্রেণী হিসাবে পরিচিত। তার মধ্যে অর্থলাভের বদাভ্যাস সংস্কৃতি বা বিবেকের কাছে নিন্দার্হ নয়। সে মহামারীতে মুনাফা অর্জনকারীর দাদনদারের মতো বেনিয়া ও দাদনদারের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে, দাদনকারী মহামারী সৃষ্টি করে না, বেনিয়া করে। উৎপাদনের জন্য সে টাকা কাজে লাগায় না। দারিদ্র্য সৃষ্টি ও আরও গভীর করতে সে টাকা ধার দেয় অনুৎপাদক উদ্দেশ্যে। সুদের ওপর সে জীবন চালায় এবং তার ধর্ম বলে, যে দাদনকে তার পেশা হিসাবে ঠিক করে দিয়েছেন মনু। সেজন্য সে এটাকে ন্যায্য অধিকার বলে মনে করে। ব্রাহ্মণ বিচারপতির সাহায্যে ও তাঁর ডিক্রি জারির বলে সে কারবার চালিয়ে যায়। সুদ, সুদের ওপর সুদ চড়তে থাকে এবং এভাবে সে পরিবারগুলিকে কব্জায় আনে। ঋণী যত টাকাই ফেরত দিক, সবসময়েই সে ঋণজালে বন্দী। বিবেক না থাকার জন্য সে এমন কোনও ঠগবাজি, চুরি নেই, যা করে না। জাতের ওপর তার কব্জা সম্পূর্ণ। ভারতের দরিদ্র, ক্ষুধার্ত, নিরক্ষর সব মানুষ-ই বেনিয়ার কাছে বন্ধক রয়েছে।

এককথায় বলা যায়, ব্রাহ্মণ মনকে দাসত্বে বন্দি করেছে, বেনিয়া করেছে দেহকে। এরাই শাসক শ্রেণীর লুটের মাল ভাগ করে। যে ভারতের শাসক শ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গি, ঐতিহ্য ও সমাজ দর্শন বুঝে, সে কি বিশ্বাস করবে যে ভারত স্বাধীন ও সার্বভৌম হয়ে কংগ্রেসের রাজত্ব এলে সবকিছু ভিন্ন হয়ে যাবে?

V

শোষিত শ্রেণীর প্রবক্তা হিসাবে কংগ্রেস যেসব কথা বলে তা যদি ঠিক হয়, তবে কংগ্রেস কি বলতে পারবে শাসক শ্রেণীর ক্ষমতা খর্ব করার জন্য কী করেছে? বারবার উচ্চকণ্ঠে বলা হয়, ১৯৩৭-এর নির্বাচনে কংগ্রেস বিপুল ভাবে জিতেছে।

অতিশয়োক্তি বাদ দিয়ে প্রশ্ন করা যায় : কংগ্রেস ভোটে জিতেছে সত্যি, কিন্তু ভারতের মানুষের কোন্ শ্রেণী এই ট্রফি নিয়ে গেল? দুর্ভাগ্যবশত কোনও ভারতীয় প্রচারক এখনও ডড-এর সংসদীয় আচরণবিধির অনুরূপ কিছু তৈরি করেননি। পরে কংগ্রেস আইনসভা সদস্যদের জাত, পেশা, শিক্ষা ও সামাজিক স্থিতির বিবরণ নথিভুক্ত করা শক্ত। বিষয়টির গুরুত্ব উপলব্ধি করে আমি একসময়ে কংগ্রেসের নির্বাচিত সদস্যদের যাবতীয় তথ্য সংগ্রহের কথা ভাবি। প্রতি সদস্যের নির্দিষ্ট তথ্য পাইনি। অনেককে অ-শ্রেণীবদ্ধ হিসাবে রাখতে বাধ্য হই। কিন্তু যেসব তথ্য পাই তার থেকেই কংগ্রেসের জয় সম্বন্ধে আলোকপাত করা যায়। এর থেকে বুঝা যায় ভারতের মানুষের কাছে স্বাধীনতা ও হিতাহিতের অর্থ কী।

সারণি ১৮-তে প্রাদেশিক আইনসভায় কংগ্রেস সদস্যদের মধ্যে ব্রাহ্মণ অ-ব্রাহ্মণের অনুপাত এবং তফসিলি জাতের সংখ্যা রয়েছে।

সারণি - ১৮

প্রাদেশিক আইনসভায় জাত অনুযায়ী কংগ্রেস সদস্যসংখ্যা

প্রদেশ	ব্রাহ্মণ	অ-ব্রাহ্মণ	তফসিলি	অকথিত	মোট
আসম	৬	২১	১	৫	৩৩
বাংলা	১৫	২৭	৬	৬	৫৪
বিহার	৩১	৩৯	১৬	১২	৯৮
মধ্যপ্রদেশ	২৮	৩৫	৭	—	৭০
মাদ্রাজ	৩৮	৯০	২৬	৫	১৫৯
ওড়িশা	১১	২০	৫	—	৩৬
যুক্তপ্রদেশ	৩৯	৫৬	১৬	২৪	১৩৩

হিন্দু জনসংখ্যায় ব্রাহ্মণদের অনুপাত কত অল্প এটা যাঁরা জানেন না, তাঁরা হয়তো বুঝবেন না কংগ্রেস নির্বাচনে ব্রাহ্মণদের সিংহভাগ কতটা। কিন্তু যারা জানেন, তাঁরা বুঝবেন সংখ্যার দিক থেকে ব্রাহ্মণরা অনেক বেশি।

কংগ্রেস সম্পদশালী গোষ্ঠীর লোকদের—বেনিয়া, ব্যবসায়ী ও জমিদার শ্রেণীর কত প্রতিনিধিত্ব দিয়েছে? সারণি ১৯-এ তার চিত্র রয়েছে।

সারণি - ১৯

প্রাদেশিক আইন সভায় পেশা অনুযায়ী কংগ্রেস সদস্য

প্রদেশ	আইন	চিকিৎসক	জমিদার	ব্যবসায়ী	বেসরকারি দফতরে	দাদন ব্যবসায়	শূন্য	অকথিত	মোট
অসম	১৬	২	২	১	—	—	৩	৯	৩৩
বাংলা	৯	২	১৬	৫	২	—	১৬	৪	৫৪
বিহার	১৪	৪	৫৬	৬	৩	—	১	১৪	৭৮
মধ্যপ্রদেশ	২০	২	২৫	১০	—	—	৮	৫	৭০
মাদ্রাজ	৫২	২	৪৫	১৮	২	১	৩	৩৬	১৫৯
ওড়িশা	৮	১	১২	৪	৪	১	১	—	৩৬

এক্ষেত্রে বেনিয়া, জমিদার, ব্যবসায়ীর সংখ্যা অনেক। এতে কি সন্দেহ রয়েছে যে, কংগ্রেস শাসক শ্রেণীর বিরুদ্ধে লড়াইয়ের বদলে তাদের সাহায্যই করেছে? কংগ্রেসের জয়ের আর একটা দিক তুলে ধরা দরকার। সেটা হচ্ছে কংগ্রেস মন্ত্রী সভার বিন্যাস।

সারণি - ২০

কংগ্রেস শাসিত প্রদেশে মন্ত্রিসভার বিন্যাস *

প্রদেশ	মন্ত্রিসভার মোট মন্ত্রী	অ-হিন্দু মন্ত্রী	হিন্দু মন্ত্রী				প্রধানমন্ত্রী
			ব্রাহ্মণ	অ-ব্রাহ্মণ	তফসিলি	মোট	
বিহার	৪	১	?	?	১	৩	ব্রাহ্মণ
বোম্বাই	৭	২	৩	২	শূন্য	৫	ব্রাহ্মণ
মধ্যপ্রদেশ	৫	১	৩	১	শূন্য	৪	ব্রাহ্মণ
মাদ্রাজ	৯	২	৩	৩	১	৭	ব্রাহ্মণ
ওড়িশা	৩	শূন্য	?	?	?	৩	?
যুক্তপ্রদেশ	৬	২	?	শূন্য	শূন্য	৪	ব্রাহ্মণ
অসম	৮	৩	?	?	শূন্য	৫	ব্রাহ্মণ

** সারণি বিন্যাস ১৯৩৯ মে ১-এর 'ইন্ডিয়ান ইনফরমেশন' থেকে। জিজ্ঞাসা চিহ্ন অর্থ লেখক ব্রাহ্মণ কি অ-ব্রাহ্মণ ঠিক করতে পারেননি।*

সারণি ২০ ও ২১ কংগ্রেস শাসিত প্রদেশগুলির মন্ত্রিসভায় ব্রাহ্মণদের সংখ্যা রয়েছে। সবক'টি হিন্দু প্রদেশের প্রধানমন্ত্রী ব্রাহ্মণ, অ-হিন্দু মন্ত্রীরা বাদ গেলে মন্ত্রিসভা পুরো ব্রাহ্মণদের। বিশেষ করে জওহরলাল নেহরুর যুক্তপ্রদেশে এই ব্যাপার প্রকট।

কাজেই কোনও সন্দেহ আছে কি যে, ব্রাহ্মণরাই ভারতের শাসক শ্রেণী? সন্দেহ রয়েছে কি যে, স্বাধীনতার জন্য কংগ্রেসের লড়াই শাসক শ্রেণীর স্বাধীনতার জন্য? সন্দেহ আছে কি যে, কংগ্রেসই শাসক শ্রেণী ও শাসক শ্রেণীই কংগ্রেস? কোনও সন্দেহ আছে কি যে, ১৯৩৭-এ প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের আকারে স্বরাজ এলে কংগ্রেস শাসক শ্রেণীকে ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের স্থানে বসায়?

বাস্তব ঘটনা হল, কংগ্রেস শাসক শ্রেণীকে ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের আসনে বসায় বললেও কম বলা হয়। এর চেয়ে অনেক বেশি কিছু। এক্ষেত্রেও লোকে বাস্তব না দেখলে কংগ্রেস কী করেছে বিশ্বাস করবে না। ঘটনা হচ্ছে, প্রার্থী মনোনয়নে কংগ্রেস, বিশেষ করে ব্রাহ্মণদের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট নীতি অনুসরণ করে—উচ্চতম শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন ব্রাহ্মণকে অগ্রাধিকার, তফসিলি ও অ-ব্রাহ্মণদের ক্ষেত্রে সবচেয়ে কম শিক্ষার প্রার্থীকে অগ্রাধিকার দেয়। সারণি-২২ দেখলেই সন্দেহ দূর হবে।

সারণি - ২২

ব্রাহ্মণ, অ-ব্রাহ্মণ কংগ্রেস প্রার্থীর শিক্ষাগত মান

প্রদেশ	জাত	মোট	স্নাতক	প্রাক্-স্নাতক	ম্যাট্রিক	নিরক্ষর	অকথিত
অসম	ব্রাহ্মণ	৬	৫	১	—	—	—
	অ-ব্রাহ্মণ	২১	১৫	২	—	১	৯
বাংলা	ব্রাহ্মণ	১৫	১৪	১	—	—	—
	অ-ব্রাহ্মণ	২৭	২১	৪	—	১	৭
	তফসিলি	৬	৩	—	১	২	—
বিহার	ব্রাহ্মণ	৩১	১১	৫	৮	৪	৩
	অ-ব্রাহ্মণ	৩৯	২৩	৪	৩	৮	১৩
	তফসিলি	—	১	১	৪	১০	—
মধ্যপ্রদেশ	ব্রাহ্মণ	৩৯	১৫	—	২	৯	২
	অ-ব্রাহ্মণ	৫৪	১৫	—	২	১৭	১
	তফসিলি	—	১	—	—	৬	—

[পরের পৃষ্ঠায়]

প্রদেশ	জাত	মোট	স্নাতক	প্রাক্-স্নাতক	ম্যাট্রিক	নিরক্ষর	অকথিত
মাদ্রাজ	ব্রাহ্মণ	৩৮	১৬	২	৩	৪	১৩
	অ-ব্রাহ্মণ	৯০	৩১	৩	১	৭	৬১
	তফসিলি	২৬	১	১	১	১৪	—
	অনগ্রসর	—	১	—	—	—	—
ওড়িশা	ব্রাহ্মণ	১১	৬	১	—	৩	১
	অ-ব্রাহ্মণ	২০	৭	৩	২	৭	১
	তফসিলি	৫	—	—	—	৫	—

এটা স্পষ্ট, অব্রাহ্মণ ও তফসিলিদের তুলনায় ব্রাহ্মণদের ক্ষেত্রে প্রাক্-স্নাতকদের চেয়ে স্নাতক প্রার্থীর অনুপাত অনেক বেশি। স্নাতক ও প্রাক্-স্নাতকদের সংখ্যার পার্থক্য প্রকৃত পরিস্থিতি তুলে ধরে না। ঠিকভাবে বলতে গেলে বলা যায়, ব্রাহ্মণ স্নাতকরা পোড় খাওয়া রাজনীতিবিদ, যাদের মর্যাদা অত্যন্ত উঁচু, অ-ব্রাহ্মণ স্নাতকরা শুধু স্নাতক-ই, যারা দ্বিতীয় শ্রেণীর রাজনীতিবিদ্দের সুপারিশের ওপর নির্ভর করে।

কংগ্রেস সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষিত ব্রাহ্মণদের প্রার্থী মনোনীত করে কেন? আর তফসিলি ও অ-ব্রাহ্মণ প্রার্থী নিরক্ষর তাদের থেকে বেছে নেয় কেন? এই প্রশ্নের একটা উত্তর-ই খুঁজে পাচ্ছি। কংগ্রেসে অ-ব্রাহ্মণরা যাতে মন্ত্রিসভা করতে না পারে, তার জন্যই এই কৌশল। অ-ব্রাহ্মণদের ক্ষেত্রে কংগ্রেস ইচ্ছে করেই শিক্ষিতদের চেয়ে নিরক্ষরদের অগ্রাধিকার দেয়, কারণ শাসক শ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গিতে নিরক্ষর অ-ব্রাহ্মণদের শিক্ষিত অ-ব্রাহ্মণদের চেয়ে দুটি ক্ষেত্রে সুবিধা রয়েছে। প্রথমত, সে নির্বাচিত হওয়ার জন্য কংগ্রেস হাইকমাণ্ডের কাছে কৃতজ্ঞ থাকবে বেশি, এবং শাসক শ্রেণী গঠিত মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে কংগ্রেসের অ-ব্রাহ্মণ শিক্ষিতদের মন্ত্রিসভা গড়ার প্রয়াসে হাত মিলিয়ে বিদ্রোহ করবে না। দ্বিতীয়ত, আরও বেশি সংখ্যক অ-ব্রাহ্মণ স্নাতক বা প্রাক-স্নাতক প্রার্থী মনোনীত হলে তার উদ্দেশ্য হবে শাসক শ্রেণীর বিরুদ্ধে কংগ্রেসের অ-ব্রাহ্মণদের দ্বারা কোনও বিকল্প যোগ্য মন্ত্রিসভা গঠনে বাধা দেওয়া। কংগ্রেসের অ-ব্রাহ্মণরা জানেন না কংগ্রেস কীভাবে তাঁদের প্রবঞ্চিত করেছে এবং কংগ্রেসের মধ্যে তাঁদের টেনে এনে কীভাবে শাসক শ্রেণীকে ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের জায়গায় স্থায়ীভাবে সুরক্ষিত করছে।

VI

বর্তমান ভারতের সঙ্কটকালে শাসক শ্রেণীর ভূমিকার সঙ্গে বিশ্বের অন্যান্য দেশে

জাতীয় সঙ্কটে শাসক শ্রেণীর ভূমিকা তুলনা করা যুক্তিযুক্ত হবে। ফ্রান্সে যখন বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান ঘটে এবং সাম্যের দাবি ওঠে, ফ্রান্সের শাসক শ্রেণী স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে ক্ষমতা ও সুবিধা ত্যাগ করে জাতির জনতার সঙ্গে মিশে যায়। রাষ্ট্রের শাসন পরিষদ থেকেই এটা স্পষ্ট। কমন্সরা পান ৬০০ প্রতিনিধি, পুরোহিত ও অভিজাতরা ৩০০ করে। প্রশ্নে ওঠে ১২০০ সদস্য কোথায় কীভাবে বসবেন, বিতর্কে যোগ দেবেন। কমন্সরা জোর দেন, তিনটার সম্মেলনে একটা চেম্বারে অধিবেশন এবং মাথা গুনে ভোট। অভিজাত ও পুরোহিতদের পক্ষে এটা মেনে নেওয়া সম্ভব ছিল না। কারণ, এর অর্থ তাদের প্রাচীন, মহার্ঘ সুযোগসমূহ সমর্পণ। তবু এদের বৃহদাংশ কমন্স-এর দাবি মেনে নেয় এবং সাম্য, স্বাধীনতা ও মৈত্রীর ভিত্তিতে ফ্রান্সের নতুন সংবিধান উপহার দেয়।

১৮৫৫-'৭০ জাপানে সামন্ততান্ত্রিক সমাজ থেকে আধুনিক জাতি হিসাবে রূপান্তরকালে জাপানের শাসক শ্রেণী ফরাসি শাসক শ্রেণীর চেয়ে আরও দেশপ্রেমিক ভূমিকা নেয়। জাপানের ইতিহাসের ছাত্রমাত্রই জানেন, জাপানি সমাজে চারটি শ্রেণী—ডামিয়ো, সামুরাই, হেমিন বা সাধারণ মানুষ এবং ইটা বা অন্ত্যজ। এরা একে অপরের ওপর অসমভাবে বিন্যস্ত[১]। সবচেয়ে নীচে ইটা, হাজার হাজার মানুষ। তার ওপর হেমিন, ২-৩ কোটি। এদের ওপরে সামুরাই, সংখ্যা ২ কোটির মতো, হেমিনদের ওপর ক্ষমতা প্রয়োগ ও তাদের জন্ম-মৃত্যুর বিধাতা। শীর্ষে রয়েছে ডামিয়ো বা সামন্ত প্রভুরা, সংখ্যায় মাত্র ৩০০। এরাই তিন শ্রেণীর ওপর লাঠি ঘোরায়। ডামিয়ো ও সামুরাইরা বুঝে যে সামন্ততান্ত্রিক সমাজের শ্রেণী বিন্যাস এবং শ্রেণী অধিকার বজায় রেখে সমান নাগরিক অধিকারভিত্তিক আধুনিক সমাজ গড়ে তোলা সম্ভব নয়। জাতীয়তাবাদে উদ্দীপ্ত হয়ে এবং জাতীয় ঐক্যের অন্তরায় না হওয়ার জন্য ডামিয়োরা নিজেদের সুযোগ-সুবিধা স্বেচ্ছায় বির্সজন দেয় এবং সাধারণ জনতার সঙ্গে মিলে যায়।

৫ মার্চ, ১৮৬৯ সম্রাটের কাছে এক স্মারকলিপি পেশ করে তাঁরা জানান[২] :

'আমরা সম্রাটের দেশে বাস করি। যে খাদ্যগ্রহণ করি তা সম্রাটের লোকেরা উৎপাদন করে। কোনও সম্পত্তি নিজেদের বলে দাবি করব কীভাবে? আমরা আমাদের যাবতীয় সম্পত্তি (আমাদের অনুগামী সামুরাইরাও) ছেড়ে দিচ্ছি এবং সম্রাটের কাছে নিবেদন করছি তিনি যা প্রাপ্য মনে করবেন সেই পুরস্কার দেবেন, যাদের প্রাপ্য

১. 'রোমান্স অব্ জাপান', জেমস্ এ. বি. স্চেইচরার (Scherer)

২. তদেব, পৃ : ২৩৩

নয় তাদের জরিমানা করবেন। সম্রাট নতুন নির্দেশবিধি জারি করে বিভিন্ন পরিবার গোষ্ঠীর সীমানা পুনর্বিন্যাস করুন। সব দেওয়ানি ও ফৌজদারি বিধি, সামরিক আইন থেকে উর্দির নিয়মাবলী এবং যুদ্ধের উপকরণ নির্মাণের নিয়মাবলী সম্রাট প্রণয়ন করুন। সাম্রাজ্যের (ছোট-বড়) যাবতীয় বিষয়, তাঁর কাছে পেশ করা হোক।'

ভারতের শাসক শ্রেণী এ-ব্যাপারে জাপানের শাসক শ্রেণীর সঙ্গে নিজেদের তুলনা করে কীভাবে? ভারতের শাসক শ্রেণী দেশের স্বাধীনতার পাদপদ্মে কোনও আত্মত্যাগ করতে ইচ্ছুক নয়। জাতীয়তাবাদের নামে নিজেদের সুবিধা সমর্পণ করার বদলে তারা সুবিধা রক্ষায় জাতীয়তাবাদের স্লোগান ব্যবহার করছে। যখন-ই শাসিত শ্রেণী আইনসভা, শাসনকার্য ও সরকারি চাকুরিতে সংরক্ষণের দাবি তোলে, শাসক শ্রেণী 'জাতীয়তাবাদ বিপন্ন' হওয়ার ধুয়া তোলে। লোককে বলা হয়, জাতীয় স্বাধীনতা অর্জন করতে হলে জাতীয় ঐক্য চাই, আইনসভা, প্রশাসন ও সরকারি চাকরিতে সংরক্ষণ জাতীয় ঐক্যের পরিপন্থী, এবং সেজন্যই জাতীয় স্বাধীনতায় বিশ্বাসীদের কাছে সংরক্ষণের প্রশ্ন অনৈক্য সৃষ্টি করবে। শাসক শ্রেণীর এই হচ্ছে দৃষ্টিভঙ্গি। জাপানের শাসক শ্রেণীর সঙ্গে এদের আকাশ-পাতাল পার্থক্য। জাতীয়তাবাদের জন্য স্বার্থত্যাগের প্রশ্নই নেই। এরা স্বার্থরক্ষার জন্য জাতীয়তাবাদকে কাজে লাগাচ্ছে।

ভারতের শাসক শ্রেণী নিজের ক্ষমতা ও কর্তৃত্বত্যাগ অস্বীকার করেই ক্ষান্ত হয়নি, বঞ্চিত শ্রেণীর রাজনৈতিক দাবির প্রতি ব্যঙ্গ করার সুযোগ ছাড়েনি। শাসিত শ্রেণীর দাবি হাস্যকর ও অবাস্তব পরিগণিত করার জন্য শাসক শ্রেণীর অনেকে[১] ব্যঙ্গ কবিতা, ছড়া রচনা করেছে। অস্ট্রেলিয়ায় ভারতীয় রাষ্ট্রদূত আর. পি. পরাঞ্জপে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ব্যঙ্গ কবিতা লিখেছেন। তাঁর মতো এক উদারতন্ত্রী ব্যক্তি কীভাবে এটা লিখেলেন তা রহস্যময়।

ওইসব ব্যঙ্গ কবিতা থেকে মনে হয়, শাসিত শ্রেণীর লোকের বিকৃত বা বোকা বলে এইসব দাবি তুলছে এবং শাসক শ্রেণী এর বিরোধিতা করছে দক্ষ শাসনযন্ত্র অটুট রাখতে। তারা জোর দিচ্ছে ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের জায়গায় সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি থাকুন। এ নিয়ে কেউ ঝগড়া করবে না যে, এমন কিছু করা হোক যাতে শ্রেষ্ঠদের

---

১. তাঁর রচনাটি প্রকাশিত হয় 'গুজরাটি পুঞ্চ' পত্রিকায়, মে, ১৯২৬ সালে। নাম ছিল 'ভবিষ্যতে উঁকি মারা'। শাসক শ্রেণীর লোকের রচনা বলে এটা উল্লেখ্য। সাম্প্রদায়িক সংরক্ষণের নীতির জন্য কিছু কল্পিত ঘটনা কেন্দ্র করে রচিত এই কবিতাটি।

পরবর্তী বিষয়গুলি কমিশনের প্রতিবেদন, পুলিশ আদালতে মামলা, আদালতের বিচার, আইনসভা বিবরণী, প্রশাসনিক রিপোর্ট, ১৯৩০ থেকে গৃহীত এবং 'গুজরাটি পুঞ্চ' পাঠকদের জন্য উদ্ধৃত হল।

পাশ কাটিয়ে শুধু ভালরা পদ দখল করবে, অথবা ভালদের জায়গায় খারাপরা বসবে। কিন্তু এই যুক্তি বিশ্বাসযোগ্য হয় না, যখন বাস্তবে দেখা যায়, ভারতের ঐতিহাসিক পরিস্থিতির জন্য যেসব শ্রেষ্ঠ মানুষ বাছা হয় তাঁরা সবাই ঘটনাক্রমে শাসক শ্রেণীভুক্ত। শাসক শ্রেণীর কাছে অবশ্য এটা ঠিক আছে। কিন্তু শাসিত শ্রেণীর কাছে কি এটা ঠিক হতে পারে?. সর্বশ্রেষ্ঠ জর্মন কি ফ্রান্সের জন্যও সর্বশ্রেষ্ঠ

I

রয়্যাল কমিশনের প্রতিবেদন, ভারত সরকার ১৯৩৯ :

ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে যে স্মারকলিপি দেওয়া হয় তা আমরা গভীরভাবে পর্যালোচনা করেছি। গতবারের আদমশুমারকে ভিত্তি করে আমাদের কাছে পেশ করা সবক'টি দাবি মোটামুটি মেটাবার কথা বলতে পারি, কারণ সরকারি প্রশাসন গড়ার সমস্যার পুরো সমাধান করা সম্ভব নয় এবং দেশের সব লোক এর সদস্যও হতে পারে না। বিভিন্ন সম্প্রদায় এক-ই ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত নয়। আমরা ২৩৭৫ সংখ্যাকে সংবিধানের মূল সংখ্যা করেছি এবং এই সংখ্যা বিভিন্ন অংশে ভাগ করে সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায়ের জন্য করা হয়েছে। আমাদের প্রতিবেদনের সঙ্গে যুক্ত তফসিল থেকে সেটা বোঝা যাবে। প্রতি সম্প্রদায়ের দাবি সংশ্লিষ্ট সংখ্যায় প্রতিনিধিত্ব করা হবে এবং সব নিয়োগ, বিভিন্ন সংস্থার সদস্য, এবং বাস্তবে দেশের সব কিছু তফসিলে প্রদত্ত অংশ অনুযায়ী নির্ধারিত হবে। ভাইসরয়ের 'নির্বাহি পরিষদ' হবে ৪৭৫ জন সদস্যের, এঁরা নির্বাচিত হবেন প্রতি সম্প্রদায়ের এক-পঞ্চমাংশ হিসাবে, তিনজন সদস্য এক বছরের জন্য থাকবেন যাতে করে প্রতি সম্প্রদায়ের সদস্যরা পাঁচ বছরের মেয়াদ পূর্ণ করতে পারে। প্রতিটি উচ্চ ন্যায়ালয়ে ১২৫ জন বিচারক থাকবেন এক বছরের মেয়াদে, এই ব্যবস্থা অনুযায়ী প্রতি অংশ ১৯ বছরে একবার স্বকীয় অংশ পাবে। সব দাবির নিখুঁত ব্যবস্থার জন্য অন্য ধরনের নিযুক্তির সংখ্যা এক-ই ভিত্তিতে ঠিক হবে।

সবক'টি সংস্থার কাজ করার জন্য যথেষ্ট সংখ্যায় সরকারি ভবন ভেঙে নতুন আকারে আবার তৈরি করা হবে।

II

ভারত সরকারের বিজ্ঞপ্তি, ১৯৩২

ভারত শাসন আইন, ১৯৩১ অনুযায়ী মহামান্য সম্রাট নিম্নোক্ত ৪৭৫ জনকে বরলাটের 'নির্বাহি পরিষদ' সদস্য হিসাবে নিয়োগ করলেন :

২৬৭. মাতাদিন রামদিন (জাত নাপিত), চিকিৎসা বিভাগের শল্য-চিকিৎসা শাখার প্রধান সদস্য।

৩৭২. আল্লাবক্স পীর বক্স (মুসলমান, উটচালক). সামরিক বিভাগে উট পরিবহণের প্রধান।

৪৩৩. রামস্বামী (অন্ধ্র ঝাড়ুদার) পূর্ত দপ্তরে রাস্তা পরিষ্কার শাখার প্রধান।

৪৩৭. জগন্নাথ ভট্টাচার্য (কুলীন ব্রাহ্মণ পুরোহিত) নিবন্ধন (Registration) বিভাগের গার্হস্থ্য শাখা প্রধান।

* * * * *

হতে পারে? শ্রেষ্ঠ তুর্কি কি গ্রিকের জন্যও শ্রেষ্ঠ হতে পারে? শ্রেষ্ঠ পোলন্ডের অধিবাসী কি ইহুদিরা শ্রেষ্ঠ মনে করবে? এইসব প্রশ্নের সঠিক উত্তর নিয়ে সন্দেহ নেই। শ্রেণীগত যোগ্যতা অবজ্ঞা করার অবকাশ নেই। মানুষ নেহাত যন্ত্র নয়। মানুষ হিসাবে কিছু লোকের প্রতি সহানুভূতি, কিছুর প্রতি বৈরিতা থাকবেই। শ্রেষ্ঠ মানুষের ক্ষেত্রেও এটা সত্য। সেও শ্রেণীগত সহানুভূতি ও বৈরিতার বাহক। এসব বিচার করেই শাসক শ্রেণীর শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি শাসিত শ্রেণীর কাছে সবচেয়ে খারাপ লোক হতে পারেন। পরস্পরের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপারে শাসক শ্রেণী ও শাসিত শ্রেণীর পার্থক্য এক জাতির মানুষের প্রতি আরেক জাতির মানুষের মনোভাবের মতো। শাসিত শ্রেণীর দাবিগুলি হাস্যোদ্দীপক করার সময়ে শাসক শ্রেণীর লোকেরা ভুলে যান যে, ভারতের শাসক শ্রেণী ও শাসিত শ্রেণীর পার্থক্য ফরাসি ও জর্মনের

IV

(সব স্থানীয় সরকারের কাছে চিঠি, ১৯৩৪)

প্রাদেশিক আইনসভায় গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী, ভারত সরকার এর সঙ্গে সহমত, আমাকে বলতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, এখন থেকে সরকারের সব নিয়োগ প্রার্থীর যোগ্যতা নির্বিশেষে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে পালাক্রমে বন্টন করা হবে।

V

(বোম্বাই সরকারের ইশতিহার (gazette), ১৯৩৪)

বোম্বাই সরকার ডিসেম্বরে নিম্নোক্ত নিয়োগ করবে। সরকারের ... নং অর্ডার, ৩০ ডিসেম্বর, ১৯৩৪ অনুসারে বিভিন্ন নিয়োগের জন্য আবেদনকারী উল্লিখিত জাত গোষ্ঠীর মধ্য থেকে পালাক্রমে হতে হবে।

১. চিফ ইঞ্জিনিয়ার, সেচ (সিন্ধু), কুনবি সম্প্রদায়, উত্তর কানাড়া।

২. সংস্কৃত অধ্যাপক, এলফিনস্টন কলেজ, বোম্বাই, বালুচি পাঠান, সিন্ধু।

৩. মহামান্য সম্রাটের দেহরক্ষী কমানডেন্ট; উত্তর গুজরাটের মারোয়াড়ি।

৪. সরকারের পরামর্শদাতা স্থপতি; দাক্ষিণাত্যের ওয়াগ্রি (ভ্রাম্যমাণ জিপসি)।

৫. ইসলামি সংস্কৃতির নিদেশক, করদ ব্রাহ্মণ।

৬. অ্যানাটমির অধ্যাপক (গ্রান্ট মেডিকেল কলেজ), মুসলমান কসাই।

৭. যারবেদা জেল অধীক্ষক (Superintendent) ঘন্টিচর।

৮. মদ্য নিরোধ প্রচারক ২; ধরলা (খেড়া জেলার ভিল), পঞ্চমহল।

পার্থক্যের সমগোত্রীয় এবং একের শাসন অন্যেরা বরদাস্ত করতে পারবে না। যদিও উভয় ক্ষেত্রেই শ্রেষ্ঠ মানুষেরা এক-ই হতে পারেন।

এদের দাবি হাস্যকর করার চেষ্টায় শাসক শ্রেণী ভুলে যায় কীভাবে তারা তাদের ক্ষমতার ইমারত গড়েছে। নিজেদের মনুস্মৃতি দেখুন, দেখবেন পরাঞ্জপের কল্পনামূলক সিদ্ধান্তের মতোই তারা তাদের ক্ষমতার পথ করেছে। মনুস্মৃতি দেখলেই বোঝা যাবে, শাসক শ্রেণীর মুখ্য ও নেতৃস্থানীয় ব্রাহ্মণ বুদ্ধির (বুদ্ধি কারও একচেটিয়া নয়) শক্তি দিয়ে নয়, স্রেফ সাম্প্রদায়িকতা দিয়ে ক্ষমতা অর্জন করেছে। মনুস্মৃতির বিধান অনুসারে পুরোহিত, রাজার যাজক এবং প্রধানমন্ত্রী, প্রধান বিচারপতি ও উচ্চ-ন্যায়ালয়ের বিচারক, রাজার মন্ত্রী, সব পদ ব্রাহ্মণের জন্য সরক্ষিত। এমনকী সেনাধ্যক্ষের পদেও ব্রাহ্মণকে যোগ্য ও যথার্থ বলে সুপারিশ করা হত, যদিও তার জন্য সংরক্ষিত ছিল না। সব গুরুত্বপূর্ণ পদ ব্রাহ্মণের জন্য সংরক্ষিত থাকার সুবাদে বলা যায় সব মন্ত্রীর পদ ব্রাহ্মণের জন্য রাখা হত। এটাই সব নয়। ক্ষমতা ও লাভজনক পদে সুরক্ষিত থেকেও ব্রাহ্মণ সন্তুষ্ট ছিল না। সে বুঝত যে, শুধু

VI

(১৯৩৫, হাইকোর্টের একটি মামলার রিপোর্ট থেকে)

ক, খ (তেলি জাত) বাবাকে ঘুমন্ত অবস্থায় হত্যার জন্য অভিযুক্ত। জজ অভিযুক্তের বিরুদ্ধে অভিযোগ সংক্ষিপ্তসার করেন, জুরিরা অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করেন। শাস্তিদানের রায় দেওয়ার আগে জজসাহেব অভিযুক্তের উকিলকে জিজ্ঞেস করলেন কিছু বলার আছে কিনা। উকিল শ্রী বোমানজী বললেন, হ্যাঁ, শাস্তির রায়ের সঙ্গে আমি একমত, তবে আইন অনুযায়ী আসামির মৃত্যুদণ্ড বা শাস্তিই হওয়া উচিত নয়। কারণ এই বছরে সাতজন তেলি ইতিমধ্যে শাস্তি পেয়েছে, দু'জনের মৃত্যুদণ্ড। ভারত সরকার আইন অনুযায়ী অন্যান্য সম্প্রদায়ের শাস্তির কোটা পূরণ হয়নি। অথচ তেলিদের সব পূরণ হয়ে গেছে। মহামান্য বিচারক উকিলের যুক্তি মেনে অভিযুক্তকে মুক্তি দেন।

VII

'ইন্ডিয়ান ডেইলি মেল' ১৯৩৬ থেকে উদ্ধৃত।

আন্নাজী রামচন্দ্রকে (চিদপবন ব্রাহ্মণ) পুনার রাস্তায় একটা ছুরি হাতে ঘোরাঘুরি করতে দেখা গেল, যাকে সামনে পাচ্ছে আক্রমণ করছে। ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে তাকে হাজির করলে দেখা যায় কিছুদিন আগেই সে মানসিক হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছে। হাসপাতালের সুপারিনটেনডেন্ট সাক্ষ্যদানকালে জানান, আন্নাজী বিপজ্জনক পাগল হিসাবে হাসপাতালে তিন বছর ছিল। কিন্তু যেহেতু চিদপবনদের কোটা ভর্তি ছিল এবং হাসপাতালে অন্যান্য সম্প্রদায়ের বাৎসরিক কোটা পূরণ হয়নি সেজন্য তিনি তাকে আর রাখতে পারেননি। চিদপবনদের জন্য বিশেষ সুবিধা দিতে না পেরে সরকারের মেডিকেল দপ্তরের ...নম্বর নির্দেশ অনুসারে তাকে ছেড়ে দিয়েছেন। ম্যাজিস্ট্রেট আন্নাজীকে খালাস করেন।

সংরক্ষণে কিছু হবে না। অন্য সম্প্রদায় থেকে উঠে আসা যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীকে আটকাতে ব্রাহ্মণকে বিক্ষোভ দেখাতে হবে এবং প্রয়োজনে সংরক্ষণ প্রথা ভেঙে দিতে হবে, রাজ্যে সব প্রশাসনিক পদ ব্রাহ্মণদের জন্য সংরক্ষিত রাখা ছাড়াও একটা আইন করে শিক্ষায় ব্রাহ্মণদের একচেটিয়া সুযোগ দেওয়া হয়। আগেই বলা হয়েছে, এই আইনে শূদ্রের পক্ষে শিক্ষাগ্রহণকে অপরাধ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল। অর্থাৎ হিন্দু সমাজের নিম্নস্তরের লোকদের শিক্ষা অর্জন নিষিদ্ধ ছিল। এই আইন ভঙ্গ করলে শুধু কঠোর নয়, অমানুষিক শাস্তি—যেমন অপরাধীর জিহ্বা কর্তন এবং কানে গরম সিসা ঢেলে দেওয়ার বিধান ছিল। এইসব পদ্ধতি এখন আর নেই, একথা বলে কংগ্রেসিরা রেহাই পেতে পারেন না। তাঁদের স্বীকার করতে হবে যে, অধিকার সব গেছে বটে, কিন্তু কয়েক শতাব্দী ধরে সুবিধা ভোগ অটুট আছে। নির্যাতিত, শাসিত শ্রেণীর দাবিকে সাম্প্রদায়িকতা বলে কংগ্রেসিরা দাবি চাপা দিতে পারেন না। তাঁরা ভালভাবেই জানেন যে, ব্রাহ্মণরা ক্ষমতা অর্জন করার জন্য এর

VIII

(বোম্বাই প্রেসিডেন্সির জেল প্রশাসকের প্রতিবেদন, ১৯৩৭ থেকে উদ্ধৃত)

সব সাবধানতা সত্ত্বেও জেলখানায় আটকের সংখ্যা প্রতি সম্প্রদায়ের জন্য নির্দিষ্ট কোটার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। এই অসঙ্গতি দূর করার জন্য অধীক্ষক সরকারের কাছে নির্দেশাবলী চেয়েছেন।

সরকারের প্রস্তাব : সরকার আই. জি (জেল)-এ কর্তব্যে অবহেলার জন্য অসন্তোষ প্রকাশ করছে। অবিলম্বে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নির্দিষ্ট কোটা পূরণ করার জন্য তাদের গ্রেপ্তার এবং জেলে রাখার নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। প্রয়োজনীয় যথেষ্ট সংখ্যক লোককে গ্রেপ্তার করা না গেলে, যথাযথ সংখ্যার লোককে মুক্তি দিয়ে সবাইকে এক স্তরে আনতে হবে।

IX

(প্রাদেশিক আইনসভার বিবরণ, ১৯৪১)

শ্রী চেন্নাপ্পার প্রশ্ন : সরকারের দৃষ্টি কি আকর্ষণ করা হয়েছে যে পালি এম. এ পরীক্ষার সাম্প্রতিক শ্রেণী তালিকায় মাঙ্গ-গারুদির জন্য যথার্থ কোটা নেই?

মাননীয় মন্ত্রী দামু শ্রফ (শিক্ষামন্ত্রী) : বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার জানাচ্ছেন, যে মাঙ্গ-গারুদির কোনও প্রার্থী পরীক্ষার জন্য আবেদন করেননি।

শ্রী চেন্নাপ্পা : সরকার কি এদের প্রার্থী না আসা অবধি পরীক্ষা বন্ধ রাখবেন এবং বিশ্ববিদ্যালয় সরকারের নির্দেশ অমান্য করলে বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্জুরি কেড়ে নেবেন ও বিশ্ববিদ্যালয় আইন সংশোধন করবেন?

মাননীয় সদস্য : সরকার প্রস্তাবটি বিবেচনা করবে (হর্ষধ্বনি)।

চেয়ে জঘন্য সাম্প্রদায়িকতার আশ্রয় নিয়েছেন। এখন শাসিত শ্রেণীর রক্ষাকবচ দাবি করার কারণ ব্রাহ্মণরা সুবিধা কব্জা রাখার জন্য আইন করে এদের শিক্ষা বা সম্পত্তি অর্জনকে অপরাধ হিসাবে নির্ধারিত করেছিল। শাসিত শ্রেণী আজ যেসব দাবি করছে, তা ব্রাহ্মণদের আগ্রাসন ও প্রাধান্য চিরস্থায়ী করার চেয়ে অর্ধেক খারাপ কাজও নয়। যেসব কথা বলা হল, তার থেকে দেখা যাবে যে, শাসক শ্রেণীর নেতৃত্বে স্বাধীনতার লড়াই শাসিতদের চোখে অত্যন্ত স্বার্থপর, ফাঁকিবাজির আন্দোলন। ভারতের শাসক শ্রেণী যে স্বাধীনতার জন্য লড়াই করছে, তা শাসিত শ্রেণীকে শাসন করার স্বাধীনতার জন্য। তাঁরা যা চাইছেন তা হল, প্রজাদের শাসন করার জন্য প্রভুজাতির স্বাধীনতা, এটা নাৎসি বা নীৎসের অতিমানবের স্বাধীনতার তত্ত্ব, সাধারণ মানুষকে শাসন করায় অতিমানবের অধিকারের তত্ত্বের সমতুল্য।

VIII

যেসব বিদেশি ভারতের রাজনীতির বিষয় জানতে চান ও সমস্যার সমাধানে কিছু করতে চান, তাঁদের জানা দরকার ভারতীয় রাজনীতির মূল ব্যাপার কী। সেটা বুঝতে না পারলে অথৈ জলে পড়বেন এবং কোনও দলের পাল্লায় পড়ে তাঁরা মোহগ্রস্ত হবেন। ভারতের রাজনীতির মূল বিষয়গুলি হল : (১) শাসিত শ্রেণীর ব্যাপারে শাসক শ্রেণীর দর্শন ও দৃষ্টিভঙ্গি; (২) কংগ্রেসের সঙ্গে শাসক শ্রেণীর সম্পর্ক এবং (৩) সাংবিধানিক রক্ষাকবচের জন্য শাসিত শ্রেণীর রাজনৈতিক দাবির মূল উদ্দেশ্য।

প্রথমটার বিষয়ে অনেক বলা হয়েছে, তার থেকেই বিদেশি মত গঠন করবেন। তথ্য ও ঘটনা সহকারে আমি যে তত্ত্ব উপস্থাপিত করতে চাই, তা সহজে বলা

X

('টাইমস্ অব ইন্ডিয়া' ১৯৪২ থেকে উদ্ধৃতি)

জে. জে. হাসপাতালে অপারেশনের পর রামজি সোনুর মৃত্যুর তদন্ত করার জন্য করোনার শ্রী ... ডাকা হয়। ডাঃ তানু পাণ্ডব (জাত নাপিত) স্বীকার করেন যে, তিনি অপারেশন করেছেন। তিনি পেটের তলায় একটা ফোঁড়া কাটার জন্য পেট খোলেন। কিন্তু কাঁচিটা হৃদয় বিদ্ধ করে ও রোগী মারা যায়। এ ধরনের কোনও অপারেশন তিনি আগে করেছেন কিনা জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি জানান, মাত্র একদিন আগে তিনি ওই হাসপাতালে মুখ্য শল্য-চিকিৎসক হিসাবে যোগ দিয়েছেন যেহেতু তাঁর সম্প্রদায়ের পালা আসে এবং আগে তিনি কোনওদিন অপারেশনের যন্ত্রপাতি ধরেননি, একমাত্র দাড়ি কামাবার ক্ষুর ছাড়া। জুরি মৃত্যুদণ্ড প্রত্যাহার করেন।

যেতে পারে। এতে বলা হয়েছে, স্বাধীন ও সার্বভৌম ভারতকে পৃথক ভারত করতে হলে এমন এক সংবিধান রচনা করতে হবে, যার রক্ষাকবচ দিয়ে শাসিত শ্রেণীকে শাসন করার জন্য শাসক শ্রেণীর ক্ষমতা সীমিত করা যাবে এবং তার লুণ্ঠন ক্ষমতা সীমিত করা যাবে। অন্ত্যজরা এই দাবিই করছে এবং কংগ্রেস এর বিরোধিতা করছে। কংগ্রেস ও অন্ত্যজদের মধ্যে বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দু এই সাংবিধানিক রক্ষাকবচ। প্রশ্ন হচ্ছে : ভারতের সংবিধানে কি তফসিলি জাতের জন্য রক্ষাকবচ থাকবে, না থাকবে না? বিদেশি এই প্রশ্ন বুঝে না, সে এটাও বুঝে না যে, কংগ্রেসের তথাকথিত প্রতিনিধিত্বকারী চরিত্র এক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক।

কংগ্রেস প্রতিনিধিত্বকারী সংস্থা হতে পারে, কিন্তু সংবিধানে এই রক্ষাকবচ রাখার সিদ্ধান্তের সঙ্গে এর সম্পর্ক নেই। প্রয়োজনের ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্ত হতে পারে এবং প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন হচ্ছে : তফসিলিরা যে রক্ষাকবচের দাবি করছে সেটা তাদের দরকার কী? কংগ্রেস প্রতিনিধিত্বকারী সংস্থা, সেজন্য এক্ষেত্রে কংগ্রেসকে বিদেশির সমর্থনের যুক্তি নেই। অবশ্যই সে তফসিলিদের দাবির পক্ষে যুক্তি চাইতে পারে। এমনকী সে বলতে পারে, শাসক শ্রেণীর অস্তিত্ব যথেষ্ট নয় এবং তাদের প্রমাণ করতে হবে এই শ্রেণী কত নীচ, নিষ্ঠুর ও সুরক্ষিত, যার জন্য সর্বজনীন ভোটাধিকারের দাবি মানবে না। নিঃসন্দেহে ভারতের শাসক শ্রেণী অন্যান্য দেশের শাসক শ্রেণীর তুলনায় বিশিষ্ট স্থান নিয়ে আছে। অন্যান্য দেশে অন্তত শাসক শ্রেণী ও অন্যদের মধ্যে একটা হাইফেন আছে। ভারতের দুইয়ের মধ্যে বাধার প্রাচীর রয়েছে। হাইফেন একটা পৃথকত্ব মাত্র। কিন্তু বাধা স্বার্থের মধ্যে বিভেদ এবং সমবেদনা একেবারে বিভক্ত। অন্যান্য দেশে শাসক শ্রেণীতে সবসময়ে অন্যদের অন্তর্ভুক্তির ব্যবস্থা রয়েছে, যারা এর অংশ নয় কিন্তু শাসক শ্রেণীর পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে তাদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ভারতে শাসক শ্রেণী একটা বদ্ধ যৌথ সংস্থা, এই শ্রেণীজাত নয় এমন কাউকে এর প্রবেশাধিকার দেওয়া হয় না। এই পার্থক্য খুব গুরুত্বপূর্ণ। যেসব ক্ষেত্রে শাসক শ্রেণীবদ্ধ সংস্থা সেখানে ঐতিহ্য, সমাজ-দর্শন ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি থাকে অটুট এবং প্রভু ও দাস, সুবিধাভোগী ও বঞ্চিতদের মধ্যে পার্থক্য কঠোরভাবে চালু থাকে। অন্যদিকে যেখানে শাসক শ্রেণবদ্ধ নয়, অন্যদের সঙ্গে সামাজিক লেন-দেন থাকে, সেখানে মানসিক সাঙ্গীকরণ হয় এবং এর সূত্রে শাসক শ্রেণী উদার হয়, তার দর্শন কম সমাজবিরোধী হয়। এই পার্থক্যের পেছনকার সত্য বুঝলে বিদেশির পক্ষে জানা সহজ হবে যে, শুধু সর্বজনীন ভোটাধিকার অন্যদেশের শাসক শ্রেণীর ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণে সহায়ক হলেও ভারতে হবে না। ভারতে অন্ত্যজদের মতো আরও অনেকের সংবিধানে বাড়তি রক্ষাকবচের দাবি

বিদেশির সমর্থনযোগ্য। ভারতকে গণতন্ত্রের পক্ষে নিরাপদ করার তাগিদে কংগ্রেসকে সমর্থন করার চেয়ে বরং এই রক্ষাকবচের দাবি সমর্থন করা উচিত। কারণ, কংগ্রেসের লক্ষ্য স্বাধীন ভারতকে শাসক শ্রেণীর কব্জায় রাখা।

দ্বিতীয় বিষয় সংশ্লিষ্ট তথ্যও রয়েছে। এর থেকে বিদেশিরা বুঝবেন কংগ্রেস ও শাসক শ্রেণীর মধ্যে গভীর সম্পর্ক কতটা। বুঝা যাবে ভারতের শাসক শ্রেণী কেন কংগ্রেস আন্দোলনের নেতৃত্বে থাকতে চায় এবং কেন সবাইকে কংগ্রেসের মধ্যে আনতে চায়। সংক্ষিপ্তভাবে বলা যায়, শাসক শ্রেণী জানে যে শ্রেণীভিত্তিক আদর্শ, শ্রেণীস্বার্থ, শ্রেণীসমস্যা ও শ্রেণীসঙ্ঘাতের ভিত্তিতে রাজনৈতিক প্রচার তার মৃত্যুঘন্টা বাজাবে। এরা জানে যে, শাসক শ্রেণীকে বোকা বানাবার সবচেয়ে সহজ উপায় জাতীয়তাবাদ ও জাতীয় ঐক্যের আবেগকে কাজে লাগানো এবং কংগ্রেস-ই একমাত্র মঞ্চ, যা শাসক শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা করতে পারে। কারণ কোনও মঞ্চ থেকে গরিব-ধনীর সঙ্ঘাত, ব্রাহ্মণ বনাম অ-ব্রাহ্মণ, জমিদার প্রজা, দাদনদার ঋণগ্রস্তের সঙ্ঘাতের কথা বলা হয়, যা শাসক শ্রেণীর মনঃপূত নয়, তা বন্ধ করতে কার্যকরী কংগ্রেস মঞ্চ, এই মঞ্চ শাসক শ্রেণীর স্বার্থে শুধু জাতীয়তাবাদ ও জাতীয় ঐক্য প্রচার-ই নয়, জাতীয়তাবাদের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ যে-কোনও আদর্শ প্রতিরোধ করে।

এই দুটি বিষয় বুঝলে বিদেশিরা শাসিতদের রাজনৈতিক দাবির যৌক্তিকতা বুঝতে অসুবিধা বোধ করবেন না।

শাসিত শ্রেণীর সংরক্ষণের জন্য দাবি প্রকৃতপক্ষে শাসক শ্রেণীর ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণের দাবি। এমনকী ইউরোপের দেশগুলিতেও সমাজের কিছু শ্রেণীর ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণের দাবি আছে। উৎপাদক, বন্টনকারী, টাকা দাদনকারী ও জমিদারদের ওপর নিয়ন্ত্রণ আছে। কিছু শ্রেণীর ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা ভারতের চেয়ে আরও ঐক্যবদ্ধ ও এক-ই সত্তার দেশগুলিতে অনুভূত হলে বিদেশিরা বুঝতে পারবেন নিশ্চয়ই ভারতে এর দরকার কেন। সংরক্ষণ দেশের সংবিধানের চেয়ে বরং সামাজিক বিধি-সংস্থার সঙ্গে সম্পর্কিত। শাসক শ্রেণীর হাতে রাজনৈতিক ক্ষমতা কব্জা রোধ করার জন্যই এই দাবি।

এতসব তথ্য ও যুক্তি ব্যাখ্যার পর আমার মনে হয় না বিদেশির এটা বিশ্বাস করা শক্ত হবে না যে, কংগ্রেসের প্রচারের অন্য এক দিক আছে। বিদেশির বুদ্ধিমত্তা ও চরিত্রের বিষয়ে করুণার উদ্রেক হবে, যদি তিনি এতসব তথ্য ও ঘটনা জানার পরও কংগ্রেসের মতামত পোষণ করে না এমন দৃষ্টিভঙ্গির নির্মোহ বিশ্লেষণে অনীহ হন।

IX

ভারতীয় রাজনীতি সম্বন্ধে বিদেশির চিন্তাধারার একটা করুণ দিক রয়েছে, এটা উল্লেখ না করা সম্ভব নয়। ভারতীয় রাজনীতি সম্বন্ধে উৎসাহী বিদেশিদের তিনটি দল আছে। প্রথম দল ভারতের রাজনীতির ওপর সামাজিক বিভাগের বিষয়ে সচেতন—সংখ্যাগরিষ্ঠ ও সংখ্যালঘু, হিন্দু ও অন্ত্যজদের মধ্যে বিভেদ ইত্যাদি। তাদের মুখ্য উদ্দেশ্য যথাযথ সাংবিধানিক রক্ষাকবচ দিয়ে এই বিভাগের সমাধান করে ভারতের সাংবিধানিক অগ্রগতি নয়, তাতে বাধা সৃষ্টির জন্য এইসব ভাগকে কাজে লাগানো। দ্বিতীয় দল এই বিভাগের ব্যাপারে নজর-ই দেন না, সংখ্যালঘু ও অন্ত্যজদের জন্য এতটুকু মাথাব্যথা তাঁদের নেই। তাঁরা কংগ্রেসের পক্ষ সমর্থনে বদ্ধপরিকর এবং রক্ষাকবচ নিয়ে চিন্তা না করে কংগ্রেসের লক্ষ্যপূরণে উৎসাহী। তৃতীয় দলটি ভারতে আসে, পর্যটক হিসাবে এবং রাতারাতি ভারতের রাজনীতি বুঝতে চান। এঁরা সবাই বিপজ্জনক লোক। তবে তৃতীয় দলটি বেশি বিপজ্জনক ভারতীয়দের স্বার্থের বিচারে।

বিদেশি পর্যটক ধরনের লোকেরা ভারতীয় রাজনীতির জটিল ব্যাপার বুঝতে পারেন না এবং কংগ্রেসকে অন্য কারণ ছাড়া শুধু সর্ববৃহৎ জনতার সঙ্গে থাকার জন্য আছেন, মিঃ পিকউইক একথাই সাম হুইলারকে বলেছিলেন। কিন্তু সবচেয়ে বিরক্তিজনক ব্রিটিশ শ্রমিক দলের দৃষ্টিভঙ্গি, ইউরোপ আমেরিকার বামপন্থী প্রগতিশীল প্রতিনিধি বলে গণ্য লাস্কি, কিংসলে মার্টিন এবং আমেরিকার 'নেশন', ব্রিটেনের 'নিউ স্টেটসম্যান' পত্রিকার সম্পাদকদের আচরণ, এর অবদমিত শোষিত শ্রেণীর স্বার্থের প্রবক্তা। এঁরা কীভাবে কংগ্রেসকে সমর্থন করেন তা বুঝা দুষ্কর। তাঁরা কি জানেন না যে, কংগ্রেস মানে শাসক শ্রেণী এবং শাসক শ্রেণী মানেই কংগ্রেস? এঁরা কি জানেন না যে, ভারতের শাসক শ্রেণী ব্রাহ্মণ-বেনিয়াদের জোট? জনতা কংগ্রেসের কাছে যায় শুধু শিবিরের অনুসারক হিসাবে। কংগ্রেসের নীতিতে এঁদের মতের কোনও স্থান নেই? তাঁরা কি জানেন না, যে কারণে সুলতান ইসলাম বাতিল বা পোপ ক্যাথলিক ধর্ম বানচাল করতে পারেননি, ভারতের শাসক শ্রেণীও এক-ই কারণে ব্রাহ্মণ্যবাদ ধ্বংস করতে পারবে না, এবং যতদিন শাসক শ্রেণী তার বর্তমান অবস্থায় থাকবে, যে ব্রাহ্মণ্যবাদ ব্রাহ্মণ ও সহযোগী জাতের শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার করে এবং শূদ্র ও অন্ত্যজদের অত্যাচারকে রাষ্ট্রের পবিত্র কাজ বলে মনে করে, ভারত স্বাধীন হলেও এই মতবাদ রাষ্ট্রের আদর্শ হিসাবে থাকবে। তাঁরা কি জানেন না যে, ভারতের এই শাসক শ্রেণী ভারতীয় জনতার অংশ নয়, জনতা থেকে শুধু বিচ্ছিন্নই

নয়, এরা নিজেদের বিচ্ছিন্ন রাখায় বিশ্বাসী, তাদের সংস্পর্শে অশুদ্ধ না হয়ে যাওয়ায় দৃঢ়বদ্ধ, ব্রাহ্মণবাদী দর্শনের প্রভাবে এদের মনে এদের বাইরের লোকদের প্রতি বিদ্বেষভাব ও শত্রুতা রয়েছে, সেজন্য নিপীড়িত মানুষের প্রতি এদের সহানুভূতি নেই। তাদের অভাব দাবি, দুঃখ-দুর্দশা, আশা-আকাঙ্ক্ষার বিরোধী, তাদের শিক্ষায় প্রগতি, উচ্চ পদে প্রমোশনের বিরোধিতা করেন। তাঁরা কি জানেন যে, ভারতের স্বরাজ-এ ৬ কোটি অন্ত্যজ মানুষের ভাগ্য জড়িত? এটা অসম্ভব যে, 'ব্রিটিশ লেবার পার্টি', কিংসলে মার্টিন, ব্রেইলস ফোর্ড এবং লাস্কি স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের ওপর যাঁর লেখা সব শোষিত মানুষের অনুপ্রেরণার উৎস, তাঁরা এসব ঘটনা জানেন না? তবু ভারতের কথা উল্লেখ করলেই এঁরা কংগ্রেসের সমর্থনের জন্য বলেন। খুব কম, নগণ্য সময়ে অন্ত্যজদের সমস্যার ওপর তাঁদের আলোচনা শোনা যায়। এদের সমস্যাই প্রগতিশীল ও গণতন্ত্রীদের কাছে শক্ত আবেদনপূর্ণ হওয়ার কথা। কংগ্রেসের কার্যকলাপে তাদের মূল দৃষ্টি এবং ভারতের জাতীয় জীবনে অন্যান্যদের ব্যাপারে অবহেলা প্রমাণ করে তারা কত বিপথে চালিত। কংগ্রেস রাজনৈতিক গণতন্ত্রের জন্য লড়াই করলে কংগ্রেসকে সমর্থন করার যুক্তি বুঝা যেত। সবাই জানেন, কংগ্রেস জাতীয় স্বাধীনতার জন্য লড়াই করছে, রাজনৈতিক গণতন্ত্রে তাদের উৎসাহ নেই। রাজনৈতিক গণতন্ত্রের জন্য যে দল লড়াই করছে তারা হল অন্ত্যজদের দল। এদের ভয় কংগ্রেসের স্বাধীনতার লড়াই সফল হলে শক্তিশালী ও ক্ষমতাবানরা দুর্বল নিপীড়িত মানুষকে শোষণ ও অত্যাচর করার স্বাধীনতা অর্জন করবে, সাংবিধানিক রক্ষাকবচ দিয়ে এদের রক্ষা না করলে তাই হবে। প্রগতিশীল নেতাদের সমর্থন এদের-ই পাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু অন্ত্যজরা এত বছর বৃথা এদের সদিচ্ছা ও সমর্থন পাওয়ার আশায় ছিল। ইউরোপ ও আমেরিকার এইসব প্রগতিশীল ও বামপন্থীরা কংগ্রেসের পেছনকার শক্তি সম্বন্ধে জানার প্রয়োজনবোধ করেননি। অজ্ঞ বা অমনোযোগী কি জানা নেই, কিন্তু ঘটনা হচ্ছে এইসব বামপন্থী ও প্রগতিশীলরা পুঁজিপতি, জমিদার ও দাদনদার, প্রতিক্রিয়াশীল পরিচালিত কংগ্রেসকে বিনা প্রশ্নে অন্ধ ভাবে সমর্থন করছেন। তার একমাত্র যুক্তি কংগ্রেস স্বকীয় কাজকর্মকে 'স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ' বলে বাগাড়ম্বরপূর্ণ অভিধা দিচ্ছে। স্বাধীনতার সব যুদ্ধ এক-ই নৈতিক পর্যায়ে পড়ে না। এর সোজা কারণ এইসব স্বাধীনতা যুদ্ধের উদ্দেশ্য ও অভিসন্ধি সব সময়ে এক নয়। ব্রিটিশ ইতিহাস থেকে কয়েকটি দৃষ্টান্ত নেওয়া যায়। জনের বিরুদ্ধে ব্যারনদের যুদ্ধকে (যাকে Magna Charta বলা হয়) স্বাধীনতার যুদ্ধ বলা যায়। কিন্তু আধুনিক কালের কোনও গণতন্ত্রী কি একে ব্রিটিশ ইতিহাসে সংঘটিত কৃষক বিদ্রোহ বা সাম্যবাদীদের বিদ্রোহের মতো একেই সমর্থন করবে যেহেতু একে

স্বাধীনতার যুদ্ধ বলা যায়? সেটা করলে স্বাধীনতার জন্য মিথ্যা কান্নার প্রতি সমর্থন বলে গণ্য হবে। বাঁচার স্বাধীনতা ও শোষণের স্বাধীনতার মধ্যে পার্থক্য বুঝতে না পারে এমন কোনও গোষ্ঠী এরকম মূর্খ আচরণ করলে মার্জনীয় ছিল। কিন্তু সর্বশ্রী লাস্কি, মার্টিন, ব্রেইলস ফোর্ড, লুই ফিশারের মতো প্রগতিবাদী বামপন্থী গোষ্ঠী ও গণতন্ত্রের প্রবক্তাদের পক্ষে এই আচরণ ক্ষমার অযোগ্য।

প্রকৃত গণতন্ত্রের প্রবক্তা অন্যান্য দলকে সমর্থন নয় কেন, এই প্রশ্নের উত্তরে বিদেশিরা পাল্টা প্রশ্ন করেন, ভারতে তেমন দল আছে কী? তেমন দল আছে বললে তাঁরা বলেন, যদি থাকতই, তবে সংবাদপত্রে তাদের কাজের সংবাদ প্রকাশিত না কেন? যখন বলা হয়, সংবাদ মাধ্যম কংগ্রেস মাধ্যম, তাঁরা প্রত্যুত্তর দেন, ইংরাজি সংবাদপত্রের বিদেশি প্রতিনিধিরা এদের সম্বন্ধে সংবাদ প্রকাশ করে না? আমি দেখিয়েছি, বিদেশি সাংবাদিকদের থেকে আর কিছু ভাল আশা করা যায় না কেন। ভারতে বিদেশি সংবাদ সংস্থাগুলি ভারতীয় সংবাদপত্রের মতোই খারাপ। ভাল হতে পারে না। ভারতে বিদেশি সংবাদপত্রের প্রতিনিধিরা আছেন। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তাঁরা ভারতীয়, মাত্র কয়েকজন বিদেশি। ভারতীয় সাংবাদিকদের নির্বাচন করা হয় এমনভাবে, যাতে তাঁরা কংগ্রেস শিবিরভুক্ত হন। বিদেশি সাংবাদিকদের মধ্যে দু' ধরনের লোক আছেন। তাঁরা মার্কিন হলে ব্রিটিশ-বিরোধী হবেন এবং সেজন্য ভারত সমর্থক। ভারতের যে-কোনও রাজনৈতিক দল কট্টর ব্রিটিশ-বিরোধী না হলে তাঁদের উৎসাহ হয় না। যাঁরা কংগ্রেসের নন তারা বলবেন, ১৯৪১-'৪২-এ এই দেশে নিযুক্ত মার্কিন সমর সংবাদদাতাদের বুঝানো কত শক্ত ছিল যে, কংগ্রেস-ই একমাত্র দল নয়। অন্য দল সম্বন্ধে তাঁদের উৎসাহিত করা অনেক দূরের ব্যাপার। অনেককাল পরে তাঁরা প্রকৃতিস্থতা ফিরে পেলেন এবং বুঝলেন যে, কংগ্রেস সংগঠনটি অসম্ভব সব ব্যক্তির দ্বারা পরিচালিত। তখন তাঁরা কংগ্রেসকে নিন্দা করতেন অথবা ভারতীয় রাজনীতি সম্পর্কে উৎসাহহীন হয়ে পড়েন। তাঁরা কখনই অন্যান্য রাজনৈতিক দল সম্বন্ধে উৎসাহিত হননি এবং তাদের মতামত বুঝার চেষ্টা করেননি। ভারতস্থ ব্রিটিশ সংবাদদাতাদের ক্ষেত্রেও অবস্থা কিছু ভাল ছিল না। তাঁরাও শুধু সেই ধরনের দলের প্রতি উৎসাহ নিতেন যারা ব্রিটিশ-বিরোধী। ভারতের যেসব রাজনৈতিক দল স্বাধীন ভারতকে গণতন্ত্রের পক্ষে নিরাপদ করতে চাইতেন, তাদের প্রতি এঁদের উৎসাহ ছিল না। এর ফলে বিদেশি সংবাদপত্রে ভারতীয় রাজনীতি সম্বন্ধে ভারতীয় সংবাদপত্রের মতো একই ধরনের সংবাদ বেরুত। এইসব বিষয় প্রগতিশীল বামপন্থীদের ধারণার বাইরে ছিল এমন নয়। সংবাদদাতা হোন বা সংবাদদাতা না হোন। প্রগতিপন্থীদের এটা কি দায়িত্ব ছিল না, অন্যান্য দেশের সমগোত্রীয়দের সঙ্গে

যোগাযোগ রাখা এবং গণতন্ত্র যাতে সব দেশে সফল হয় তার জন্য তাদের সাহায্য করা? এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা, ইংলন্ড ও আমেরিকার প্রগতিপন্থীরা এই শ্রেণীর প্রতি তাদের দায়িত্ব ভুলে গেছেন এবং ভারতীয় বা ভারতীয় রক্ষণশীলদের দালাল হয়ে বিশ্বজনতাকে বোকা বানাবার জন্য স্বাধীনতার স্লোগানকে কাজে লাগাচ্ছেন।

কংগ্রেসের সৃষ্ট কুহেলিকা থেকে সত্বর মুক্ত হয়ে এঁরা যদি বুঝেন যে, ভারতে স্বাধীনতা সব মানুষের করায়ত্ত না হলে গণতন্ত্র ও স্বায়ত্তশাসন অর্থবহ হবে না, তাহলেই এঁদের ও ভারতের মানুষের মঙ্গল। কংগ্রেসের ফাঁকা প্রচার এবং উদ্দেশ্যের যথাযথ বিশ্লেষণ না করে এঁরা যদি কংগ্রেসকে জোর করে সমর্থন করেন, আমি নির্দ্বিধায় বলতে পারি, এঁরা ভারতের বন্ধু নন, বরং ভারতের মানুষ ও স্বাধীনতার শত্রু। এটা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, এঁরা দুই স্বৈরতন্ত্রীর মধ্যে পার্থক্য করতে অক্ষম। এক স্বৈরতন্ত্রী তার শোষণ ক্ষমতা অটুট রাখার জন্য স্বাধীনতার আর্জি করছেন, আর এক স্বৈরতন্ত্রী শ্রেণী স্বৈরতন্ত্রীর শোষণের হাত থেকে মুক্ত হওয়ার কথা বলছেন। ভারতের স্বাধীনতা আনার জন্য তাড়াহুড়োতে এঁরা বুঝতে পারছেন না যে, কংগ্রেসের পক্ষাবলম্বী হয়ে এঁরা ভারতকে গণতন্ত্রের পক্ষে নিরাপদ করছেন না, স্বৈরতন্ত্রীর ক্ষমতা একচ্ছত্র প্রয়োগের স্বাধীনতা চাইছেন। এটা কি তাদের বলে দেওয়ার দরকার আছে যে, কংগ্রেসকে সমর্থন করা মানে দাসত্ব বজায়ের স্বৈরতন্ত্র অটুট রাখা?

অধ্যায় ১০

অস্পৃশ্যরা কী বলেন?
শ্রী গান্ধী থেকে সাবধান!

কংগ্রেসিরা অস্পৃশ্যদের এই কথা বলে প্রভাবান্বিত করতে কখনও ইতস্তত করেন না যে শ্রী গান্ধী তাঁদের ত্রাণকর্তা। সমগ্র ভারতের কংগ্রেসিরা কেবলমাত্র একথাই বিশ্বাস করেন না যে শ্রী গান্ধী একজন বাস্তবিক উদ্ধারকর্তা, বরং তাঁরা অস্পৃশ্যদের, তাঁকে তাঁদের একমাত্র উদ্ধারকর্তা বলে মেনে নিতে উস্কানিও দেন। যখন কোনও সাক্ষ্য প্রমাণের জন্য চাপ দেওয়া হয়, তারা অস্পৃশ্যদের এই কথাই বলেন যে, গান্ধী ছাড়া অন্য কেউ-ই তাঁদের জন্য আমরণ অনশন করার জন্য প্রতিজ্ঞা করেননি।

বাস্তবিক পক্ষে কোনও রকম পশ্চাত্তাপ ছাড়াই তাঁরা অস্পৃশ্যদের এই কথাই বুঝান যে 'পুনা চুক্তি'র দ্বারা যে সমস্ত রাজনৈতিক অধিকার তাঁরা পেয়েছেন, তা একমাত্র গান্ধীজির-ই প্রয়াসের ফল। এই প্রচারের প্রমাণস্বরূপ আমি রায়বাহাদুর মেহেরচাঁদ খান্নার বক্তব্যকে[১] উদ্ধৃত করতে চাই যা তিনি গত ১২ই এপ্রিল ১৯৪৫ সালে পেশোয়ারে 'অবদমিত শ্রেণী লীগ' (Depresed Classes League)-এর দ্বারা আয়োজিত অস্পৃশ্যদের এক সভায় বলেছিলেন বলে সংবাদপত্রে বর্ণিত।

'তোমাদের একমাত্র উত্তম এবং প্রকৃষ্ট বন্ধু হলেন মহাত্মা গান্ধী, যিনি তোমাদের জন্য জীবনপণ করে অনশন করেছেন এবং পুনা সন্ধির মাধ্যমে তোমাদের স্থানীয় সংস্থায় এবং সংসদে (বিধানসভায়) ভোটাধিকার এবং প্রতিনিধিত্ব করার অধিকার আদায় করেছেন। তোমাদের মধ্যে কিছু লোক, আমি জানি, ড. আম্বেদকরের অনুগামী, যিনি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের সৃষ্ট এবং ব্রিটিশ সরকারের হাতকেই মজবুত করার জন্যই চেষ্টা করেন, যাতে করে ভারতবর্ষকে ভাগ করা যায় এবং ব্রিটিশরা তাদের শক্তিকে অক্ষুণ্ণ রাখতে পারে। আমি তোমাদের স্বার্থেই আবেদন করব যে তোমরা তোমাদের প্রকৃত বন্ধু এবং এইসব স্ব-ঘোষিত নেতাদের মধ্যে পার্থক্য করবে।'

রায়বাহাদুর মেহেরচাঁদ খান্নার এই বক্তব্য যে বিশেষভাবে লক্ষণীয় সেজন্য আমি উদ্ধৃত করছি না। কিন্তু ভারতীয় রাজনীতিতে এঁর মতো আর কেউ-ই দুরাচার

---

১. 'ফ্রি প্রেস জার্নাল', ১৪.৪.৪৫

দোষে দুষ্ট নন। এক বছরের অবধিতে — বেশি দূরের কথা নয়, এই ১৯৪৪ সালে—তিনি সার্থকভাবে তিন প্রকারের চরিত্রে চরিত্রাভিনয় করেছেন। তিনি হিন্দু মহাসভার সম্পাদক হয়ে শুরু করেন, তারপর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের চরে পরিণত হন, ব্রিটেন এবং আমেরিকাবাসীদের নিকট ভারতের যুদ্ধের প্রচেষ্টা সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করার জন্য বিদেশে যান এবং এখন উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে কংগ্রেসের প্রতিনিধি। রায়বাহাদুর খান্নার মতো লোকের মতামত (ড্রাইডেনের ভাষায় বলতে গেলে) এতই অনিশ্চিত ও অনির্দিষ্ট যে শুরুতেই সর্বসম্পন্ন এবং সংক্ষিপ্ত এবং একপক্ষ কালের মধ্যেই তিনি কখনও রসায়নবিদ, কখনও জাদুকর, কখনও সরকারি প্রবক্তা এবং তখন-ই আবার একজন ক্ষমার অযোগ্য বা অপমানের অযোগ্য ভাঁড়। আমি তাঁর প্রসঙ্গে উল্লেখ করছি এইটুকু মাত্র দেখাতে যে শ্রী গান্ধীর প্রচারক বন্ধুগণ[১] অস্পৃশ্যদের বোকা বানাতে কীরকম প্রচার চালাচ্ছেন।

আমি জানি না কতজন অস্পৃশ্য এই মিথ্যাকে গলাধঃকরণ করতে প্রস্তুত হবেন। কিন্তু আমি মনে করি যে, নাৎসিরা এটা প্রমাণ করেছে যে মিথ্যাটা যদি ডাহা (বড়) মিথ্যা হয় এবং সাধারণ মানুষ যদি তাদের বুদ্ধি দ্বারা পরীক্ষা-নিরীক্ষা না করতে পারে—এবং এই মিথ্যাকে যদি বারবার আবৃত্তি করা হয়, তবে তা একদিন সত্য-রূপে গৃহীত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে—আর যদি সত্যরূপে গৃহীত না হয় তবে তা প্রচার দ্বারা প্রভাবান্বিত ব্যক্তিদের ওপর প্রতিফলিত হবে এবং তারা তাকে সত্য বলে গ্রহণ করবে। এইজন্য আমার একান্ত প্রয়োজন যে, অস্পৃশ্যদের আন্দোলনে শ্রী গান্ধী যে ভূমিকা গ্রহণ করেছেন তা প্রকাশ করার এবং অস্পৃশ্যদের এই প্রচারের মুখে আত্মবিসর্জন থেকে সাবধান করে দেওয়ার।

I

অস্পৃশ্যদের আন্দোলনে শ্রী গান্ধীর ভূমিকার জরিপ বা মূল্যায়ন করতে গেলে সেই সময়টি নির্ধারণ করে শুরু করতে হবে যখন থেকে শ্রী গান্ধী প্রথম অনুভব করলেন যে, অস্পৃশ্যতা একটি পাপ বা হানিকারক। এই বিষয়ে আমরা শ্রী গান্ধীর নিজস্ব সাক্ষ্য বা প্রমাণপত্র গ্রহণ করতে পারি। নিপীড়িতবর্গ সম্মেলনের সভাপতি হিসাবে ১৯২১-সালের ১৪ই এবং ১৫ই এপ্রিল আহমেদাবাদে তাঁর ভাষণে শ্রী গান্ধী বললেন—

---

১. এরকম প্রচারের নিদর্শন যা বহন করে গেছেন জনৈক পার্শি ভদ্রলোক, নাম অধ্যাপক এ.আর.ওয়াদিয়া। অধ্যাপক ওয়াদিয়ার অভিমত পর্যালোচনা করেছেন শ্রী ই.জে. সঞ্জনা তাঁর বোম্বাই থেকে প্রকাশিত গুজরাটি সাপ্তাহিক 'রস্ত-রহবর' ২৯ অক্টোবর, ১৯৪৪ থেকে ১৫ এপ্রিল, ১৯৪৫ পর্যন্ত সংখ্যায় ধারাবাহিক প্রবন্ধাবলীতে। শীর্ষক ছিল 'রাজনীতিতে যুক্তি ও যুক্তিহীনতা।'

'আমার বয়স তখন বড়জোর বারো, যখন এই ভাবনাটা আমার মধ্যে এল। উখা নামে একজন মেথর, অস্পৃশ্য, আমাদের বাড়িতে পায়খানা সাফ করতে আসত। অনেক সময় আমি আমার মাকে জিজ্ঞাসা করতাম, তাকে (উখাকে) ছুঁলে দোষ হয় কেন, কেন তাকে ছুঁতে আমাকে নিষেধ করা হত। যদি আকস্মিক ভাবে কোনও রকমে তাকে ছুঁয়ে ফেলতাম আমাকে চান করতে বলা হত, শৌচ করতে বলা হত, এবং যদিও আমি সেই আদেশ পালন করতাম, তবুও কখনও হাসিমুখে আপত্তি না করে থাকতাম না। আমি আপত্তি করতাম যে, এটা (অস্পৃশ্যতা) কোনও ধর্মের বিধান নয়, এবং ধর্মের সেরকম বিধান হওয়াও অসম্ভব। আমি একজন অনুগত এবং কর্তব্যপরায়ণ ছেলে ছিলাম এবং এই শৌচ হওয়ার ব্যাপারটা কেবলমাত্র পিতামাতার প্রতি শ্রদ্ধার জন্যই করতাম। কখনও কখনও আমার তাঁদের সঙ্গে ঝগড়া হত এই ব্যাপারে। আমি মাকে বলতাম যে 'উখাকে স্পর্শ করলে পাপ হয়, তাঁর এই ভাবনাটা একেবারে ভুল।

'যখন স্কুলে থাকতাম তখন কখনও কখনও আমি অস্পৃশ্যদের ছুঁয়ে ফেলতাম, এবং আমি আমার বাবা-মায়ের কাছে তা লুকোতাম না। আমার মা বলত, এই ছোঁয়াছুঁয়ির পাপ কাটাবার সংক্ষিপ্ত উপায় হল যে তখনই কোনও মুসলমানকে ছুঁয়ে দেওয়া। এবং কেবলমাত্র মায়ের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা দেখানোর জন্য আমি সেইরকম করতাম। কিন্তু কখন-ই তা ধর্মীয় নিয়ম বা কর্তব্য হিসাবে করতাম না।

'তারপর কিছুদিন পরে আমরা পোরবন্দরে চলে গেলাম এবং তখন আমার সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে প্রথম পরিচয় হল। তখনও আমাকে ইংরাজি স্কুলে দেওয়া হয় নি। আমাকে ও আমার ভাইকে একজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের দায়িত্বে দেওয়া হয়েছিল। তিনি আমাদের 'রামরক্ষা' এরং 'বিষ্ণু পুঞ্জর' শিক্ষা দিতেন। সেই পাঠ্য পুস্তকের 'জলে বিষ্ণু', 'স্থলে বিষ্ণু' আমার স্মৃতি থেকে কখনও মুছে যায়নি। একজন মাতৃস্থানীয়া বৃদ্ধা আমাদের বাড়ির কাছেই থাকতেন। ব্যাপারটা হল যে, আমি তখন খুব-ই ভীতু ছিলাম এবং আলো নিভে অন্ধকার হলেই আমি ভূত এবং পিশাচের ভয়ে চিৎকার করতাম। সেই বুড়িমা আমাকে তখন ভূতের ভয় থেকে মুক্ত করবার জন্য 'রামরক্ষা'র পড়ার বিষয়গুলো মনে মনে বিড়বিড় করে বলতে বলত এবং বলত যে ঐরকম করলেই ঐসব পাপ আত্মাগুলো পালিয়ে যাবে। এটা আমি করতাম এবং আমি যেমন ভাবতাম তাতে ভাল ফল হত। আমি তখনও বিশ্বাস করতাম না যে 'রামরক্ষা'তে অস্পৃশ্যকে স্পর্শ করলে পাপ হয় বলে কিছু লেখা আছে। আমি তখন এটার মানেই বুঝতাম না—কিংবা বলতে পারি যে এটাকে অত্যন্ত ত্রুটিপূর্ণ বা অশুদ্ধভাবে বুঝতাম। কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, 'রামরক্ষা'

সব ভূতের ভয়কে নষ্ট করতে পারে, তার মধ্যে অস্পৃশ্যকে ছোঁওয়ায় পাপের ভয়কে নিশ্চয় প্রশ্রয় দেবে না।

'আমাদের পরিবারে নিয়মিত রামায়ণ পাঠ হত। লধা মহারাজ নামে এক ব্রাহ্মণ তা পাঠ করত। তার কুষ্ঠ রোগ হয়েছিল এবং সে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করত যে, নিয়মিত রামায়ণ পাঠে সে আরোগ্যলাভ করবে এবং বাস্তবিক-ই তার রোগ সেরে গিয়েছিল। আমি নিজে নিজেই চিন্তা করতাম যে, রামায়ণে লেখা আছে একজন 'অস্পৃশ্য' রামকে কী করে নৌকোয় গঙ্গা পার করে দিয়েছিল। যদি রামায়ণ অস্পৃশ্যতাকেই প্রশ্রয় দেয় বা তাদেরকে দূষিত আত্মা মেনে অস্পৃশ্য বলে তাহলে তা কি করে হল? আসলে আমরা ভগবানকে পাপীর পাপ মোচনকারী বলে সম্বোধন করি এবং অনুরূপভাবেই এ-ও এক-ই ভাবে জানায় যে, হিন্দুত্বের মধ্যে জাত কাউকেই পরিদূষিত বা অস্পৃশ্য রূপে গণ্য করা পাপ। এটা করা শয়তানের কাজ। সেই থেকে আমি এটাকে পাপ বলে দ্বিরুক্তি করতে ক্লান্ত হই না। আমি একথা ছলনা করে বলছি না যে, এই ব্যাপারটা আমার বিশ্বাস বা প্রত্যয় হিসাবে দানা বেঁধেছিল বারো বছর বয়সে, কিন্তু আমি বলছি যে, সেই সময়েই আমি অস্পৃশ্যতাকে পাপ বলে মনে করতাম। আমি এই কাহিনী বৈষ্ণব এবং গোঁড়া হিন্দুদের অবধানের জন্যই বললাম।'

এটা জানা নিঃসন্দেহে রুচিকর ও আনন্দদায়ক যে শ্রী গান্ধী সেই অন্ধ গোঁড়ামিতে ভরা যুগেই অস্পৃশ্যতাকে একটি পাপ বলে জেনেছিলেন, এবং তাও তাঁর বয়স যখন মাত্র বারো বছর। কিন্তু অস্পৃশ্যরা জানতে চায় যে শ্রী গান্ধী সেই পাপকে, সেই কুসংস্কারকে দূরীকরণের জন্য কী করেছিলেন। আমি এ বিষয়ে মাদ্রাজের 'টেগোর অ্যাণ্ড কোং' কর্তৃক প্রকাশিত 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' নামক গ্রন্থের শ্রী গান্ধীর জীবনীমূলক একটি পাদটীকার উল্লেখ করতে চাই যাতে শ্রী গান্ধীর বিশেষ কাজকর্মের উল্লেখ আছে, যা নিয়ে শ্রী গান্ধী তাঁর প্রথম জনগণের জন্য কাজ শুরু করেন। ওই পাদটীকায় বলা হয়েছে—

'মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর জন্ম হয় ১৮৬৯ খিস্টাব্দের ৫ই অক্টোবর। তিনি করমচাঁদ গান্ধীর পুত্র, যিনি পোরবন্দর, রাজকোট এবং কাথিয়াওয়াড় রাজ্যের অন্যান্য জায়গার দেওয়ান ছিলেন। তিনি কাথিয়াওয়াড় উচ্চ বিদ্যালয় থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত হন, এবং পরবর্তীকালে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইনার টেম্‌পলে। বিলেত থেকে ফিরে আসার পর বোম্বাই উচ্চ-ন্যায়ালয়ের অধিবক্তা (Advocate) হিসাবে নথিভুক্ত হন। তারপর তিনি নাটালে গিয়েছিলেন এবং একটি আইন বিষয়ক দূত হিসাবে ট্রান্সভাল-

এ যান। সেখানে নাটালের উচ্চতম-ন্যায়ালয়ে একজন আইনের অধিবক্তা হিসাবে নথিভুক্ত হন বা সদস্যপদ পান। সেইখানেই থাকবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। সেখানে ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে 'নাটাল ইন্ডিয়ান কংগ্রেস' (Natal Indian Congress)-এর স্থাপনা করেন। পরে ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন। নাটালের এবং ট্রান্সভালের ভারতীয়দের হয়ে তিনি আন্দোলন শুরু করেন ভারতে এসে। তারপর তিনি ডারবানে ফিরে যান। সেখানে নামতেই ক্ষিপ্ত জনতা কর্তৃক আক্রান্ত হন এবং মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই পান। ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি 'ইন্ডিয়ান অ্যামবুলেন্স ক্যোর' নামক এক সেনাবাহিনী পরিচালনা করেন বুয়র যুদ্ধে। ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে আবার ভগ্নস্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের জন্য ভারতে ফিরে আসেন। আবার তিনি মিঃ চেম্বারলিনের কাছে দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়দের কষ্টের ওপর ভারতীয় মনোভাব উপস্থাপনের জন্য ভারতীয়দের প্রতিনিধিত্ব করতে ট্রান্সভালের উচ্চতম ন্যায়ালয়ে একজন ন্যায়বাদী (Attorney) হিসাবে নাম নথিভুক্ত করেন এবং সেখানে 'ট্রান্সভাল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন'-এর প্রতিষ্ঠা করেন এবং তার অবৈতনিক সচিব এবং আইন পরামর্শদাতা হিসাবে কাজ করেন। ১৯০৩ খ্রিঃ তিনি 'ইন্ডিয়ান ওপিনিয়ন' (Indian Opinion) নামে এক পত্রিকা প্রকাশ করেন এবং ফীনিক্স (Phenix) উপনিবেশ স্থাপনা করেন। ১৯০৬ খ্রিঃ যুদ্ধের সময় 'রুগ্ন ও আহতদের খাটুলি-বাহক বাহিনী' (Stretcher Bearer Corps) পরিচালনা করেন। ১৯০৬ সালে 'অ্যান্টি এশিয়াটিক অ্যাক্ট ১৯০৬' (Anti Asiatic Act, 1906)-এর বিরুদ্ধে আন্দোলন করেন। তারপর এই আইন তুলে নেওয়ার জন্য ইংলন্ডে ডেপুটেশনে যান। এই সময় এই আইনের বিরুদ্ধে সহনশীল বা নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ আন্দোলন শুরু হয়। সেই সময় জেনারেল স্মার্ট-এর সঙ্গে তাঁর আলোচনা হয় এবং একটি চুক্তি বা বুঝাপড়া হয়। স্মার্ট পরে এই চুক্তির ব্যাপারে এবং আইনটিকে রদ করার ব্যাপারে অস্বীকার করেন এবং আবার নিষ্ক্রিয় অবরোধ শুরু হয়। এই সময় আইন ভঙ্গের জন্য দু'বার জেল হয়। আবার ১৯০৯ খ্রিঃ তিনি ইংলন্ডের জনগণের কাছে ভারতীয়দের অবস্থা সম্বন্ধে জানাতে ইংল্যান্ডে যান। ১৯১১ খ্রিঃ মিঃ গোখলে দক্ষিণ আফ্রিকায় যান এবং একটি সাময়িক ফয়সলা হয়। আবার ১৯১৪ খ্রিঃ সরকার সেই চুক্তিকে সম্পাদন করতে অগ্রাহ্য করলে আবার নিষ্ক্রিয় আন্দোলন শুরু হয়। তারপর ১৯১৪ খ্রিঃ এর নিষ্পত্তি হয়। আবার ইংল্যান্ডে যান; ১৯১৪ খ্রিঃ 'ইন্ডিয়ান অ্যাম্বুলেন্স ক্যোর' (Indian Ambulance Corps) নামে এক বাহিনী সংগঠন করেন।

এই জীবনীমূলক পাদটীকা থেকে এটা পরিষ্কার যে, শ্রী গান্ধী তাঁর জনসেবামূলক জীবন ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে শুরু করেন যখন তিনি নাটাল ভারতীয় কংগ্রেসের স্থাপনা

করেন। ১৮৯৪ থেকে ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে পর্যন্ত তিনি দক্ষিণ আফ্রিকায় ছিলেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি অস্পৃশ্যদের ব্যাপারে কখনও চিন্তা করেননি। এমনকী উখার ব্যাপারেও (তাঁর ঘরের মেথর ছেলেটি) কখনও কোনও খোঁজ-খবর নেননি।

শ্রী গান্ধী ভারতে ফিরে আসেন ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে। সে সময়েও কি তিনি অস্পৃশ্যদের ব্যাপারে কোনও প্রচেষ্টা করেছিলেন? তা হলে আমি ঐ আত্মজীবনী-মূলক টীকা থেকে আরও উদ্ধৃতি দিই, যা বলে—

'১৯১৫তে তিনি ভারতে ফিরে এলেন। আহমেদাবাদে সত্যাগ্রহ আশ্রমের প্রতিষ্ঠা করলেন। ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে চম্পারণে আন্দোলনের (নিষ্পত্তিতে) মীমাংসায় অংশগ্রহণ করলেন। এবং খেড়া দুর্ভিক্ষে এবং আহমেদাবাদে ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে মিল ধর্মঘটে অংশ নিলেন; ১৯১৮ খ্রিঃ সেনাদলে নিযুক্তির জন্য আন্দোলন করলেন; রাওলাট আইন-এর বিরুদ্ধে আন্দোলন করলেন এবং ১৯১৯-এ সত্যাগ্রহ আন্দোলনের শুভ উদ্বোধন করলেন। তারপর তাঁর দিল্লি যাওয়ার পথে কোশীতে তিনি বন্দী হলেন এবং তাঁকে বোম্বাইতে ফেরত পাঠানো হ'ল। ১৯১৯ খ্রিঃ পঞ্জাবের অশান্তি এবং সরকারি নিষ্ঠুরতা। পঞ্জাবে সরকারি নিষ্ঠুরতার জন্য কংগ্রেস কর্তৃক গঠিত অনুসন্ধান কমিটির সদস্য নিযুক্ত হন। খিলাফৎ আন্দোলনে অংশ নিলেন। ১৯২০ খ্রিঃ অসহযোগ আন্দোলনের ও প্রচারের উদ্বোধন করলেন; ১৯২১ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে লর্ড রিডিং-এর সঙ্গে সাক্ষাৎকার; কংগ্রেসের ১৯২১ খ্রিস্টাব্দের এর অধিবেশনে কংগ্রেসের একমাত্র এবং পূর্ণ কার্যকরী প্রাধিকার গ্রহণ; ফেব্রুয়ারি ১৯২২-এ নাগরিক আইন অমান্য আন্দোলনের কার্যক্রম; চৌরিচৌরার ঘটনায় (দাঙ্গার জন্য) আইন অমান্য আন্দোলনের বিরতি ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে। ১৯২২ খ্রিস্টাব্দের ১০ই মার্চ আবার বন্দী হলেন এবং বিচার হল। বিচারে তাঁর ছয় বছরের জন্য সাধারণ বন্দিত্বের শাস্তি হিসাবে জেলে যেতে হ'ল বা কারাদণ্ডে দণ্ডিত হলেন।'

এই পাদটীকাটি বাস্তবিক-ই ত্রুটিপূর্ণ বা ভুল। এটি গান্ধীজির জীবনের অনেক মহত্ত্বপূর্ণ এবং সর্বজনজ্ঞাত ঘটনার উল্লেখ করেনি। এটাকে সম্পূর্ণ করতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অবশ্যই যোগ করতে হবে। যথা—

'১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি ভারতকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের কবল থেকে মুক্ত করতে আফগান আক্রমণকে স্বাগত জানাতে প্রস্তুত বলে ঘোষণা করলেন। ১৯২০-তে দেশের সম্মুখে বারদৌলি কার্যক্রমের গঠনমূলক কার্যের প্রস্তাব রাখলেন ১৯২১

খ্রিঃ 'তিলক স্বরাজ নিধি' নামে একটি কোষ স্থাপনা করেন এবং দেশকে 'স্বরাজ' জয় করবার প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য ১ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করেন।'

এই পাঁচ বছরে গান্ধীজি সম্পূর্ণরূপে কংগ্রেসকে একটি সংগ্রামী প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে, একটি যুদ্ধের যন্ত্র হিসাবে তৈরি করতে এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে ঝাঁকিয়ে দেওয়ার জন্য নিজেকে সম্পূর্ণরূপে নিয়োজিত করেছিলেন। তিনি খিলাফতের হয়ে আন্দোলন করেছিলেন মুসলমানদের কংগ্রেসে যোগদান করানোর জন্য, এবং হিন্দুদের খিলাফৎ আন্দোলনকে অনুমোদন করে এর অনুধাবন করানোর জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন।

এই সময়ে শ্রী গান্ধী অস্পৃশ্যদের জন্য কী করেছিলেন? কংগ্রেস কর্মীগণ অবশ্যই বারদৌলির কর্মসূচির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করবেন। এটা সত্য যে, অস্পৃশ্যদের উন্নতিসাধনও বারদৌলি কার্যক্রমের[১] একটি অংশ ছিল। কিন্তু যেটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন সেটি হল যে, এ বিষয়ে কী হয়েছিল তা জানা? এই কাহিনীর সারমর্ম হিসাবে বলতে গেলে বলতে হয় যে, বারদৌলি কার্যক্রম অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের জন্য কার্যক্রম ছিল না। এটি একটি উন্নতিসাধনের জন্য কর্মানুষ্ঠান ছিল, যা ডিসরেলির পরিভাষা অনুসারে এক প্রাচীন সমাজ সংগঠনের সঙ্গে আধুনিক উন্নতির সংযোজন। এই কার্যক্রম খোলাখুলি ভাবে অস্পৃশ্যতাকে সমর্থন করেছিল এবং অস্পৃশ্যদের জন্য আলাদা কুয়ো, আলাদা বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা করা ছাড়া আর কিছু করার যোজনা করেনি। যে উপ সমিতি অস্পৃশ্যদের উন্নতিসাধনের উদ্দেশ্যে কার্যক্রম তৈরির জন্য গঠিত হয়েছিল, তার মধ্যে এমন সব সদস্য ছিলেন যাঁরা অস্পৃশ্যদের ব্যাপারে কোনও দিন-ই আগ্রহ দেখাননি এবং তার মধ্যে কিছু সদস্য ছিলেন এদের প্রতি বিরুদ্ধভাবাপন্ন ছিলেন। স্বামী শ্রদ্ধানন্দ, একমাত্র এই উপসমিতিতে ছিলেন যিনি এই অস্পৃশ্যদের জন্য কিছু সারপূর্ণ কাজ করতে ইচ্ছা পোষণ করতেন, কিন্তু পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। এই সমিতির কাজ চালাবার জন্য অত্যন্ত স্বল্প পরিমাণ অর্থের বরাদ্দ করা হয়েছিল। একটা সভাও না করে এই সমিতিকে ভেঙে দেওয়া হয়েছিল। অস্পৃশ্যদের উন্নতিসাধনের কর্মকে হিন্দু মহাসভার পক্ষে যথার্থ কর্তব্য বলে ঘোষণা করা হয়েছিল। বারদৌলির কার্যক্রমের যে অংশে অস্পৃশ্যদের ব্যাপার সম্পর্কিত ছিল, শ্রী গান্ধী সেই অংশের জন্য কোনওরূপ আগ্রহ প্রদর্শন করেননি। বিপরীত

---

১. বিস্তৃত তথ্যের জন্য অধ্যায় -.II দ্রষ্টব্য।

ভাবে স্বামী শ্রদ্ধানন্দের পক্ষে সায় না দিয়ে তিনি তাঁর প্রতিক্রিয়াশীল প্রতিদ্বন্দ্বীদের পক্ষ নিয়েছিলেন এবং তিনি ভালভাবেই জানতেন যে, এরা অস্পৃশ্যদের ব্যাপারে বড় মাপের কিছুই করতে চায় না।

বারদৌলি কার্যক্রমের অঙ্গ হিসাবে ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে শ্রী গান্ধী যা করেছিলেন তা এইটুকুই।

১৯২২-এর পরে শ্রী গান্ধী কী করেছিলেন? আগের জীবনীমূলক টীকা যে পুস্তিকা থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে সেটি ১৯২২-এর রচনা। অতএব ওই টীকাটিকে হাল-নাগাদ করতে হলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির সংযোজন প্রয়োজন।

'খ্রিঃ ১৯২৪-এ জেল থেকে মুক্তি পান। পরিষদে প্রবেশ এবং গঠনমূলক কার্যাবলী এই দুই বিষয় নিয়ে কংগ্রেসের দুই বিবদমান গোষ্ঠীর মধ্যে একটি ফয়সলা করান। খ্রিঃ ১৯২৯-এ পূর্ণ স্বাধীনতাই ভারতের রাজনৈতিক লক্ষ্য বলে ঘোষণা; খ্রিঃ ১৯৩০-এ আবার আইন অমান্য আন্দোলনের আরম্ভ; খ্রিঃ ১৯৩১-এ 'গোল টেবিল বৈঠক'-এ ভারতের প্রতিনিধিত্ব করতে লন্ডন (বিলেত) গমন; খ্রিঃ ১৯৩২-এ তিনি জেলে গেলেন। তারপর সরকারের সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার বিরুদ্ধে আমরণ অনশন এবং ১৯৩৩-এর 'পুনা চুক্তি' করে জীবনরক্ষা এবং হিন্দুদের মন্দিরে অস্পৃশ্যদের প্রবেশ বিষয়ে সম্প্রচার এবং 'হরিজন সেবক সংঘ'-এর প্রতিষ্ঠা করলেন। খ্রিঃ ১৯৩৪-এ তিনি কংগ্রেসের সদস্যপদ ছাড়লেন। খ্রিঃ ১৯৪২-এ 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন-এর সূত্রপাত করলেন এবং জেলে গেলেন। খ্রিঃ ১৯৩৪-এ তিনি অনশন শুরু করলেন এবং তাঁকে জেল থেকে মুক্তি দেওয়া হল। খ্রিঃ ১৯৪৪-এ তিনি লর্ড ওয়াভেল (Lord Wavell)-এর সঙ্গে পত্রাচার শুরু করলেন এবং ৮ই আগস্ট ১৯৪২-এর প্রস্তাবকে ব্যাখ্যার জন্য বিভিন্ন বিজ্ঞাপন প্রচার করলেন। খ্রিঃ ১৯৪৫-এ তিনি 'কস্তুরবা নিধি' (Kasturba Fund) নিয়ে ব্যস্ত রইলেন।'

খ্রিঃ ১৯২৪-এর বছরটি শ্রী গান্ধীকে অস্পৃশ্যতা উন্মূলনের প্রচারকে এগিয়ে দেওয়ার জন্য আরও একটি সুযোগ এনে দিয়েছিল এবং সার্থক করারও সুযোগ দিয়েছিল। শ্রী গান্ধী কী করলেন?

১৯২২ এবং ১৯৪৪-এর মধ্যেকার বছরগুলি কংগ্রেসের রাজনৈতিক ইতিহাসের বিশেষ মহত্ত্বপূর্ণ সময়। সেপ্টেম্বর ১৯২০-তে কলকাতায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের এক বিশেষ সভায় অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচি গৃহীত হয়েছিল। এই কর্মসূচিতে পাঁচ

রকমের বয়কট অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। সেগুলি হল : বিধানসভার বয়কট, বিদেশি বস্ত্র বয়কট ইত্যাদি। এই অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তাবটি বুদ্ধিজীবীবর্গের কিছু নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি যেমন সর্বশ্রী বিপিনচন্দ্র পাল, চিত্তরঞ্জন দাশ*, লালা লাজপত রায় প্রমুখ কর্তৃক বিরোধিতা করা হয়েছিল। কিন্তু এঁদের বিরোধিতা সত্ত্বেও প্রস্তাবটি অনুমোদিত হয়েছিল। খ্রিঃ ১৯২০-এর ডিসেম্বর মাসে কংগ্রেসের নিয়মমাফিক বার্ষিক সভা নাগপুরে হয়। অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তাবটি আলোচনার জন্য পুনরুত্থাপন করা হয়। এটি শুনতে খুবই আশ্চর্যজনক যে, ওই এক-ই প্রস্তাব শ্রী চিত্তরঞ্জন দাশ কর্তৃক উত্থাপিত হয় এবং লালা লাজপত রায় কর্তৃক সমর্থিত হয় এবং অনুমোদিত হয়। তার ফলে ১৯২১ সালে অসহযোগ আন্দোলনের প্রাচুর্য দেখতে পাওয়া যায়। ১৯-শে মার্চ ১৯২২ সালে গান্ধীর রাজদ্রোহ অপরাধে বিচার হয় এবং বিচারে তাঁর ছয় বছরের জন্য কারাদণ্ড হয়। যে মুহূর্তে শ্রী গান্ধী জেলে বন্দী হন, শ্রী চিত্তরঞ্জন দাশ যেন তাঁর সংজ্ঞা ফিরে পান এবং আইনসভা বয়কটের সিদ্ধান্তকে তুলে নেওয়ার জন্য প্রচার শুরু করেন। তাঁর এই প্রচারে সর্বশ্রী বিঠলভাই প্যাটেল, পণ্ডিত মতিলাল নেহরু এবং পণ্ডিত মালব্য যোগ দেন। কিন্তু শ্রী গান্ধীর অনুগত কিছু কংগ্রেসি এই কাজের প্রচারের বিরোধিতা করেন, যাঁরা কলকাতা কংগ্রেসে প্রস্তাবিত এবং নাগপুরে (অনুমোদিত) পুষ্টীকৃত অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তাবের কার্যাবলী থেকে একচুলও সরে আসতে চাননি। এর ফলে কংগ্রেসের মধ্যে ফাটল ধরে। খ্রিঃ ১৯২৪-এ শ্রী গান্ধী অসুস্থতার জন্য জেল থেকে মুক্তি পান। তিনি যখন জেলের বাইরে এলেন, দেখতে পেলেন যে, তাঁর কংগ্রেস আইনসভা বয়কটের ইস্যুতে দুটি বিবদমান শিবিরে ভাগ হয়ে গেছে। এই লড়াই অত্যন্ত তীব্ররূপ ধারণ করেছে এবং দু'দল-ই একে অপরের বিরুদ্ধে কাদা ছোড়াছুড়ি করছেন। শ্রী গান্ধী জানতেন যে, এই বিবাদ কিছুদিন চললে কংগ্রেস দুর্বল হয়ে পড়বে। তাই এটিকে মিটমাট করতে উদ্যত হলেন। কোনও পক্ষই হার মানতে রাজি নয়। বিবৃতি এবং পাল্টা বিবৃতির জোয়ার বয়ে যায়। সবশেষে, দুই দলের মধ্যে বিবাদ মিটিয়ে শান্তি স্থাপনের জন্য শ্রী গান্ধী

---

* এটা হয়েছিল শ্রী পট্টভি সীতারামাইয়া যিনি কংগ্রেসের ঘোষিত ঐতিহাসিক ছিলেন তাঁর উল্লেখ করা সত্ত্বেও। যেমন—

'মিঃ সি. আর. দাশ পূর্ববঙ্গ এবং অসম থেকে ২৫০ জন প্রতিনিধি নিয়ে এসেছিলেন এবং তাঁদের যাতায়াতের খরচ নিজে বহন করেছিলেন, এবং নিজের পকেট থেকে ৩৬,০০০ (ছত্রিশ হাজার) টাকা খরচ করেছিলেন এজন্য যে, কলকাতায় যা করা হয়েছিল তা নস্যাৎ করার জন্য।

এমনকী তাঁর লোকদের সঙ্গে তাঁর বিরোধী জিতেন্দ্রলাল ব্যানার্জির লোকদের একটি ক্ষুদ্র লড়াইও হয়েছিল।'

'দি হিস্ট্রি অব্ ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস', পৃ : ৩৪৭

কিছু প্রস্তাব দেন এবং তা দু'দল কর্তৃক গ্রাহ্য হয়। পরিষদে প্রবেশের পক্ষে মতদাতা নায়কদের সন্তুষ্ট করবার জন্য তিনি প্রস্তাব দেন যে, কংগ্রেস এই পরিষদে বা বিধানসভায় প্রবেশটাকে কংগ্রেসের কর্মকাণ্ডেরই একটি অংশ বলে মেনে নেবে এবং বিরোধীরা তাঁদের বিরুদ্ধে প্রচার বন্ধ করবে। এরপর বিরোধীদের সন্তুষ্ট করবার জন্য তিনি প্রস্তাব দিলেন যে, কংগ্রেস ভোটাধিকারের জন্য একটি নতুন সূত্রকে গ্রহণ করবে। যথা—

(১) কংগ্রেসে ভোটাধিকারের জন্য বাৎসরিক চার আনা চাঁদার পরিবর্তে ২০০০ (দুই হাজার) গজ হাতে কাটা এবং নিজের হাতে কাটা সুতো জমা দিতে হবে এবং তা জমা দিতে অক্ষম হলে কংগ্রেসের সদস্যপদ পাওয়ার অযোগ্য বলে বিবেচিত হবে বা অযোগ্য করা হবে এবং (২) পাঁচরকমের বয়কট, যথা বিদেশি বস্ত্র বর্জন, সরকারি আদালত বর্জন, সরকারি স্কুল এবং কলেজ বয়কট, এবং কোনও রকম পদবি/উপাধি নেওয়া বর্জন কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠানে কোনও পদ পাওয়ার যোগ্যতা বলে বিবেচিত হবে এবং যে এই পাঁচরকমের বয়কটের সিদ্ধান্তকে মানবে না, বা নিজে ব্যক্তিগত ভাবে তা পালন করবে না, কংগ্রেসের সদস্য বা পদপ্রার্থী হিসাবে অযোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

এই জায়গায় শ্রী গান্ধীর পক্ষে তাঁর অস্পৃশ্যতা-বিরোধী প্রচার অভিযান চালাবার এক সুযোগ ছিল। তিনি এইভাবে প্রস্তাব দিতে পারতেন যে, যদি কোনও হিন্দু কংগ্রেসের সদস্য হতে চান, তবে তাঁকে অস্পৃশ্যতা মেনে নেওয়া বা পালন করা চলবে না এবং এর প্রমাণস্বরূপ তাঁকে অন্তত একজন অস্পৃশ্যকে তাঁর বাড়ির কাজে নিযুক্ত করতে হবে এবং তাঁর এই কাজের প্রমাণ ছাড়া অন্য কোনও প্রমাণ গ্রাহ্য হবে না। এরকম একটি প্রস্তাব মোটেই দুষ্কর হত না, কারণ সব হিন্দুই, বিশেষত যাঁরা উচ্চবর্ণের হিদু বলে নিজেদের মনে করেন, তাঁদের বাড়িতে দু-একটি কাজের লোক রাখেন। যদি চরকায় সুতো কাটা এবং বয়কটকে কংগ্রেসের সদস্যপদ পাওয়ার জন্য ভোটাধিকারের শর্ত বলে প্রবর্তন করতে পারেন, তা হলে হিন্দুর বাড়িতে একজন অস্পৃশ্যের নিযুক্তিকেও তিনি কংগ্রেসের সদস্যপদ পাওয়ার এবং ভোটাধিকারের শর্ত হিসাবে গ্রাহ্য করাতে পারতেন। কিন্তু শ্রী গান্ধী তা করলেন না।

এরপর খ্রিঃ ১৯২৪ থেকে খ্রিঃ ১৯৩০ পর্যন্ত ফাঁকা বা শূন্য। এই সময়ের মধ্যে অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের জন্য বা অস্পৃশ্যদের উপকারী কোনও কর্মতৎপরতার জন্য শ্রী গান্ধীর কোনও প্রচেষ্টাই দেখা যায়নি বা তিনি এ বিষয়ে আগ্রহী ছিলেন

না। যখন শ্রী গান্ধী নিষ্ক্রিয় ছিলেন, তখন অস্পৃশ্যরা 'সত্যাগ্রহ' নামে এক আন্দোলন শুরু করে। এই আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল যে সর্বজনিন কুয়ো থেকে জল নেওয়ার এবং সর্বজনিন মন্দিরে তাদের প্রবেশের অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করা। বোম্বাই প্রেসিডেন্সির কোলাবা জেলায় অবস্থিত মাহাদ শহরের চৌদার পুকুরে সত্যাগ্রহ অনুষ্ঠিত হয়েছিল, সর্বজনীন পুষ্করিণী থেকে অস্পৃশ্যদের জল নেওয়ার অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য। তেমন-ই অস্পৃশ্যদের হিন্দু মন্দিরে প্রবেশাধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে বোম্বাই প্রেসিডেন্সির নাসিক জেলার নাসিক শহরে অবস্থিত 'কালা রাম মন্দির'এ সত্যাগ্রহ অনুষ্ঠিত হয়েছিল। তাছাড়া অনেক ছোটখাটো সত্যাগ্রহ হয়েছিল। এর মধ্যে এই দুইটি মূখ্যত প্রধান ছিল যার ওপর অস্পৃশ্যদের এবং তাদের বিরোধী হিন্দু জাতীয়দের সব প্রচেষ্টা কেন্দ্রীভূত ছিল। এর ফলে উদ্ভূত কোলাহল সমগ্র ভারতবর্ষে শোনা গিয়েছিল। অস্পৃশ্যদের মধ্য থেকে হাজার হাজার নরনারী এই সত্যাগ্রহে যোগদান করেছিল। অস্পৃশ্যদের পুরুষ এবং স্ত্রী সকলেই হিন্দু কর্তৃক অপমানিত ও প্রহৃত হয়েছিল। অনেকে আহত হয়েছিল এবং সরকার দ্বারা অনেককেই শান্তিভঙ্গের অপরাধে জেলে ভরা হয়েছিল। এই সত্যাগ্রহ ছয় বৎসর ধরে চলেছিল এবং ১৯৩৫ সালে নাসিক জেলার ইয়োলা শহরের সম্মেলনে এর পরিসমাপ্তি হয়, যাতে হিন্দুদের এই আপসহীন অনমনীয় মনোবৃত্তি অনুসারে অস্পৃশ্যদের হিন্দুদের সমান সামাজিক অধিকার না দেওয়ায় তারা হিন্দু সম্প্রদায় থেকে বাইরে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এই সত্যাগ্রহ আন্দোলন নিঃসন্দেহে কংগ্রেস থেকে স্বতন্ত্র ছিল। এটি অস্পৃশ্যদের দ্বারাই পরিচালিত হয়েছিল, এবং অস্পৃশ্যরাই এর মূলধন বা ব্যয়ভার জুগিয়েছিল। তবুও অস্পৃশ্যগণ শ্রী গান্ধীর নৈতিক সমর্থন লাভের আশা ছাড়েনি। সত্যিই তাদের এই সমর্থন লাভের যথেষ্ট ভিত্তি বা পটভূমি ছিল। কারণ এই 'সত্যাগ্রহ', যার মূল বৈশিষ্ট্য বা উপাদান ছিল যন্ত্রণা বা শাস্তিভোগের দ্বারা প্রতিদ্বন্দ্বী বা বিরোধীর হৃদয়কে দ্রবীভূত করা—তা ছিল সেই অস্ত্র, যা শ্রী গান্ধীর-ই আবিষ্কৃত এবং যা তিনি ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে স্বরাজ জয় করবার জন্য ব্রিটিশের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করার অনুশীলন করতে কংগ্রেসকে পরিচালিত করতেন। স্বভাবতই অস্পৃশ্যরা তাদের এই সত্যাগ্রহে শ্রী গান্ধীর পূর্ণ সমর্থন লাভে আশাবাদী ছিল, যার উদ্দেশ্য ছিল সর্বজনীন কুয়ো থেকে জল নেওয়ার এবং সর্বজনীন হিন্দু মন্দিরে প্রবেশ করার অধিকারকে প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু শ্রী গান্ধী তৎসত্ত্বেও 'সত্যাগ্রহ'কে সমর্থন করেননি। কেবলমাত্র সমর্থন না করেই ক্ষান্ত হননি, তিনি এই 'সত্যাগ্রহ'কে অত্যন্ত কটূ ভাষায় নিন্দা করেছিলেন।

এই প্রসঙ্গে মানুষের ত্রুটির বা অন্যায়ের প্রতিবিধানের জন্য দুটো অভিনব

অস্ত্রের উল্লেখ করা যেতে পারে। শ্রী গান্ধী এই দুটোর সংমিশ্রণ এবং পরিশোধনকারীর প্রশংসা দাবি করতে পারেন। প্রথমটি হল সত্যাগ্রহ। শ্রী গান্ধী রাজনৈতিক অন্যায় (Wrong)-এর দূরীকরণের জন্য ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে এই সত্যাগ্রহ অস্ত্রটির বহুবার প্রয়োগ করেছেন। কিন্তু শ্রী গান্ধী অস্পৃশ্যদের জন্য কুয়ো এবং মন্দিরদ্বার উন্মুক্ত করার জন্য হিন্দুদের বিরুদ্ধে এই অস্ত্রের কখনওই প্রয়োগ করেননি। অনশন শ্রী গান্ধীর আর একটি অস্ত্র। এটা বলা হয় যে, শ্রী গান্ধী সর্বসাকুল্যে ২১ বার অনশন করার কৃতিত্ব অর্জন করেছেন। এর মধ্যে কতকগুলি হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের জন্য ছিল; এবং বেশ কিছু সংখ্যক অনশন ছিল তাঁর আশ্রমের বাসিন্দা কর্তৃক কিছু দুশ্চরিত্রতা অবলম্বনের প্রতিবিধানের জন্য, আর একটি ছিল বোম্বাই-এর সরকারের বিরুদ্ধে, যারা শ্রী পটবর্ধন নামে একজন জেলবন্দীকে জেলে কোনও মেথরের সেবা দিতে অস্বীকার করার জন্য। এই একুশটি অনশনের একটিও অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের জন্য অনুষ্ঠিত হয়নি। এগুলি নিঃসন্দেহে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে 'গোল টেবিল বৈঠক'[১] হল **(Round Table Conference)**। শ্রী গান্ধী এই সম্মেলনের আলোচনায় যোগ দিলেন ১৯৩১-এ। এই সম্মেলনের প্রধান বিবেচ্য বিষয় ছিল স্ব-শাসিত ভারতের জন্য একটি সংবিধান প্রণয়ন করা। এটা সর্বসম্মতিক্রমে মেনে নেওয়া হয়েছিল যে, যদি ভারত একটি স্ব-শাসিত দেশ হয়, তবে এর সরকারকে জনগণের সরকার, জনগণ দ্বারা গঠিত সরকার, এবং জনগণের জন্যই সরকার হতে হবে। সকলেই স্বীকার করেছিলেন যে, যদি সরকারকে বাস্তবিক ক্ষেত্রে জনগণের এবং জনগণের জন্য সরকার হতে হয় তবে তা জনগণের দ্বারাই গঠিত হতে হবে। কিন্তু সমস্যা হল যে, ভারতে 'জনগণের দ্বারা' সরকার কী করে হতে পারে, যখন দেশ সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে বিভক্ত, কিছু গরিষ্ঠ সম্প্রদায়, কিছু লঘিষ্ঠ সম্প্রদায় এবং তারা কেবলমাত্র সামাজিক বিভেদের বা ফাটলের দ্বারা আক্রান্ত নয় বরং সামাজিক বৈপরীত্য এবং বিরোধের দ্বারাও আক্রান্ত। এই পরিপ্রেক্ষিতে একথা স্বীকার করে নেওয়া হয়েছিল যে, ভারতে জনগণের দ্বারা শাসন **(Government by the People)** সম্ভব নয় যদি আইনসভা এবং শাসন বিভাগ সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্বের মাধ্যমে গঠিত না হয়।

অস্পৃশ্যতার সমস্যাটি সম্মেলনে বিশেষভাবে উপলব্ধি হতে লাগল। এটি একটি নতুন ভাব গ্রহণ করল। প্রশ্ন ছিল : অস্পৃশ্যদের কি হিন্দুদের দয়ার ওপর যেমন আছে তেমনই, ছেড়ে দেওয়া হবে, না কি সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্বের নীতি অনুসারে

---

১. বিস্তৃত তথ্যের জন্য অধ্যায়-III. দ্রষ্টব্য।

তাদের নিজেদের সুরক্ষার উপায় তাদের হাতে তুলে দেওয়া হবে? অস্পৃশ্যগণ হিন্দুদের খেয়ালখুশির ওপর তাদের ছেড়ে দেওয়ার ব্যাপারটিকে কঠোরভাবে বিরোধিতা করল এবং অন্যান্য সংখ্যালঘিষ্ঠদের যেভাবে সুরক্ষা দেওয়া হয়েছে তাই দাবি করল। অস্পৃশ্যদের যুক্তিটিকে সবাই স্বীকার করে নিলেন। এটি ন্যায্য এবং যুক্তিযুক্ত ছিল। তাদের যুক্তি ছিল যে, হিন্দু এবং মুসলমানের মধ্যে যে প্রভেদ বা সম্পর্কের ফাটল, হিন্দু এবং শিখদের মধ্যে, হিন্দু এবং খ্রিস্টানদের মধ্যে যে সম্পর্কের ফাটল তা হিন্দু এবং অস্পৃশ্যদের মধ্যে সম্পর্কের তুলনায় মোটেই গভীর নয়। এটি সবচেয়ে বিস্তৃত এবং গভীরতম। হিন্দু এবং মুসলমানের মধ্যে যে সম্পর্কের ফাটল তা ধর্মীয়, সামাজিক নয়। কিন্তু হিন্দু এবং অস্পৃশ্যদের মধ্যে যে বিভেদ তা ধর্মীয় এবং সামাজিক, দুই-ই। হিন্দু এবং মুসলমানের সম্পর্কজনিত ফাটল থেকে উৎপন্ন যে বৈরীতা, তা মুসলমানদের জন্য রাজনৈতিক দুর্ভাগ্য ডেকে আনবে না। কারণ হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে প্রভু এবং ক্রীতদাসের সম্পর্ক নেই। এটা কেবলমাত্র বিচ্ছিন্নতা বা বহিরাগতের সম্পর্ক। কিন্তু অন্যদিকে হিন্দু এবং অস্পৃশ্যদের মধ্যে যে সম্পর্কের ফাটল, তা রাজনৈতিক দুর্ভাগ্য ডেকে আনবে। কারণ এই সম্পর্ক হল প্রভু এবং ভৃত্যের সম্পর্ক। অস্পৃশ্যগণ যুক্তি দেখায়, তর্ক করে যে তাদের এবং হিন্দুদের এই সম্পর্কের ফাটলকে মেটাবার জন্য বহুযুগ ধরে নানা সামাজিক পদ্ধতির মাধ্যমে প্রচেষ্টা চলে আসছে। কিন্তু সব-ই বিফল হয়েছে। তাদের সাফল্য লাভের কোনও আশা নেই। তাই যেহেতু রাষ্ট্রক্ষমতা হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠদের হাতে হস্তান্তর হতে চলেছে সেইহেতু তাদের মুসলমান বা অন্য সংখ্যালঘুদের থেকে ভাল না হোক অন্তত তাদের মতোই রাজনৈতিক সুরক্ষা তাদের দিতেই হবে।

এই সময়ে শ্রী গান্ধীর পক্ষে অস্পৃশ্যদের দাবির প্রতি সহানুভূতি এবং সমর্থন জানিয়ে অস্পৃশ্যদের প্রতি তাঁর সহানুভুতি জানানোর সুযোগ ছিল এবং এর দ্বারা হিন্দুদের নির্দয়তা এবং নিপীড়নের বিরুদ্ধে তাদের প্রতিরোধের শক্তি শক্তিশালী হয়ে উঠত। কিন্তু শ্রী গান্ধী তাদের প্রতি সহানুভুতি না দেখিয়ে তাদের পরাস্ত করার জন্য তাঁর ক্ষমতার সমস্ত রকম উপায়ের অপপ্রয়োগ করলেন। তিনি অস্পৃশ্যদেরকে বিচ্ছিন্ন করার অভিপ্রায়ে মুসলমানদের সঙ্গে এক চুক্তি করলেন। কিন্তু মুসলমানদের নিজের দিকে টানতে না পেরে তিনি আমরণ অনশন আরম্ভ করলেন, যার উদ্দেশ্য ব্রিটিশ সরকার দ্বারা যেন অস্পৃশ্যদেরকে অন্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে প্রদত্ত রাজনৈতিক অধিকারের মতো অধিকার দেওয়ার সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। কিন্তু এই অনশন বিফল হওয়ায় শ্রী গান্ধী 'পুনা চুক্তি' (Puna Pact) নামক চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করে বাধিত করেন—যাতে অস্পৃশ্যদের কিছু রাজনৈতিক দাবি

স্বীকৃত হয়েছিল—তিনি কংগ্রেসকে অন্যায় নির্বাচন পদ্ধতি অনুসরণ করতে দিয়ে এর প্রতিশোধ নিলেন এবং এতে তাদের রাজনৈতিক অধিকারের সুযোগ থেকে তারা বঞ্চিত হল। এই রাজনৈতিক অধিকার তাদের কোনও কাজেই লাগল না।

১৯৩৩ সালে শ্রী গান্ধী দুটো আন্দোলন কার্যান্বিত করেন। প্রথমটি ছিল 'মন্দির প্রবেশ' আন্দোলন।[১] এই দুটি কর্মকাণ্ডকে যথাযোগ্য উতরে দিতে তিনি নিজে দায়িত্ব নিয়েছিলেন। একটি ছিল গুরুভায়ুর মন্দিরকে খোলা। অন্যটি ছিল কেন্দ্রীয় বিধানসভায় শ্রীরঙ্গ আয়ার দ্বারা প্রোথিত 'মন্দির প্রবেশ' বিধেয়ককে অনুমোদন করানো। শ্রী গান্ধী বলেছিলেন যে, যদি গুরুভায়ুর মন্দিরের অছি (Trustee) একটা নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে যদি এই মন্দির অস্পৃশ্যদের জন্য খুলে না দেয় তবে তিনি আমরণ অনশন করবেন। ওই গুরুভায়ুর মন্দির এখনও অস্পৃশ্যদের জন্য বন্ধ আছে কিন্তু শ্রী গান্ধী তাঁর অনশন করার প্রতিজ্ঞা পূরণ করেননি। অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় যে তাঁর প্রতিজ্ঞার পর আজ পর্যন্ত তেরো বছর হয়ে গেল, তবু শ্রী গান্ধী এই মন্দির অস্পৃশ্যদের জন্য খোলার কোনও পদক্ষেপই নেননি। শ্রী গান্ধী বস্তুত বড়লাটকে জবরদস্তি করে বাধ্য করেছিলেন এই মন্দির প্রবেশ বিধেয়কটিকে অনুমোদন করতে। কংগ্রেস দল কেন্দ্রীয় বিধানসভায় ওই বিলকে কার্যান্বিত করার শপথ নেওয়া সত্ত্বেও, বিলটা প্রবর সমিতিতে (Select Committee) প্রেরণের জন্য উপস্থাপিত হলে তাঁরা এটিকে সমর্থন করতে অস্বীকার করলেন এই অজুহাতে যে, এতে হিন্দুদের বিরুদ্ধে অপরাধমূলক তত্ত্ব আছে এবং আগামী নির্বাচনে হিন্দুরা এর ফলে কংগ্রেসের ওপর প্রতিশোধনের এবং কংগ্রেসকে ভোটে পরাজিত করবে। বিলটি পাস না করিয়ে মৃত্যুমুখে ঠেলে দিয়ে কংগ্রেস দল শ্রীরঙ্গ আয়ারকে অত্যন্ত হতাশ করে নিচে নামিয়ে দিয়েছিল। শ্রী গান্ধী এতে কিছু মনে করলেন না। তিনি এমনকী কংগ্রেসের এই ব্যবহারকে সমর্থন করে অনেক কথা বলেছিলেন।

আর একটি আন্দোলন যা শ্রী গান্ধী পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন তা হল 'হরিজন সেবক সংঘে'র প্রতিষ্ঠা করা এবং এর শাখা-প্রশাখা সমগ্র ভারতে জাল বিস্তার করেছিল। এই সংঘের প্রতিষ্ঠার মূলে তিনটি উদ্দেশ্য বা প্রেরণা কাজ করেছিল। প্রথমটি ছিল এটা প্রমাণ করা যে, হিন্দুদের অস্পৃশ্যদের প্রতি অনেক দাক্ষিণ্যের মনোভাব আছে এবং তা তারা অস্পৃশ্যদের উন্নতিসাধনে উদার অনুদানের মাধ্যমে দেখাতে চায়। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য ছিল, অস্পৃশ্যরা দৈনন্দিন জীবনে যে সমস্ত সমস্যার বা সংকটের সম্মুখীন হত সে-ব্যাপারে সাহায্য করে তাদের সেবা করা। তৃতীয়

১. বিশদ বিবরণের জন্য অধ্যায়-IV. দ্রষ্টব্য।

উদ্দেশ্য ছিল অস্পৃশ্যরা, যারা রাজনৈতিক বিষয়ে হিন্দুদের থেকে বিচ্ছিন্নতা বোধে ভুগত তাদের মনে হিন্দুদের প্রতি আস্থা সৃষ্টি করা। এই উদ্দেশ্যগুলির কোনওটিই সফল হয়নি। প্রথম উচ্ছ্বাসে হিন্দুরা সংঘের জন্য আট লাখ টাকা চাঁদা দিয়েছিল কিন্তু সাধারণ রাজনৈতিক খাতে তারা যে পরিমাণ চাঁদা দিয়েছিল তার তুলনায় এটা কিছুই ছিল না। তারপর তারা শুকিয়ে গেছে—সব-ই শেষ হয়ে গেছে। এই সংঘ এখন তার আর্থিক ব্যয়ভারের জন্য হয় সরকারি অনুদানের ওপর নির্ভরশীল, না হয় গান্ধীর হস্তাক্ষর বিক্রি করে যে আয় হয় তার ওপর, অথবা কিছু ধনী ব্যবসায়ীর দানশীলতার ওপর। যাঁরা এই সংঘকে দান করেন, অস্পৃশ্যদের প্রতি কোনওরূপ ভালবাসার জন্য নয় বরং তাঁরা শ্রী গান্ধীকে সন্তুষ্ট করাটা লাভজনক বলে মনে করেন। প্রতি বছর-ই সংঘের শাখাগুলি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। সংঘটি এত শীঘ্র সংকুচিত হয়ে চলেছে যে, খুব শীঘ্রই এর কেন্দ্রবিন্দু দুটিই শুধু থাকবে এবং পরিধি থাকবে না। শ্রী গান্ধীর কর্মতৎপরতার একমাত্র দুঃখজনক তত্ত্ব এই নয় যে, হিন্দুরা সংঘের ব্যাপারে সমস্ত রকম উৎসাহ হারিয়েছে। এই সংঘ যাদের উপকারের জন্য সৃষ্ট বা স্থাপিত হয়েছে সেই অস্পৃশ্যদেরও মঙ্গল কামনা এবং সহযোগিতা আদায় করতে সক্ষম হয়নি। এর অনেক কারণ আছে। সংঘের কার্য বিশেষভাবে অপ্রাসঙ্গিক এবং বেশিরভাগ অযৌক্তিক। এটি কারও কল্পনার সঙ্গে মিল খায় না। এই সংঘ অনেক জরুরি ব্যাপার, যে বিষয়ে অস্পৃশ্যদের সাহায্যের দরকার, সেগুলিকে অবহেলা করে। সংঘের ব্যবস্থাপনায় বা পরিচালনায় অস্পৃশ্যদের কঠোর ভাবে বাদ দেওয়া হয়। অস্পৃশ্যরা ভিখারির বেশি কিছু নয়, দয়ার দান গ্রহীতা মাত্র। ফলে অস্পৃশ্যগণ এই সংঘের ব্যাপারে মাথা ঘামায় না। তারা এই সংঘকে হিন্দুদের দ্বারা অসৎ উদ্দেশ্যে স্থাপিত একটি বিদেশি সম্পর্কহীন সংস্থা বলে মনে করে। এইখানে শ্রী গান্ধীর পক্ষে এই সংঘকে হিন্দু এবং অস্পৃশ্যদের মধ্যে একটি সেতু তৈরি করার সুযোগ ছিল। তিনি এই সংস্থার কাজে অস্পৃশ্যদের যোগদান করতে দিয়ে এবং এর কার্যক্রমের উন্নতি ঘটিয়ে এটিকে একটি পুরুযোচিত সংস্থায় পরিণত করতে পারতেন। শ্রী গান্ধী এসবের কিছুই করেননি। তিনি এই সংঘকে ক্ষীণ ও দুর্বল করে তুললেন। এটি শান্তিপূর্ণ ভাবে মরতে চলেছে এবং শ্রী গান্ধীর জীবদ্দশাতেই হয়তো সমাপ্ত হয়ে যাবে।

শ্রী গান্ধীর এই অস্পৃশ্যতা-বিরোধী অভিযানের জরিপ, তাঁর বক্তব্য এবং কৃতকর্মের মূল্যায়ন যে-কোনও পাঠককে প্রতিহত করবে এবং সমস্যায় ফেলবে এ-বিষয়ে আশ্চর্য হওয়ার প্রয়োজন নেই। নিম্নলিখিত বিষয়গুলি নিয়ে কোনও পাঠক যদি একটু চিন্তা করেন এবং এই দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রশ্নগুলি করেন, তবেই তাঁর মনে পরিষ্কার

ভাবে ধারণা হয়ে যাবে, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ বা আশ্চর্য হওয়ার ব্যাপার নেই। যেমন—

(১) ১৯২১ সালে শ্রী গান্ধী 'তিলক স্বরাজ নিধি'র জন্য ১ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করেছিলেন। শ্রী গান্ধী দৃঢ়তা সহকারে বলেছিলেন যে, অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ না হলে স্বরাজ লাভ করা কোনও মতেই সম্ভব নয়। কিন্তু তিনি কেন আপত্তি করেননি, যখন মাত্র ৪৩,০০০ টাকা অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের জন্য দেওয়া হয়েছিল?

(২) ১৯২২-এ বারদৌলির গঠনমূলক কর্মকাণ্ডের তালিকা তৈরি হয়েছিল। অস্পৃশ্যদের উন্নতিসাধন এর একটি বিষয় ছিল। বিশদ তালিকা তৈরি করবার জন্য একটি কমিটি গঠিত হয়েছিল। কিন্তু এই কমিটি কোনওদিন-ই কাজ করেনি এবং এটিকে ভঙ্গ করা হয়েছিল এবং ওই গঠনমূলক কার্যাবলী থেকে অস্পৃশ্যদের উন্নতির বিষয়টি মিটিয়ে দেওয়া বা লুপ্ত করে দেওয়া হয়েছিল। কেবলমাত্র ৫০০ টাকা এই কমিটির জন্য ভাগ করে দেওয়া হয়েছিল কাজের ব্যয় সঙ্কুলানের জন্য। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির এই কার্পণ্য এবং বিমাতৃসুলভ ব্যবহারের জন্য শ্রী গান্ধী কেন প্রতিবাদ করেননি? স্বামী শ্রদ্ধানন্দকে, যিনি কমিটির জন্য আরও বেশি টাকার বন্দোবস্তের দাবিতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সঙ্গে লড়াই করছিলেন, কেন শ্রী গান্ধী সমর্থন করেননি? এই কমিটির অবলুপ্তির বিরুদ্ধে কেন শ্রী গান্ধী প্রতিবাদ করেননি? শ্রী গান্ধী কেন অপর একটি কমিটি নিযুক্ত করলেন না? কেন তিনি অস্পৃশ্যদের জন্য কাজগুলিকে লুপ্ত করতে দিলেন যেন এগুলির কোনও গুরুত্বই ছিল না?

(৩) শ্রী গান্ধী তাঁর স্বরাজ-এর জন্য প্রচার অভিযানের সময় অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে বলেছিলেন যে, স্বরাজ প্রাপ্তির পূর্বশর্ত হবে : (ক) হিন্দু-মুসলমান ঐক্য; (খ) অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ; (গ) হাতে কাটা এবং হাতে বোনা 'খাদি'র সর্বজনীন গ্রহণ; (ঘ) শর্তহীন অহিংস এবং (ঙ) সম্পূর্ণ অসহযোগ আন্দোলন। শ্রী গান্ধী কেবলমাত্র এই শর্তগুলি আরোপিত করেননি বরং ভারতবাসীদের তিনি বলেছিলেন যে, এই শর্তগুলি পূরণ না করতে পারলে স্বরাজ পাওয়া যাবে না। ১৯২২ সালে তিনি হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের জন্য অনশন করেছিলেন। ১৯২৪ সালে তিনি খদ্দরের জন্য সুতোর উৎপাদনকে কংগ্রেসের সদস্যপদের এবং ভোটাধিকারের জন্য শর্ত করেছিলেন। তা হলে তিনি কেন ১৯২৪ সালে অস্পৃশ্যতা বর্জনকে কংগ্রেসের সদস্যপদের জন্য মতাধিকারের শর্ত হিসাবে বললেন না কিংবা তারপরেও কখনও বললেন না?

(৪) শ্রী গান্ধী তাঁর প্রিয় নানান উদ্দেশ্যের সফলতার জন্য বহুবার অনশন

করেছেন। কিন্তু কেন তিনি অস্পৃশ্যদের কল্যাণের জন্য একবারও অনশন করলেন না?

(৫) শ্রী গান্ধী ত্রুটি-বিচ্যুতি মোচনের এবং স্বাধীনতা জয়ের জন্য 'সত্যাগ্রহ' অস্ত্রের উদ্ভাবন করেছিলেন এবং এটিকে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করেছেন। শ্রী গান্ধী কেন একবারও অস্পৃশ্যদের পক্ষ নিয়ে হিন্দুদের বিরুদ্ধে তাদের কুয়ো থেকে জল নেওয়ার জন্য মন্দিরে বা অন্য সর্বজনীন জায়গায় তাদের প্রবেশ, যা হিন্দুরা তাদের কোনওদিন অনুমতি দেয়নি, তার জন্য সত্যাগ্রহ শুরু করলেন না?

(৬) শ্রী গান্ধীর ভূমিকা অনুসরণ করে ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে অস্পৃশ্যরা হিন্দুদের কুয়ো থেকে জল নেওয়া এবং মন্দিরে প্রবেশের জন্য সত্যাগ্রহ শুরু করেছিল। শ্রী গান্ধী তাদের সত্যাগ্রহকে কেন নিন্দা করলেন?

(৭) শ্রী গান্ধী ঘোষণা করেছিলেন যে জামোরিনরা অস্পৃশ্যদের জন্য গুরুভায়ুর মন্দির খুলে না দিলে তিনি আমরণ অনশন করবেন। এই মন্দির এখনও খুলে দেওয়া হয়নি। শ্রী গান্ধী কেন অনশন করলেন না?

(৮) ১৯৩২ সালে শ্রী গান্ধী ব্রিটিশ সরকারকে অত্যন্ত খারাপ পরিণতির হুমকি দিয়েছিলেন যদি বড়লাট শ্রীরঙ্গ আয়ারকে কংগ্রেস দলের পক্ষে কেন্দ্রীয় আইন সভায় 'মন্দির প্রবেশ' বিধেয়কটি তুলতে অনুমতি না দেয়। কিন্তু যখন-ই কেন্দ্রীয় আইনসভার নির্বাচনের ঘোষণা করা হল, কংগ্রেস দল এই বিধেয়কের সমর্থন প্রত্যাহার করল এবং শ্রীরঙ্গ আয়ারকে এই বিধেয়কের উত্থাপন থেকে নিরস্ত হতে হল। যদি শ্রী গান্ধী মন্দির প্রবেশ ব্যাপারে উৎসাহী এবং নিষ্কপট ছিলেন তা হলে তিনি কংগ্রেসের এই কাজকে কী করে সমর্থন করলেন? কোন্ বিষয়টি বেশি মহত্ত্বপূর্ণ ছিল—অস্পৃশ্যদের জন্য মন্দির প্রবেশ, না কি কংগ্রেসের নির্বাচনে জয়লাভ?

(৯) শ্রী গান্ধী জানেন যে, অস্পৃশ্যদের সমস্যা তাদের নাগরিক অধিকার না পাওয়ার মধ্যে নয়। তাদের সমস্যা ছিল হিন্দুদের ষড়যন্ত্র, যারা, 'অস্পৃশ্যরা এই অধিকার প্রয়োগ করলে অত্যন্ত সাংঘাতিক ফল হবে' বলে ধমকানি দিত। অস্পৃশ্যদিগকে সাহায্য করার বাস্তব উপায় হল তাদের নাগরিক অধিকারগুলির সুরক্ষার জন্য কোনও প্রতিষ্ঠান, যে প্রতিষ্ঠান সেই সমস্ত হিন্দুর, যারা অস্পৃশ্যদের আঘাত করবে, তাদের বিরুদ্ধে আইনগত অভিযোগ আনবে এবং তাদের বিরুদ্ধে সামাজিক এবং অর্থনৈতিক বয়কট সহকারে তাদেরকে সবরকম নাগরিক অধিকার প্রয়োগ করার অধিকার থেকে বঞ্চিত করবে। শ্রী গান্ধী এই বিষয়টিকে 'হরিজন সেবক সংঘে'র উদ্দেশ্যাবলীর অন্তর্ভুক্ত করলেন না কেন?

(১০) শ্রী গান্ধীর দৃশ্যে আসার আগেই 'ডিপ্রেস্‌ড ক্লাস মিশন সোসাইটি' নামে একটি সমাজ অস্পৃশ্যদের উন্নয়নের জন্য হিন্দুদের দ্বারা স্থাপিত হয়। হিন্দুরাই এর জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ চাঁদা দেয়। তথাপি এই সোসাইটির কার্যাবলী হিন্দু এবং অস্পৃশ্য উভয় গোষ্ঠীর দ্বারা গঠিত একটি সংযুক্ত পরিষদের দ্বারা পরিচালিত হত। 'হরিজন সেবক সংঘে'র পরিচালনা থেকে শ্রী গান্ধী অস্পৃশ্যদের সরিয়ে রাখলেন কেন?

(১১) শ্রী গান্ধী যদি সত্যি-সত্যিই অস্পৃশ্যদের বন্ধু হন, তাহলে তিনি তাদের হাতেই সিদ্ধান্ত নিতে ছেড়ে দিলেন না কেন যে, রাজনৈতিক নিরাপত্তাই তাদের সুরক্ষার ভাল উপায় হবে কি না? কেন তিনি অস্পৃশ্যদের একঘরে এবং পরাজিত করতে অনেকদূর পর্যন্ত গেলেন, এমনকী মুসলমানদের সঙ্গে সন্ধি বা চুক্তি পর্যন্ত করলেন? কেন শ্রী গান্ধী অস্পৃশ্যদেরকে এই সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারর সুবিধা ভোগ থেকে বঞ্চিত করার জন্য অত্যন্ত দমনমূলক উপায়, যথা আমরণ অনশনের ঘোষণা করলেন?

(১২) 'পুনা চুক্তি' গ্রহণ করা হলে শ্রী গান্ধী অস্পৃশ্যদের সঙ্গে বিশ্বাস রাখলেন না কেন কংগ্রেসকে এই কথা বলে যে, তারা যেন অস্পৃশ্যদের রাজনীতিটুকু চুরি করে না নেয়, তাদের জন্য সংরক্ষিত আসনগুলিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে এবং তাতে তো সেই সমস্ত অস্পৃশ্যগণই নির্বাচিত হত যারা হিন্দুদের হাতে পুতুলমাত্র হওয়ার জন্য তৈরি ছিল?

(১৩) 'পুনা চুক্তি' গ্রহণ করার পর শ্রী গান্ধী ভদ্রলোকের চুক্তি ভঙ্গ করলেন কেন এবং কেন কংগ্রেস মন্ত্রিসভায় অস্পৃশ্যদের প্রতিনিধিদের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য কংগ্রেস হাইকমান্ডকে নির্দেশ দিলেন না?

(১৪) মধ্যপ্রদেশ-এর কংগ্রেস মন্ত্রিসভায় ডাঃ খারে দ্বারা নিযুক্ত শ্রী অগ্নিভোজ, যিনি তফসিলি জাতের সদস্য ছিলেন এবং সবদিক দিয়ে মন্ত্রী হওয়ার যোগ্যতার অধিকারী ছিলেন, সেই অগ্নিভোজের নিযুক্তিতে কেন শ্রী গান্ধী অসম্মতি প্রকাশ করলেন? শ্রী গান্ধী কি বলেছিলেন যে, তিনি তফসিলি জাতের অন্তর্ভুক্ত কোনও ব্যক্তির মধ্যে এরূপ উচ্চাশা সৃষ্টির বিপক্ষে ছিলেন?

II

এ-ব্যাপারে শ্রী গান্ধী কী ব্যাখ্যা দেবেন? শ্রী গান্ধীর বন্ধুদেরই বা কী কৈফিয়ত থাকতে পারে? শ্রী গান্ধীর অস্পৃশ্যতা বিরোধী অভিযান এতই ঘোরানো এবং প্যাঁচানো, অসঙ্গতিপূর্ণ এবং পরস্পর বিরোধী, আক্রমণ এবং আত্মসমর্পণ, অগ্রসরণ এবং পশ্চাদানুসরণ দ্বারা পূর্ণ যে, সমস্ত অভিযানটি একটি বোধাতীত রহস্য হয়ে গেছে। এর অভীষ্ট ফলপ্রসূতার ব্যাপারে কতিপয় ব্যক্তির বিশ্বাস আছে এবং এক বৃহৎ সংখ্যক ব্যক্তি মনে করেন যে, এর পশ্চাতে যথাযথ উৎসাহ এবং নিষ্কপটতা নেই। এজন্য কিছু ব্যাখ্যার প্রয়োজন। এই ব্যাখ্যা শ্রী গান্ধীর লক্ষ্য এবং উপায়কে পরিষ্কার ভাবে বুঝার জন্য নয়। বরং এটি শ্রী গান্ধীর উদ্যম এবং নিষ্কপটতার যশের জন্যই বেশি করে প্রয়োজন, যার দ্বারা একজন পাঠক শ্রী গান্ধী এবং তাঁর বন্ধুদের কাছ থেকে পূর্বোক্ত প্রশ্নগুলির ব্যাখ্যা চাইতে পারেন।

এই প্রশ্নগুলির জবাবে শ্রী গান্ধী এবং তাঁর বন্ধুদের বক্তব্য নিঃসন্দেহে আকর্ষক হবে। প্রশ্নগুলির ব্যাপারে সমস্ত আগ্রহী ব্যক্তিই এ প্রশ্নগুলির উত্তরের অপেক্ষায় থাকবেন। তৎসত্ত্বেও এর উত্তরগুলির অন্য কেউ প্রত্যাশা করবেন এবং তারপর এগুলি নিয়ে আলোচনা করবেন, এরকম হবে না। তাদেরকে তাদের মনোমতো ভাবে এগুলিকে তৈরি করার জন্য ছেড়ে দিতে হবে এবং তাঁরা তার জন্য নিজের সময় নির্বাচিত করবেন। এর মধ্যে কেউ কেউ প্রশ্ন করতে পারেন যে, শ্রী গান্ধী এবং তাঁর অস্পৃশ্যতা বিরোধী অভিযান সম্পর্কে অস্পৃশ্যদের বক্তব্য কী? অস্পৃশ্যগণ শ্রী গান্ধীর অস্পৃশ্যতা বিরোধী অভিযান সম্পর্কে কী অভিমত পোষণ করে তা বলা খুব শক্ত নয়।

অস্পৃশ্যগণ কি শ্রী গান্ধীকে এ ব্যাপারে নিষ্কপট বা সাগ্রহ বলে মনে করে? এর জবাব হবে নঞর্থক বা 'না'। তারা শ্রী গান্ধীকে আগ্রহী ভাবাপন্ন বা আগ্রহী বলে মনে করে না। তারা কী করে পারবে?

তারা তাঁকে কী করে আগ্রহান্বিত বলে মনে করবে, কারণ ১৯২১ সালে যখন গোটা দেশ বারদৌলি কার্যক্রমকে কার্যে পরিণত করতে সক্রিয়ভাবে জেগে উঠল, তিনি তখন অস্পৃশ্যতা বিরোধী অংশটির ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন রইলেন। তারা তাঁকে কী করে আগ্রহান্বিত বলে মনে করবে, কারণ তিনি যখন দেখলেন যে, স্বরাজ তহবিলের ১ কোটি ২৪ লক্ষ টাকার মধ্যে অস্পৃশ্যদের কাজের জন্য মোটে ৪৩,০০০ টাকা মাত্র বরাদ্দ করা হয়েছিল, তখন এই দীর্ঘকাল ধরে অবহেলিত

কাজের ব্যাপারে কংগ্রেসিদের কৃপণ ব্যবহারে তিনি কোনও প্রতিবাদ করলেন না? একজন ব্যক্তিকে কী করে আন্তরিক ভাবাপন্ন বলে মানা যায়, যখন খ্রিঃ ১৯২৪ সালে হিন্দুদের ওপর অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের জন্য নৈতিক বাধ্যবাধকতা চাপাবার সুযোগ পেয়েও এবং সেটির সুযোগ এবং প্রচলন করার শক্তি থাকা সত্ত্বেও তিনি তা করলেন না? এরকম একটি পদক্ষেপ তিনটি উদ্দেশ্য সাধন করতে পারত। এর দ্বারা কংগ্রেসিদের জাতীয়তাবোধের পরীক্ষা হয়ে যেত। এর দ্বারা অস্পৃশ্যতা দূরীকরণে সহায়তা হত, এবং এও প্রমাণ হয়ে যেত যে, শ্রী গান্ধী যে অস্পৃশ্যতাকে পাপ, ক্ষতিকর এবং হিন্দুত্বের উপর কলঙ্ক বলে বর্ণনা করেন সে ব্যাপারে তিনি সত্যিই আগ্রহী। কেন শ্রী গান্ধী তা করলেন না? এটার দ্বারা প্রমাণ হয় না কি যে, শ্রী গান্ধী অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের চেয়ে চরকায় সুতো কাটার প্রচারে বিশেষ আগ্রহী ছিলেন? এটা কি প্রমাণ করে না যে অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ শ্রী গান্ধীর কর্মতৎপরতার অত্যন্ত ক্ষুদ্রতম অংশ ছিল এবং এটি এমনকী শেষের ভাগও ছিল না? এটা কি প্রমাণ করে না যে শ্রী গান্ধীর সেই বক্তব্য, যাতে তিনি বলেছিলেন যে 'অস্পৃশ্যতা হিন্দুত্বের ওপর একটি কালির ছিটা বা কলঙ্ক এবং অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ ছাড়া স্বরাজ পাওয়া যাবে না' একটি শূন্যগর্ভ বাকশৈলী মাত্র ছিল, যার পিছনে কোনওরূপ আন্তরিকতা ছিল না? তারা সেই ব্যক্তির আগ্রহকে কী করে বিশ্বাস করবে, যিনি শপথ নিয়েছিলেন যে গুরুভায়ুর মন্দির অস্পৃশ্যদের জন্য খুলে না দিলে আমরণ অনশন করবেন, অথচ তিনি অনশন করেননি যখন আজ পর্যন্ত গুরুভায়ুর মন্দির অস্পৃশ্যদের বন্ধ থাকে? তারা কী করে একজন ব্যক্তিকে আগ্রহান্বিত বলে মেনে নেবে যখন সেই লোক মন্দিরে প্রবেশের অধিকারকে আইন করার জন্য বিধেয়ক প্রণয়নকে সমর্থন করেন এবং পরবর্তীকালে তা প্রত্যাহারের জন্য সহযোগী হন? সেই লোকের নিষ্কপট আগ্রহকে তারা কী করে বিশ্বাস করবে যিনি এইটুকু বলেই সন্তুষ্ট থাকেন যে, তিনি সেই মন্দিরে অস্পৃশ্যদের জন্য খুলে না দিলে যাবেন না; যখন মন্দিরগুলি অস্পৃশ্যদের জন্য খুলে দেওয়ার ব্যাপারে তাঁর সবরকম উপায় অবলম্বন করা উচিত ছিল? কী করে তারা একজন লোকের আগ্রহের ওপর আস্থা রাখবে যখন সেই ব্যক্তি সব কিছুর জন্য অনশন করার জন্য তৈরি কিন্তু অস্পৃশ্যদের জন্য কখনওই অনশন করবেন না? অস্পৃশ্যরা কী করে একজন লোকের আগ্রহের ওপর বিশ্বাস রাখবে যখন তিনি সবকিছুর জন্য এবং সব লোকের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ করতে রাজি কিন্তু হিন্দুদের বিরুদ্ধে অস্পৃশ্যদের জন্য কখনওই তা প্রয়োগ করবেন না? তারা কী করে একজন লোকের আগ্রহের ওপর আস্থা রাখবে যিনি অস্পৃশ্যতার দোষ সম্বন্ধে কেবল বড় বড় উপদেশই শুধু দিয়েছেন কিন্তু কাজের কাজ কিছুই

করেন নি।

তারা কি শ্রী গান্ধীকে সৎ এবং খাঁটি বা অকৃত্রিম মনে করে? এর উত্তর হচ্ছে যে তারা শ্রী গান্ধীকে সৎ এবং অকৃত্রিম বলে মনে করে না। শ্রী গান্ধী স্বরাজের জন্য তাঁর অভিযানের প্রারম্ভে অস্পৃশ্যদের ব্রিটিশের পক্ষ না নিতে বলেছিলেন। তিনি তাদের বলেছিলেন যে, তারা যেন খ্রিস্টধর্ম বা অন্য কোনও ধর্ম গ্রহণ না করে। তিনি তাদের বলেছিলেন যে, তারা হিন্দুত্বের মধ্য দিয়েই মোক্ষ বা মুক্তি খুঁজে পাবে। তিনি হিন্দুদের বলেছিলেন যে স্বরাজপ্রাপ্তির পূর্বশর্ত হিসাবে তাদের অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ করতে হবে। তথাপি যখন ১৯২১ সালে 'তিলক স্বরাজ তহবিল' থেকে অতি অল্প পরিমাণ টাকার বরাদ্দ করা হল অস্পৃশ্যদের উন্নতির জন্য, পরিকল্পনা করার সমিতিকে শিষ্টাচারহীন ভাবে তুলে দেওয়া হল, তখন শ্রী গান্ধী প্রতিবাদের একটি শব্দও উচ্চারণ করেননি।

শ্রী গান্ধীর নিজের নিয়ন্ত্রণে 'তিলক স্বরাজ তহবিল'-এর ১ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা ছিল। শ্রী গান্ধী কেন অস্পৃশ্যদের উন্নতির জন্য এর থেকে মোটারকম টাকা সুরক্ষিত রাখার জন্য বললেন না? শ্রী গান্ধী যে অস্পৃশ্যদের ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীনতা দেখিয়েছেন সে-ব্যাপারে কোনও বিতর্ক বা ঝগড়া নেই। শ্রী গান্ধী তাঁর উদাসীনতার জন্য যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন সেটাই বিস্মিত করানো বা চমকপ্রদ। তিনি বলেছিলেন যে, তিনি স্বরাজ লাভ করার অভিযানের যোজনায় ব্যস্ত ছিলেন এবং তাঁর কাছে অস্পৃশ্যদের দুঃখ মোচনের জন্য কাজ করার মতো কোনও সময়ের অবকাশ ছিল না। তিনি যে কেবল লজ্জায় লাল হয়ে যাননি তা নয়, তিনি অস্পৃশ্যদের ব্যাপারে তাঁর ঔদাসীন্যের একটি নৈতিক সাফাই বা ন্যায্যতাও দিয়েছিলেন। তিনি এই অজুহাতের আধারের ওপর দৃঢ়ভাবে দণ্ডায়মান ছিলেন যে, অস্পৃশ্যদের দুঃখ-দুর্দশার ব্যাপার বাদ দিয়ে তিনি যে দেশের কাজে সর্বতোভাবে নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন তা কোনও দোষের নয়। কারণ তাঁর মতে 'সকলের মঙ্গল হলে একেরও মঙ্গল হয়' এবং যেহেতু হিন্দুরা ব্রিটিশের দাস, ক্রীতদাস কখনও ক্রীতদাসের ত্রাণ করতে পারবে না। এই সমস্ত শব্দগুচ্ছ যেমন Slaves of Slaves—'ক্রীতদাসের ক্রীতদাস' এবং 'বৃহৎ ক্ষুদ্রকেও অন্তর্ভুক্ত করে' খুব প্রশংসনীয় তার্কিক বিচার, তবুও এতে সত্যতা আছে বলে মনে হয় না। যেমন 'দেশের ধনসম্পত্তি বেড়েছে, অতএব সবার-ই ধনসম্পত্তি বেড়েছে' একথাকে সত্য বলে মেনে নেওয়া যায় না। কিন্তু আমরা শ্রী গান্ধীর ক্ষমতাকে একজন তার্কিক হিসাবে বিচার করছি না। আমরা তাঁর ঐকান্তিকতা যাচাই করছি। আমরা কি কোনও ব্যক্তির ঐকান্তিকতাকে মেনে নিতে পারি, যিনি তাঁর দায়িত্বকে এড়িয়ে যান এবং একটি

ওজর খাড়া করেন? অস্পৃশ্যরা কি বিশ্বাস করতে পারে যে শ্রী গান্ধী তাদের পক্ষ নিয়ে লড়বার নেতা ছিলেন?

সাংবিধানিক সুরক্ষার ব্যাপারগুলির ব্যাপারে তাদের প্রতি এবং মুসলমান ও শিখদের প্রতি শ্রী গান্ধীর আচরণ বিচার করলে তারা কি শ্রী গান্ধীকে সৎ এবং ঐকান্তিক মনোভাবাপন্ন বলে মেনে নিতে পারে?

শ্রী গান্ধী সাংবিধানিক সুরক্ষার ব্যাপারে তফসিলি জাত এবং অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যে তাঁর ভেদাভেদমূলক বিচারের সত্যতা প্রতিপাদন করতেন অন্য একটি কৈফিয়তের দ্বারা। তাঁর কৈফিয়ত ছিল যে 'ঐতিহাসিক কারণ-'ই তাঁকে শিখ এবং মুসলমানদের স্বীকৃতি দিতে বাধ্য করেছিল। ঐ কারণগুলি কী ছিল তা তিনি কোনওদিনই ব্যাখ্যা করেননি। 'মুসলমান এবং শিখরা এককালের শাসকবর্গের খণ্ডিত অংশ'—এ ছাড়া তাঁর দেওয়া কারণগুলি অন্য কিছু হতে পারে না। শ্রী গান্ধী এরকম একটি শিশুসুলভ এবং অগণতান্ত্রিক বিচারধারা বা তর্কের বশীভূত হবেন তার জন্য কেউ কিছু মনে করে না, তথাপি তিনি জেদাজেদি করতে পারতেন যে সমস্ত সংখ্যালঘুকেই তিনি সমান চক্ষে দেখবেন এবং এরকম অতার্কিক এবং অসংবদ্ধ বিবেচনাকে কোনও মূল্য দেবেন না। এখন প্রশ্ন হল যে, কী করে এমন একটি যুক্তি বা কৈফিয়তের স্বীকৃতি শ্রী গান্ধীকে তফসিলি জাতের দাবিগুলির বিরোধিতা করা থেকে প্রতিরোধ করেছে? শ্রী গান্ধী কেন ভাবেন যে, তিনি অন্য কোনও কারণ ছাড়া কেবলমাত্র ঐতিহাসিক কারণের দ্বারাই বাধ্য হয়েছেন। শ্রী গান্ধী কেন একথা ভাবলেন না যে, যদি মুসলমান এবং শিখদের ব্যাপারে ঐতিহাসিক কারণগুলিই চূড়ান্ত এবং নিষ্পত্তিমূলক ছিল, তা হলে নৈতিক কারণগুলি অস্পৃশ্যদের ব্যাপারে চূড়ান্ত ছিল? আসলে ব্যাপার হল যে, ঐতিহাসিক কারণের যুক্তিটি অত্যন্ত ফাঁকা এবং আন্তরিকতা শূন্য। এটি কোনও যুক্তিই ছিল না। এটি অস্পৃশ্যদের দাবিগুলি স্বীকার না করার অছিলা মাত্র।

শ্রী গান্ধী কখনওই এত বিরক্ত হন না, যেমনটি সংখ্যাগুরু বনাম সংখ্যালঘুর প্রশ্নের সম্মুখীন হলে হন। তিনি এই প্রশ্নটিকে উপেক্ষা করেন এবং ভুলে যেতে চান। কিন্তু পরিস্থিতি তাঁকে কোনওটাই করতে দেয় না এবং কখনও বা তাঁকে বাধ্য হয়ে এই ব্যাপারে আচরণ বা ব্যবহার করতে হয়। এ-ব্যাপারে তার বক্তব্য ১৯৩৯-এর ২১শে অক্টোবর 'হরিজন' পত্রিকার সম্পাদকীয়তে 'সংখ্যাগরিষ্ঠের কাহিনী' (The Fiction of Majority) এই শীর্ষক দিয়ে। এই সম্পাদকীয় প্রবন্ধটি বিষে পরিপূর্ণ ছিল এবং শ্রী গান্ধী তাঁদের ওপর, যাঁরা অবিরাম এই প্রশ্নটি উত্থাপন করছিলেন,

সমস্ত রকম উপহাস আরোপ করতে ইতস্তত করেননি। এই প্রবন্ধে তিনি প্রচণ্ডভাবে অস্বীকার করেন যে, মুসলমানরা সংখ্যালঘু। তিনি এও মেনে নিতে অস্বীকার করেন যে, শিখরা এবং খ্রিস্টানরা সংখ্যালঘু। তাঁর যুক্তি ছিল যে, পারিভাষিক তত্ত্ব অনুসারে—অর্থাৎ নিপীড়িত বা অবদমিত বর্গ হিসাবে সংখ্যালঘু ছিল না; যদি তাদের সংখ্যালঘু বলতে হয় তবে তা সংখ্যাতত্ত্ব অনুসারে মাত্র'—অর্থাৎ তারা কোনও মতেই সংখ্যালঘু ছিল না। তফসিলি জাতদের ব্যাপারে শ্রী গান্ধীর কী বলার ছিল? তাদের বক্তব্য যে তারা সংখ্যালঘু—এই বক্তব্যকে তিনি কি অস্বীকার করবেন? এখন আমি শ্রী গান্ধীর বক্তব্যের উদ্ধৃতি দিতে চাই। শ্রী গান্ধী বলেছিলেন—

'আমি দেখাতে প্রয়াস করেছিলাম যে ভারতবর্ষে এমন কোনও বাস্তব সংখ্যালঘু জাত বা সম্প্রদায় নেই যাদের অধিকারসমূহ ভারতবর্ষ স্বাধীন হলে বিপন্ন হবে। অবদমিত বর্গ বাদে এমন কোনও সংখ্যালঘু সম্প্রদায় নেই যারা নিজেদের ব্যাপারে সযত্নে তত্ত্বাবধান করতে পারে না।'

এই শ্রী গান্ধীর নিজের-ই স্বীকারোক্তি যে তফসিলি জাত পারিভাষিক অর্থে বাস্তবিক পক্ষে একটি সংখ্যালঘু সম্প্রদায় এবং তারাই ভারতবর্ষে একমাত্র সংখ্যালঘু যারা হিন্দু সাম্প্রদায়িক সংখ্যাগরিষ্ঠ শাসিত স্বাধীন ভারতে নিজেদের সযত্নে তত্ত্বাবধান করতে পারবে না। এই আন্তরিক আত্মপ্রত্যয় সত্ত্বেও শ্রী গান্ধী অত্যন্ত উগ্ররূপে মত পোষণ করতেন যে, তিনি কখনওই অস্পৃশ্যদেরকে কোনও রাজনৈতিক সুরক্ষা দেওয়া অনুমোদন করবেন না। তা হলে অস্পৃশ্যরা কী করে এইরকম লোককে আগ্রহী এবং সৎ বলে স্বীকার করবে?

শ্রী গান্ধী 'গোল টেবিল বৈঠকে' (Round Table Conference) অস্পৃশ্যদের রাজনৈতিক সুরক্ষার দাবির বিরোধিতা করেছিলেন। তিনি অস্পৃশ্যদের উদ্দেশ্যকে পরাস্ত বা নস্যাৎ করতে সব কিছু করেছিলেন। তাদের দাবির পিছনের শক্তিকে দুর্বল করতে এবং তাদের বিচ্ছিন্ন করতে তিনি মুসলমানদের ১৪ দফা দাবির সবগুলি মেনে নিতে স্বীকার করে তিনি তাদের ক্রয় করবার চেষ্টা করেছিলেন। শ্রী গান্ধী 'সংখ্যালঘু উপ সমিতি' সভায় বলেছিলেন : 'কমিটি যদি অস্পৃশ্যদের দাবিগুলি অনুমোদন করে তা হলে সেগুলিকে বিরোধিতা করার আমি কে?' শ্রী গান্ধীর পক্ষে মুসলমানদের সমস্ত দাবি—যা মিঃ জিন্নার চৌদ্দ দফার অন্তর্ভুক্ত ছিল—তফসিলি জাতের দাবিগুলিকে বিরোধিতা করতে রাজি হওয়ার শর্তে-মেনে নিয়ে কমিটির রায়কে নস্যাৎ করার প্রচেষ্টা অত্যন্ত অন্যায় ছিল। এটি তাঁর একটি

চতুর কৌশল ছিল। তিনি মুসলমানদের একটি অত্যন্ত কঠিন বাছাই-এর প্রস্তাব দিয়েছিলেন—'হয় তারা তাদের চৌদ্দ দফা দাবি পূরণ পাবে এবং অস্পৃশ্যদের দাবি পূরণের সমর্থন তুলে নেবে—না হয় তারা অস্পৃশ্যদের পক্ষ নেবে এবং চৌদ্দ দফা হারাবে। শেষে শ্রী গান্ধীর চাল (কৌশল) বিফল হয়েছিল—মুসলমানরাও চৌদ্দ দফা হারায়নি এবং অস্পৃশ্যরা তাদের ব্যাপারটাও নষ্ট করেনি। কিন্তু এই উপাখ্যান শ্রী গান্ধীর বিশ্বাসঘাতকতার নজির হয়ে আছে। এর থেকে একজন লোকের চরিত্রের আর কি যথার্থ বর্ণনা হতে পারে, যিনি অন্য ব্যক্তিকে তার শপথ ভঙ্গ করার জন্য অপরাধমূলক পরামর্শ দিয়ে রাজি করান, যিনি একজন ব্যক্তিকে বন্ধু বলে ডাকেন এবং তাকেই আবার পিছন থেকে ছুরি মারার পরিকল্পনা করেন। অস্পৃশ্যরা কী করে এমন একজন ব্যক্তিকে সৎ এবং আগ্রহী বলে মেনে নিতে পারে?

শ্রী গান্ধী সাম্প্রদায়িক প্রশ্নের সিদ্ধান্তের ব্যাপারটি ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর সালিশিতে পাঠান। অস্পৃশ্যদেরকে শ্রী গান্ধী দ্বারা পরাস্ত করার প্রচেষ্টা সত্ত্বেও মহামান্য সরকার তাদের রাজনৈতিক দাবিগুলি স্বীকার করেন। এই সালিশি (Arbitration) পক্ষ হিসাবে শ্রী গান্ধী রায় মেনে নিতে বাধ্য ছিলেন। কিন্তু শ্রী গান্ধী এই রায়কে না মানার বা অনাদর করার সিদ্ধান্ত নিলেন এবং তা আমরণ অনশনের দ্বারা করলেন। শ্রী গান্ধী ভারতবর্ষকে তথা বহির্বিশ্বকে এই আমরণ অনশনের দ্বারা কাঁপিয়ে দিলেন। এই অনশনের উদ্দেশ্য ছিল যে ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক ব্রিটিশ প্রধান-মন্ত্রীর নতুন সংবিধান অনুসারে অস্পৃশ্যদের সাংবিধানিক সুরক্ষার যে যে প্রস্তাব দিয়েছিলেন, তা তুলে নেওয়া। শ্রী গান্ধীর একজন ভক্ত এই অনশনকে মহাকাব্যিক বলে বর্ণনা করেছেন। কেন এটিকে মহাকাব্যিক অনশন বলে বর্ণনা করা হয়েছে তা বুঝা সহজ নয়। এটির মধ্যে এমন কোনও বীরত্ব ছিল না। এটি বীরত্বের ঠিক বিপরীত ছিল। এটি একটি দুঃসাহসিক অভিযান ছিল। শ্রী গান্ধী এটি আরম্ভ করেছিলেন এজন্য যে, তিনি বিশ্বাস করতেন যে, অস্পৃশ্যরা এবং ব্রিটিশ সরকার উভয়েই তাঁর এই আমরণ অনশনের ধমকানিতে ভয়ে শিহরিত হবে এবং তাঁর দাবির কাছে পরাজয় স্বীকার করবে। দুই দল-ই তাঁর এই ধাপ্পাবাজি ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিল এবং বস্তুত ফিরিয়ে নিতে বাধ্য করল। যখন-ই শ্রী গান্ধী বুঝতে পারলেন যে, তিনি এই চালটি একটু বেশি বাড়াবাড়ি করিয়া ফেলেছেন, তাঁর সব বীরত্ব মুহূর্তের মধ্যে মিলিয়ে গেল। যে ব্যক্তি এই কথা বলে আমরণ অনশন শুরু করেছিলেন যে, অস্পৃশ্যদিগকে দেওয়া সাংবিধানিক সুরক্ষাগুলি উঠিয়ে না নিলে, এবং তার দ্বারা অস্পৃশ্যগণ অধিকারহীন এবং মান্যতাবিহীন হয়ে অত্যন্ত অসহায় রূপে রূপান্তরিত

হয় সেই ব্যক্তি অত্যন্ত শোকাকুল হয়ে মিনতি করছিলেন এই বলে যে, 'আমার জীবন এখন আপনাদের হাতে, আমাকে রক্ষা করুন!' শ্রী গান্ধীর 'পুনা চুক্তি' স্বাক্ষর করার জন্য অতিশয় অধৈর্য—যদিও এই চুক্তি, প্রধানমন্ত্রীর ফয়সলাকে, তাঁর চাহিদামতো বাতিল করে নি, কেবলমাত্র তার বিকল্প ব্যবস্থা করেছে এবং অন্যরকম সাংবিধানিক সুবিধা দিয়েছে—একটি শক্তিশালী সাক্ষ্য যে সেই বীরপুঙ্গব তাঁর সাহস হারিয়েছেন এবং তাঁর মুখ রক্ষা করতে এবং কোনও রকমে জীবন রক্ষার জন্য উদ্গ্রীব।

এই অনশনে মহৎ কিছুই ছিল না। এটা একটি নোংরা এবং অন্যায় কাজ ছিল। এই অনশন অস্পৃশ্যদের উপকারের জন্য ছিল না। বরং এটি তাদের বিরুদ্ধে ছিল এবং একদল অসহায় লোকের বিরুদ্ধে জঘন্য রকমের দমনমূলক ব্যবস্থা ছিল, যার দ্বারা তাদের প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ফয়সলা এবং প্রাপ্ত কিছু সাংবিধানিক সুরক্ষা ব্যবস্থা ছেড়ে দিতে হত এবং হিন্দুদের দয়ার উপর নির্ভর করে বাস করতে রাজি হতে হত। এটি একটি অত্যন্ত ইতর এবং পাপপূর্ণ কর্মানুষ্ঠান ছিল। কেমন করে অস্পৃশ্যরা এরকম একটি লোককে উৎসাহী এবং সৎ বলে মেনে নেবে!

আমরণ অনশনে বসার পর তিনি 'পুনা চুক্তি' স্বাক্ষর করেছিলেন। লোকে বলে যে শ্রী গান্ধী নিষ্কপটভাবে বিশ্বাস করতেন যে, সাংবিধানিক সুরক্ষাগুলি অস্পৃশ্যদের পক্ষে ক্ষতিকর ছিল। কিন্তু একজন সৎ এবং নিষ্কপট ব্যক্তি যিনি অস্পৃশ্যদের রাজনৈতিক দাবির বিরোধিতা করলেন, যিনি তাদের পরাস্ত করার জন্য মুসলমানদের ব্যবহার করলেন, যিনি আমরণ অনশন করলেন এবং সবশেষে সেই দাবিগুলিই মেনে নিলেন—কারণ. 'পুনা চুক্তি' এবং সাম্প্রদায়িক রায় দানের মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই—যখন দেখলেন যে আর বিরোধিতা করে লাভ নেই কারণ বিরোধিতা সফল হবে না। কেমন করে একজন সৎ নিষ্কপট ব্যক্তি অস্পৃশ্যদের দাবিগুলিকে নিরীহ (Harmless) বলে মেনে নিলেন যখন একবার তিনি সেইগুলিকেই ক্ষতিকারক বলে স্বীকার করেছিলেন?

অস্পৃশ্যগণ কি শ্রী গান্ধীকে তাদের বন্ধু এবং মিত্র মনে করে? এর উত্তর হল নঞর্থক অর্থাৎ 'না'। তারা তাঁকে তাদের বন্ধু বলে মনে করে না। তারা কী করে করবে?

এটা হতে পারে যে, শ্রী গান্ধী অস্পৃশ্যদের সমস্যাকে একটি সামাজিক সমস্যা বলে মনে করেন। কিন্তু তারা তাঁকে তাদের বন্ধু বলে কী করে মেনে নেবে যখন তিনি জাতপাতকে রেখে অস্পৃশ্যতাকে দূর করতে চান—যখন এটা পরিষ্কার যে অস্পৃশ্যতা কেবলমাত্র জাত বিচারের-ই প্রসারিত রূপ, এবং সেই হেতু জাতপাতের বিচার না মেটালে অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের কোনও সম্ভাবনাই নেই? এটা হতে পারে

যে, শ্রী গান্ধী সত্য-সত্যই বিশ্বাস করেন যে, অস্পৃশ্যদের সমস্যাটি সামাজিক প্রক্রিয়ার দ্বারাই সমাধান হতে পারে। কিন্তু অস্পৃশ্যরা কী করে তাঁকে বন্ধু বলে মেনে নেবে, যখন তিনি রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার অবলম্বনের গোড়া এবং উন্মত্ত বিরোধিতা করেন, যদিও সবাই স্বীকার করে যে, রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার ব্যবহার সামাজিক প্রক্রিয়ার ফলাফলকে নষ্ট করতে পারে না এবং হতে পারে যে একে অপরের ওপর নির্ভর করবে সমস্যার সমাধানের জন্য। একজন ব্যক্তিকে কী করে বন্ধু বলে মেনে নেওয়া যায় যখন তিনি 'অস্পৃশ্যরা রাষ্ট্রের শক্তির এবং কর্তৃত্বের কেন্দ্রগুলিতে যাক' এটা বিশ্বাস করেন না। এই রাজনৈতিক সুরক্ষার মতবিরোধে বা বিবাদে শ্রী গান্ধী নিম্নলিখিত যে-কোনও একটি পন্থা অবলম্বন করতে পারতেন। তিনি অস্পৃশ্যদের সমর্থক বা রক্ষক হতে পারতেন। সেক্ষেত্রে তিনি 'অস্পৃশ্যদের সুরক্ষার দাবিকে কেবলমাত্র স্বাগত'ই জানাতেন না, বরং তারা নিজেরা দাবি করবে এই আশায় প্রতীক্ষা না করে তিনি নিজেই এর প্রস্তাব করতেন। তিনি যে কেবলমাত্র তাদের প্রস্তাব-ই করতেন তা নয়, বরং সেগুলির জন্য লড়াই করতেন। কারণ, অস্পৃশ্যদের একজন যথার্থ সমর্থনকারীর পক্ষে এটা দেখা 'যে তাদের আইনসভায় সদস্যপদ পাওয়ার জন্য, তাদের কার্যপালিকায় মন্ত্রী হওয়ার জন্য এবং রাষ্ট্রে অনেক উচ্চপদে আসীন হওয়ার জন্য ব্যবস্থা করা হয়েছে', এর চেয়ে আনন্দের বা সুখের আর কীই-বা থাকতে পারে। নিঃসন্দেহে, যদি শ্রী গান্ধী অস্পৃশ্যদের হিতাকাঙ্ক্ষী বা সমর্থনকারী হতেন, এগুলিই হল সেই ব্যবস্থা, যার জন্য তিনি লড়াই করতে পারতেন। দ্বিতীয়ত, যদি তিনি তাদের অর্থাৎ অস্পৃশ্যদের সমর্থনকারী (Champion) না হতে চাইতেন, তিনি তাদের মিত্র (Ally) হতে পারতেন। তিনি তাদেরকে তাঁর নৈতিক এবং ভৌতিক আশ্রয় বা সাহায্য দিতে পারতেন। তৃতীয়ত, যদি শ্রী গান্ধী বীরের ভূমিকা না নিতে চাইতেন, এবং অস্পৃশ্যদের মিত্র হতেও পরাঙ্মুখ থাকতেন তাহলে, তাঁর বারবার ঘোষিত এবং বিজ্ঞাপিত অস্পৃশ্যদের প্রতি সহানুভূতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে, তিনি তাদের বন্ধু হতে পারতেন। তারপর বন্ধু হিসাবেও তিনি হিতৈষীর নিরপেক্ষতা নিয়ে তাদের সুরক্ষার দাবিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সবরকম সাহায্য করতে পারতেন। এই হিতৈষীর নিরপেক্ষতা না নিতে পারলে তিনি কঠোর নিরপেক্ষতা অবলম্বন করে অস্পৃশ্যদের একথা বলতে পারতেন যে, যদি 'গোল টেবিল বৈঠক' তাদের সুরক্ষা দিতে চায় তবে তা তারা নিতে পারে কিন্তু তিনি এ-ব্যাপারে সাহায্য বা বিরোধিতা কিছুই করবেন না। এ সমস্ত বিনম্র বিবেচনা পরিত্যাগ করে শ্রী গান্ধী অস্পৃশ্যদের খোলাখুলিভাবে শত্রু রূপে প্রকট হলেন। তাহলে কী করে অস্পৃশ্যরা এরকম একজনকে তাদের বন্ধু বা মিত্র মনে করবে?

III

শ্রী গান্ধীর অস্পৃশ্যতা বিরোধী অভিযান যে ব্যর্থ হয়েছে তা আক্ষেপেরও বাইরে। এমনকী কংগ্রেসের কাগজপত্রও তা স্বীকার করে। আমি নিচে তার থেকে কিছু উদ্ধৃতি দিচ্ছি—

'১৭ই আগস্ট ১৯৩৯ তারিখে বোম্বাই বিধানসভার একজন তফসিলি জাতের সদস্য শ্রী বি. কে. গাইকোয়াড় প্রশ্ন করেছিলেন যে, 'বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে ১৯৩২ সাল থেকে, যখন শ্রী গান্ধী তাঁর মন্দির-প্রবেশ আন্দোলন শুরু করেছিলেন, কতগুলি মন্দির অস্পৃশ্যদের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে? কংগ্রেসি মন্ত্রীর দেওয়া সংখ্যা মতো সর্বসাকুল্যে ১৪২টা মন্দির খুলে দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে ১২১টা রাস্তার ধারের কাছে দাঁড়িয়ে থাকা, যেগুলি কারও দায়িত্বে ছিল না এবং এগুলিতে পূজা বা উপাসনাও হত না। আর একটি ব্যাপার প্রকাশিত হয়েছিল যে, শ্রী গান্ধীর বাড়ি যে জেলায় সেই গুজরাটে একটিও মন্দির অস্পৃশ্যদেরকে খুলে দেওয়া হয়নি।'

১০ই মার্চ ১৯৪০-এর শ্রী গান্ধীর গুজরাটি কাগজ 'হরিজন বন্ধু'র একটি লেখায় বলা হয়েছিল—

'হরিজনদের অস্পৃশ্যতা, বিশেষত স্কুলে ভর্তির ব্যাপারে, কোথাও এমন অটলভাবে টিকে থাকেনি থাকে নাই যেমন আছে গুজরাটে[১]।'

'হরিজন সেবক সংঘে'র একটি মাসিকপত্র থেকে ২৭শে আগস্ট ১৯৪০-এর 'দি বোম্বে ক্রনিকল্'-এর সংখ্যায় পুনঃপ্রকাশিত লেখায় বলা হয়েছিল :

'আহমেদাবাদ জেলার গোদাভিতে হরিজনদের ছেলেদের স্থানীয় পর্ষদ্ বিদ্যালয়ে পাঠানোর জন্য এমনভাবে নির্যাতন করা হয়েছিল যে, ৪২টি হরিজন পরিবার গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিল........ এবং 'সানন্দ'-এর মহকুমা তালুকে চলে গিয়েছিল।'

১৯৪৩ সালের ২৭শে আগস্ট শ্রী এম. এম. নন্দগাঁওকরকে, যিনি অস্পৃশ্যদের একজন নেতা ছিলেন, বোম্বাই প্রেসিডেন্সির থানাতে বাস করতেন এবং থানা পুরসভার প্রাক্তন উপ-সভাপতি ছিলেন, তাঁকে একটি হিন্দু হোটেলে চা দিতে অস্বীকার করে। 'দি বোম্বে ক্রনিকল্' ইং ১৯৪৩-এর ২৮শে অগাস্ট এর ওপর মন্তব্য করে লেখে যে—

'যখন ১৯৩২ সালে গান্ধীজি অনশন করেছিলেন, তখন অত্যন্ত উত্তেজিত ভাবে

১. সঞ্জনার 'রাজনীতিতে যুক্তি ও যুক্তিহীনতা' থেকে উদ্ধৃত।

কিছু মন্দির এবং হোটেল হরিজনদের জন্য খুলে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু মন্দির এবং হোটেলে প্রবেশের অধিকারের ব্যাপারটি এখনও পূর্ব্ববৎ আছে। সবচেয়ে পরিচ্ছন্ন হরিজনকেও মন্দির এবং হোটেলে ঢুকতে দেওয়া হয় না। তথাপি কিছু অস্পৃশ্যতা বিরোধী কর্মী এই অক্ষমতার ব্যাপার একটি আত্মতুষ্টির দৃষ্টিতে দেখেন এবং পৃষ্ঠপোষকের মতো 'আগে উন্নয়ন' এই কথা বলে বলেন যে, যখন হরিজনরা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হতে শিখবে, তাদের নাগরিক অক্ষমতাগুলি আপনা-আপনিই খসে পড়বে। এটি অর্থহীন বোকামি মাত্র।'

১৯৪৪-এর জানুয়ারিতে কানপুরে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত তফসিলি জাতি পরিষদ-এর কার্য-বিবরণী লিখতে গিয়ে 'বোম্বে ক্রনিক্‌ল' তার ৪ঠা ফেব্রুয়ারি ১৯৪৪-এর সংখ্যায় লিখল :

'কিন্তু হিন্দু সমাজ এমন-ই নিষ্ক্রিয় যে জাতপাতের বিচার এবং অস্পৃশ্যতা দুই-ই আজ পর্যন্ত টিকে আছে। কেবল এটাই নয়, অনেক হিন্দুনেতা ব্রিটিশদের দ্বারা স্বার্থ বিষয়ক প্রচারের দ্বারা ভুল পথে পরিচালিত হয়ে এখনও যুক্তি দেয় যে, হিন্দু সংস্কৃতির জাত বিচারের মধ্যে এমন কিছু অজ্ঞাত রহস্য আছে বলেই হিন্দু সংস্কৃতি এখনও আছে। তা ছাড়া, তারা তর্ক করে, জাতবিচার কখনওই শতাব্দীর আঘাত সহ্য করে বেঁচে থাকতে পারত না। এটি সত্যিই খুব-ই দুঃখের বিষয় যে, গান্ধীজি এবং অন্যান্য সমাজ সংস্কারকদের প্রয়াস সত্ত্বেও, অস্পৃশ্যতা এখনও বেশ বৃহৎ ব্যাপ্তি নিয়ে টিকে আছে। গ্রামে এটি অব্যাহত ভাবে বর্ধনশীল..... এমনকী বোম্বাই-এর মতো শহরে একজন ঝাড়ুদার, মেথরের কথা ছেড়ে দিলেও, যতই পরিষ্কার পোশাকে থাকুক না কেন, কোনও হিন্দু, এমনকী ইরানি রেস্তোরাঁয়ও অস্পৃশ্যরা চা খেতে প্রবেশ করতে পারে না।'

অস্পৃশ্যরা সব সময়েই বলে আসছে যে, শ্রী গান্ধীর অস্পৃশ্যতা বিরোধী অভিযান বিফল হয়েছে। পঁচিশ বছরের পরিশ্রমের পরেও অস্পৃশ্যদের জন্য হোটেল বন্ধ হয়ে আছে, কুয়োগুলি বন্ধ হয়ে আছে, মন্দিরগুলি বন্ধ হয়ে আছে এবং ভারতের অনেক অংশে, বিশেষত গুজরাটে, এমনকী স্কুলগুলিও বন্ধ হয়ে আছে। খবরের কাগজ বা পত্রিকা থেকে উদ্ধৃতিগুলি এর প্রমাণ ও সাক্ষ্য হিসাবে আছে—বিশেষত এই কাগজগুলি 'কংগ্রেসি কাগজ'। যেহেতু এই কাগজগুলি অস্পৃশ্যদের বক্তব্যকে পুরোপুরি সমর্থন করে, এই বিষয়ে আর বেশি কিছু বলার প্রয়োজন নেই, কেবল একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা ছাড়া।

প্রশ্নটি হল—কেন শ্রী গান্ধী বিফল হলেন? আমার মতে, এই অসফলতার তিনটি কারণ আছে—

প্রথম কারণ হল হিন্দুরা, যাদের কাছে তিনি অনুনয় করেছিলেন, এই অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের জন্য, তার কোনও রকম প্রতিক্রিয়া হয় নি। এটা এমন কেন? এটি খুব-ই সাধারণ অভিজ্ঞতা যে, একজন মানুষ যে ভাষা বা শব্দ প্রয়োগ করে এবং তার যে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে, তা সব সময়েই যথানুপাত হয় না। তিনি যখন কিছু বলেন তার গতিবেগ, অনির্দিষ্টভাবে গুণিতকে বর্ধিত হয়, না হয় শূন্যতায় পরিণত হয় বা অবনমিত হয়; কারণ ভাল কিংবা মন্দ যে কোনও কারণেই হোক, শ্রোতা বক্তার বক্তব্যের সারমর্ম তৈরি করে নেয় বা অনুমান করে নেয়। এই ব্যাপারটিই সমাধানের সূত্র বলে দেয় কেন অস্পৃশ্যতার ব্যাপারে শ্রী গান্ধীর উপদেশগুলি হিন্দুদের প্রভাবান্বিত করতে বিফল হয়েছে, কেন লোকেরা তাঁর প্রার্থনা-শেষের উপদেশাবলী কিছুক্ষণের জন্য শোনে এবং পরক্ষণেই কোনও হাসির নাটক দেখতে ছুটে যায় এবং কেন এরপরে তার আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না? দোষটা সর্বতোভাবে হিন্দু জনগণের নয়। এটা শ্রী গান্ধীর নিজের-ই দোষ। শ্রী গান্ধী তাঁর মহাত্মা হওয়ার খ্যাতিকে তৈরি করেছেন রাজনৈতিক স্বাধীনতা আনয়নের অগ্রদূত হিসাবে এবং একজন আধ্যাত্মিক বা ধর্মীয় শিক্ষাগুরু হিসাবে নয়। শ্রী গান্ধীর অভিপ্রায় যাই থাকুক না কেন, তাঁকে লোকে স্বরাজের দূত বা প্রচারক মনে করে। তাঁর এই অস্পৃশ্যতা-বিরোধী অভিযানকে লোকে তাঁর অতিরিক্ত ক্রিয়াকলাপ না মনে করলেও একটি খেপামি বলে মনে করে। সেজন্য হিন্দুরা তাঁর রাজনৈতিক প্রস্তাবের প্রতি প্রতিক্রিয়ান্বিত হয় কিন্তু কখনওই তাঁর সমাজ বিষয়ক বা ধর্মীয় উপদেশের দ্বারা নয়। এইজন্যই তাঁর অস্পৃশ্যতা বিরোধী অভিযানের গতিবেগ শূন্যই থাকবে। শ্রী গান্ধী একজন রাজনৈতিক খুরত্রিক (বা মুচি)। তাঁর রাজনৈতিক ছাঁচেই আটকে থাকা উচিত। তিনি ভাবলেন যে, তিনি সামাজিক প্রশ্নের সমাধানের কাজও নিতে পারবেন। এটাই তাঁর ভুল ছিল। একজন রাজনৈতিক ব্যক্তি এর জন্য উপযুক্ত নয়। সেইজন্য যে আশা অস্পৃশ্যদের দেওয়া হয়েছিল যে, শ্রী গান্ধীর উপদেশ ফলবে, তা বিফল হয়েছে।

দ্বিতীয় কারণ এই যে, শ্রী গান্ধী হিন্দুদিগকে শত্রু বানাইতে চান নি যদিও তাঁর অস্পৃশ্যতা, বিরোধী কার্য্যক্রমকে এগিয়ে নিয়ে যেতে এরকম শত্রুতার প্রয়োজন ছিল। কিছু ঘটনার উদাহরণ শ্রী গান্ধীর মানসিকতাকে বিশদ বা স্পষ্ট করবে।

শ্রী গান্ধীর বেশির ভাগ বন্ধুই এই অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের জন্য আগ্রহের এবং উৎসাহের কৃতিত্ব শ্রী গান্ধীকে দেয় এবং আশা করে যে অস্পৃশ্যরা এটা বিশ্বাস করবে কেবলমাত্র এই কারণেই যে, শ্রী গান্ধীই মাত্র একজন, যিনি হিন্দুদের সর্বদাই অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের প্রয়োজনীয়তার ওপর উপদেশ দিয়ে থাকেন। কিন্তু তাঁরা

সেই পুরনো প্রবাদবাক্য ভুলে গেছেন যে, 'উপদেশের চেয়ে উদাহরণ ভাল', বা 'এক আউন্স কাজ করে দেখানো একটন উপদেশের চেয়ে ভাল', এবং শ্রী গান্ধীকে কখনও ব্যাখ্যা করতে বলেন নি যে, কেন তিনি হিন্দুদের অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের প্রয়োজনীয়তার উপদেশ দেওয়া থেকে ক্ষান্ত হন না, এবং একটি সত্যাগ্রহ অভিযান বা অনশন করেন না। এরকম প্রশ্ন করলেই তাঁরা জানতে পারতেন, কেন শ্রী গান্ধী অস্পৃশ্যতার ওপরে কেবলমাত্র উপদেশ দিয়েই সন্তুষ্ট থাকেন।

শ্রী গান্ধী কেন উপদেশ দেওয়ার বাইরে কিছু করবেন না তার সত্য কারণটি অস্পৃশ্যদের কাছে উন্মোচিত হয়েছিল প্রথমবার[১] ১৯২৯ সালে যখন অস্পৃশ্যরা বোম্বাই প্রদেশে তাদের নাগরিক অধিকারকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে, মন্দিরে প্রবেশ এবং সর্বজনীন কুয়ো থেকে জল নেওয়ার অধিকার নিয়ে, হিন্দুদের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ অভিযান শুরু করেছিল। তারা শ্রী গান্ধীর আশীর্বাদ পাওয়ার আশা করেছিল, কারণ অন্যায়ের প্রতিবিধানের জন্য সত্যাগ্রহ ছিল শ্রী গান্ধীরই উদ্ভাবিত অস্ত্র। যখন তাঁর সহায়তার জন্য আবেদন করা হল, অস্পৃশ্যদের বিস্মিত ও চকিত করে হিন্দুদের বিরুদ্ধে এই সত্যাগ্রহকে দোষারোপ এবং নিন্দা করে তিনি একটি বিবৃতি বা ইস্তাহার জারি করেছিলেন। এর জন্য তিনি যে তর্কের অবতারণা করেছিলেন তা অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে উদ্ভাবিত ছিল। তিনি বলেছিলেন যে, সত্যাগ্রহ কেবলমাত্র বিদেশিদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ হতে পারে ; এটি নিজের স্বজাতি বা স্বদেশীদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা যায় না এবং যেহেতু হিন্দুরা অস্পৃশ্যদের স্ব-জাতি এবং স্বদেশীয়, সেইহেতু সত্যাগ্রহের নিয়ম অনুসারে তা অস্পৃশ্যরা হিন্দুদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করতে পারে না!! কী সুন্দর সর্বোচ্চ মহত্তম অবস্থা থেকে উপহাসাস্পদ অবস্থায় পতন! এই বিবৃতি দিয়ে শ্রী গান্ধী সত্যাগ্রহকে বাজে অর্থহীনতায় পরিণত করলেন। কেন শ্রী গান্ধী এটা করলেন? কেবলমাত্র এই কারণে যে, তিনি হিন্দুদের বিরক্ত বা উত্তেজিত করতে চাইলেন না।

এই ব্যাপারে দ্বিতীয় প্রমাণ হিসাবে আমি 'কবিতা-প্রসঙ্গে'র উল্লেখ করতে চাই। গুজরাটের আহমেদাবাদ জেলার একটি গাঁয়ের নাম কবিতা (Kabitha)। ১৯৩৫ সালে এই গ্রামের অস্পৃশ্যগণ হিন্দুদের কাছে দাবি করল যে, গ্রামের সর্বসাধারণের স্কুলে হিন্দু ছেলেমেয়েদের সঙ্গে তাদের ছেলেমেয়েদেরও ভর্তি করতে হবে। হিন্দুরা এই দাবিতে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হল এবং তাদের সম্পূর্ণ সামাজিক বয়কট ঘোষণা করে

১. ১৯২৪ সালে ভাইকমের সত্যাগ্রহ—যার উদ্দেশ্য ত্রিবাঙ্কুরে একটা জনসাধারণের ব্যবহৃত রাস্তা অস্পৃশ্যদের খুলে দেওয়ার জন্য ছিল। শ্রী গান্ধী শিখদের দ্বারা সত্যাগ্রহীদের জন্য লঙ্গরখানা খোলায় আপত্তি করেছিলেন। শ্রী গান্ধী কিন্তু এই আপত্তির কারণ ব্যাখ্যা করেন নি।

তারা এর প্রতিশোধ নিল। এই বয়কটের সঙ্গে জড়িত ঘটনাগুলি শ্রী এ. ভি. ঠক্করের দ্বারা বর্ণিত হয়েছে, যিনি অস্পৃশ্যদের পক্ষ নিয়ে দু'পক্ষের মধ্যে মিল স্থাপনের জন্য হিন্দুদের কাছে মধ্যস্থতা করতে কবিতা গিয়েছিলেন। যে কাহিনী তিনি বলেছিলেন তা হল এইরূপ—

'এ-মাসের দশ তারিখে 'দি অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস' (The Associated Press) একটি সংবাদে জানায় যে, কবিতা গ্রামের হিন্দুরা ওই গ্রামের হরিজন ছেলেদের গ্রামের স্কুলে ভর্তি করতে রাজি হয়েছে এবং এই ব্যাপারটি আপসে সম্পাদিত হয়েছে। কিন্তু ওই মাসেরই ১৩ তারিখে আহমেদাবাদ 'হরিজন সেবক সংঘে'র সম্পাদক দ্বারা এটি অস্বীকার করা হয় এবং এক বিবৃতিতে তিনি বলেন যে, হরিজনরা (অবশ্যই গোপনভাবে) তাদের সন্তানদের স্কুলে না পাঠাবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। এই প্রতিশ্রুতি স্বতঃপ্রণোদিত ছিল না, বরং হিন্দু জাতের লোকেদের দ্বারা, জোর করে আদায় করা হয়েছিল, এক্ষেত্রে ওই গ্রামের গরাসিয়াদের দ্বারা যারা এই সমস্ত হরিজনদের—তাঁতি, জোলা, চামার এবং অন্যান্যদের—যাদের সংখ্যা একশত পরিবারেরও বেশি—বিরুদ্ধে সামাজিক বয়কট ঘোষিত হয়েছিল। তাদের কৃষিকর্মের শ্রমিক হওয়া থেকে, তাদের পশুদের পশুচারণের মাঠে চরানোর থেকে, এবং তাদের ছেলেমেয়েদের ঘোল খাওয়া থেকে বঞ্চিত করেছিল। কেবলমাত্র এই নয়, বরং একজন হরিজন নেতাকে মহাদেবের নামে শপথ নিতে বাধ্য করেছিল যে, সে এবং অন্যেরা এরপর কোনওদিন তাদের ছেলেমেয়েদের পুনরায় স্কুলে ভর্তি করবার জন্য কোনও রকম প্রচেষ্টা করবে না। তথাকথিত মীমাংসা এইভাবে হয়েছিল।

'কিন্তু এই মিথ্যা বাজে মীমাংসা ১০ তারিখে প্রকাশিত হওয়ার পরেও এবং বেচারা হরিজনদের সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণের পরেও ১৯ তারিখ পর্যন্ত এবং অংশত তাঁতিদের ওপর থেকে ২২ তারিখ পর্যন্ত এই বয়কট উঠিয়ে নেওয়া হয়নি। চামারদের মাথার ওপর থেকে এই বয়কট কিছুদিন আগে তুলে নেওয়া হয়েছিল কারণ গরাসিয়ারা নিজেরা তাদের মৃত পশুদের শব সরাতে পারছিল না এবং সেইজন্য তাড়াতাড়ি চামারদের সঙ্গে একটা বুঝাপড়ায় আসতে হয়েছিল। যেহেতু এইরূপ দুষ্কার্যের সম্পাদনও যথেষ্ট হয় নি, হরিজনদের কুয়োতে, একবার ১৫ তারিখে এবং আর একবার ১৯ তারিখে কেরোসিন ঢেলে দেওয়া হয়েছিল। যে কোনও ব্যক্তি কল্পনা করতে পারেন, এই গরিব হরিজনদের ওপরে কী পরিমাণ অত্যাচার করা হয়েছিল। কারণ তারা তাদের সন্তানদের রাজোচিত গরাসিয়াদের ছেলেদের সঙ্গে এক পঙক্তিতে বসবার জন্য স্কুলে পাঠাতে সাহস করেছিল।

'আমি ২২শের সকালে গরাসিয়া নেতাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। তাঁরা বললেন যে, তাঁরা কখনই বরদাস্ত করবেন না যে 'ধেদ' এবং 'চামার'রা তাদের নিজের ছেলেদের পাশে বসুক। এর একটা সুরাহা হয় কিনা—এই আশায় আমি আহমেদাবাদের জেলা শাসকের সঙ্গে দেখা করলাম—যদি তিনি এ-ব্যাপারে কিছু করতে পারেন—কিন্তু কোনও ফল-ই হল না।

হরিজন ছেলেরা প্রকৃতপক্ষে এইভাবে গ্রামের স্কুল থেকে বহিষ্কৃত হয়েছে এবং তাদের সাহায্য করার কেউ নেই। এই ব্যাপারটি হরিজনদের এতই হতাশ করেছে যে, তারা একসঙ্গে অন্য কোনও গ্রামে স্থানান্তরিত হবার চিন্তা করতে থাকল।'

শ্রী গান্ধীর কাছে এই প্রতিবেদনটি রাখা হয়েছিল। শ্রী গান্ধী কী করলেন? নিম্নলিখিত[১] বয়ানটি কবিতা গ্রামের অস্পৃশ্যদের প্রতি শ্রী গান্ধীর পরামর্শ—

'স্বাবলম্বনের মতো কোনও সাহায্য নেই। স্বাবলম্বীদের ভগবান সহায় হন। সংশ্লিষ্ট হরিজনগণ যদি প্রতিবেদনে বর্ণিত সিদ্ধান্তকে কার্যে পরিণত করতে কৃতসংকল্প, যদি তারা তাদের পা থেকে 'কবিতা'র ধুলো ঝেড়ে দিতে চায়, তারা কেবল নিজেরাই সুখী হবে না, বরং অন্য যারা এমন-ই আচরণ পাওয়ার আশা করে, তাদেরকেও রাস্তা দেখাবে। যদি কাজ খোঁজার জন্য লোক স্থানান্তরিত হয়, তবে আত্মসম্মান রাখার জন্য তার চেয়ে বেশি করতে পারে। আমি আশা করি যে, হরিজনদের শুভাকাঙ্ক্ষীরা তাদের, এই গরিব হরিজনদের আতিথেয়তাহীন এই কবিতা গ্রাম ছাড়তে সাহায্য করবে।'

শ্রী গান্ধী অস্পৃশ্যদের কবিতা গ্রাম ছাড়তে পরামর্শ দিলেন। কেন তিনি শ্রী ঠক্করকে কবিতা গ্রামের হিন্দুদের বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগ আনতে পরামর্শ দিলেন না এবং অস্পৃশ্যদের তাদের অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করতে সাহায্য করলেন না? স্পষ্টতই তিনি যদি পারেন তো অস্পৃশ্যদের উন্নতি সাধন করতে চাইতেন, কিন্তু হিন্দুদিগকে ক্ষুব্ধ করে নয়। এইরকম এক ব্যক্তি অস্পৃশ্যদের অবস্থার উন্নতি করতে কি ভাল কাজ করতে পারেন? এই সমস্ত ব্যাপার শ্রী গান্ধীর হিন্দুদের প্রতি ভাল করার উৎকণ্ঠাই প্রকাশ করে। এইজন্যই তিনি হিন্দুদের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহের বিরোধিতা করেন? এইজন্যই তিনি অস্পৃশ্যদের রাজনৈতিক দাবিগুলির বিরোধিতা করেন। কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন যে, এগুলি তাদের বিরুদ্ধেই নির্দিষ্ট ছিল। তিনি হিন্দুদের ভালর জন্য এতই উদ্‌গ্রীব ছিলেন যে, তার জন্য তিনি অস্পৃশ্যদের জন্য অপদার্থ

---

১. 'হরিজন' পত্রিকা, ৫ অক্টোবর ১৯৩৫।

হয়ে গেলেও তিনি কিছু মনে করতেন না। সেইজন্যই শ্রী গান্ধীর অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের সমস্ত কার্যাবলীই কেবলমাত্র শব্দের ফুলঝুরি মাত্র, কাজ করার কোনও প্রয়াসই এর পিছনে ছিল না।

তৃতীয় কারণ এই যে, শ্রী গান্ধী কখনওই চাইতেন না যে, অস্পৃশ্যরা সংগঠিত এবং শক্তিশালী হোক। কারণ তিনি ভয় করতেন যে, তারা হিন্দুদের থেকে স্বাধীন বা স্বতন্ত্র হয়ে যাবে এবং হিন্দুদের পদমর্যাদা বা প্রতিষ্ঠাকে দুর্বল করে তুলবে। 'হরিজন সেবক সংঘে'র কার্যাবলী দ্বারা তা সর্বোত্তম উদাহরণস্বরূপ প্রতিপাদিত। এই সংঘের সমগ্র উদ্দেশ্য ছিল অস্পৃশ্যদের মধ্যে তাদের হিন্দু প্রভুদের প্রতি একপ্রকার দাসত্বের মনোভাব সৃষ্টি করা। যে কোনওদিক থেকেই এই সংঘকে বিচার বা পরীক্ষা করা হোক না কেন, ক্রীতদাসের মনোবৃত্তি সৃষ্টি এর বিশিষ্টতম উদ্দেশ্য বলে পরিলক্ষিত হবে।

এই সংঘের কাজ মহাভারতের অনুষঙ্গ শাস্ত্র ভাগবতের সেই পৌরাণিক দানব রমণী পূতনার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। মথুরার রাজা কংস কৃষ্ণকে হত্যা করতে চেয়েছিলেন, কারণ এই ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল যে, কংস কৃষ্ণের হাতেই মারা পড়বে। তাই কৃষ্ণের জন্ম হয়েছে জানতে পেরে কংস কৃষ্ণকে শিশু অবস্থাতেই মারবার জন্য পূতনাকে ওই উদ্দেশ্যে নিয়োগ করে। পূতনা এক সুন্দরী রমণীর রূপ ধরে কৃষ্ণের পালিকা মাতা যশোদার কাছে গেল এবং স্তনে বিষ মাখিয়ে কৃষ্ণকে স্তন্যপান করানোর জন্য অনুমতি চাইল এবং এইভাবে কৃষ্ণকে মারবার জন্য সুযোগ পেল। গল্পের শেষ অংশটুকু আর বলা নিষ্প্রয়োজন। গল্পের আলোচ্য বিষয়বস্তু হল যে, আপাতদৃশ্য উদ্দেশ্য সব সময় বাস্তব উদ্দেশ্য নয় এবং একজন ধাত্রী হত্যাকারীও হতে পারে। কৃষ্ণের কাছে পূতনা যেমন ছিল অস্পৃশ্যদের কাছে এই সংঘও তেমন-ই।

এই সংঘ সেবার অছিলায় অস্পৃশ্যদের মধ্য থেকে স্বাধীনতার উদ্দীপনাকে হত্যা করতে উদ্যত। অস্পৃশ্যগণ তাদের আন্দোলনের গোড়ার দিকে কিছু সদাভিপ্রায়যুক্ত হিন্দুর সাহায্য নিয়েছিল এবং তাদের নেতৃত্বকে অনুসরণ করেছিল। 'গোল টেবিল বৈঠকে'র সময় পর্যন্ত অস্পৃশ্যগণ সম্পূর্ণ আত্মবিশ্বাসী এবং স্বতন্ত্র হয়ে উঠেছিল। তারা কোনও ক্রমেই হিন্দুদের দয়ার উপর সন্তুষ্ট ছিল না। তারা তাদের অধিকার দাবি করে বসল। এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই যে, অস্পৃশ্যদের স্বাধীনতা লাভের এই উদ্যমটিকেই নষ্ট করার জন্য শ্রী গান্ধী 'হরিজন সেবক সংঘ' শুরু করেছিলেন। 'হরিজন সেবক সংঘ' তার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাজের দ্বারা একদল কৃতজ্ঞ ও বিশ্বস্ত অস্পৃশ্যদের সংগ্রহ করেছিল এবং তাদের নিযুক্ত করেছিল এই প্রচার করবার জন্য

যে, শ্রী গান্ধী এবং হিন্দুরা অস্পৃশ্যদের ত্রাণকর্তা ছিল। একজন আইরিশ নেতা, দ্যানিয়েল ও' কর্নেল একদা বলেছিলেন যে, কোনও মানুষ-ই তার আত্মসম্মানের মূল্যে কৃতজ্ঞ হতে পারে না, কোনও স্ত্রীলোক তার সতীত্বের মূল্যে কৃতজ্ঞ হতে পারে না এবং কোনও দেশ-ই কৃতজ্ঞ হতে পারে না তার স্বাধীনতার মূল্য দিয়ে। এই অস্পৃশ্যরা এতই সরলমতি যে, তারা জানে না যে, এই 'হরিজন সেবক সংঘ' যে পরিষেবা তাদের দিতে চায় তার মূল্য হল স্বাধীনতার ক্ষতি। শ্রী গান্ধী ঠিক এটিই চান।

'হরিজন সেবক সংঘে'র ক্রিয়াকলাপের সবচেয়ে নিকৃষ্টতম অংশ হল যে, সংঘ কর্তৃক পরিচালিত হোস্টেলে থাকা অস্পৃশ্য ছাত্রদের সাহায্য দান। এই অস্পৃশ্য ছাত্রেরা আমাকে মহাভারতের দুটি বিশেষ চরিত্র 'ভীষ্ম' এবং 'কচ'-এর কথা মনে করিয়ে দেয়। ভীষ্ম ঘোষণা করেছিলেন, যে পাণ্ডবরা ঠিক এবং কৌরবেরা ভুল পথে চলছে। তবু যখন দু' পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ উপস্থিত হল, তিনি পাণ্ডবের বিরুদ্ধে কৌরবের পক্ষ নিলেন।

এরূপ আচরণের যথার্থতা প্রতিপাদন করতে প্রশ্ন করলে তিনি একথা বলতে মোটেই লজ্জিত ছিলেন না যে, তিনি কৌরবের পক্ষে যুদ্ধ করেছিলেন কারণ তারা তাঁকে ভরণ-পোষণ করেছিল বা খাইয়েছিল। 'কচ' দেবতাদের সম্প্রদায়ে ছিল, যারা দৈত্যদের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত ছিল। দৈত্যদের ধর্মগুরু একটি মন্ত্র জানতেন যার দ্বারা তিনি মৃত দৈত্যকে বাঁচিয়ে তুলতেন। দেবগণ যুদ্ধে হেরে যাচ্ছিল কারণ তাঁদের প্রধান সঞ্জীবনী মন্ত্র জানতেন না এবং মৃত দেবতাদের বাঁচাতেও পারছিলেন না। দেবতারা কচকে ওই দৈত্যগুরুর কাছে গিয়ে মন্ত্র শিখে ফিরে আসবার জন্য এক পরিযোজনা করলেন। শুরুতে কচ সফল হয়নি। সবশেষে সে ওই দৈত্যগুরুর কন্যা দেবযানীর সঙ্গে এক চুক্তি করল যে, যদি দেবযানী তাকে ওই মন্ত্র শিখবার জন্য সাহায্য করে তবে সে দেবযানীকে বিবাহ করতে রাজি হবে। দেবযানী এই চুক্তি অনুযায়ী তার অংশটি পূরণ করতে সফল হয়েছিল। কিন্তু কচ তার অংশটি সম্পাদন করতে অস্বীকার করল এই বলে যে, দেবযানীর কাছে তার প্রতিজ্ঞার অপেক্ষা তার সম্প্রদায়ের স্বার্থের দাম অনেক বেশি মহত্ত্বপূর্ণ।

ভীষ্ম এবং কচ, আমার মতে, নৈতিকভাবে কলুষিত চরিত্রের প্রতীকস্বরূপ, যারা নিজের স্বার্থ ছাড়া আর কিছুই বুঝে না। হরিজন হোস্টেলের এই অস্পৃশ্য ছাত্রেরা ভীষ্ম এবং কচ এই দুয়ের-ই ভূমিকায় অভিনয় করছে। তাদের হোস্টেলে তারা শ্রী গান্ধী এবং কংগ্রেসের গুণগান করে ভীষ্মের ভূমিকায় অভিনয় করে। আর যখন

তারা হোস্টেল থেকে বেরিয়ে আসে তারা কচের ভূমিকায় অভিনয় করে এবং শ্রী গান্ধী এবং কংগ্রেসকে সর্বসমক্ষে অভিযুক্ত করে। এটা দেখতে খুব-ই কষ্ট বোধ করি। অস্পৃশ্য যুবকদের এরূপ নৈতিক অধঃপতন অপেক্ষা আর কিছু বেশি খারাপ হতে পারে না। কিন্তু 'হরিজন সেবক সংঘ' অস্পৃশ্যদের এইটিই সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ক্ষতিসাধন করেছে। এটা তাদের চরিত্রকে নষ্ট করেছে। এই সংস্থা তাদের স্বাধীনতাকে নষ্ট করেছে। শ্রী গান্ধী ঠিক এইরকম-ই চেয়েছিলেন।

এবার চতুর্থ দৃষ্টান্ত-চিত্র দেখুন। এই সংঘটি হিন্দুজাতীয়দের দ্বারা পরিচালিত। কিছু অস্পৃশ্য দাবি করেছিলেন যে, এই প্রতিষ্ঠানটি তাঁদের হাতে তুলে দেওয়া হোক এবং এটি তাঁদের-ই দ্বারা পরিচালিত হোক। অন্য কিছু লোক দাবি করেছিলেন যে পরিচালকমণ্ডলীতে অস্পৃশ্যদের প্রতিনিধিত্ব থাকতে হবে। শ্রী গান্ধী সরাসরি এই দুটির একটিও করতে অস্বীকার করেন এবং যে বিচক্ষণ কারণ দর্শান তা অত্যন্ত চতুর লোকও খণ্ডন করতে পারবে না। শ্রী গান্ধীর প্রথম তর্কটি ছিল যে, হরিজন সেবক সংঘ হিন্দুদের অস্পৃশ্যতা পালনের পাপের প্রায়শ্চিত্ত-স্বরূপ। এর জন্য হিন্দুরাই প্রায়শ্চিত্ত করতে পারে। সেইজন্য অস্পৃশ্যরা এই সংঘ পরিচালনায় কোনও স্থান পেতে পারে না। দ্বিতীয়ত, শ্রী গান্ধী বলেন যে, এর জন্য যে টাকা তিনি সংগ্রহ করেছেন, তা হিন্দুরা দিয়েছে এবং অস্পৃশ্যরা কোনও টাকা এবং যেহেতু এই টাকা অস্পৃশ্যদের নয়, পরিচালকমণ্ডলীতে অস্পৃশ্যদের থাকারও কোনও অধিকার নেই। শ্রী গান্ধীর এই অস্বীকারকে সহ্য করা যেতে পারে কিন্তু তাঁর অজুহাত বা তর্কগুলি অত্যন্ত অপমানসূচক এবং একজন আত্মসম্মানীয় অস্পৃশ্যকে ক্ষমা করা যায় যদি তিনি এই সংঘের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক না রাখেন। যে কোনও লোক ভাবতে পারতেন যে, 'হরিজন সেবক সংঘ' একটি অছি বা (Trust) এবং অস্পৃশ্যরা এর সুবিধাভোগী (Beneficiary)। আইনজ্ঞ যে কোনও তিন ব্যক্তি এটা স্বীকার করবেন যে, সুবিধাভোগীদের জানার অধিকার আছে যে অছির লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য কী, এর সম্পত্তি কী আছে, বা এর উদ্দেশ্যগুলি যথাযথ ভাবে সাধিত হচ্ছে কি না। সুবিধাভোগীদের এমন অধিকারও আছে যে, বিশ্বাসভঙ্গের অভিযোগে তারা অছি পরিষদের সদস্যদের তাড়িয়ে দিতে পারে। এই ভিত্তিতে পরিচালন সমিতিতে বা ম্যানেজিং বোর্ডে অস্পৃশ্যদের প্রতিনিধিত্বের দাবিকে অস্বীকার করা অসম্ভব। স্পষ্টত শ্রী গান্ধী এই অবস্থাকে স্বীকার করতে ইচ্ছুক নন। একজন আত্মসম্মান বিশিষ্ট অস্পৃশ্য, যার বশ্যতা স্বীকার করার কোনও ইচ্ছা নেই, এবং যিনি অস্পৃশ্যদের ভবিষ্যতকে অযাচিত অপরিচিত ব্যক্তির লোকহিতৈষণার উপর বাজি রাখতে রাজি নন, শ্রী গান্ধীর সঙ্গে তাঁর কোনও বিবাদ নেই। তিনি এটা বলতে সর্বদাই প্রস্তুত

যে, যদি নীচতা বা হীনচরিত্রতা গুণের হয় তাহলে শ্রী গান্ধীর তর্কটি অতীব চমৎকার বা মহিমান্বিত এবং শ্রী গান্ধীকে এর লাভের ফসল তুলতে স্বাগত। কেবলমাত্র এইটুকু যে তিনি অস্পৃশ্যদের দোষ দেবেন না যদি তারা এই সংঘকে বয়কট করতে চায়।

তৎসত্ত্বেও অস্পৃশ্যদের সংঘটিকে পরিচালনা করতে না দেওয়ার বাস্তবিক কারণ এগুলি ছিল না। বাস্তব কারণগুলি ছিল অন্যরকম। প্রথমত, যদি সংঘকে অস্পৃশ্যদের হাতে তুলে দেওয়া হত, শ্রী গান্ধী এবং কংগ্রেস—কারও অস্পৃশ্যদের উপর নিয়ন্ত্রণের উপায় থাকত না। অস্পৃশ্যরাও হিন্দুদের উপর নির্ভরশীল থাকত না। দ্বিতীয়ত, অস্পৃশ্যরা স্বতন্ত্র হয়ে গেলে আর হিন্দুদের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকত না। এই সমস্ত ফলাফল বা পরিণামগুলি শ্রী গান্ধীর লক্ষ্য এর উদ্দেশ্যের বিপরীত। তিনি অস্পৃশ্যদের মতো 'মিশন চৌহদ্দি'র মানসিকতা গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। সেইজন্য শ্রী গান্ধী এই সংঘের নিয়ন্ত্রণ এবং পরিচালনার ভার অস্পৃশ্যদের হাতে তুলে দিতে ইচ্ছুক নন। এটা কি অস্পৃশ্যদের মুক্তির অভিপ্রায়ের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ? শ্রী গান্ধীকে কি এর পরেও অস্পৃশ্যদের মুক্তিদাতা বলা যেতে পারে? এটা কি তাই প্রমাণ করে না যে, শ্রী গান্ধী অস্পৃশ্যদের বন্ধন সূত্রটিকে হিন্দুদের পরিধেয়র সঙ্গে আটকে দিতে, তাদের হিন্দুদের ক্রীতদাসত্বের থেকে মুক্তির চেয়ে বেশি আগ্রহী ছিলেন?

এই সমস্ত কারণেই শ্রী গান্ধীর অস্পৃশ্যতা বিরোধী অভিযান সম্পূর্ণ বিফল হয়েছে।

IV

এই সমস্ত বক্তব্যের সারসংক্ষেপ করে এটা কি বলতে পারা যায় যে, শ্রী গান্ধী মনুষ্যত্বের স্বাধিকারপত্রটি যা অস্পৃশ্যরা হারিয়েছে, তা পুনরুদ্ধার করতে পেরেছেন? স্পষ্টত প্রতীয়মানভাবে, না। এই স্বাধিকারপত্রগুলি এখনও পর্যন্ত হিন্দুদের কাছেই আছে। এগুলি পুনরুদ্ধার করতে তিনি কিছুই করেননি। না তিনি পুনরুদ্ধারের ব্যাপারে অস্পৃশ্যদের সাহায্য করেছেন। বিপরীত ভাবে তিনি তাদের পথে সব রকমের বাধা উপস্থিত করেছেন। অস্পৃশ্যরা অনুভব করে যে তাদের মনুষ্যত্বের স্বাধিকারপত্র—যার অর্থ হিন্দুদের ক্রীতদাসত্ব থেকে তাদের মুক্তি, রাজনৈতিক শক্তির দ্বারা তারা নিজেরাই আনতে পারবে এবং অন্য কোনও কিছুর দ্বারা নয়। বিপরীতভাবে, শ্রী গান্ধী বিশ্বাস করেন যে, তাঁর উপদেশ দেওয়া এবং হিন্দুদের ভাবাবেগ এবং দানশীলতা বা দয়াই অস্পৃশ্যদের পক্ষে সর্বরোগহর ঔষধ। অস্পৃশ্যরা কি হিন্দুদের এই দানশীলতা এবং হিন্দুদের ভাবাবেগের চিরন্তন ধারার উপর ভরসা করতে পারে? দানের যে রোষ আছে তাও তো বলার মতো। উদ্দীপনা বা উৎসাহ যার প্রতিহিংসাপরায়ণতা আছে, তাও নির্মাণের যোগ্য। কিন্তু অস্পৃশ্যদের এমন কোন বন্ধু তাদের হিন্দুদের শোচনীয় পরিমাপের দানশীলতা এর হিন্দু ভাবাবেগের ওপর নির্ভর করতে বলবে? অস্পৃশ্যতা আজ দু'হাজার বছর ধরে বিদ্যমান এবং এই সময়ের মধ্যে হিন্দুরা দিবারাত্র অস্পৃশ্যদের রক্ত শুষে নিয়েছে, তাদের অঙ্গচ্ছেদ করেছে এবং সবরকম ভাবে তাদের পদদলিত করেছে। এই দু'হাজার বছরে হিন্দুরা অস্পৃশ্যদের কতটুকু দান করেছে? মাত্র আট লাখ, তাও আবার যখন গান্ধী নিজে ভিক্ষাপাত্র হাতে নিয়ে সারা দেশ ঘুরে বেড়িয়েছেন!

শ্রী গান্ধী তাঁর এই কার্যক্রমকে পরীক্ষা করতে অস্পৃশ্যদের রাজনৈতিক ক্ষমতা পাওয়ার দাবিটিকে, যা তাদের মুক্তির একমাত্র উপায়, মেনে নেওয়ার ইচ্ছা প্রকট করতে পারতেন। এই দাবির ন্যায্যতা এতই বাস্তবিক যে, একজন অত্যন্ত সাধারণ বুদ্ধিযুক্ত ব্যক্তি এ-ব্যাপারটা বুঝতে পারে যে, অস্পৃশ্যদের হাতে কার্যপালিকার শক্তি, এক বছরে যা করতে পারত তা ওই উপদেশ বিলি করা ভিক্ষুদের দ্বারা এক শতাব্দীতে যা করতে পারে বলে বিশ্বাস করা যেত, তার থেকে অনেক বেশি হত। কিন্তু অস্পৃশ্যদের হাতে রাজনৈতিক ক্ষমতার ধারণাটাই শ্রী গান্ধীর নিকট ঘৃণ্য। কেন অস্পৃশ্যরা বলবে না 'শ্রী গান্ধী হতে সাবধান' যখন তারা জানে যে, তিনি কখনওই অস্পৃশ্যদের মুক্তির জন্য রাজনৈতিক পদ্ধতির ব্যবহার করতে দেবেন না। যদিও শ্রী গান্ধী এ-ব্যাপারে সর্বদা সচেতন যে, যে-সামাজিক পদ্ধতির ওপরে এতটা বিশ্বাস

করে আসছেন, তা সম্পূর্ণ বিফল হয়েছে।

এই সম্পর্কে আমেরিকার গৃহযুদ্ধের সময়ে 'ইউনিয়ন এবং দাসত্ব'—এই দুই প্রশ্নের ব্যাপারে রাষ্ট্রপতি লিঙ্কনের যে মনোভাব তা স্মরণ করা যেতে পারে। এই মনোভাবটি ১৮৬২ সালে মিঃ হোরেস গ্রিলি এবং রাষ্ট্রপতি লিঙ্কনের মধ্যে যে পত্রাচার হয় তার দ্বারা পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত হয়েছে। 'দ্য প্রেয়ার অব টোয়েন্টি মিলিয়ন্স' (The Prayer of Twenty Millions) শীর্ষক এক চিঠি যা রাষ্ট্রপতিকে লেখা হয়েছিল, তাতে মিঃ গ্রিলি বলেছিলেন—

'মিঃ প্রেসিডেন্ট, এই পৃথিবীতে এমন একজনও নিঃস্বার্থ, কৃতসংকল্প, বুদ্ধিমান ইউনিয়নের সমর্থক নেই যে অনুভব করে না যে, বিদ্রোহকে সংহত করার জন্য সমস্ত প্রচেষ্টা এবং তার সঙ্গে বিদ্রোহকে উস্কানি দেওয়ার কারণটিকে অনুমোদন করা অযৌক্তিক এবং নিষ্ফল বা ব্যর্থ।'

এই চিঠির উত্তরে রাষ্ট্রপতি লিঙ্কনের জবাব ছিল—

'যদি এমন লোক থাকেন যাঁরা দাসত্ব প্রথাকে না বাঁচাতে পারলে ইউনিয়নকে বাঁচাবেন না, আমি তাঁদের সঙ্গে একমত নই।'

'যদি এমন লোক থাকেন, যাঁরা দাসত্ব প্রথাকে ধ্বংস করা না হলে ইউনিয়নকে বাঁচাবেন না, আমি তাঁদের সঙ্গে একমত নই।'

'আমার প্রধানতম উদ্দেশ্য হল ইউনিয়নকে রক্ষা করা; দাসত্বকে রক্ষা করা বা ধ্বংস করা নয়।'

'যদি একজনও ক্রীতদাসকে মুক্ত না করে আমি ইউনিয়নকে রক্ষা করতে পারি, আমি তাই করব। আমি যদি সমস্ত ক্রীতদাসকে মুক্ত করে ইউনিয়নকে রক্ষা করতে পারি, আমি তাই করব—এবং যদি আমি কিছুকে মুক্ত করে এবং অন্যকে ছেড়ে দিয়েও ইউনিয়নকে রক্ষা করতে পারি—আমি তাও করব।'

এই ছিল নিগ্রো দাসত্ব এবং ইউনিয়ন বা রাষ্ট্রের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক ব্যাপারে রাষ্ট্রপতি লিঙ্কনের অভিমত বা দৃষ্টিভঙ্গি। এগুলি নিশ্চয়াত্মক ভাবে একজন ব্যক্তি, যিনি নিগ্রোদের উদ্ধারকর্তা বলে প্রসিদ্ধ, তাঁর প্রতি অন্যরকম ভাবে আলোকপাত করে। বাস্তবিক ক্ষেত্রে তিনি নিগ্রোদের দাসত্ব থেকে মুক্তিকে চরম অনুজ্ঞাসূচক প্রয়োজনীয় বলে স্বীকার করতেন না। স্বভাবতই প্রসিদ্ধ সেই (Gettysberg) গেটিশবার্গ বক্তৃতার, যাতে সরকারকে 'জনতার সরকার, জনতার দ্বারা সরকার, এবং জনতার জন্যই সরকার' বলা হয়েছিল। রচনাকার কিছু মনে করতেন না, যদি

তাঁর বক্তব্যটি এরূপ আকৃতি ধারণ করত যে, সরকার হল যে শাদা লোকের দ্বারা কালো জনতার শাসন, এবং সরকার শাদা লোকের জন্য, যদি রাষ্ট্র (Union) বেঁচে থাকে। 'স্বরাজ এবং অস্পৃশ্য'র প্রতি শ্রী গান্ধীর দৃষ্টিভঙ্গি বা মনোভাব ঠিক রাষ্ট্রপতি লিঙ্কনের 'নিগ্রো এবং ইউনিয়ন' প্রশ্নের প্রতি মনোভাবের সঙ্গে সাদৃশ্য যুক্ত। রাষ্ট্রপতি লিঙ্কন যেমন রাষ্ট্রকে চাইতেন, শ্রী গান্ধীও তেমনি 'স্বরাজ' চাইতেন। কিন্তু তিনি, অস্পৃশ্যদের রাজনৈতিক দাসত্ব মুক্তির নামে হিন্দুত্বের পরিকাঠামোটিকে চূর্ণবিচূর্ণ করে স্বরাজ চাইতেন না, যেমন রাষ্ট্রপতি লিঙ্কন দাসদের মুক্তি চাইতেন না যদি রাষ্ট্রের খাতিরে তার প্রয়োজন না হত। শ্রী গান্ধী এবং রাষ্ট্রপতি লিঙ্কনের মধ্যে এই পার্থক্যটুকু নিশ্চিতভাবে ছিল। রাষ্ট্রপতি লিঙ্কন নিগ্রোদের দাসত্ব থেকে মুক্তি দিতে চাইতেন, যদি তা রাষ্ট্রের ঐক্যরক্ষার জন্য প্রয়োজন ছিল। কিন্তু শ্রী গান্ধীর মনোভাব এর সম্পূর্ণ বিপরীত। তিনি অস্পৃশ্যদের রাজনৈতিক দাসত্ব থেকে মুক্তির জন্য মোটেই প্রস্তুত নন, যদিও তা স্বরাজ প্রাপ্তির জন্য অত্যাবশ্যক ছিল। শ্রী গান্ধীর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল যে, 'যদি অস্পৃশ্যদের রাজনৈতিক স্বাধীনতার মূল্যে স্বরাজ আসে তবে তেমন স্বরাজ নষ্ট হোক।'

কিছু অস্পৃশ্য ব্যক্তি সম্ভবত ভাবছেন বা এরূপ প্রভাবগ্রস্ত যে, এ সমস্তই অতীতের ঘটনা। এবং যেহেতু শ্রী গান্ধী 'পুনা চুক্তি'কে সমর্থন করেছেন তাই 'পুনা চুক্তি'র পক্ষ হিসাবে অস্পৃশ্যদের দাবির বিরোধিতা করবেন না, কারণ শ্রী গান্ধী এটা মেনে নিয়েছেন বলে প্রতীয়মান যে, অস্পৃশ্যগণ ভারতের জাতীয় জীবনে একটি পৃথক বা আলাদা অংশ। এটা সম্পূর্ণ ভুল বুঝাবুঝি। কারণ, এটা বিশ্বাস করার ভিত্তি আছে যে 'পুনা চুক্তি' শ্রী গান্ধীর দৃষ্টিভঙ্গিতে কোনও পার্থক্য আনেনি, এবং তিনি অস্পৃশ্যদের প্রতি সেইরকমই মনোবৃত্তি পোষণ করেন, বিশেষত তাদের রাজনৈতিক সুরক্ষার দাবির ব্যাপারে যেমন 'গোল টেবিল বৈঠকে' এবং 'পুনা চুক্তি'র আগে করতেন। এই কারণগুলির ভিত্তি এই ঘটনার উপরে স্থাপিত যে, যখন মহামান্য সরকার ১৯৪০ সালে ঘোষণা করলেন যে, অস্পৃশ্যরা ভারতের জাতীয় জীবনে একটি আলাদা অংশ, এবং ভারতের সংবিধানের ব্যাপারে তাদের সম্মতির প্রয়োজন, শ্রী গান্ধী প্রতিবাদ করে বাইরে চলে এসেছিলেন। যখন ভাইসরয় লর্ড লিন্‌লিথগো অস্পৃশ্যদের একটি পৃথক তত্ত্ব হিসাবে তাদের সম্মতির প্রয়োজনের কথা বলেন, শ্রী গান্ধী বলেন—

'আমি মনে করি যে, প্রথমে ভাইসরয়, পরে ভারত-সচিব দ্বারা কংগ্রেসের সঙ্গে রাজন্যবর্গের, মুসলিম লীগের, এবং এমনকী তফসিলিদের ঐক্যমত্যের অভাবের কথাটিকে, ভারতের স্বাধীনতার অধিকারের ব্রিটিশ সরকারের সমর্থন বা মেনে নেওয়ার

পথে বাধাস্বরূপ উত্থাপিত করা, কংগ্রেস এবং ভারতীয় জনতার প্রতি অন্যায়ের থেকেও বেশি।'

* * * *

'এই মতবিরোধে বা তর্কের মধ্যে তফসিলি শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ব্রিটিশ সরকারের ব্যাপারটির অবাস্তবতা আরও দ্বিগুণভাবে অবাস্তব করে তুলেছে। তারা ভাল করেই জানে যে, এ ব্যাপারগুলি কংগ্রেসের বিশেষ দুশ্চিন্তা বা উদ্বেগ, এবং কংগ্রেস ব্রিটিশ সরকারের অপেক্ষা বেশি তাদের স্বার্থ সুরক্ষিত রাখতে সক্ষম। অধিকন্তু, এই তফসিলি শ্রেণী হিন্দু সমাজের জাতির মতোই অনেক জাতিতে বিভক্ত। কোনও তফসিলি শ্রেণীর সদস্যই সম্ভবত এবং সত্যনিষ্ঠ ভাবে অসংখ্য জাতির প্রতিনিধিত্ব করতে পারবে না।'

শ্রী গান্ধীর দ্বারা এইরকম তর্ক বা বিচার পেশ করা অত্যন্ত শিশুসুলভ। এটা নির্দেশ করা যেতে পারে যে, ভাইসরয় দ্বারা তফসিলিদের অবস্থানটির নির্দেশের প্রতিবাদ করার জন্য তাড়াতাড়িতে শ্রী গান্ধী ভুলে গিয়েছিলেন যে, তফসিলি জাত যদি নানা জাতে বিভক্ত হয় এবং কোনও একটি জাত তাদের প্রতিনিধিত্ব করতে পারবে না, তা হলে মুসলমান এবং ভারতীয় ক্রীস্টানদের ব্যাপারও কোনও ভাবেই পৃথক নয়। মুসলমানরা তিনটি দলে বিভক্ত (১) সুন্নী, (২) শিয়া এবং (৩) মোমিন, এবং প্রত্যেক দলের মধ্যেই আবার অনেক উপজাত আছে যারা পরস্পর একসঙ্গে ভোজন করলেও পরস্পর বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হয় না। ভারতীয় ক্রীস্টানরাও (১) ক্যাথলিক এবং (২) প্রোটেস্ট্যান্ট-এই দুই ভাগে বিভক্ত। ক্যাথলিকরা আবার দুই ভাগে বিভক্ত — (১) কাস্ট-ক্রিস্টান এবং (২) নন্-কাস্ট-ক্রিস্টান। ক্যাথলিক এবং প্রেটেস্ট্যান্ট দুই দলের মধ্যেই জাতভেদ আছে যারা একে অপরের সঙ্গে বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হয় না। এই কাস্ট-ক্রিস্টান এবং ননকাস্ট-ক্রিস্টানরা একসঙ্গে ভোজন করে না এবং এক চার্চে যায় না। এটা এই প্রমাণ করে যে, শ্রী গান্ধী, নিজে 'পুনা চুক্তি'তে পক্ষ হওয়া সত্ত্বেও, অনুসূচিত জাতির একটি পৃথক তত্ত্বের মর্যাদা পাওয়াকে অনুমোদন করবেন না এবং তিনি তাঁর বিরোধিতার মনোভাবকে যথার্থ প্রমাণ করার জন্য যে-কোনও রকম বেপরোয়া তর্কের অবতারণা করতে রাজি।

সংক্ষেপে বলতে গেলে, অস্পৃশ্যদের সম্পর্কে শ্রী গান্ধী এখনও যুদ্ধের পথে অবতীর্ণ। তিনি হয়তো আবার ঝঞ্ঝাটে ফেলার চেষ্টা করবেন। তাঁকে বিশ্বাস করার সময় এখনও আসেনি। অস্পৃশ্যদের এখনও বিশ্বাস করা উচিত যে, যদি তারা তাদের সুরক্ষা চায়, তাহলে তারা এখনও বলুক —

'শ্রী গান্ধী থেকে সাবধান।'

অধ্যায় ১১

গান্ধীবাদ

অস্পৃশ্যদের নিয়তি বা শেষ বিচার

অধুনা যখন-ই ভারতীয়েরা ভারতের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের কথা বলে, তখন তারা এইসব শব্দগুচ্ছ ব্যবহার করে বলে, যেমন ব্যক্তিবাদ বনাম সংগঠনবাদ, পুঁজিবাদ বনাম সমাজবাদ, সংরক্ষণবাদ বনাম মৌলিকতাবাদ ইত্যাদি। কিন্তু আজকাল ভারতের দিগন্তে একটি নতুন 'বাদ' এসেছে। এটিকে বলা হয় 'গান্ধীবাদ'। এটা সত্যি যে, খুব-ই সাম্প্রতিক কালে শ্রী গান্ধী, 'গান্ধীবাদ' বলে কিছু আছে বলে অস্বীকার করেছেন। এই অস্বীকার যা শ্রী গান্ধী দেখান, 'যথারীতি বিনয়' ছাড়া আর কিছুই নয়। এটা 'গান্ধীবাদ'-এর অস্তিত্বকে অপ্রমাণ করে না। অনেক বই 'গান্ধীবাদ' শিরোনামে শ্রী গান্ধীর প্রতিবাদ ছাড়াই প্রকাশিত হয়েছে। এটা ভারতের ভিতরে এবং বাইরে কিছু লোকের চিন্তাকে স্পর্শ করেছে। কিছু লোকের তো এতে এমন শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস আছে যে, তাঁরা এটিকে মার্কস্‌বাদের বিকল্প বলতেও ইতস্তত করেন না।

এই গান্ধীবাদের অনুগামীরা, যাঁরা এর পূর্ববর্তী পৃষ্ঠায় যা বলা হয়েছে সেগুলি পড়েছেন, প্রশ্ন করতে পারেন, শ্রী গান্ধী হয়তো এমন কিছু করেননি যা অস্পৃশ্যরা তাঁর কাছ থেকে আশা করেছিলেন; কিন্তু 'গান্ধীবাদ' কি অস্পৃশ্যদের কোনও আশাই দেয়নি? গান্ধীবাদের অনুগামীরা আমাকে হয়তো দোষারোপ করবেন এইজন্য যে, আমি শ্রী গান্ধীর অস্পৃশ্যদের মঙ্গলের জন্য যে ছোট সংক্ষিপ্ত, ধীরগতিসম্পন্ন এবং সবিরাম পদক্ষেপগুলির কথাই শুধু বলেছি এবং তাঁর দ্বারা নিয়মানুযায়ী বিবৃত নীতিগুলির সম্ভাব্য দীর্ঘতার কথা ভুলে গেছি। আমি এটা স্বীকার করতে প্রস্তুত যে, কোনও ব্যক্তির পক্ষে কখনও কখনও এরকম হয় যে, যিনি একটি দীর্ঘ নীতি বিবৃত করেন, ছোট মাত্র পদক্ষেপ করেন এবং তাঁকে মাফ করে দেওয়া যায় এই আশায় যে, একদিন ওই নীতি বা তত্ত্বটির তার নিজস্ব সক্রিয় শক্তিই একদিন দীর্ঘ পদক্ষেপ নিতে বাধ্য করবে এবং সেই সমস্ত পরিত্যক্ত বিষয়গুলিকে অন্তর্ভুক্ত করবে। 'গান্ধীবাদ' সত্যি-সত্যিই একটি কৌতূহল-উদ্দীপক অধ্যয়নের বিষয়। কিন্তু শ্রী গান্ধীকে আলোচনা করার পরে 'গান্ধীবাদ' আলোচনা করা একটি ক্লান্তিকর কাজ হতে বাধ্য

এবং সেইজন্যই আমার প্রথম প্রতিক্রিয়া ছিল 'গান্ধীবাদ এবং অস্পৃশ্যরা' এই তত্ত্বকে ছেড়ে দেওয়া। তবুও আমি এ-ব্যাপারে নিরপেক্ষ থাকতে পারি না, কারণ এই বিষয়টি আলোচনা করতে বিচ্যুতি অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের হবে। কারণ গান্ধীর অনুগামীরা আমার শ্রী গান্ধীকে এইভাবে উন্মোচন সত্ত্বেও এটার সুযোগ নেবে এবং এই বলে উপদেশ বিলাবে যে, যদি শ্রী গান্ধী অস্পৃশ্যদের সমস্যার সমাধান করতে পারেননি, তবুও অস্পৃশ্যরা গান্ধীবাদের মধ্য দিয়েই তাদের মুক্তি খুঁজে পাবে। সেইজন্য আমি এরকম প্রচারের কোনও সুবিধা দিতে চাই না বলে আমি আমার প্রাথমিক অনিচ্ছাকে দমন করতে পেরেছি এবং গান্ধীবাদের আলোচনায় নিজেকে নিযুক্ত করছি।

II

'গান্ধীবাদ' কী? এটা কিসের পক্ষ সমর্থন করে? অর্থনৈতিক সমস্যা সম্বন্ধে এটি কী শিক্ষা দেয়? সামাজিক সমস্যা সম্বন্ধে এটি কী বলে?

শুরুতেই এটা বলা দরকার, কিছু গান্ধী-অনুগামী গান্ধীবাদের ধারণাকে একটা বিস্ময়কর কিছু কল্পনা করে নিয়েছে, যা নির্ভেজাল কাল্পনিক। এই ধারণা অনুসারে গান্ধীবাদের অর্থ গ্রামে ফিরে যাওয়া এবং গ্রামকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে তোলা। এটা গান্ধীবাদকে একটি আঞ্চলিকতাবাদের বিষয়ে পরিণত করে। আমি নিশ্চিত যে, গান্ধীবাদ না এত সরল, না আঞ্চলিকতার মতো নিরীহ বা নির্দোষ। গান্ধীবাদের বিষয়বস্তু আঞ্চলিকতাবাদের চেয়ে অনেক বড় এবং ব্যাপক। আঞ্চলিকতাবাদ এর একটি অতি ক্ষুদ্র নগণ্য অংশ মাত্র। এটার একটি সামাজিক দর্শন ও একটি অর্থনৈতিক দর্শন আছে। গান্ধীবাদের এই অর্থনৈতিক এবং সামাজিক দর্শনকে হিসাবের মধ্যে না নিয়ে বাদ দেওয়া গান্ধীবাদের একটি মিথ্যা ছবির স্বেচ্ছাকৃত প্রদর্শন হবে। সর্বপ্রথম এবং সর্বাগ্রে প্রয়োজনীয় হল গান্ধীবাদের একটি প্রকৃত সত্য আলেখ্য উপস্থাপিত করা।

সামাজিক সমস্যার ওপর শ্রী গান্ধীর উপদেশ দিয়ে শুরু করা যাক। জাতপ্রথার ওপর শ্রী গান্ধীর দৃষ্টিভঙ্গি, যা ভারতে প্রধান সামাজিক সমস্যাগুলি গঠন করে, ১৯২১-২২ সালে একটি গুজরাটি পত্রিকা 'নবজীবন'-এ তাঁর দ্বারা বিশেষভাবে সম্প্রসারিত হয়েছিল। এই প্রবন্ধটি[১] গুজরাটিতে লেখা হয়েছিল। আমি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির যতদূর সম্ভব তাঁর ভাষার কাছাকাছি একটি ইংরেজি অনুবাদ নিচে দিচ্ছি। শ্রী গান্ধী বলছেন—

---

১. এটি 'গান্ধী শিক্ষণ' খণ্ড ২, ১৮-এ পুনর্মুদ্রিত হয়েছে।

'১. আমি বিশ্বাস করি যে, হিন্দু সমাজ দাঁড়িয়ে থাকতে সক্ষম হয়েছে, এর কারণ এই সমাজ জাতপ্রথার ওপর প্রতিষ্ঠিত।'

'২. স্বরাজের বীজগুলি জাতপ্রথার মধ্যেই খুঁজে পাওয়া যাবে।' বিভিন্ন জাত হচ্ছে একটি মিলিটারি ডিভিশনের বিভিন্ন বিভাগের মতো। প্রত্যেক বিভাগ ডিভিশনের ভালর জন্য কাজ করছে।'

'৩. একটি সম্প্রদায়, যা জাতপ্রথা সৃষ্টি করতে পারে, 'তা অনুপম সাংগঠনিক শক্তি ধারণ করে' বলা যেতে পারে।

'৪. জাত প্রথার মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষার প্রসারের একটি তৈরি অবস্থাতেই কিনিতে পারা যায় এমন ব্যবস্থা আছে। প্রত্যেক জাতই তাদের নিজের জাতের ছেলেমেয়ের শিক্ষার দায়িত্ব নিতে পারে। জাতের একটি রাজনৈতিক বুনিয়াদ বা মূল উপাদান আছে। এটি একটি প্রতিনিধিত্বমূলক দল গঠনের জন্য নির্বাচক-মণ্ডলীর মতো কাজ করতে পারে। জাতপ্রথা বিচার বিভাগীয় কাজও করতে পারে, বিচারক হিসাবে কাজ করার জন্য এবং বিরোধ মেটানোর জন্য ব্যক্তির নির্বাচন করে, নিজের জাতের মধ্য থেকে। জাত প্রথার দ্বারা প্রতিরক্ষা বাহিনী তৈরি করা খুব-ই সহজ হয়, যদি প্রত্যেক জাতকে সেনাবাহিনীর (Brigade) এক বৃহদংশ গঠন করতে দেওয়া হয়।

'৫. আমি বিশ্বাস করি যে 'জাতীয় ঐক্য' প্রচলিত করার জন্য আন্ত-র্জাতীয় ভোজন বা অসবর্ণ বিবাহের প্রয়োজন নাই। একসঙ্গে 'এক পঙক্তিতে ভোজন বন্ধুত্ব সৃষ্টি করে' এই ধারণা কিন্তু অভিজ্ঞতার বিপরীত। এটা যদি সত্যি হত, তাহলে ইউরোপে যুদ্ধ হত না। খাওয়াটাও মলমূত্র ত্যাগের মতো নোংরা কাজ। কেবলমাত্র এইটুকু তফাত যে, মলমূত্র ত্যাগ করে আমরা শান্তি বা স্বস্তি পাই, কিন্তু খাবার পর আমাদের অস্বস্তি হয়। আমরা মলমূত্র ত্যাগ যেমন নিরালায় করি, তেমনই খাবার খাওয়ার কাজটিও নিরালায় করা উচিত।

'৬. ভারতবর্ষে ভাইদের সন্তান-সন্ততির মধ্যে অনুলোম বিবাহ হয় না। তারা অনুলোম করে না বলে কি তারা একে অপরকে ভালবাসে না? বৈষ্ণবদের মধ্যে অনেক স্ত্রীলোক এমন গোঁড়া যে তারা পরিবারের অন্য সদস্যের সঙ্গে খাবে না, এমনকী তারা এক সাধারণ জলপাত্র থেকে জলও খাবে না। তা বলে কি তাদের ভালবাসা নেই? যেহেতু জাতপ্রথা একসঙ্গে ভোজন এবং অনুলোম বিবাহের অনুমতি দেয় না, সেইজন্য জাতপ্রথাকে খারাপ বলা যেতে পারে না।

'৭. নিয়ন্ত্রণের আর-এক নাম জাতপ্রথা। জাত আনন্দ উপভোগের সীমারেখা

বেঁধে দেয়। জাত কোনও ব্যক্তিকে তার উপভোগের জন্য জাতের সীমারেখাকে অতিক্রম করতে দেয় না। এই হল জাতপ্রথার নিষেধগুলি, যেমন এক পঙক্তিতে ভোজন বা আন্তর্বিবাহ, প্রকৃত অর্থ।

'৮. এই জাতপ্রথার বিলোপ সাধন এবং পশ্চিমী ইউরোপীয় সামাজিক প্রথা গ্রহণ করার অর্থ এই হবে যে, হিন্দুরা তাদের জাতপ্রথার আত্মাস্বরূপ যে বংশগত জীবনধারণের বৃত্তিকে ছেড়ে দেবে। বংশপরম্পরাগত নীতি একটি চিরন্তন নীতি। এর পরিবর্তন-এব অর্থ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা। আমার ব্রাহ্মণের কোনও প্রয়োজন নেই, যদি আম তাকে সারা জীবন ব্রাহ্মণ বলতে না পারি। যদি প্রতিদিন একজন ব্রাহ্মণের শূদ্রে পরিবর্তন হয়, এবং একজন শূদ্রের ব্রাহ্মণে পরিবর্তন হয়, তাহলে এটি একটি অত্যন্ত বিশৃঙ্খল অবস্থা হবে।

'৯. জাতপ্রথা সমাজের একটি প্রাকৃতিক রীতি। ভারতবর্ষে এটিকে একটি ধর্মীয় আবরণ দেওয়া হয়েছে। অন্য দেশে এই জাতপ্রথার উপযোগিতা বুঝতে পারেনি বলে এটি অত্যন্ত ঢিলেঢালা অবস্থায় বর্তমান, এবং ফলস্বরূপ অন্য দেশগুলি জাতপ্রথার সুযোগ-সুবিধা, ভারতের মতো পায়নি।

'আমার এই দৃষ্টিভঙ্গির জন্য, যারা এই জাতপ্রথাকে বিলোপ করতে চায়, আমি তাদের সকলের বিরুদ্ধে।'

১৯২২ সালে শ্রী গান্ধী জাতপ্রথার সমর্থক ছিলেন। এই অন্বেষণ চালাতে গিয়ে, যে কোনও ব্যক্তি ৩রা ফেব্রুয়ারি ১৯২৫ সালে শ্রী গান্ধীর জাতপ্রথার ওপর একটি সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি দেখতে পাবেন। ১৯২৫ সালে শ্রী গান্ধী বলেছিলেন—

'আমি জাতপ্রথাকে সমর্থন করেছিলাম, কারণ এটির অর্থ ছিল সংযম বা নিয়ন্ত্রণ। কিন্তু বর্তমানে জাতপ্রথার অর্থ নিয়ন্ত্রণ বা সংযম নয়, এখন এটির অর্থ সীমাবদ্ধকরণ। সংযম বা নিয়ন্ত্রণ হল মহিমান্বিত, উজ্জ্বল এবং তা স্বাধীনতা লাভে সাহায্য করে। কিন্তু সীমিতকরণ শৃঙ্খলের মতো। এটি বেঁধে ফেলে। এই জাতপ্রথা, আজকে যেমন আছে, এতে কোনও কিছুই প্রশংসনীয় নেই। এই প্রথাগুলি শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্তের বিপরীত। এই জাতের সংখ্যা অসীম এবং আন্ত-র্বিবাহে বাধা দেওয়া হয়েছে। এটি উন্নতির শর্ত নয়। এটি পতনের অবস্থা।'

'তাহলে উপায় কী!' এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রী গান্ধী বললেন—

'সর্বোত্তম প্রতিবিধানের উপায় হল যে, ছোট ছোট জাতগুলির তাদের নিজেদের

মিলিয়ে একটি বড় জাত তৈরি করা উচিত। এইভাবে চারটি বড় জাতি তৈরি হবে যার দ্বারা আমরা সেই চার বর্ণের পুরানো প্রথাকে পুনরুৎপাদন করতে পারি।'

সংক্ষেপে, ইং ১৯২৫ সালে শ্রী গান্ধী বর্ণপ্রথার সমর্থক ছিলেন।

পুরাতন বর্ণপ্রথা, যা প্রাচীন ভারতে প্রচলিত ছিল, সমাজকে চারটি সম্প্রদায় বা আশ্রমে বিভক্ত করেছিল : (১) ব্রাহ্মণ, যাদের পেশা বা কাজ ছিল শিক্ষা; (২) ক্ষত্রিয়, যাদের পেশা ছিল যুদ্ধবিদ্যা; (৩) বৈশ্য, যাদের পেশা ছিল ব্যবসা-বাণিজ্য এবং (৪) শূদ্র, যাদের পেশা ছিল অন্য বর্গের লোকেদের সেবা। শ্রী গান্ধীর বর্ণ-প্রথা কি গোঁড়া হিন্দুদের সেই পুরাতন বর্ণপ্রথার মতোই? শ্রী গান্ধী তাঁর বর্ণপ্রথা নিম্নলিখিত ভাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন।[১]

'১. আমি বিশ্বাস করি যে বর্ণের বিভাগ জন্মের ওপর ভিত্তি করে স্থাপিত।

'২. বর্ণপ্রথায় এমন কিছুই নেই যা শূদ্রদের সৈন্যদলের আক্রমণ ও প্রতিরোধের কলা বিদ্যার অর্জন শিক্ষা বা অধ্যয়নের পথে বাধাস্বরূপ হয়ে দাঁড়াতে পারে। বিপরীত ভাবে একজন ক্ষত্রিয়ের জন্যও সেবার কাজ খোলা আছে। বর্ণপ্রথা তার জন্য কোনও বাধা নয়। যা এই বর্ণপ্রথা সংযোজন করে তা হল যে, একজন শূদ্র অধ্যয়নকে বা শিক্ষাগ্রহণকে তার জীবিকা উপার্জনের উপায় বলে গ্রহণ করতে পারবে না। না কি একজন ক্ষত্রিয়ও সেবাকে তার জীবিকা অর্জনের উপায় বলে গ্রহণ করবে না। সেইরূপ ভাবেই একজন ব্রাহ্মণ যুদ্ধ বা ব্যবসায়ের কলা নৈপুণ্য শিখতে পারবে। কিন্তু সে সেগুলিকে জীবিকা অর্জনের উপায় বলে গ্রহণ করতে পারবে না। বিপরীত ভাবেও একজন বৈশ্য যুদ্ধবিদ্যা শিখতে অথবা অভ্যাস করতে পারবে। কিন্তু সেগুলিকে সে জীবিকা করবে না।

'৩. এই 'বর্ণপ্রথা' জীবিকা অর্জনের উপায়ের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। কোনও এক বর্ণের ব্যক্তির পক্ষে অন্য বর্ণের ব্যক্তি যে সমস্ত বিষয়ে যেমন জ্ঞান, বিজ্ঞান বা কলা, বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হয়েছে, তা অর্জন বা সংগ্রহ করায় কোনও দোষ নেই। কিন্তু যতদূর পর্যন্ত জীবিকা অর্জনের ব্যাপারটি সম্পর্কযুক্ত, সে অবশ্যই তার নিজস্ব বর্ণের পেশাটিই অবলম্বন করবে। তার অর্থ এই যে, সে তার পূর্বপুরুষের বংশগত পেশাটিই অবলম্বন করবে।

'৪. এই বর্ণপ্রথার উদ্দেশ্য হল প্রতিযোগিতা, শ্রেণীদ্বন্দ্ব এবং শ্রেণীর যুদ্ধকে

---

১. এই উদ্ধৃতাংশটি শ্রী গান্ধীর একটি প্রবন্ধ থেকে নেওয়া হয়েছে এবং এটি 'বর্ণ-ব্যবস্থা' নামক একটি পুস্তিকায় পুনর্মুদ্রিত হয়েছে—এই পুস্তিকায় শ্রী গান্ধীর রচনাগুলি গুজরাটি ভাষায় লেখা হয়েছিল।

ব্যাহত করা। আমি বর্ণ বিভাগে বিশ্বাস করি, কারণ এটি ব্যক্তিবর্গের কর্ম এবং কর্তব্যকে ধার্য করে।

'৫. বর্ণের অর্থ হল একজন ব্যক্তির জন্মের পূর্ব থেকেই তার পেশার নির্ধারণ।

'৬. এই বর্ণপ্রথায় কোনও ব্যক্তির পেশা পছন্দ করার স্বাধীনতা নেই। তার পেশা তার বংশপরম্পরাক্রমে নির্ধারিত।

এখন অর্থনৈতিক জীবনের ক্ষেত্রের দিকে ফিরলে দেখা যায় যে, শ্রী গান্ধী দুটি আদর্শগত ভাবনার পক্ষে :

এগুলির মধ্যে একটি হল যন্ত্রের বিরোধিতা। ১৯২১ সালের গোড়ার দিকে শ্রী গান্ধী তাঁর যন্ত্রের প্রতি অপছন্দের ব্যাপারটি প্রকাশ করেছিলেন। গত ১৯শে জানুয়ারি ১৯২১-এর 'ইয়ং ইণ্ডিয়া'-তে লিখতে গিয়ে শ্রী গান্ধী বললেন—

'আমি কি উন্নতির ঘড়ির কাঁটাকে পিছনের দিকে ঘোরাতে চাই? আমি কি কারখানাগুলিকে হাত-চরকা এবং হস্তচালিত তাঁত দিয়ে প্রতিস্থাপন করতে চাই? আমি কি রেলগাড়ির পরিবর্তে গরুর গাড়ি প্রতিস্থাপন করতে চাই? আমি কি মেশিনারি বা যন্ত্রপাতিকে একেবারে ধ্বংস করতে চাই? কিছু সাংবাদিক এবং কিছু ব্যক্তি আমাকে এই প্রশ্নগুলি করেছেন। আমার উত্তর হল—আমি কল-কারখানা বা যন্ত্রপাতির উধাও হওয়াতে চোখের জল ফেলব না বা কাঁদব না অথবা আমি এটিকে চরম দুর্দশা বলেও বিবেচনা করব না।'

যন্ত্রের ওপর তাঁর বিরোধিতা ভালভাবে প্রমাণিত হয়েছে তাঁর 'চরকা'কে (সুতো কাটার চাকা) পূজার মূর্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠা করায় এবং হাতে সুতা কাটা এবং হাত দিয়ে কাপড় বোনার জন্য জেদাজিদির দ্বারা। তাঁর এই মেশিনের প্রতি বিরোধিতা এবং চরকার প্রতি তাঁর আগ্রহ কোনও আকস্মিক ঘটনার ব্যাপার নয়। এটা একটি দর্শনের ব্যাপার। এই দর্শনটি প্রচার করতে শ্রী গান্ধী একটি বিশেষ অনুষ্ঠানকে বেছে নেন এবং তিনি তা ৮ই জানুয়ারি ১৯২৫-এ অনুষ্ঠিত কাথিয়াওয়াড় রাজনৈতিক সম্মেলনে তাঁর সভাপতির ভাষণে বিবেচনার জন্য উপস্থাপিত করেছিলেন। শ্রী গান্ধী বলেছিলেন—

'রাষ্ট্রগুলি এই প্রাণহীন যন্ত্র, যা অন্তহীন সীমা পর্যন্ত গুণিতকে বেড়ে চলেছে, এর পূজা করতে করতে ক্লান্ত। আমরা তুলনাহীন জীবন্ত যন্ত্রগুলিকে নষ্ট করে ফেলছি ; তা হল আমাদের এই শরীর, যাকে অকেজো করে মরচে ধরতে দিচ্ছি এবং তার পরিবর্ত হিসাবে এই প্রাণহীন যন্ত্রগুলি ব্যবহার করছি। এটি হল ভগবানের

নিয়ম যে শরীরকে পূর্ণভাবে কাজ করাতে হবে এবং এর সদ্ব্যবহার করতে হবে। আমাদের এই ব্যাপারটিকে উপেক্ষা করা চলে না। এই 'চরকা' স্পিনিং উইল শরীর যজ্ঞের শারীরিক শ্রমের—মঙ্গলজনক প্রতীক-স্বরূপ। যে এই বলি প্রদান না করে (অর্থাৎ শ্রম না করে) খাদ্য খায়, সে চুরি করে। এই বলিদান (শ্রমদান) পরিত্যাগ করে আমরা দেশের কাছে বিশ্বাসঘাতক বা রাষ্ট্রদ্রোহী হয়েছি, এবং সৌভাগ্যের দেবতা (মা লক্ষ্মী)-র মুখের উপর দরজা বন্ধ করে দিয়েছি।'

যে-কোনও ব্যক্তি যিনি শ্রী গান্ধীর 'হিন্দ স্বরাজ' (Indian Home Rule) নামক পুস্তিকাটি পড়েছেন, জানতে পারবেন যে শ্রী গান্ধী আধুনিক সভ্যতার বিরোধী। এই পুস্তিকাটি ১৯০৮ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। কিন্তু তাঁর ভাগবত কোনও পরিবর্তন হয়নি। ১৯২১ সালে লিখতে গিয়ে শ্রী গান্ধী বললেন[১]—

'এই পুস্তিকাটি 'আধুনিক সভ্যতার' কঠোর দোষারোপ।' এটি ১৯০৮ সালে লেখা হয়েছে। আমার প্রত্যয় এখন সব সময়ের চেয়ে আরও গভীর। আমি উপলব্ধি করি যে, যদি ভারত এই আধুনিক সভ্যতাকে অপ্রয়োজনীয় বলে ছুড়ে ফেলে দেয়, তাতে তার লাভই হবে।' শ্রী গান্ধীর দৃষ্টিতে[২]—

'পশ্চিমী সভ্যতা শয়তান দ্বারা সৃষ্ট।'

শ্রী গান্ধীর দ্বিতীয় আদর্শ হল শ্রেণী-যুদ্ধের দূরীকরণ এমনকী শ্রেণী সংঘর্ষের দূরীকরণ, নিযুক্তকারী (মালিক) এবং নিযুক্ত (শ্রমিক) ব্যক্তির মধ্যে সম্পর্কের ব্যাপারে এবং ভূস্বামী এবং প্রজার মধ্যেও। এই মালিক-শ্রমিক সম্পর্কের ব্যাপারে শ্রী গান্ধীর দৃষ্টিভঙ্গি 'নবজীবন' পত্রিকার ৮ই জুন ১৯২১-এ প্রকাশিত এই বিষয়ের উপর একটি প্রবন্ধে বিশেষভাবে সন্নিবিষ্ট। তার থেকেই নিম্নলিখিত বক্তব্যটি উদ্ধৃত করা হল—

'ভারতবর্ষের কাছে দুটি রাস্তা খোলা, হয় ভারত পশ্চিমী নীতি 'জোর যার মুলুক তার'-কে প্রচলন করুক অথবা প্রাচ্যের নীতিকে সমর্থন করুক, যা হল—যে 'সত্যই কেবল জয়ী হয়, সত্যের কোনও দুর্ঘটনা হয় না, সবল এবং দুর্বল সকলের-ই 'ন্যায়' প্রাপ্তির সমান অধিকার আছে। এ বিষয়ে পছন্দ করতে হলে সর্বাগ্রে শ্রমিক শ্রেণী দিয়ে শুরু করতে হবে। শ্রমিক শ্রেণী কি তাদের মজুরি বৃদ্ধি হিংস্রতার দ্বারা প্রাপ্ত হবে? যদিও সেটা সম্ভব হয়, যতই তাদের দাবি ন্যায্য হোক

১. 'ইয়ং ইন্ডিয়া', জানুয়ারি ২৬, ১৯২১

২. 'ধর্ম মন্থন', পৃ : ৬৫

না কেন, তারা হিংস্রতার আশ্রয় নিতে পারে না। যদিও অধিকার আদায়ের জন্য হিংস্রতা অবলম্বন সহজ উপায় বলে মনে হয়, তবুও এই পথ অবশেষে সমস্যাসঙ্কুল বা কন্টকাকীর্ণ বলে প্রমাণিত হয়। যারা তরবারিকে জীবিকা করে তারা তরবারির আঘাতেই মরে। সাঁতারু প্রায়ই ডুবে মরে। ইউরোপের দিকে তাকাও। সেখানে কেউ সুখী বলে মনে হয় না, কারণ কেউ-ই তৃপ্ত নয়। পুঁজিপতিকে শ্রমিকরা বিশ্বাস করে না, এবং পুঁজিপতির শ্রমিকদের ওপর কোনও আস্থা নেই। উভয় পক্ষেরই কর্মশক্তি ও সামর্থ্য আছে, কিন্তু ষাঁড়েরও তো শক্তি আছে। তারা অত্যন্ত খারাপ পরিসমাপ্তি পর্যন্ত লড়াই করে। সমস্ত প্রকার গতিকেই উন্নতি বলা যায় না। আমাদের বিশ্বাস করার কোনও কারণ নেই যে, ইউরোপের লোক উন্নতি করছে। তাদের ধনসম্পত্তির ভোগদখল প্রমাণ করে না যে তারা কোনও নৈতিক অথবা আধ্যাত্মিক গুণাবলী আয়ত্ত করেছে।

'তাহলে আমরা কী করব? বোম্বাই-এর শ্রমিকরা একটি সুন্দর উদাহরণ সৃষ্টি করল। আমি ঘটনার সমস্ত কিছু জানতাম না। কিন্তু এইটুকু জানতে পারলাম যে তারা আরও ভালভাবে লড়াই করতে পারত। কারখানা মালিক সম্পূর্ণ দোষ করতে পারে। এই পুঁজি এবং শ্রমের লড়াই-এ সাধারণত, এটাই বলা হয় যে পুঁজিপতিরা প্রায়শই ভুল করে থাকে। কিন্তু শ্রমিক যখন তার শক্তি সম্যকভাবে উপলব্ধি করে, আমি জানি যে তা পুঁজির থেকেও অত্যাচারী ও নিষ্ঠুর হয়ে পড়ে। কারখানা মালিকদের শ্রমিকের হুকুমে কাজ করতে হবে, যদি শ্রমিকরা মালিকদের বুদ্ধিমত্তাকে আকর্ষণ করতে পারে। কিন্তু এটা পরিষ্কার যে, শ্রমিক কখনও সেই বুদ্ধিমত্তা বা মেধা অর্জন করতে পারবে না। যদি সে তা পারে, তবে সে আর শ্রমিক থাকতে পারবে না এবং সে নিজেই মালিক (Master) বা প্রভু হয়ে যাবে। পুঁজিপতিরা কেবল অর্থের জোরেই লড়াই করে না। তারা বুদ্ধিমত্তা এবং কৌশলও আয়ত্তে করে।

এখন আমাদের সম্মুখে প্রশ্ন হল—যখন শ্রমিকেরা, তাদের বর্তমান অবস্থাতে থেকেই, একপ্রকার সচেতনতা জাগিয়ে তোলে, তাদের আচরণটি কেমন হওয়া উচিত? যদি শ্রমিকরা তাদের সংখ্যার শক্তি বা পাশবিক শক্তির ওপর নির্ভর করে; অর্থাৎ হিংস্রতার ওপর নির্ভর করে, তা হলে তা আত্মঘাতী হবে। এরূপ আচরণ করে তারা দেশের শিল্পেরই ক্ষতি করবে। কিন্তু যদি, বিপরীত ভাবে, তারা তাদের দাবি বা যুক্তিকে ন্যায়ের ওপর ভিত্তি করে এবং তা আদায়ের জন্য ব্যক্তিগতভাবে যন্ত্রণা ভোগ করে, তারা যে কেবল সর্বদা নিজেরাই সফলকাম হবে তাই নয়, তারা তাদের মালিকেরও সংস্কার করবে, শিল্পের সম্প্রসারণ করবে এবং মালিক ও শ্রমিক

উভয়েই এক-ই পরিবারের সদস্যরূপে পরিগণিত হবে।'

এক-ই বিষয়বস্তুর প্রসঙ্গে অন্য এক অনুষ্ঠানে শ্রী গান্ধী বললেন[১]—

'আগেও এটা অন্যরকম ছিল না। ভারতের ইতিহাসে পুঁজি এবং শ্রমের সম্পর্ক বিবর্ণ কলঙ্কিত নয়।'

বিশেষ করে শ্রমিকের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতির জন্য 'ধর্মঘট' শ্রমিকদের হাতে যে একটি অস্ত্র, তার উপর শ্রী গান্ধীর দৃষ্টিভঙ্গি উল্লেখযোগ্য। শ্রী গান্ধী বলেন[২]—

'সেইজন্য একটি বৃহৎ সফলীভূত ধর্মঘট পরিচালক হিসাবে বলতে গিয়ে, আমি সেই সাধারণ সত্য বাণী-রই পুনরুক্তি করব, যা এই পৃষ্ঠাগুলিতে বলা হয়েছে, যা সমস্ত ধর্মঘটের নেতাদের পথনির্দেশক হবে :

(১) বাস্তবিক দুঃখদায়ক অভিযোগ না থাকলে ধর্মঘট করা উচিত হবে না।

(২) যদি ধর্মঘটী শ্রমিকেরা নিজস্ব বাঁচানো অর্থ দিয়ে নিজেদের সাহায্য করতে সমর্থ না হয়, অথবা সাহায্য করবার জন্য কোনও অস্থায়ী কাজে যেমন, পেঁজ বানানো, সুতো কাটা, বা কাপড় বোনা ইত্যাদিতে নিযুক্ত হতে না পারে, তবে ধর্মঘট করা উচিত হবে না। ধর্মঘটীরা কখনওই জনসাধারণের চাঁদা বা অন্য দানের ওপর নির্ভর করবে না।

(৩) ধর্মঘটী শ্রমিকেরা ধর্মঘটে যাওয়ার পূর্বে একটি অপরিবর্তনীয় ন্যূনতম দাবি ঠিক করবে এবং তা ঘোষণা করবে।

কোনও ন্যায্য দাবি থাকা সত্ত্বেও এবং ধর্মঘটীদের অনির্দিষ্টকাল চালিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও একটি ধর্মঘট ফেল করতে পারে, বা অসফল হতে পারে, যদি তাদের বদলি নিযুক্ত করবার জন্য শ্রমিক পাওয়া যায়। একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তি, সেইজন্য তার বেতন বৃদ্ধি বা অন্য আরামের জন্য ধর্মঘট করবে না, যদি সে অনুভব করে যে তার পরিবর্তে সহজেই অন্য ব্যক্তি নিযুক্ত করা যাবে। কিন্তু একজন লোকহিতৈষী বা স্বদেশভক্ত ব্যক্তি চাহিদা অপেক্ষা জোগান বেশি হলেও ধর্মঘট করবে, যখন সে তার অন্তরে শ্রমিকদের দুঃখ অনুভব করবে এবং তার প্রতিবেশীর দুঃখের সঙ্গে নিজেকে জড়িত করতে চাইবে। একথা বলা অপ্রয়োজনীয়

১. 'ইয়ং ইন্ডিয়া', ফেব্রুয়ারি ২৩, ১৯২২
২. 'ইয়ং ইন্ডিয়া', ১১ আগস্ট, ১৯২১

যে, জন-সম্পর্কিত একটি ধর্মঘটে, যা আমি বর্ণনা করেছি, হিংসার, যেমন ভয় দেখিয়ে বাধ্য করা (Intimidation), অগ্নিসংযোগ করা ইত্যাদির কোনও স্থান নেই। আমার দেওয়া পরীক্ষাগুলির পরিপ্রেক্ষিতে এটা পরিষ্কার যে, ধর্মঘটী শ্রমিকের বন্ধুগণ কখনও তাদের কংগ্রেস তহবিল বা অন্য কোনও জনগণের তহবিল থেকে তাদের সাহায্য পাওয়ার জন্য দরখাস্ত করতে পরামর্শ দেবেন না। ধর্মঘটীদের প্রতি অন্যের সমর্থন বা সহানুভূতি ও সমবেদনা তখন-ই হ্রাস পায় যখন-ই তারা অর্থসাহায্য গ্রহণ করে। সহানুভূতি বা সমবেদনামূলক ধর্মঘটের প্রশংসনীয় উৎকর্ষ, সহানুভূতিসম্পন্ন ব্যক্তি বা সমব্যথীর অসুবিধা এবং ক্ষতি সহ্য করার মধ্যেই নিহিত।'

জমির মালিক এবং প্রজার সম্পর্কের ব্যাপারে শ্রী গান্ধীর দৃষ্টিভঙ্গি তাঁর দ্বারা ১৮ই মে ১৯২১-এর 'ইয়ং ইন্ডিয়া' পত্রিকায় তাঁর যুক্তপ্রদেশের প্রজাদের প্রতি উপদেশের রূপে সম্প্রসারিত হয়েছিল। শ্রী গান্ধী বলেছিলেন—

'একদিকে যখন যুক্তপ্রদেশের সরকার যোগ্যতা এবং ভদ্রতার সীমারেখা অতিক্রম করছে, এর লোককে জোর করে ভয় দেখিয়ে বাধ্য করছে, এ ব্যাপারে সন্দেহ নেই যে প্রজারাও তাদের নতুন করে খুঁজে পাওয়া শক্তির বুদ্ধিমানের মতো ব্যবহার করছে না। অনেক জমিদারিতে তারা তাদের গণ্ডি অতিক্রম করেছে, আইন তাদের নিজেদের হাতে তুলে নিয়েছে, এবং অন্য লোকের, যারা তাদের ইচ্ছামতো কাজ করতে রাজি নয়, তাদের প্রতি অধীর হয়ে উঠেছে। তারা সামাজিক বয়কটের অপব্যবহার করছে এবং এটিকে হিংসার যন্ত্রে পরিণত করছে। সংবাদে বলা হয়েছে যে, তারা জমিদারদের জল দেওয়া বন্ধ করেছে এবং মূল্য দিয়ে কেনা যায় এরকম পরিষেবা, যেমন নাপিত, ধোপা ইত্যাদি, বন্ধ করেছে এবং এমনকী জমির ভাড়া বা কর দেওয়াও স্থগিত করেছে। এই কিষান আন্দোলন অসহযোগ আন্দোলন থেকে প্রেরণা পেয়েছে কিন্তু এটি তার পূর্ববর্তী এবং তা থেকে স্বতন্ত্র। যখন সময় আসবে, ঠিক সেই সময়ে আমরা কিষানদের সরকারকে কর (Tax) না দিতে বলতে ইতস্তত করব না, এটা গভীরভাবে চিন্তা করে ঠিক করা হয়নি যে অসহযোগের যে কোনও পর্যায়ে আমরা জমিদারদের তাদের প্রাপ্য খাজনা থেকে বঞ্চিত করতে চাইব। এই কিষান আন্দোলনকে কিষানদের অবস্থার উন্নতির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে হবে এবং জমিদার ও কিষানদের মধ্যে সম্পর্কের উন্নতি করতে হবে। কিষানদের পরামর্শ দিতে হবে যাতে তারা জমিদারদের সঙ্গে চুক্তিগুলি যথাযথ ভাবে পালন করে, তা সেই চুক্তি লিখিত বা প্রথা থেকে অনুমিত নাই হোক না কেন যেখানে কোনও রীতি বা প্রথা (Custom) অথবা একটি লিখিত চুক্তি খারাপ, সেখানেও তারা সেই চুক্তির মূলোৎপাটন হিংসার দ্বারা অথবা জমিদারকে তার জন্য

অগ্রিম উল্লেখ না করে করবে না। প্রত্যেকটি মামলায় জমিদারের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ আলোচনা করা উচিত এবং প্রয়াস করা উচিত যাতে একটি মীমাংসায় পৌঁছনো যায়।'

শ্রী গান্ধী সম্পত্তি বা ধনবান শ্রেণীকে আঘাত করতে বা ব্যথা দিতে চান না। এমনকী তিনি তাদের বিরুদ্ধে প্রচার অভিযানেরও বিরোধী। অর্থনৈতিক সমতার জন্য তাঁর কোনও গভীর অনুরাগ নেই। এই ধনবান বা সম্পন্ন শ্রেণীর প্রসঙ্গে শ্রী গান্ধী সাম্প্রতিক কালে বলেছিলেন যে তিনি সোনার ডিম দেওয়া মুরগিটিকে নষ্ট করতে চান না। জমিদার এবং প্রজার মধ্যে, মালিক এবং শ্রমিকের মধ্যে, ধনী এবং গরীবের মধ্যে এবং নিয়োগকারী এবং কর্মচারীর মধ্যে যে অর্থনৈতিক বিবাদ, তার সমাধান তাঁর কাছে অত্যন্ত সরল। মালিকদের তাদের সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হওয়ার প্রয়োজন নেই। তাদের যা করা প্রয়োজন তা হল যে, তারা নিজেকে গরীবের ন্যাসরক্ষক বা অছি বলে ঘোষণা করবে। অবশ্যই এই ন্যাস বা স্বেচ্ছাকৃত হবে এবং কেবলমাত্র ধর্মীয় বাধ্যবাধকতা বহন করবে।

III

গান্ধীজির অর্থনৈতিক অমঙ্গলের বিশ্লেষণে নতুন কিছু আছে কি? গান্ধীবাদের অর্থশাস্ত্র কি সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুযুক্তিপূর্ণ? সাধারণ লোকের প্রতি, জীবনযুদ্ধে যারা পরাজিত তাদের প্রতি গান্ধীবাদ কি আশার আলো দেখায়? এটা কি তাকে একটি সুস্থ সুন্দর জীবনের, আনন্দের জীবনের, এবং সংস্কৃতির জীবনের, স্বাধীনতার জীবন, কেবলমাত্র অভাব থেকে স্বাধীনতা নয়, কিন্তু উত্থানের স্বাধীনতা, পরিপূর্ণ দৈহিক উচ্চতায় বেড়ে ওঠা—যা করার জন্য সে সক্ষম, তার অঙ্গীকার করে, প্রতিশ্রুতি দেয়?

গান্ধীর দেওয়া অর্থনৈতিক পীড়া বা অমঙ্গলের বিশ্লেষণে নতুন কিছু নেই যতদূর পর্যন্ত তা যন্ত্রাদি এবং সভ্যতা, যার ওপর এটি নির্মিত, এর ওপর আরোপ করে। এই তর্ক বা বিচার, যে পরিকাঠামো এবং আধুনিক সভ্যতা ব্যবস্থাপনা এবং নিয়ন্ত্রণকে মুষ্টিমেয়র হাতে কেন্দ্রীভূত হতে সাহায্য করে, এবং ব্যাঙ্ক এবং ঋণের সাহায্যে সমস্ত দ্রব্যের আরও মুষ্টিমেয়র হাতে হস্তান্তর এর সুবিধা করে দেয়, এবং কারখানা এবং মিলগুলির যেখানে লক্ষ লক্ষ লোক রক্তশূন্যতায় ভুগে শাদা হয়ে যায় কেবল মাত্র বড় শিল্পকে সাহায্য করার জন্য, ঘরের থেকে সহস্র যোজন দূরে বাস করে, অথবা যে পরিকাঠামো এবং আধুনিক সভ্যতা মৃত্যু ঘটায়, পঙ্গু করে দেয়, অক্ষম করে দেয়, যা যুদ্ধের ক্ষতের চেয়ে গভীরতায় এবং সংখ্যায় অনেক বেশি, এবং যার ফলে বড় বড় শহরের উৎপত্তি এবং তৎসহ রোগ এবং শারীরিক অবনতি, যা ধোঁয়া, ময়লা, গোলমাল, দূষিত বায়ু, রৌদ্রের অভাব, বাইরের খেলাধূলার অভাব, ঘিঞ্জি বস্তি, বেশ্যাবৃত্তি, অপ্রাকৃত জীবনযাপন, যা এই কলকারখানা এবং সভ্যতা নিয়ে আসে—এগুলি সমস্তই পুরনো এবং বহু ব্যবহারে জীর্ণ তর্ক বা বিচার। এগুলির মধ্যে নতুন কিছুই নেই। গান্ধীবাদ কেবলমাত্র রুশো, রাস্কিন, টলস্টয় এবং তাঁদের সমধর্মী দার্শনিক গোষ্ঠী দ্বারা বর্ণিত দৃষ্টিভঙ্গির-ই পুনরাবৃত্তি মাত্র।

যে সমস্ত ধারণাগুলি গান্ধীবাদের সৃষ্টি করে সেগুলি অত্যন্ত পুরনো ও সেকেলে। এগুলি কেবল প্রকৃতির কোলে ফিরে যাওয়া এবং জান্তব জীবন যাপন করা। এগুলির একমাত্র গুণ তাদের সারল্য। যেহেতু অনেক সরল লোক এগুলির দ্বারা আকর্ষিত হয়, তাই এই সরল ধারণাগুলি মরে যায় না ; এবং সর্বদাই কিছু হাবাগোবা লোক থাকে এগুলিকে প্রচার করতে। তৎসত্ত্বেও, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই

যে, মানুষের ব্যবহারিক সহজ প্রবৃত্তি—যা কদাচিৎ ভুল হয়—এগুলিকে অসফল বা অফলবতী বলে প্রমাণ করেছে এবং এই প্রগতিশীল সমাজ সেগুলিকে মেনে নিতে অস্বীকার করেছে।

গান্ধীবাদের অর্থনীতি আশাহীন ভাবে ভ্রান্ত। এই তথ্য—যে যন্ত্র এবং আধুনিক সভ্যতা অনেক অশুভ বা অমঙ্গল উৎপন্ন করেছে—গ্রহণ করা যেতে পারে। কিন্তু এই অশুভ বা অমঙ্গলগুলিকে তাদের বিরুদ্ধে তর্ক হিসাবে খাড়া করা যায় না। কারণ এই অমঙ্গল যন্ত্র এবং আধুনিক সভ্যতার জন্য হয়নি। এগুলি ভুল সামাজিক সংগঠনের প্রতি আরোপিত, যা ব্যক্তিগত সম্পত্তি এবং ব্যক্তিগত লাভের প্রচেষ্টাকে চরম পবিত্রতার ব্যাপারে পরিণত করেছে। যদিও মেশিন বা যন্ত্র এবং সভ্যতা সকলকে লাভবান করতে পারেনি, তবু এর প্রতিকার যন্ত্র এবং সভ্যতাকে দোষ দেওয়া বা নিন্দা করা নয়, এর জন্য সমাজের সংগঠনের পরিবর্তন করা দরকার, যাতে করে এর লাভ মুষ্টিমেয়র দ্বারা বলপূর্বক পরিগৃহীত না হয়, বরং সকলের জন্য লাভদায়ক হবে।

গান্ধীবাদে সাধারণ মানুষের কোনও আশা নেই। এই গান্ধীবাদ মানুষকে পশুর মতো ব্যবহার করে—তার থেকে বেশি কিছু নয়। এটা সত্যি যে, মানুষ পশুদের শারীরিক গঠন এবং কিছু কাজ যেমন পৌষ্টিক এবং পুনরুৎপাদন ইত্যাদিতে অংশ নেয় অর্থাৎ পশুর মতোই। কিন্তু এগুলি স্বাতন্ত্র্যসূচক মানবিক কার্য বা প্রক্রিয়া নয়। বৈশিষ্ট্যপূর্ণ মানবিক কাজ হচ্ছে যুক্তি, বিচারশক্তি, যার কাজ হল মানুষকে নিরীক্ষণ, ধ্যান, গভীরভাবে চিন্তা, অধ্যয়ন প্রভৃতি করতে সক্ষম করে এবং এই বিশ্বের সৌন্দর্যকে আবিষ্কার করে নিজের জীবনকে সমৃদ্ধ করতে সক্ষম করে এবং মানুষ তার জীবনের পাশবিক তত্ত্বটিকে নিয়ন্ত্রণ করে। মানুষ সেইভাবে এই সচেতন অস্তিত্বের পরিকল্পনায় সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করে। যদি এটা সত্য হয়, তাহলে এর পর কি পরিণতি? এর যে পরিণতি, যা আসে তা হল যে, একদিকে যেমন একটি পশুর জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছনো হয়ে যায় তখন-ই যখন তার শারীরিক ক্ষুধার নিবৃত্তি হয়, বিপরীত ভাবে তেমন-ই একটি মানুষের জীবনের অস্তিত্বের লক্ষ্যে পৌঁছনো যায় না যতক্ষণ না সে তার মনকে সম্পূর্ণরূপে সংস্কৃত করতে পেরেছে। সংক্ষেপে, সংস্কৃতিই মানুষ এবং পশুর মধ্যে বিভাজন এনেছে। সংস্কৃতি পশুর পক্ষে আয়ত্ত করা সম্ভব নয়, কিন্তু মানুষের পক্ষে এটি অত্যাবশ্যক। তাই যদি হয়, তাহলে মানুষের সমাজের লক্ষ্য হবে যাতে করে সমাজের প্রত্যেকটি মানুষ এক সাংস্কৃতিক জীবন অতিবাহিত করতে পারে, যার অর্থ হল, মনের উৎকর্ষ সাধন যা কেবলমাত্র দৈহিক অভাবের সন্তুষ্টিকরণ নয়। কী করে এটা ঘটতে পারে?

সমাজের জন্য যেমন, তেমনই ব্যক্তি, উভয়ের জন্যই কেবলমাত্র বেঁচে থাকা এবং যথার্থভাবে বাঁচার মধ্যে একটি বৃহৎ ফাঁক আছে। একজন মানুষকে যথার্থভাবে বাঁচতে হলে প্রথমে তাকে বাঁচতে হবে। কেবলমাত্র জীবনধারণের জন্য যে পরিমাণ সময় এবং কর্মশক্তি ব্যয় করা হয়, মানুষকে বিশিষ্ট ভাবে মানবিক প্রকৃতির কার্যাবলী, যা একটি সাংস্কৃতিক জীবন গড়ে তোলে, করার থেকে অন্য খাতে বইয়ে দেয়, তাহলে কেমন করে একটি সাংস্কৃতিক জীবন গড়ে তোলা সম্ভব? এটা সম্ভব হবে না, যদি যথেষ্ট অবকাশ না থাকে। কারণ যখন অবকাশ থাকে, তখন-ই মানুষ নিজেকে সাংস্কৃতিক জীবনের দিকে একান্তভাবে নিয়োজিত করতে পারে। মনুষ্য সমাজকে যে সমস্ত সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় তার মধ্যে প্রধান সমস্যা হল, কী করে প্রত্যেক ব্যক্তিকে অবকাশের সুযোগ দেওয়া যায়। এই অবকাশের বা অবসরের অর্থ কী? অবকাশের অর্থ হল জীবনের দৈহিক বা শারীরিক অভাবগুলি মোচনের জন্য যে শ্রম এবং প্রচেষ্টা প্রয়োজন তার লাঘব করা। কেমন করে অবসর সম্ভব হবে? অবসর বা অবকাশ সত্যিই অসম্ভব যতক্ষণ না মানুষের অভাব পূরণের জন্য প্রয়োজনীয় বস্তুর উৎপাদনের জন্য যে শ্রম এবং প্রচেষ্টার দরকার হয়, তার লাঘবের জন্য কোনও উপায় খুঁজে পাওয়া যায়। কী এই শ্রমকে লাঘব করতে পারে? কেবলমাত্র তখনই যখন যন্ত্র মানুষের জায়গা নেবে অবকাশ উৎপাদনের অন্য কোনও উপায় নেই। মানুষকে পাশবিক জীবনযাত্রা থেকে ত্রাণ করতে, এবং তাকে যথেষ্ট অবকাশ দিয়ে একটি সুস্থ সাংস্কৃতিক জীবন গঠন করতে যন্ত্র এবং আধুনিক সভ্যতা অপরিহার্য। যে ব্যক্তি মেশিন এবং আধুনিক সভ্যতার নিন্দা করে, সে সম্পূর্ণভাবে এদের উদ্দেশ্য বুঝে না এবং চরম লক্ষ্য কী যা মানব সামাজ আয়ত্ত করার জন্য প্রচেষ্টা করছে, তাও বুঝতে পারে না।

যে সমাজ গণতন্ত্রকে তার আদর্শ বলে গ্রহণ করে না, তার জন্য গান্ধীবাদ খুব-ই উপযোগী বা উপযুক্ত। যে সমাজ গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে না, সেই সমাজ তার ওপর নির্ভরশীল যন্ত্র এবং সভ্যতার প্রতি উদাসীন হতে পারে। কিন্তু একটি গণতান্ত্রিক সমাজ তা পারে না। পূর্ববর্ণিত সমাজ মুষ্টিমেয় কয়েকজনের জীবনে অবকাশ এবং সংস্কৃতি নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে পারে এবং অবশিষ্ট বহুর জন্য পরিশ্রম এবং নীরস শ্রমসাধ্য কাজ নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে পারে। কিন্তু একটি গণতান্ত্রিক সমাজের তার প্রত্যেকটি নাগরিকের জন্য একটি অবকাশপূর্ণ সাংস্কৃতিক জীবন নিশ্চিত করা উচিত। যদি উপর্যুক্ত বিশ্লেষণটি সঠিক হয়, তাহলে একটি গণতান্ত্রিক সমাজের শ্লোগান হওয়া উচিত 'যন্ত্র এবং আরও যন্ত্র', 'সভ্যতা এবং আরও সভ্যতা'। গান্ধীবাদ অনুসারে সাধারণ মানুষ অতি অল্প বরাদ্দে বা বেতনে অবিরাম পরিশ্রম করে যাবে

এবং পশুর মতো জীবন যাপন করবে। সংক্ষেপে বলতে গেলে, গান্ধীবাদ তার প্রকৃতির ক্রোড়ে ফিরে যাওয়ার ডাক সহ, এর অর্থ দাঁড়ায় সমগ্র জনতার জন্য সেই নগ্নতায় ফিরে যাওয়া, সেই নোংরা জীবনে ফিরে যাওয়া, সেই দারিদ্র্য এবং অজ্ঞানতায় ফিরে যাওয়া।

জীবনকে বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপে বিভক্তিকরণ এবং সমাজের বিভিন্ন পৃথক শ্রেণীতে বিভক্ত হওয়াকে সম্পূর্ণরূপে বিলোপ করা যেতে পারে না। অনেক সামাজিক এবং অর্থনৈতিক পরিবর্তন সত্ত্বেও, আইনত দাসত্ব প্রথা, ক্রীতদাস প্রথার উচ্ছেদ সত্ত্বেও, এবং গণতন্ত্রের ভাবধারার বিস্তার, পাশাপাশি বিজ্ঞানের প্রসার, সাধারণ শিক্ষার প্রসার, বইয়ের মাধ্যমে, সংবাদপত্রের দ্বারা, ভ্রমণ এবং সর্বসাধারণের আপসে সামাজিক মেলামেশা বা আদান-প্রদানের দ্বারা এবং স্কুলে ও কারখানায় সাধারণ মেলামেশার দ্বারা পরিবর্তন সত্ত্বেও সমাজে এখনও শিক্ষিত এবং অশিক্ষিত শ্রেণীর বিভেদ, অবকাশ বা অবসরপ্রাপ্ত এবং শ্রমিকশ্রেণীর দ্বারা বিভক্ত হয়ে সমাজে অনেক ফাটল থেকে গেছে এবং সম্ভবত থাকবেও।

কিন্তু গান্ধীবাদ কেবলমাত্র ধারণাগত শ্রেণীস্বাতন্ত্র্যে সন্তুষ্ট নয়। গান্ধীবাদ 'শ্রেণী-গঠন' এর ওপর জেদাজিদি করে। এই মতবাদ সমাজের শ্রেণী-গঠন এবং আয়ের বিভিন্ন গঠনকে অলঙ্ঘনীয় বলে শ্রদ্ধা করে এবং তৎসঙ্গে সংশ্লিষ্ট ধনী ও গরীবের পার্থক্য, উঁচু এবং নিচুর পার্থক্য, এবং মালিক এবং শ্রমিকের অবস্থান বা পার্থক্যকে সামাজিক সংস্থার চিরস্থায়ী অঙ্গ বলে মেনে নেয়। সামাজিক গুরুত্বের দৃষ্টিভঙ্গিতে এর থেকে বেশি ক্ষতিকর আর কিছু হতে পারে না। মনস্তাত্ত্বিক ভাবে, শ্রেণী-সংগঠন এমন সব প্রভাব ফেলে যা দুটি শ্রেণীর পক্ষেই নৈতিকভাবে ক্ষতিকর। এতে এমন কোনও সামান্য (Common) ভূমি নেই যার ওপর বিশেষ সুবিধাভোগী শ্রেণী এবং প্রজা শ্রেণী মিলিত হতে পারে। এটাতে কোনওরূপ প্রীতির লক্ষণ নেই, জীবনের আশা, অভিজ্ঞতার লেন-দেনের কোনও বালাই নেই। প্রজা শ্রেণীর ওপর এই বিচ্ছেদের সামাজিক এবং নৈতিক দোষগুলি নিশ্চিতভাবে বাস্তব এবং স্পষ্টতই প্রতীয়মান। এটা এদের দাস তৈরি হওয়ার জন্য শিক্ষিত করে এবং দাসত্বের মনোবৃত্তি অনুসরণকারী মনোবিকৃতি সৃষ্টি করে। কিন্তু যেগুলি সুবিধাভোগী শ্রেণীকে প্রভাবিত করে, যদিও কম বস্তু বিষয়ক বা বস্তুতান্ত্রিক এবং কম প্রত্যক্ষ, তথাপি সমভাবে বাস্তব। এই শ্রেণী সংগঠনের অনুবর্তী নিঃসঙ্গীকরণ এবং স্বতন্ত্রী ভাব সুবিধাভোগীদের মধ্যে দস্যুদলের মতো সমাজ-বিরোধী মেজাজ সৃষ্টি করে। এই শ্রেণী সর্বত্র নিজের স্বার্থ অনুভব করে এবং বর্তমান উদ্দেশ্য বা অভিধাকে বাঁচাতে সবার বিরুদ্ধে দাঁড়ায় এমনকী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধেও। এরা নিজের সংস্কৃতিকে বন্ধ্যা

করে, তাদের কলাবিদ্যাকে দম্ভপূর্ণ জমকালো করে, তাদের ধনসম্পত্তিকে আলোকস্নায়ক বা চাকচিক্যপূর্ণ, এবং তাদের ব্যবহারকে রুচিবাগীশ বা খুঁতখুঁতে করে। কার্যত, বলতে গেলে বলতে হয় যে, শ্রেণী সংগঠনে একদিকে আছে নিপীড়ন, অত্যাচার, অহঙ্কার, গর্ব, দম্ভ, লোভ, স্বার্থপরতা এবং অন্যদিকে নিরাপত্তাহীনতা, দারিদ্র্য, পদমর্যাদা হ্রাস, এবং স্বাধীনতার হ্রাস, আত্মবিশ্বাসের ক্ষয়, স্বতন্ত্রতা হারানো, মর্যাদার হানি এবং আত্মসম্মান নষ্ট করা। গণতান্ত্রিক সমাজ এই সমস্ত ফলাফলের প্রতি উদাসীন হতে পারে না। কিন্তু গান্ধীবাদ এই সমস্ত ফলাফল সম্বন্ধে সামান্যতমও কিছু মনে করে না। গান্ধীবাদ কেবলমাত্র শ্রেণী-বৈষম্যে সন্তুষ্ট নয়, একথা বললে যথেষ্ট বলা হয় না। একথা বলাও যথেষ্ট নয় যে, গান্ধীবাদ শ্রেণী-সংগঠনে বিশ্বাস করে। গান্ধীবাদ তার থেকেও বেশি কিছুর সমার্থক। একটি শ্রেণী সংগঠন, যা ক্ষেপামিপূর্ণ, নীরস এবং দুর্বল বস্তু—একটি কেবলমাত্র ভাবপ্রবণতা উদ্রেককারী, একটি কঙ্কালসার মাত্র—তা গান্ধীবাদ চায় না। এটি চায় যে, এই 'শ্রেণী সংগঠন' একটি জীবন্ত বিশ্বাসের মতো কাজ করবে। এর মধ্যে আশ্চর্যান্বিত হওয়ার মতো কিছুই নেই। কারণ গান্ধীবাদের শ্রেণী সংগঠন কেবলমাত্র দুর্ঘটনা বা আকস্মিক নয়। এটা হচ্ছে এর অফিসিয়্যাল (সরকারি) শিক্ষার বিষয়বস্তু বা মতবাদ।

যে ন্যাসের (Trusteeship) ধারণা গান্ধীবাদ সর্বরোগহর বলে প্রস্তাব দেয়, যাতে সমস্ত ধনী শ্রেণী তাদের সম্পত্তিকে গরীবদের জন্য সঞ্চিত ধন বলে বিবেচনা করবে; তা অত্যন্ত হাস্যাস্পদ অংশ। এ ব্যাপারে বলা যেতে পারে যে, এর প্রণেতা যদি অন্য কেউ হত, তাকে নির্বোধ বোকা বলে উপহাস করা হত, যে জীবনের কঠোর বাস্তবতাকে জানেনি এবং সেই সমস্ত ক্রীতদাসের মতো আজ্ঞাবাহী শ্রেণীকে কৌশলে ভুল পথে চালিত করছে এই বলে যে এই এক দাগ নৈতিক আত্মরক্ষার ব্যবস্থার দ্বারা ওই ধনীবর্গ—যারা এই পৃথিবীকে, তাদের অপূরণীয় বা অতৃপ্ত লোলুপতার দ্বারা এবং অদম্য দাম্ভিকতার দ্বারা, লক্ষ লক্ষ শ্রমিকের জন্য অশ্রুর উপত্যকা বানিয়েছে বা সর্বদাই বানাবে, নিজেদের মেরামত করিয়ে পুনরায় কার্যোপযোগী করবে, যাতে করে তারা এই শ্রেণী সংগঠনের দেওয়া সর্বাত্মক শক্তির দুর্ব্যবহারের লোভকে সামলে নিতে পারবে।

গান্ধীবাদের সামাজিক আদর্শ, হয় 'জাত' না হয় 'বর্ণ'। যদিও এটা বলা খুব-ই শক্ত যে কোনটি, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই যে গান্ধীবাদের সামাজিক আদর্শ কখনওই গণতন্ত্র নয়। কারণ তুলনা করার জন্য 'জাত' অথবা 'বর্ণ' যেটাই ধরা হোক না কেন, দুটিই মৌলিকভাবে গণতন্ত্রের বিরোধী। এটা অন্যরকম কিছু হতে পারত যদি গান্ধীবাদের দেওয়া জাতি প্রথার প্রতিবেদনটি সৎ এবং মজবুত হত।

কিন্তু তাঁর জাতপাতের পক্ষ সমর্থনের প্রতিবেদনটি একটি অনুভূতিশূন্য বাগাড়ম্বরপূর্ণ বক্তৃতা, যা কেউ ভাবতেও পারে না। জাতি প্রথার পক্ষ সমর্থনে শ্রী গান্ধীর তর্কগুলিকে পরীক্ষা করুন, দেখতে পাবেন যে, এর প্রত্যেকটিই প্রথম দর্শনে সুন্দর যদি বালসুলভ না হয়। এই তর্কগুলি পূর্বেই বর্ণনা করা হয়েছে।

প্রথম তিনটি তর্ক বা বিচার দেখলে সমবেদনা হয়। হিন্দু সমাজ যে এখনও টিকে থাকতে সক্ষম হয়েছে, যখন অন্যেরা হয় মৃত না হয় অন্তর্হিত ; কোনও অভিনন্দন পাওয়ার মতো ব্যাপার নয়। যদি এটা টিকে আছে, এটা তার জাতির জন্য নয়, এর কারণ হল যে বিদেশিরা যারা হিন্দুদের পরাজিত করেছিল, তারা তাদের সকলকে হত্যা করা প্রয়োজন মনে করেনি। কেবলমাত্র বেঁচে থাকায় কোনও সম্মান নেই। বিচার্য বিষয়টি হল 'বেঁচে থাকার স্তর' বা 'অস্তিত্বের স্তর'। কেউ বেঁচে থাকতে পারে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ করে। কেউ কাপুরুষের মতো পশ্চাদপসরণ করে বেঁচে থাকতে পারে এবং কেউ বা লড়াই করে বেঁচে থাকতে পারে। কোন্ স্তরে হিন্দুরা বেঁচে আছে? যদি বলা যেতে পারে যে তারা বেঁচে আছে লড়াই করে বা তাদের শত্রুদের পরাজিত করে, তাহলে জাতি প্রথার উপর শ্রী গান্ধীর দ্বারা আরোপিত গুণগুলি স্বীকার করা যেত। হিন্দুদের ইতিহাস আত্মসমর্পণের ইতিহাস—শোচনীয় আত্মসমর্পণ। এটা সত্যি যে অন্যেরাও তাদের আক্রমণকারীদের নিকট আত্মসমর্পণ করেছে। কিন্তু তাদের ক্ষেত্রে আত্মসমর্পণ বিদেশি শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহকে অনুসরণ করেছে। হিন্দুরা যে কেবল কখনও বিদেশি আক্রমণকারীদের প্রতিরোধ করেনি এমন নয়, তারা কখনও বিদেশি শাসনের জোয়াল বা গোলামিকে ছুঁড়ে ফেলতে বিদ্রোহ সংগঠিত করার ক্ষমতা দেখায়নি। অন্যদিকে হিন্দুরা দাসত্বকে আরামদায়ক করে তোলার চেষ্টা করেছে। এর উপরে কেউ বিপরীত ভাবে যুক্তি দ্বারা আলোচনা করতে পারেন বা তর্ক করতে পারেন যে, হিন্দুদের এই অসহায় অবস্থার জন্য জাতি প্রথাই দায়ী।

চতুর্থ অনুচ্ছেদে তর্ক বাকচাতুর্যে মনোহর এবং আপাতদৃষ্টিতে ন্যায়সঙ্গত। কিন্তু একথা কখনওই বলা যেতে পারে না যে, প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার অথবা বিবাদের ন্যায়সঙ্গত বিচার ও ফয়সলা প্রভৃতি কার্যাবলীর জন্য জাত-প্রথা একমাত্র সুসংগঠিত ব্যবস্থা। জাত প্রথা সম্ভবত সবচেয়ে খারাপ যন্ত্র এই সমস্ত কার্যাবলী সম্পন্ন করার জন্য এটিকে সহজেই প্রভাবিত করতে পারা যায় এবং সহজেই ভ্রষ্ট করা যেতে পারে। এই সমস্ত কাজগুলি অন্য দেশে ভারতবর্ষ থেকে অনেক ভালভাবে সম্পাদিত হয়েছে, যদিও তাদের কোনও জাত প্রথা ছিল না। আবার এ-ব্যাপারে জাত প্রথাকে সেনাবাহিনী গড়ে তোলার আধার রূপে ব্যবহার করা—একটি উদ্ভট কল্পনাপ্রসূত

ধারণা। জাত প্রথার পেশাগত সিদ্ধান্ত অনুসারে এটা চিন্তা করাও যায় না। শ্রী গান্ধী জানেন যে তাঁর নিজের প্রদেশ গুজরাটে কোনও একটিও জাত সেনাদল তৈরি করেনি। এই বিশ্বযুদ্ধেও তারা এটা করেনি। কিন্তু গত বিশ্বযুদ্ধেও, যখন শ্রী গান্ধী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সৈন্য সংগ্রহ করার এজেন্ট হিসাবে সারা গুজরাট ভ্রমণ করেছিলেন। বাস্তবিক পক্ষে জাতি প্রথা অনুসারে জনসাধারণকে যুদ্ধার্থে প্রস্তুত করার জন্য পরিচালনা অসম্ভব, যেহেতু এই যুদ্ধার্থে পরিচালনার জন্য জাতি প্রথার যে পেশাগত সিদ্ধান্ত আছে তার বিলোপ করা দরকার।

সে তর্ক অনুচ্ছেদ ৫ ও ৬-এ দেওয়া হয়েছে সেগুলি যেমন অর্থহীন তেমনি বিদ্রোহকারী। পঞ্চম অনুচ্ছেদের তর্কটিকে কোনও মতেই ভাল তর্ক বলা যায় না। এটা সত্যি, পরিবার একটি আদর্শ একক, যার প্রত্যেকটি সদস্য স্নেহ ও ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ, যদিও একটি পরিবারের সদস্যদের মধ্যে অন্তর্বিবাহ নেই। এটা স্বীকার করা যেতে পারে যে, কোনও বৈষ্ণব পরিবারে সেই পরিবারের সদস্যরা একসঙ্গে বসে ভোজন করে না, তথাপি তাদের একে অপরের প্রতি স্নেহ ভালবাসা আছে। এগুলা কী প্রমাণ করে? এটা প্রমাণ করে না যে একসঙ্গে পঙক্তিভোজন এবং অন্তর্বিবাহ সৌভ্রাত্র বা সমধর্মিতা স্থাপনের জন্য দরকার হয় না। এটা যা প্রমাণ করে তা হল যেখানে সৌভ্রাত্র প্রতিষ্ঠার অন্য উপায় আছে—যেমন পারিবারিক বন্ধনের ব্যাপারে সচেতনতা—একসঙ্গে ভোজন বা অন্তর্বিবাহ, এর প্রয়োজন নেই। কিন্তু এটা অস্বীকার করা যাবে না যে, যেখানে—যেমন জাতি প্রথায় কোনও রকম বন্ধন করার শক্তি নেই। অন্তর্বিবাহ পঙ্‌ক্তি ভোজন বা অন্তর্বিবাহ শর্তহীন বা নিশ্চিত রূপে অত্যাবশকীয়। পরিবার এবং জাতির মধ্যে কোনও সাদৃশ্য নেই। পঙ্‌ক্তি ভোজন এবং অন্তর্বিবাহ প্রয়োজন, কারণ বিভিন্ন জাতিকে বন্ধন করতে অন্য কোনও উপায় নেই, কিন্তু পরিবারের ব্যাপারে, তাদের একত্র বন্ধন করতে অন্য শক্তি বিদ্যমান। যাঁরা একসঙ্গে পঙ্‌ক্তি ভোজন এবং অন্তর্বিবাহের নিষিদ্ধকরণের জন্য পীড়াপীড়ি করেছেন তাঁরা এটিকে একটি আপেক্ষিক মূল্যবোধের প্রশ্ন হিসাবে বিচার করেছেন। তাঁরা এটিকে কখনওই চরম মূল্যবোধের প্রশ্ন হিসাবে উন্নত করেননি। শ্রী গান্ধীই এ ব্যাপারে সর্বপ্রথম। এক পঙ্‌ক্তিতে ভোজন খারাপ এবং যদিও এটা ভাল কিছু করতে পারে, তবুও এটা করা উচিত নয়—এবং কেন? কারণ ভোজন করা একটি খারাপ বা নোংরা কাজ, এমন নোংরা যেমন মলমূত্রত্যাগ। জাতি প্রথাকে অন্যের দ্বারাও প্রতিরোধ করা হয়েছে। কিন্তু আমি এই প্রথম এটিকে সাহায্যের জন্য, এমন একটি বিস্ময়কর যদি অভিঘাতী না হয়, তর্ক দেখলাম। এমনকি অত্যন্ত গোঁড়াও বলবে 'গান্ধী থেকে আমাদের বাঁচাও।' এটা দেখায় যে

শ্রী গান্ধী কিরূপ গোঁড়া হিন্দু। তিনি গোঁড়ার থেকেও গোঁড়া হিন্দুকে হার মানিয়েছেন। এটা যে একজন গুহা মানবের তর্ক সেটা বলাও যথেষ্ট হবে না। এটি বাস্তবিক পক্ষে একজন পাগলের তর্ক।

অনুচ্ছেদ ১-এ জাত-প্রথার পক্ষে যে তর্ক বিবৃত করা হয়েছে তা নৈতিক শক্তি গঠনের পক্ষে বিশেষ মূল্যবান নয়। এই জাতি প্রথা নিঃসন্দেহে একজন মানুষকে তার থেকে অন্য জাতির স্ত্রীলোকের প্রতি লালসা চরিতার্থ করাকে নিষেধ করে। জাত-প্রথা নিঃসন্দেহে একজন মানুষকে অন্য জাতের ঘরে রান্না খাবার খাওয়ার লালসা চরিতার্থ করতে নিষেধ করে। যদি নৈতিকতা, চেতনা অথবা সংযমের সংবেদনশীলতার প্রতি কোনওরূপ শ্রদ্ধা না দেখিয়ে কেবলমাত্র সংযম প্রতিপালনের মধ্যেই সংহত থাকে, তবে এই জাত-প্রথাকে একটি নৈতিক প্রথা বলে স্বীকার করা যেতে পারে। কিন্তু শ্রী গান্ধী দেখেন না যে, এই সংযমগুলি হিন্দুত্বের দ্বারা স্বীকৃত স্বাধীনতাগুলি সন্তুলিত হওয়া থেকে বেশি কিছু হয়েছে। কারণ হিন্দুত্ব একজন লোকের একশ'টি নারীকে বিবাহ এবং তার নিজের জাতের মধ্যেই সীমিত একশ'টি বেশ্যাকে রাখার ওপর কোনও নিষেধ বা সংযম আরোপ করেনি। না তাকে তার যৌন ক্ষুধা মেটাবার জন্য তার জাতের লোকদের সঙ্গে যে কোনও পরিমাপে ব্যবহারের ওপর বিধি-নিষেধ আরোপ করেছে বা থামিয়েছে।

যে তর্কটি অনুচ্ছেদ ৮-এ দেওয়া হয়েছে তা সমস্ত প্রশ্নটিকে অনুমানের ভিত্তিতে মেনে নিয়েছে। বংশানুক্রমিক প্রথা ভালো হতে পারে অথবা ভাল নাও হতে পারে। কেউ কেউ এটিকে স্বীকার করবে। আবার কেউ কেউ এটিকে স্বীকার করবে না। কেন তাহলে এটাকে সরকারি কার্যালয়ের নীতি হিসাবে উন্নীত করা হয়। কেন এটিকে বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে? ইউরোপে এটি সরকারি নীতি নয় এবং এটি বাধ্যতামূলকও নয়। এটি কোনও ব্যক্তির পছন্দের উপরে ছেড়ে দেওয়া হয়, যাদের বেশিরভাগই তাদের পূর্বপুরুষের বৃত্তি বা পেশাকে অনুসরণ করে এবং কিছু লোক তা করে না। কে বলতে পারে যে 'বাধ্যতামূলক প্রথা' 'স্বেচ্ছাকৃত প্রথা' থেকে ভাল ফল করেছে? যদি ভারতের জনগণের অর্থনৈতিক অবস্থার সঙ্গে ইউরোপের জনগণের তুলনা কোনও পথপ্রদর্শক হয়, তাহলে দেখা যাবে যে, বিচার বুদ্ধি-সম্পন্ন খুবই কম ব্যক্তি জাত-প্রথাকে এই ভিত্তিতে অনুমোদন করে। ঘন ঘন পেশা পরিবর্তনের সঙ্গে তাল রেখে নাম বা পরিভাষা পরিবর্তনের অসুবিধার কথা যা বলা হয়, তা 'কৃত্রিম'। কোনও একটি পেশায় নিযুক্ত ব্যক্তিদের পদের একটি আখ্যা দেওয়ার অনুমিত প্রয়োজনীয়তার থেকে এটা উদ্ভূত। এই শ্রেণীর তক্‌মা বা নামকরণ সম্পূর্ণরূপে অপ্রয়োজনীয় এবং কোনও রকম অসুবিধা ছাড়াই এটাকে বিলোপ করা

যায়। তাছাড়া আজকাল ভারতবর্ষে কী ঘটছে? মানুষের পেশা এবং তার শ্রেণীর তকমা বা আখ্যার মিল হয় না। একজন ব্রাহ্মণ জুতা বিক্রি করে। কেউ এতে বিক্ষুব্ধ হয় না, কারণ তাকে চামার বলে ডাকা হয় না। একজন চামার রাজ্যের অফিসার হয়। কেউ এতে বিক্ষুব্ধ হয় না, কারণ তাকে ব্রাহ্মণ বলা হয় না। সমস্ত তর্কটাই একটি ভুল বোঝাপড়ার উপর আধারিত। সমাজের কাছে কোনও ব্যক্তির শ্রেণীর পরিচয়ের তকমা বড় কথা নয়, বড় কথা হল সে কী পরিষেবা দেয়।

শেষ তর্কটি যা অনুচ্ছেদ ৯ দেওয়া হয়েছে তা আমি যে সমস্ত তর্ক এই জাতি প্রথার সমর্থনে শুনেছি তার মধ্যে সবচেয়ে বিস্ময়ে স্তম্ভিত করার মতো তর্ক। ঐতিহাসিকভাবে এটি মিথ্যা। যাঁরা মনু স্মৃতি সম্বন্ধে কিছু জানেন তাঁরা কেউ বলবেন না যে জাতি প্রথা একটি প্রাকৃতিক প্রথা। মনুস্মৃতি কী দেখায়? এ দেখায় যে, জাত-প্রথা একটি আইনসম্মত প্রথা, যা বলপ্রয়োগের দ্বারা বজায় রাখা হত। যদি এটা এখনও টিকে আছে তার কারণ (১) জনগণের দ্বারা অস্ত্র রাখা নিষিদ্ধ করা বা ব্যাহত করা; (২) জনগণকে শিক্ষার অধিকার দিতে অস্বীকার করা; এবং (৩) জনগণকে সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত করা। এই জাত-প্রথা প্রাকৃতিক প্রথা তো নয়-ই, এটা শাসক শ্রেণীর দ্বারা ক্রীতদাস শ্রেণী বা আজ্ঞাবাহী শ্রেণীর ওপর প্রতারণাপূর্বক চাপিয়ে দেওয়া।

শ্রী গান্ধীর এই অবস্থান্তর, জাত-প্রথা থেকে বর্ণ-ব্যবস্থা বা বর্ণ প্রথা, সেই অভিযোগের, যে গান্ধীবাদ গণতন্ত্রের বিরোধী, কোনও পার্থক্য আনেনি। প্রথমত, বর্ণের ধারণাটি জাতের ধারণার পিতৃস্বরূপ বা পূর্ববর্তী। যদি জাতের ধারণাটি অত্যন্ত ক্ষতিকর ধারণা, তা সম্পূর্ণরূপে বর্ণের ধারণার দুশ্চরিত্রতার দরুন। উভয় ধারণাই মন্দ এবং ক্ষতিকর এবং একজন ব্যক্তি 'বর্ণ'-কে বিশ্বাস করল কিংবা 'জত'-কে বিশ্বাস করল, তাতে কিছু আসে যায় না। বৌদ্ধরা যারা এটাকে বিশ্বাস করত না, এই বর্ণের ধারণাকে নিষ্ঠুরভাবে আক্রমণ করেছিল। গোঁড়া অথবা সনাতন বৈদিক হিন্দুদের কাছে কোনও যুক্তি-সংক্রান্ত প্রতিরোধ ছিল না। তারা যেটুকু বলতে পারত তা হল যে, এটি বেদের জ্ঞানগর্ভ কর্তৃত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং যেহেতু বেদ অভ্রান্ত ছিল, সেইরূপ বর্ণ প্রথাও অভ্রান্ত। এই তর্কটি বর্ণ প্রথাকে বৌদ্ধদের যুক্তিযুক্ততা এবং বিচার-বুদ্ধি-সম্পন্নতার বিরুদ্ধে বাঁচাতে বা রক্ষা করতে যথেষ্ট ছিল না। যদি বর্ণ প্রথা বেঁচে থাকে, তার একমাত্র হেতু ভাগবতগীতা, যা বর্ণ প্রথাকে একটি দার্শনিক ভিত্তির উপর স্থাপন করেছিল, এই বলে বাদানুবাদ করে যে বর্ণের আধার হল মানুষের সহজাত জন্মগত গুণাবলী। ভাগবতগীতা এই 'বর্ণ-ধারণা'-কে ঠেকিয়ে রাখবার জন্য সাংখ্য দর্শনের ব্যবহার করেছিল। তা না হলে

এই বর্ণ ধারনা করে একটা বাজে বোধহীন জিনিসকে বোধের মধ্যে এনে বোম ফাটিয়ে দরজা ভাঙার মতো উড়ে যেত। ভাগবত গীতা এই বর্ণ প্রথাকে একটি নতুন এবং আপাতদৃষ্টিতে ন্যায়সঙ্গত ভিত্তির ওপর স্থাপন করে, যেমন মানুষের সহজাত গুণ ইত্যাদি, এবং এই বর্ণ প্রথাকে নতুন জীবনের মেয়াদ দিয়ে অত্যন্ত দুষ্টুমি করেছে।

'ভাগবদ গীতা'র এই বর্ণ প্রথার অন্তত দুটি উৎকর্ষ আছে। এটা বলে না যে এই বর্ণ প্রথা জন্মের ওপর আধারিত। বাস্তবিক পক্ষে, এটা একটি বিশেষ দিক নির্ণয় করে যে, প্রত্যেক মানুষের বর্ণ তার সহজাত গুণ অনুসারে নির্ধারিত। এটা একথা বলে না যে, পিতার পেশাই পুত্রের পেশা হবে। এটা বলে যে, একজন ব্যক্তির সহজাত গুণ অনুসারে তার পেশা বা বৃত্তি হবে, পিতার পেশা হবে পিতার সহজাত গুণ অনুসারে এবং পুত্রের পেশা হবে পুত্রের সহজাত গুণ অনুসারে। কিন্তু শ্রী গান্ধী বর্ণ প্রথার একটি নতুন ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি এটির আমূল পরিবর্তন করে এটিকে চেনা দুষ্কর করেছেন। প্রাচীন গোঁড়াদের ব্যাখ্যায় 'জাত'-এর ভাবার্থ ছিল বংশানুক্রমিক বৃত্তি বা পেশা। কিন্তু 'বর্ণের' তা ছিল না। শ্রী গান্ধী তাঁর নিজস্ব খেয়াল মতো বর্ণের একটি নতুন ভাবার্থ প্রকাশ করেছেন। শ্রী গান্ধীর মতে 'বর্ণ' জন্মের দ্বারা নির্ধারিত হয়, এবং কোনও বর্ণের পেশা বংশানুক্রমিক নীতির দ্বারা নির্ধারিত হয়। তাহলে 'বর্ণ' হল 'জাত'রই আর এক নাম। শ্রী গান্ধী যে 'জাত' থেকে 'বর্ণে' পরিবর্তন করলেন তা কোনও বৈপ্লবিক ভারতবর্ষের জন্ম বলে নির্দেশ করে না। শ্রী গান্ধীর 'সৃজনী প্রতিভা' সর্বদাই সর্বাংশে ভুতুড়ে। এই বামন ভূতের মতো তাঁর সমস্ত অকালপক্কতা আছে, কেবল বাইরের চেহারাটি ছাড়া। এই বামনের মতো তিনি জাতির মতবাদের ওপরে বেড়ে উঠতে পারেন না।

শ্রী গান্ধী কখনও কখনও সামাজিক এবং অর্থনৈতিক বিষয়ের উপরে এমন ভাবে বলেন, যেন লজ্জায় লাল হয়ে যান। যাঁরা গান্ধীবাদ অধ্যয়ন করবেন তাঁরা শ্রী গান্ধীর কখনও কখনও গণতন্ত্রের পক্ষে এবং পুঁজিবাদের বিরোধিতায় মূর্তি পরিগ্রহণে ঠকবেন না। কারণ গান্ধীবাদ কোনওভাবেই একটি বৈপ্লবিক নীতি নয়। এটি অসংক্ষিপ্ত রূপে রক্ষণশীলতা। যতদূর ভারতবর্ষের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, এটি একটি প্রতিক্রিয়াশীল নীতি, যা তার পতাকায় উজ্জ্বল অক্ষরে লিখে রাখে, প্রাচীন যুগে ফিরে যাওয়ার ডাক। গান্ধীবাদের লক্ষ্য হল ভারতের ভয়ানক, মৃত অতীতের পুনরায় চেতনা লাভ করানো এবং সঞ্জীবিত করানো।

গান্ধীবাদ একটি 'আত্মবিরোধী কিন্তু সত্যবিরোধী নয়' এমন নীতি। এটি বিদেশি

কর্তৃত্ব থেকে স্বাধীনতার স্বপক্ষে যার অর্থ হয় দেশের বর্তমান রাজনৈতিক কাঠামোর বিনাশ। সেইসঙ্গে এটি সেই সামাজিক কাঠামোকে সুরক্ষিত রাখতে চায়, যা এক শ্রেণীর উপর আর এক শ্রেণীর বংশানুক্রমিক কর্তৃত্বকে অনুমোদন করে — যার অর্থ একটি শ্রেণীর উপর আর এক শ্রেণীর অনিবার চিরস্থায়ী কর্তৃত্ব। এই বিরোধাভাসের সরলার্থ বা ব্যাখ্যা কী? এটা কি শ্রী গান্ধীর হিন্দুদের—কী গোঁড়া, কী অ-গোঁড়া, সকলের স্বরাজের আন্দোলনে সহৃদয় সহানুভূতি পাওয়ার জন্য কৌশলের একটি অংশ? যদি তাই হয়, তাহলে গান্ধীবাদকে কি সৎ এবং আন্তরিক বলে মেনে নেওয়া যায়? এটা হতে পারে যে, গান্ধীবাদের দুটি বৈশিষ্ট্য আছে যা ধীরে ধীরে উদ্‌ঘাটিত হচ্ছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আজ পর্যন্ত এর প্রতি মনোযোগ দেওয়া হয়নি। এগুলি গান্ধীবাদকে মার্ক্‌সবাদ থেকে বেশি গ্রহণযোগ্য করে তুলবে কিনা, সেটা অন্য ব্যাপার। কিন্তু যেহেতু এগুলি গান্ধীবাদ এবং মার্ক্‌সবাদের পার্থক্য নির্ণয় করতে অবশ্যই সাহায্য করে, এগুলির প্রসঙ্গ উল্লেখ করা দরকার।

গান্ধীবাদের প্রথম বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল যে, এর দর্শন (Philosophy) যাদের কিছু আছে, সেটুকু বজায় রাখতে সাহায্য করে, এবং যাদের কিছু নেই, তাদের সেই সমস্ত পাওয়ার অধিকার সত্ত্বেও তা পাওয়াকে ব্যাহত করে। যে কোনও ব্যক্তি, যিনি ধর্মঘট বা হরতালের প্রতি গান্ধীবাদী দৃষ্টিভঙ্গি বা মনোবৃত্তির পরীক্ষা করবেন, গান্ধীর 'জাত'র প্রতি শ্রদ্ধা এবং গরীবের কল্যাণের জন্য ধনীর ন্যাসরক্ষক হওয়ার যে গান্ধীয়ান নীতি তার অধ্যয়ন করবেন, অস্বীকার করতে পারবেন না যে, এই হল গান্ধীবাদের পরিণতি।

এটি একটি সুচিন্তিত পরিকল্পনার হিসাব কষা ফলাফল কিনা, কিংবা এটি একটি দুর্ঘটনার ব্যাপার কিনা, তর্কের ব্যাপার। কিন্তু বাস্তবিক সত্য হল যে, গান্ধীবাদ অবস্থাপন্ন এবং অবসর উপভোগী শ্রেণীর দর্শন।

গান্ধীবাদের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হল জনতাকে তাদের দুর্ভাগ্যকে সৌভাগ্যের সর্বোত্তম বলে উপস্থাপিত করে তাদের তা গ্রহণ করতে বলে প্রতারিত করা। একটি বা দুটি ব্যাখ্যামূলক উদাহরণস্বরূপ উপস্থাপনা এই বক্তব্যকে সত্য বলে প্রমাণ করতে যথেষ্টে হবে।

হিন্দুদের পবিত্র আইন শূদ্রদের (চতুর্থ শ্রেণীর হিন্দু) ধন সংগ্রহের অপরাধে দণ্ডিত করেছিল। এটি বলপূর্বক দারিদ্র্য আনয়নের নিয়ম, বিশ্বের অন্য কোথাও অপরিচিত। গান্ধীবাদ কী করে? এই গান্ধীবাদ ওই নিষেধাজ্ঞাকে উঠিয়ে নেয় না। এ শূদ্রদের সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হওয়ার নৈতিক সাহসের জন্য শূদ্রকে আশীর্বাদ

দেয়! এখানে শ্রী গান্ধীর উক্তিকে, উদ্ধৃত করাই শোভনীয়। সেগুলি এইরকম :

'শূদ্র, যে কেবল উপরের বা উঁচু জাতির সেবা করে, ধর্মীয় কর্তব্য হিসাবে, এবং সে কখনও সম্পত্তির মালিক হবে না। অবশ্যই তার কোনও কিছুর মালিক হওয়ার আকাঙ্ক্ষা নেই, তাকে হাজার হাজার নমস্কার। দেবতারা তার ওপর পুষ্পবৃষ্টি করবেন।'

আরেকটি ব্যাখ্যামূলক উদাহরণ—

মেথরদের প্রতি গান্ধীবাদের মনোভাব। হিন্দুদের পূত পবিত্র আইন ব্যবস্থাপত্র দেয় যে একজন মেথরের বংশধরেরা মেথরের বা ধাঙ্গড়ের কাজ করেই জীবিকা নির্বাহ করবে। হিন্দুবাদের নিয়মে ধাঙ্গড়ের বা মেথরের কাজ কোনও পছন্দের ব্যাপার ছিল না, এটা বলপূর্বক করানোর ব্যাপার ছিল।[১] গান্ধীবাদ কী করে? গান্ধীবাদ এই প্রথাকে চিরস্থায়ী অনন্ত করতে চায়, মেথরের কাজ সমাজের প্রতি অত্যন্ত মহত্ত্বপূর্ণ সেবা বলে মেথরের কাজের প্রশংসা করে!! আমি শ্রী গান্ধীর উদ্ধৃতি দিই : অস্পৃশ্যদের সম্মেলনের সভাপতি হিসাবে, শ্রী গান্ধী বলেন :

'আমি মোক্ষ লাভ করতে চাই না। আমি পুনর্জন্ম চাই না। যদি আমাকে আবার জন্মগ্রহণ করতে হয়, আমি অস্পৃশ্য হয়ে জন্ম নিতে চাই ; যাতে করে আমি তাদের দুঃখ, বেদনা, যন্ত্রণা এবং প্রকাশ্য অপমান, যা তাদের উপর চাপানো হয়, তা ভাগাভাগি করে নিতে পারি এবং আমি আমাকে এবং তাদেরকে এই শোচনীয় অবস্থা থেকে মুক্ত করতে পারি। আমি, সেইজন্য প্রার্থনা করি যে, যদি আমাকে আবার জন্ম নিতে হয়, আমি ব্রাহ্মণ হয়ে জন্ম নিতে চাই না, আমি ক্ষত্রিয়, বৈশ্য অথবা শূদ্র হতেও চাই না—কিন্তু একজন অতিশূদ্র হয়ে জন্ম নিতে চাই........।'

'আমি মেথরের কাজ ভালবাসি। আমার আশ্রমে একটি আঠারো বছর বয়সের ব্রাহ্মণ ছেলে মেথরের কাজ করছে, কেবলমাত্র আশ্রমের মেথর এবং ধাঙ্গড়দের পরিচ্ছন্নতা শেখাবার জন্য। এই ছেলেটি কোনও সমাজ সংস্কারক নয়।

সে জন্মগ্রহণ করেছিল এবং পালিত হয়েছিল গোঁড়ামির মধ্যে। কিন্তু সে অনুভব করল যে তার সাধনার সিদ্ধি অসম্পূর্ণ যতক্ষণ সে একজন খাঁটি ঝাড়ুদার না হতে

১. 'ইয়ং ইন্ডিয়া', ২৭শে এপ্রিল ১৯২১।

পারছে, এবং সে যদি চায় যে আশ্রমের ঝাড়ুদার তার কাজ ভালভাবে করবে, সে নিজেই এ কাজ করবে এবং একটি উদাহরণ স্থাপন করবে।'

'তোমরা স্পষ্ট ভাবে উপলব্ধি করবে যে তোমরা হিন্দু সমাজকে পরিষ্কার করছ।' স্বেচ্ছাকৃত ভাবে এক শ্রেণীর ওপর আরেক শ্রেণীর চাপিয়ে দেওয়া সমস্ত দোষকে, পাপকে চিরন্তন ভাবে স্থায়ী করার জন্য গান্ধীবাদের যে প্রচেষ্টা তার মেকি প্রচারের খারাপ উদাহরণ আর হতে পারে কি? যদি গান্ধীবাদ সকলের জন্য, কেবলমাত্র শূদ্রের জন্য নয়, দারিদ্র্যের শাসন এর উপদেশ দিয়েছিল, তা হলে এর সম্পর্কে সবচেয়ে খারাপ যা বলা যেতে পারে তা হল যে, এটি একটি ভ্রান্ত ধারণা। কিন্তু এতে মাত্র এক শ্রেণীর ভাল হবে বলে কেন উপদেশ দেওয়া হয়? মানুষের সবচেয়ে মন্দ দুর্বলতা গর্ব এবং অহঙ্কার, এই দুটির ওপর কেন আবেদন করা হয়, যাতে করে তাকে স্বেচ্ছায় সেই কাজ গ্রহণ করতে হয় যা নাকি সচেতন ভাবে তার উপর নিষ্ঠুর পক্ষপাত বলে সে বিক্ষুব্ধ হয়। একজন মেথরকে এটা বলার কী দরকার যে, একজন ব্রাহ্মণ মেথরের কাজ করতে প্রস্তুত, যখন এটা পরিষ্কার যে, হিন্দু শাস্ত্র এবং যুক্তিহীন হিন্দু ধারণা অনুসারে যদিও ব্রাহ্মণ মেথরের কাজ করে তাকে সেই সমস্ত অযোগ্যতার বা অক্ষমতার শাস্তি পেতে হয় না, যা একজন জন্মগত মেথরকে ভোগ করতে হয়? কারণ ভারতবর্ষে কেউ তার কাজের জন্য মেথর বলে পরিচিত হয় না। সে তার জন্মের দরুন মেথর বলে পরিচিত হয় এই প্রশ্ন নির্বিশেষে যে সে মেথরের কাজ করে কি না। যারা এ-কাজ করতে প্রত্যাখ্যান করে তাদেরকে উৎসাহ দিতে যদি গান্ধীবাদ একথা উপদেশ দিত যে মেথরের কাজ একটি মহৎ পেশা, তাহলে ব্যাপারটা বুঝা যেত। কিন্তু মেথরের কাজ করার জন্য তাকে উৎসাহ দিতে এবং কেবলমাত্র তাকেই এই মেথরের[১] কাজ করে যেতে বলা হয় যে 'মেথরের কাজ একটি মহৎ পেশা এবং তার জন্য তার লজ্জা পাওয়ার কিছু নেই', এই বলে তার অহঙ্কার এবং আত্মশ্লাঘার কাছে কেন আবেদন করা হয়? এই উপদেশ দেওয়া 'যে দারিদ্র্য শূদ্রের জন্যই ভাল, আর কারও জন্য নয়', উপদেশ দেওয়া যে মেথরের কাজ একটি মহৎ পেশা এবং অস্পৃশ্যদের জন্য ভাল এবং আর কারও জন্য নয়, এবং জীবনের স্বেচ্ছাকৃত উদ্দেশ্য বলে এই গুরুভারের বোঝা চাপানোকে মেনে নিতে তাদের দোষত্রুটির কাছে আবেদন একটি ঘোর দৌরাত্ম্য বা অত্যাচার এবং এই সমস্ত অসহায় শ্রেণীর উপর নিষ্ঠুর উপহাস কেবলমাত্র মিঃ গান্ধীই মনের ক্ষমতা এবং শাস্তি থেকে অব্যাহতি সহকারে চালিয়ে

১. ভারতের কোনও কোনও রাজ্যে ময়লা বহন বাধ্যতামূলক নয় এবং কেউ তা করতে বাধ্য করলে তা ফৌজদারি অপরাধ বলে বিবেচিত হতে পারে।

যেতে পারেন। এই প্রসঙ্গে একজনকে ভল্‌তেয়ারের সেই বাণীকে স্মরণ করানো যেতে পারে, তিনি এই 'ইজ্‌ম'-কে—যেমন গান্ধী-ইজ্‌ম এর সারবত্তা অস্বীকার করে বলেছিলেন :

'ও! জনগণকে এই কথা বলা যে কিছু লোকের মন্ত্রণা অন্য কিছু লোকের জন্য আনন্দ আনয়ন করে এবং সকলের জন্য মঙ্গলকর হয়, একটি বিদ্রূপ মাত্র! একজন মৃত্যুপথগামী মুমূর্ষু এই কথা জেনে কি সান্ত্বনা পাবে যে তার এই নষ্ট হয়ে যাওয়া শরীর থেকে হাজার হাজার কীট জন্মগ্রহণ করবে?'

সমালোচনা দূরে সরিয়ে রেখে বলা যায়, এই হল গান্ধীবাদের কৌশল, যাতে করে সমস্ত দোষগুলিকে তার ভুক্তভোগীর কাছে এমনভাবে উপস্থাপিত করা, যেন এইগুলিই তার বিশেষ অধিকার বা সুবিধা। যদি কোনও 'বাদ' বা মতবাদ মানুষকে মিথ্যা আশার, মিথ্যা সুরক্ষার প্রলোভনে লালায়িত করে ভোলাতে ধর্মকে আফিং-এর মতো ব্যবহার করেছে, তা হল গান্ধীবাদ। শেক্সপীয়রকে অনুসরণ করে তাই কেউ বলতে পারে : আপাতদৃষ্টিতে মনোহারিত্ব! উদ্ভাবনী দক্ষতা! তোমার নামই গান্ধীবাদ!

IV

এমনই হল গান্ধীবাদ। এখন গান্ধীবাদ জেনে যাওয়ার পর 'গান্ধীবাদ কি আমাদের দেশের আইন হওয়া উচিত বা আইন হলে অস্পৃশ্যদের কী দশা হবে'—এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে মস্তিষ্কে বেশি আঁচড় কাটতে হবে না। সবথেকে নিচু হিন্দুর ভাগ্যের সঙ্গে তুলনায় এদের ভাগ্য কেমন হবে? গান্ধীর দেওয়া সমাজ-ব্যবস্থা চালু হলে কী হবে সে সম্পর্কে অনেক বলা হয়েছে। যেহেতু নীচু হিন্দু এবং অস্পৃশ্যরা একই রকম বংশপরম্পরাগত ভাবে নিঃস্ব শ্রেণীভুক্ত, অস্পৃশ্যদের ভাগ্য ভাল হতে পারে না। যদি কিছু হয়েই থাকে তবে তা আরও মন্দ হবে। কারণ ভারতবর্ষে এমনকী সবথেকে নিচু জাতের হিন্দুও—এমনকী আদিবাসী এবং পাহাড়ি উপজাতির মানুষও—যদিও শিক্ষার ক্ষেত্রে এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অস্পৃশ্যদের চেয়ে বেশি কিছু উপরে নেই, তবুও তারা অস্পৃশ্যদের চেয়ে পদমর্যাদায় উচ্চতর। এই ব্যাপার নয় যে তারা নিজেদের অস্পৃশ্যদের থেকে শ্রেষ্ঠ মনে করে। হিন্দু সমাজ তার অস্পৃশ্যদের থেকে শ্রেষ্ঠত্বের দাবিকে গ্রহণ করে। অস্পৃশ্যগণ সেইজন্য আজকের মতোই দুর্ভাগ্যের যন্ত্রণা ভোগ করে যাবে, যেমন দেশের উন্নতির সময় সে সব শেষে নিযুক্তি পাবে, এবং মন্দার সময় সেই প্রথম কর্মচ্যুত হবে।

গান্ধীবাদ অস্পৃশ্যদের এই ভাগ্য থেকে মুক্ত করতে কী করেছে? গান্ধীবাদ অস্পৃশ্যতা বিলোপ করার জন্য প্রকাশ্যে ঘোষণা করে। এটিকেই গান্ধীবাদের সর্বশ্রেষ্ঠ মহত্ত্ব বলে স্বীকার করা হয়। কিন্তু এই মহত্ত্ব বা গুণ বাস্তব জীবনে কী অর্থ (ব্যঞ্জনা) বোঝায়? গান্ধীবাদের এই গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব অস্পৃশ্যতা বিরোধের প্রকৃত মূল্যায়ন করতে হলে, এই অস্পৃশ্যতা মোচনের বা বিলোপের জন্য শ্রী গান্ধীর কার্যক্রমের সীমাকে ভাল করে বুঝা দরকার। 'হিন্দুরা অস্পৃশ্যদের ছোঁয়াছুঁয়িতে কিছু মনে করবে না' এর বেশি কিছু হয় কি? এটা কি অস্পৃশ্যদের শিক্ষা প্রাপ্তির অধিকারে উপর নিষেধাজ্ঞার বিলোপ বোঝায়? এই দুটি প্রশ্নকে আলাদা ভাবে বিচার করলে ভাল হবে।

প্রথম প্রশ্ন দিয়ে শুরু করলে, শ্রী গান্ধী বলেন না যে, একজন হিন্দু অস্পৃশ্যদের ছুঁলে স্নান করবে না। শ্রী গান্ধী যদি এটিকে দূষণ থেকে শুদ্ধিকরণ বলে কোনও আপত্তি করেন না, তাহলে এটা বোঝা শক্ত কী করে অস্পৃশ্যদের ছুঁলেই অস্পৃশ্যতা অন্তর্ধান করবে। অস্পৃশ্যতার কেন্দ্রে যে ধারণাটি আছে তা হল যে স্পর্শের দ্বারা দূষণ হয় এবং স্নানের দ্বারা তা থেকে মুক্ত হওয়া যায়। এটার দ্বারা কি হিন্দুদের

সাথে সামাজিক অঙ্গীভূত হওয়া বোঝায়? শ্রী গান্ধী নিশ্চিতভাবে বলেছেন যে অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের অর্থ এই নয় যে হিন্দু এবং অস্পৃশ্যদের মধ্যে পঙক্তি ভোজন এবং অন্তর্বিবাহ। শ্রী গান্ধীর অস্পৃশ্যতা বিরোধ-এর অর্থ যে অস্পৃশ্যদের অতি শূদ্র শ্রেণীভুক্ত না করে 'শূদ্র' শ্রেণীভুক্ত করতে হবে, এতে এর থেকে বেশি কিছু নেই। শ্রী গান্ধী কিন্তু এটা বিবেচনা করেননি যে পুরাতন শূদ্রেরা এই নতুন শূদ্রদের দলে গ্রহণ করবে কিনা। যদি তারা গ্রহণ না করে, তা হলে অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ একটি নির্বোধ প্রস্তাব, কারণ এটি তবুও অস্পৃশ্যদের একটি পৃথক সামাজিক শ্রেণী করে রাখবে। শ্রী গান্ধী সম্ভবত জানেন যে, অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ, শূদ্রদের দ্বারা অস্পৃশ্যদের একীভূত হওয়া ঘটতে দেবে না। সেইজন্যই বোধ হয় শ্রী গান্ধী অস্পৃশ্যদের একটি নতুন নামকরণ করেছিলেন। এই নতুন নাম পূর্বেই উপলব্ধি করে ঘটনা কী হতে পারে তা লিপিবদ্ধ করেছিল। অস্পৃশ্যদের 'হরিজন' নাম দিয়ে শ্রী গান্ধী এক ঢিলে দুই পাখি মেরেছিলেন। তিনি দেখিয়েছেন যে, শূদ্রদের দ্বারা অস্পৃশ্যদের একীভূতকরণ সম্ভব নয়। এই নতুন নাম দিয়ে তিনিও এই একীভূতকরণ-এর প্রতিকূলতা করেছিলেন এবং অসম্ভব করেছিলেন।

দ্বিতীয় প্রশ্নটির ব্যাপারে বলা যায় যে, এটা সত্যি যে গান্ধীবাদ হিন্দু শাস্ত্রের দ্বারা অস্পৃশ্যদের শিক্ষালাভের অধিকারের উপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞাকে তুলে নিতে চায় এবং তাদের শিক্ষা এবং জ্ঞানলাভের অনুমতি দিতে চায়। গান্ধীবাদের নিয়মে অস্পৃশ্যরা আইন বিষয় অধ্যয়ন করতে পারে, তারা চিকিৎসাবিদ্যা অধ্যয়ন করতে পারে, তারা ইঞ্জিনিয়ারিং বা তাদের ইচ্ছা অনুসারে যে-কোনও বিদ্যা অধ্যয়ন করতে পারে। এই পর্যন্ত খুব-ই ভাল। কিন্তু অস্পৃশ্যরা কি তাদের অধীত বিদ্যা এবং জ্ঞানের অবাধ ব্যবহার করতে পারবে? তারা কি তাদের পেশা নির্বাচন করার অধিকার পাবে? তারা কি আইন ব্যবসায়ী, চিকিৎসক এবং ইঞ্জিনিয়ার-এর বৃত্তি গ্রহণ করতে পারবে? এই সমস্ত প্রশ্নের গান্ধীবাদ যা দিয়েছে তা হল অত্যন্ত জোর দিয়ে উচ্চারিত 'না'।[১] অস্পৃশ্যরা তাদের বংশধারার বৃত্তিকেই অনুসরণ করবে। ওই বৃত্তিগুলি যে অপরিচ্ছন্ন, সেটা কোনও উত্তর নয়। এটাও ধর্তব্য নয় যে, ওই পেশাগুলি বংশগত হওয়ার পূর্বে তাদের উপর বল প্রয়োগ হয়েছিল এবং ইচ্ছানুসারে ছিল না। গান্ধীবাদের তর্ক হল যে, যা একবার নির্ধারিত হয়েছে তা চিরকালের জন্য নির্ধারিত, যদিও এটা ভুলভাবে নির্ধারিত। গান্ধীবাদ অনুসারে অস্পৃশ্যরা চিরন্তন মেথর বা ধাঙ্গড় হবে। এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই যে অস্পৃশ্যরা সেই অস্পৃশ্যতার

১. শ্রী গান্ধীর 'আর্টিকেলস্ অব্ ফেইথ' প্রবন্ধ। 'ইয়ং ইন্ডিয়া'-র ১৯২১ সালের ৬ই অক্টোবর সংখ্যায় বর্ণিত।

গোঁড়া পদ্ধতিই পছন্দ করবে। এই যে অস্পৃশ্যদের উপর একটা আবশ্যিক অজ্ঞতার অবস্থা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল হিন্দু শাস্ত্রের দ্বারা, তাতে ধাঙ্গড় বা মেথরের কাজকে সহনীয় করেছিল। কিন্তু গান্ধীবাদ যা একজন শিক্ষিত অস্পৃশ্যকে মেথরের কাজ করতে বাধ্য করায়, নিষ্ঠুরতা ছাড়া আর কিছুই নয়। গান্ধীবাদের এই অনুগ্রহ সব থেকে মন্দ চেহারায় একটি অভিশাপ। গান্ধীবাদের অস্পৃশ্যতা বিরোধী কর্মসূচীর এই দফাটি অত্যন্ত মায়াময়, অলীক। এতে কোনও গ্রহণযোগ্য বস্তু নেই।

V

গান্ধীবাদে আর কী আছে যা অস্পৃশ্যরা তাদের চূড়ান্ত মুক্তির রাস্তা খুলে দিতে পারে বলে গ্রহণ করতে পারে। এই অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে ভ্রান্ত মায়াময় আন্দোলন ছাড়া, গান্ধীবাদ 'সনাতনবাদ' যা গোঁড়া হিন্দুত্বের প্রাচীন নাম, এরই অন্য একটি রূপ। কী আছে গান্ধীবাদে যা গোঁড়া হিন্দুধর্মে খুঁজে পাওয়া যাবে না? হিন্দুধর্মে 'জাত' আছে, গান্ধীবাদেও 'জাত' আছে। হিন্দুধর্ম বংশানুক্রমিক পেশা বা বৃত্তির আইনে বিশ্বাস করে, গান্ধীবাদও তাই করে। হিন্দুধর্মে গো-পূজার ব্যবস্থা আছে। গান্ধীবাদেও তাই আছে। হিন্দুধর্ম কর্মের বিধানকে অনুমোদন করে, যা এই পৃথিবীতে মানুষের অবস্থার পূর্ব নির্ণায়ক, গান্ধীবাদও তাই করে। হিন্দুধর্ম শাস্ত্রের প্রাধিকার বা কর্তৃত্ব মেনে নেয়। গান্ধীবাদও তাই করে। হিন্দুধর্ম অবতারবাদে বিশ্বাস করে। গান্ধীবাদও তাই করে। হিন্দুধর্ম পুতুল-পূজায় বা মূর্তি-পূজায় বিশ্বাস করে, গান্ধীবাদও তাই করে। গান্ধীবাদ যা করেছে তা হল, হিন্দু ধর্ম এবং তার বদ্ধমূল ধারণাগুলির একটি দার্শনিক সত্যতা প্রতিপাদন করেছেন। হিন্দুধর্ম নীরস, এই অর্থে যে, এটি কতকগুলি নিয়মের সমাহার মাত্র, যার মুখের আকৃতি অত্যন্ত অমার্জিত এবং নিষ্ঠুর। গান্ধীবাদ একে একটি দর্শন ফিলোজফি জোগান দিয়েছে যা এর বাইরের অবয়বকে মসৃণ করেছে এবং এটিকে আকর্ষক ও মনোহারী বানাবার জন্য পরিবর্তন করেছে এবং সৌষ্ঠব প্রদান করেছে। হিন্দুধর্মের এই নগ্নতা আচ্ছাদন করতে গান্ধীবাদ কী দর্শন উপস্থাপনা করেছে? এই দর্শনটি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত আকারে বলা যেতে পারে। এটি সেই দার্শনিক তত্ত্ব যা বলে 'হিন্দুধর্মে যা আছে সবই ভাল, হিন্দুধর্মে যা আছে তার জনগণের মঙ্গলের জন্য প্রয়োজন।' যাঁরা ভলতেয়ার 'ক্যানডাইড' (Candide)-এর সঙ্গে পরিচিত আছেন তাঁরা নিশ্চয়ই চিনতে পারবেন যে এটি মাস্টার প্যাঙ্গিলস (Master Pangiloss)-এর দর্শন এবং ভলতেয়ার তাকে নিয়ে যে বিদ্রূপ করেছিলেন তাও স্মরণ করবেন। সন্দেহ নেই যে এটি তাঁদের পক্ষে শোভন হয় এবং তাদের স্বার্থের পরিপন্থী হয়। অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণন—তিনি তাঁর প্রকৃষ্ট অনুভব থেকে কিংবা শুধুমাত্র স্তাবকতা করতে—আমরা এ বিষয়ে অনুসন্ধান বন্ধ করতে চাই না—এতদূর গিয়েছিলেন যে শ্রী গান্ধীকে 'এই পৃথিবীর ভগবান' বলে বর্ণনা করেছেন। অস্পৃশ্যরা এটার কী অর্থ বোঝে? তাদের কাছে এটার অর্থ হল: গান্ধী নামে এই ঈশ্বর উৎপীড়িত জাতিকে সান্ত্বনা দিতে এসেছিলেন। তিনি ভারতবর্ষকে দেখেছিলেন এবং পরিবর্তন করেছিলেন এই বলে নয় যে, 'যদি হিন্দুরা জাত-প্রথার নিয়মগুলি মেনে চলে তবেই সব কিছু ভাল এবং ভাল হবে।' তিনি উৎপীড়িত জাতিকে বলেছিলেন,

'আমি এসেছি এই জাতির নীতিকে পূর্ণ করতে। কোনও উপাধি, কোনও ছিটেফোঁটাও আমি এর থেকে বাদ দিতে দেব না।'

গান্ধীবাদ অস্পৃশ্যদের কী আশা প্রদান করে? অস্পৃশ্যদের কাছে হিন্দুধর্ম বিভীষিকার একটি যথার্থ প্রকোষ্ঠ। বেদের, স্মৃতির এবং শাস্ত্রের অভ্রান্ততা ও পবিত্রতা, জাত প্রথার কঠোর আইন, কর্মের হৃদয়হীন নিয়ম, এবং জন্মের দ্বারা পদমর্যাদা পাওয়ার নির্বোধ নিয়ম, যা হিন্দু ধর্ম অস্পৃশ্যদের নিপীড়িন করার যথার্থ অস্ত্র। এই যে যন্ত্রগুলি যা অস্পৃশ্যদের জীবনকে অসম্পূর্ণাঙ্গ, বিস্ফোরিত এবং বিশীর্ণ করেছে গান্ধীবাদের হৃদয়ে অক্ষত এবং অম্লান ভাবে নিহিত রয়েছে। কী করে অস্পৃশ্যরা বলতে পারে যে গান্ধীবাদ, তাদের কাছে হিন্দু ধর্মের মতো বিভীষিকার প্রকোষ্ঠ নয়, বা এটা তাদের কাছে স্বর্গ। অস্পৃশ্যদের একমাত্র প্রতিক্রিয়া, এবং অত্যন্ত স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া হবে 'গান্ধীবাদ' থেকে দূরে পালানো।

গান্ধীর অনুসরণকারীরা বলতে পারেন যে আমি যা, বলেছি তা পুরানো গান্ধীবাদের ক্ষেত্রে প্রয়োজ্য। এখন একটি নতুন গান্ধীবাদ হয়েছে—জাত-হীন গান্ধীবাদ। শ্রী গান্ধীর সাম্প্রতিককালের একটি বক্তব্য[১] যেখানে তিনি বলেছেন জাত হল 'কালাসঙ্গতি' (কালের পক্ষে বেমানান)—তা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। সমাজ সংস্কারকরা শ্রী গান্ধীর এই ঘোষণায় স্বাভাবিক ভাবেই আনন্দিত হয়েছিলেন। শ্রী গান্ধীর মতো লোক, হিন্দুদের উপর যাঁর অত্যন্ত প্রভাব আছে, যিনি একজন সামাজিক প্রতিক্রিয়াশীল, এর অত্যন্ত ক্ষতিকর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন, যিনি জাত-প্রথার নায়ক হিসাবে দাঁড়িয়েছেন, যিনি এমন সব তর্ক, যার দ্বারা কোনটা ভাল কোনটা মন্দ কিছুই পার্থক্য করা যায় না, চিন্তাশক্তিহীন হিন্দুদের কাছে তুলে ধরে তাদের প্রতারিত করেছেন এবং বোকা বানিয়েছেন, তিনি যে তাঁর পূর্বের বক্তব্য প্রত্যাহার করে নিয়েছেন, তাতে কে না আনন্দিত হবে কিন্তু এটা কি সত্যিই কোনও আনন্দিত হওয়ার মতো ব্যাপার? এতে কি গান্ধীবাদের চরিত্রের বদল হয়? এর দ্বারা কি গান্ধীবাদ একটি নতুন বা ভাল 'বাদে' পরিণত হয়, তার আগের থেকে। যাঁরা শ্রী গান্ধীর এই প্রত্যাহারে অনুপ্রাণিত বা উদ্বুদ্ধ হন তাঁরা দুটো জিনিস ভুলে যান। প্রথমত, শ্রী গান্ধী যা বলেছেন তা হল যে, জাত-প্রথা একটি কালাসঙ্গতি বা কালের সঙ্গে বেমানান। তিনি বলেন না যে, এটি একটি অভিশপ্ত বস্তু। এটা মনে হতে পারে যে, শ্রী গান্ধী জাত-প্রথার পক্ষে নন। কিন্তু শ্রী গান্ধী এটা বলেননি যে তিনি বর্ণ প্রথার বিরুদ্ধে। এবং শ্রী গান্ধীর বর্ণ প্রথাটি কী? এটা

১. 'হিন্দুস্থান টাইম্‌স', ১৫ই এপ্রিল ১৯৪৫।

সরলভাবে জাত-প্রথার-ই একটি নতুন নাম এবং জাত-প্রথার সমস্ত মন্দ তত্ত্বগুলি এর মধ্যে আছে।

শ্রী গান্ধীর এই ঘোষণার অর্থ এই নয় যে, গান্ধীবাদে কোনও মৌলিক পরিবর্তন হয়েছে। এটা গান্ধীবাদকে অস্পৃশ্যদের গ্রাহ্য করতে পারে না। অস্পৃশ্যদের তবুও বলার কারণ থাকবে : 'হে ভগবান! এই সেই গান্ধী, যিনি আমাদের ত্রাণকর্তা?'

পরিশিষ্ট-I

শ্রদ্ধানন্দের বক্তব্য
অস্পৃশ্যদের জন্য বারদৌলি কার্যক্রম

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ এবং পণ্ডিত মোতিলাল নেহরু, কংগ্রেসের মহাসচিব-এর মধ্যে অস্পৃশ্যদের উন্নতির জন্য যোজনা প্রণয়নের জন্য ১৯২২-এ নিযুক্ত কংগ্রেস উপ-সমিতির বিষয়ে পত্রালাপ

(১) স্বামিজীর পত্র

প্রতি

মহাসচিব
নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি
শিবির দিল্লি।

আমি ধন্যবাদের সহিত আপনার পত্রসংখ্যা ৩৩১ এবং ৩৩২-এর প্রাপ্তি স্বীকার করি, যার সঙ্গে ওয়ার্কিং কমিটি এবং অল্ ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির অস্পৃশ্যতার ব্যাপারে প্রস্তাবগুলি অঙ্গীভূত করা হয়েছে। আমি কষ্টের সহিত লক্ষ্য করেছি যে, অল্ ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির প্রস্তাবটি বর্তমানে যে শব্দে প্রকাশিত, তার মধ্যে কমিটিতে গৃহীত প্রস্তাবের সমস্তটুকু অন্তর্ভুক্ত হয়নি।

ব্যাপারটি হল : আমি ২৩শে মে ১৯২২ তারিখে ভূতপূর্ব মহাসচিব মিঃ বিঠলভাই প্যাটেলকে নিম্নলিখিত পত্রটি পাঠিয়েছিলাম, যা দেশের মুখ্য দৈনিক গুলিতে প্রকাশিত হয়েছিল।

'প্রিয় মিঃ প্যাটেল,

একটা সময় ছিল (ইয়ং ইন্ডিয়া ২৫শে মে ১৯২১ দ্রষ্টব্য) যখন মহাত্মাজি অস্পৃশ্যতার প্রশ্নটি কংগ্রেসের কার্যাবলীর একেবারে সম্মুখের দিকে রাখতেন। আমি এখন দেখছি যে অস্পৃশ্য জাতিদের উন্নয়নের প্রশ্নটিকে একটি অন্ধকার কোনার দিকে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে। যখন 'খাদি' আমাদের অনেক ভাল ভাল কর্মীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, এবং এর জন্য প্রচুর অর্থ বরাদ্দ হয়েছে, অন্তত এই বৎসরের

জন্য, যখন একটি মজবুত (ক্ষমতাশালী) সাব্-কমিটি জাতীয় শিক্ষার দিকটি দেখাশোনার জন্য নিযুক্ত হয়েছে, এর জন্য 'নিধি' ফান্ড তৈরির জন্য বিশেষ আবেদন করা হবে, অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের প্রশ্নটি, আহমেদাবাদ, আহমেদনগর এবং মাদ্রাজের জন্য সামান্য অনুদান করে, মূলতুবি রাখা হয়েছে। আমার অভিমত এই যে, যখন আমলাতন্ত্রের দ্বারা আমাদের এক সংখ্যাগরিষ্ঠ ছয় কোটি ভাইবোনকে আমাদের বিরুদ্ধে লাগিয়ে দিয়েছে তখন এই খাদির যোজনাটিও সম্পূর্ণরূপে সফল হবে না। এই ওয়ার্কিং কমিটির ওয়ার্কিং কমিটি সদস্যগণ, বোধ হয় জানেন না যে, এদিকে আমাদের নিপীড়িত ভাইয়েরা 'খাদি' ছেড়ে দিচ্ছে এবং বিদেশি সস্তা কাপড় কিনতে শুরু করেছে। আমি এই প্রসঙ্গে অল্ ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির এ. আই. সি. সি. আগামী সভা, যা লক্ষ্ণৌতে ৭ই জুন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে, তাতে নিম্নলিখিত এই প্রস্তাব উত্থাপন করতে চাই যে, অস্পৃশ্য জাতির ব্যাপারে প্রস্তাবটিকে কার্যকরী করতে অল্ ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির তিনজন সদস্য নিয়ে একটি (সাব-কমিটি) উপসমিতি নিযুক্ত করা হোক, যে প্রচারকার্যের জন্য পাঁচলাখ টাকা তাদের কাছে জমা রাখা হোক, এবং অনুদানের জন্য সমস্ত দরখাস্ত ভবিষ্যতে এই সাব-কমিটির কাছে বিলিব্যবস্থার জন্য প্রেরিত হবে।' আমার প্রস্তাবটি ওয়ার্কিং কমিটি দ্বারা সংশোধিত হয়েছিল এবং এটি নিম্নরূপে বর্ণিত হয়েছিল—

'এই কমিটি ওয়ার্কিং কমিটি-র এতদ্দ্বারা সর্বশ্রী স্বামী শ্রদ্ধানন্দ, শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু এবং সর্বশ্রী জি. বি. দেশপাণ্ডে এবং আই. কে. যাজ্ঞিকদের নিয়ে একটি কমিটি নিযুক্ত করছে, যার কাজ হবে সমস্ত দেশব্যাপী অস্পৃশ্যদের অবস্থার উন্নতিকল্পে উপযুক্ত উপায়াদি সন্নিবিষ্ট করে একটি যোজনা প্রস্তুত করবে এবং তা Working Committee-র পরবর্তী সভায় কমিটির বিবেচনার জন্য উপস্থাপিত করা হবে, এবং বর্তমানে এই যোজনার জন্য দুই লাখ টাকা সংগ্রহ করা হবে।'

মিঃ প্যাটেল আমাকে ওয়ার্কিং কমিটির এই প্রস্তাবিত সিদ্ধান্তটি সম্পূর্ণরূপে (সাকুল্যে) স্বীকার করতে বলেছিলেন। আমি ওয়ার্কিং কমিটির এই সিদ্ধান্ত মেনে নিতে পারিনি এবং অল্ ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির সেই প্রথম বৈঠকেই পাঁচ লাখের পরিবর্তে দুই লাখ করা হয়, এই শর্তে যে, এর মধ্যে এক লাখ 'কংগ্রেস কমিটি' তার কাছে মজুত ভাণ্ডার থেকে বিতরণ করবে, নগদ টাকায়, এবং বাকি টাকার জন্য একটি আবেদন করা হবে।

মিঃ রাজাগোপালাচারিয়ার, ওয়ার্কিং কমিটির তরফ থেকে প্রস্তাব দিয়েছিলেন যে, কংগ্রেস নিধি (Fund) বা ভাণ্ডার থেকে যে পরিমাণ অর্থ দেওয়া হবে তা এখনই

কুয়ো থেকে নির্বিবাদে জল নেওয়ার ব্যাপারে কোনও বিধিনিষেধ নেই। কিন্তু কোনও জায়গায় বারদৌলী কার্যক্রমের নোটের পরিপ্রেক্ষিতে নতুন কুসংস্কারে হচ্ছে। আমি আমার সাম্প্রতিক আম্বালা ক্যান্টনমেন্ট, লুধিয়ানা, বাটালা, অমৃতসর এবং জাণ্ডিয়ালা পরিদর্শনে গিয়ে দেখেছি যে, অস্পৃশ্যদের অক্ষম দূরীকরণের ব্যাপারটাকে অবহেলা করা হচ্ছে। দিল্লীর ভিতরে এবং আ 'দলিতোদ্ধার সভা', আমি যার সভাপতি, কংগ্রেসের চেয়ে প্রশংসাযোগ্য কাজ আমি মনে করি যে, বারদৌলী কার্যক্রমের ওই ৪নং সূচিতে যথাযথ সঠিক পরিবর্তন না করলে, যে কাজটিকে আমি কংগ্রেসের সমস্ত কার্যাবলীর মধ্যে স অংশ বলে মনে করি এবং তা ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

অনুগ্রহ করে নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি সভাপতির কাছে পেশ করবেন এব তিনি অনুমতি দেন তবে আমি অল্ ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির পরবর্তী সভায় উত্থাপন করব। বারদৌলী প্রস্তাবের ৪নং তালিকার নোটের পরিবর্তে নিম্নলি নোটটি বিবেচনা করা হোক।

'অস্পৃশ্যবর্গের নিম্নলিখিত দাবিগুলি এখনই পূরণ করতে হবে, যথা— অসবর্ণের নাগরিকের সাথে তাদের একই কার্পেটে বসতে দিতে হবে; সর্বসাধারণের কুয়ো থেকে তাদের জল তোলার অধিকার দিতে হবে; (গ) জা স্কুলে এবং কলেজে তাদের ছেলেমেয়েদের ভর্তি হতে দিতে হবে এবং তথাকা উচ্চবর্ণের ছাত্রদের সঙ্গে মেলামেশা করতে দিতে হবে।'

আমি অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির সদস্যদের মনে ছাপ দিতে চাই যে, বাক্যগুলির অত্যন্ত গুরুত্ব আছে। আমি কিছু ঘটনা জানি যেখানে অস্পৃশ্যবর্গে লোকেরা উচ্চবর্ণের নিপীড়নের বিরুদ্ধে খোলাখুলি বিদ্রোহ করতে প্রস্তুত এবং তাদে এই দাবিগুলি মেনে না নিলে তারা সরকারি আমলাবর্গের যন্ত্রের দ্বারা মার পড়বে।

৭ই জুন লক্ষ্ণৌতে অনুষ্ঠিত এ. আই. সি. সি-র সভায় আমার প্রথম প্রস্তাবগুলি গৃহীত হওয়ার পর, আমি মিঃ প্যাটেলকে আমার ওই ৪নং সূচির নোটের প্রস্তাবিত সংশোধনীটি মিটিং-এ উপস্থাপিত করতে বলেছিলাম। তিনি আমাকে বলেছিলেন যে, ওয়ার্কিং কমিটি এটি উপ সমিতির সাব-কমিটি (Sub Committee) নিকট পাঠিয়ে দেবে এবং আমাকে ঐগুলির জন্য চাপ না দেওয়ার জন্য বলেন। আমি তখন রাজি হয়েছিলাম। কিন্তু আমি ওয়ার্কিং কমিটির সেই প্রস্তাব (সিদ্ধান্ত) যাতে আমার প্রস্তাবগুলি অস্পৃশ্যতা সাব কমিটিতে পাঠানো হয়েছে, হবে বলে সিদ্ধান্ত হয়েছে,

তার প্রতিলিপি এখনও পাইনি।

অস্পৃশ্যতার প্রশ্নটি দিল্লী এবং দিল্লীর আশেপাশে অত্যন্ত গভীর এবং আমাকে এখনই এটির সঙ্গে লড়াই করতে হবে। কিন্তু সাব কমিটি খালি হাতে তার কাজ শুরু করতে পারে না, কারণ ওয়ার্কিং কমিটিকে কংগ্রেসের হয়ে অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের জন্য প্রয়োগ করার মতো উপায় অবলম্বনের জন্য কোনও যোজনা বানানোর পূর্বে অনেক রাজনৈতিক ব্যাপারে বিবেচনা করতে হবে। এমত পরিস্থিতিতে আমি ওই সাব কমিটির কোনও ব্যবহারেই আসব না এবং সেইজন্য আমি সদস্যপদ থেকে পদত্যাগ করলাম।

আপনার অনুগত
শ্রদ্ধানন্দ সন্ন্যাসী।

৩রা জুন, দিল্লি।

(২) সচিবের জবাব

প্রিয় স্বামীজি,

আপনার ৩রা জুন ১৯২২-এর চিঠিখানি আমার অফিসে ৩০ শে জুন প্রাপ্ত হই এবং ১৮ই জুলাই বোম্বাই-এ অনুষ্ঠিত ওয়ার্কিং কমিটির সভায় একটি সিদ্ধান্তে আমার কাছে প্রেরিত হয়েছে এই সমেত যে, সমস্ত ঘটনা যেন ব্যাখ্যা করা হয় এবং আপনাকে অনুরোধ করা হয় অস্পৃশ্যতা উপ সমিতি থেকে আপনার পদত্যাগপত্র যেন পুনর্বিবেচনা করা হয়।

আপনি বোধ হয় জানেন, যে, আমার জেল থেকে মুক্তির পূর্বে কী ঘটেছিল সে সম্বন্ধে আমি ব্যক্তিগত ভাবে জ্ঞাত নই। কিন্তু আমি ওয়ার্কিং কমিটির ১০ই জুন ১৯২২-এর সভায় উপস্থিত ছিলাম যখন ওই সিদ্ধান্তটি অনুমোদিত হয় যে, মিঃ দেশপাণ্ডেকে উক্ত উপসমিতির আহ্বায়ক নিযুক্ত করা হল। সেই সময় এমন কিছু উল্লেখ করা হয়নি যে কোনও বিশেষ ব্যক্তির ওই সাব কমিটির আহ্বায়কের পদে স্থানাপন্নের ব্যাপারে বোঝাপড়া ছিল, এবং সমস্ত প্রস্তাবটি অনুমোদিত হয়েছিল কেবলমাত্র টাকাপয়সা দানের ব্যাপারে আনুষ্ঠানিক রীতিনীতি পূরণের জন্য। এটা অনুভব করা হয়েছিল যে, কোনও খরচাদি অনুমোদন করার জন্য ওই উপসমিতির ব্যাপারে একটি অনুমোদিত সিদ্ধান্ত দরকার ছিল। সেই অনুসারে মিঃ দেশপাণ্ডেকে আহ্বায়ক হিসাবে নিযুক্ত করা হয়েছিল এবং প্রারম্ভিক কাজকর্মের খরচের জন্য ৫০০ (পাঁচশত টাকা) মঞ্জুর করা হয়েছিল। অনবধানবশত সিদ্ধান্তের যে খসড়া

করা হয়েছিল তার মধ্যে ওই পাঁচশত টাকার মঞ্জুরি উল্লেখ করতে ভুল হয়ে গিয়েছিল। এক্ষণে আপনি লক্ষ করবেন যে, অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের জন্য ওয়ার্কিং কমিটি (১০,০০০) দশ হাজার টাকা দিতে অনিচ্ছুক বলে নয়, কিন্তু যেজন্য ওই সিদ্ধান্তটি ঐভাবে প্রস্তুত করা হয়েছিল; তা আপনাকে আমি উপরে ব্যাখ্যা করেছি। আপনার সাব কমিটিকে যে কাজের ভার দেওয়া হয়েছিল তার গুরুত্ব বা আপনার দেওয়া পরামর্শকে যে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে না, বা তাকে লাঘব করে দেখা হচ্ছে এবং এটাই ওয়ার্কিং কমিটির ইচ্ছা বলে যে বলা হচ্ছে তার থেকে মিথ্যা আর কিছু হতে পারে না। আপনার দেওয়া পত্রটি ওয়ার্কিং কমিটির গত সভায় উপস্থাপনা করার পরেই পাঁচশত টাকা মঞ্জুরির কথাটা বাদ পড়ে যাওয়ার ব্যাপারটা আমাকে জানানো হয় এবং আমাকে এই ব্যাপারে আপনার সঙ্গে পত্রালাপ করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়। এটা অত্যন্ত দুঃখের ব্যাপার হবে যদি অস্পৃশ্যতার পুরো প্রশ্নটির উপরে আপনার জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতার উপকার থেকে সাব কমিটি বঞ্চিত হয়, এবং সেইজন্যই আমি আপনাকে আপনার সিদ্ধান্তটি পুনর্বিবেচনা করতে অনুরোধ করব এবং আপনার সাব কমিটি থেকে পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার করে আমার এলাহাবাদ অফিসে তারবার্তা পাঠাতে। আমার এটা বলার নিশ্চয়ই প্রয়োজন নেই যে, আপনার সাব কমিটির স্থিরীকৃত যে-কোনও সিদ্ধান্তই ওয়ার্কিং কমিটি দ্বারা গুরুত্বপূর্ণ সহকারে বিবেচিত হবে।

আলাদা কুয়ো এবং স্কুলের ব্যাপারে ওয়ার্কিং কমিটির সিদ্ধান্তের পরিবর্তনের বিষয়টি সম্বন্ধে জানাই যে, সব থেকে ভাল ব্যবস্থা হবে যে, আপনার সাব কমিটি ওই পরিবর্তনগুলি সুপারিশ করবে এবং ওয়ার্কিং কমিটি তা অনুমোদন করবে।

আমি ভীত যে, আপনি এলাহাবাদের 'দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্ট' এবং দিল্লীর 'দ্য কংগ্রেস পত্রিকা দুটিকে মঞ্জুরির ব্যাপার নিয়ে ভুল আশঙ্কায় ভুগছেন। প্রথমটির প্রসঙ্গে জানাই যে, ইউ. পি রাজ্য কমিটির একটি দরখাস্ত, যাতে 'ন্যাশনেলিস্ট জার্নাল্‌স লিমিটেড' কোম্পানিকে; রাজ্য কমিটির হাতে যে কোষ মঞ্জুরি করা হয়েছে তার থেকে ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার টাকা) কর্জ হিসাবে অগ্রিম দেওয়ার কথা বলা হয়েছে এবং দ্বিতীয়টির ব্যাপারে ঋণ মঞ্জুর করার দরখাস্তটি সার্বিক ভাবে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে।

বোম্বাই,

২৩ জুলাই, ১৯২২

আপনার আগ্রহান্বিত

মোতিলাল নেহরু

মহাসচিব

স্বামীজির প্রত্যুত্তর

প্রিয় পণ্ডিত মোতিলালজী,

আমি বোম্বাই থেকে লেখা ২৩ শে জুলাই ১৯২২-এর চিঠি, যাতে আমার অস্পৃশ্যতা সাব কমিটি থেকে পদত্যাগের ব্যাপারে লেখা হয়েছে তা পেয়েছি, এবং আমি দুঃখিত যে, আমি তা পুনর্বিবেচনা করতে অক্ষম। কারণ যে সমস্ত বিষয়গুলি আমি আমার প্রথম চিঠিতে উল্লেখ করেছিলাম তার অনেকগুলিই অবহেলিত হয়েছে।

(১) অনুগ্রহ করে মিঃ রাজাগোপালাচারিয়ারে কাছে জিজ্ঞস করে দেখবেন যে অল্ ইন্ডিয়া কংগ্রেসের কাছে যে কোষ আছে তার থেকে একলাখ টাকা দেওয়ার জন্য আমি প্রথমে প্রস্তাব করেছিলাম কিনা, তিনি তার কতকগুলি শব্দের সংশোধন করে একটি সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপিত করেছিলেন কিনা, যার অর্থ দাঁড়ায় যে, ওয়ার্কিং কমিটি যখন সাব কমিটির কর্ম যোজনাটি গ্রহণ করেছে তখন অস্পৃশ্যতা সাব কমিটিকে ওয়ার্কিং কমিটি যতদূর পর্যন্ত দিতে পারা যায় ততটাই মঞ্জুর করবে কিনা, এবং যখন আমি তার সংশোধনী গ্রাহ্য করিনি, তখন সভাপতি আমাকে একপাশে ডেকে নিয়ে গেলেন এবং সেই সময়ে প্রকৃত আর্থিক অবস্থাটা কী তা ব্যাখ্যা করলেন—এটা সত্যি কি না। যদি এটা সত্যি ঘটনা হয় তা হলে সেই সংশোধনীটি মূল সিদ্ধান্তটির সঙ্গে প্রকাশিত হল না কেন?

(২) আপনি মিঃ বিঠলভাই জে. প্যাটেলকে জিজ্ঞেস করেছিলেন কি যে অল্ ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির সদস্যগণ উপ সমিতির আহ্বায়ক হিসাবে আমার নাম প্রস্তাব করেননি এবং তিনি তখন বলেছিলেন কিনা—'যেহেতু স্বামী শ্রদ্ধানন্দের নাম ও সর্বপ্রথমে আছে, তখন তিনিই এই কমিটির আহ্বায়ক হবেন এবং এ ব্যাপারে আর নতুন করে কোনও প্রস্তাব উত্থাপন করার দরকার নেই।' আমি এ-ব্যাপারে ডাঃ আনসারির কাছ থেকে জানতে চেয়েছিলাম এবং তিনি আমাকে ১৭ই জুন ১৯২২ লিখে পাঠান যে, আমিই আহ্বায়ক নিযুক্ত হয়েছি। ডাঃ আনসারি আপনার কাছেই আছেন, আপনি তাঁর নিকট এ-ব্যাপারটা যাচাই করতে পারেন। আমি আশা করি মিঃ প্যাটেল এ-ব্যাপারে সবকিছু ভুলে যাননি।

(৩) তারপর অস্পৃশ্যদের মধ্যে কাজ করা এখানে অত্যন্ত জরুরি এবং তা কোনও কারণবশতই বিলম্ব করতে পারি না। অনুগ্রহ করে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির পরবর্তী মিটিং-এ আমার পদত্যাগ মঞ্জুর করিয়ে নিন, যার দ্বারা অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের ব্যাপারে আমার নিজের যোজনা কার্যকর করতে মুক্ত হতে পারি। জুলাই এর শেষ পর্যন্ত আমার অবস্থা এই ছিল। অমৃতসর এবং মিঞাওয়ালী জেলে আমার অভিজ্ঞতা

এবং সেখানে প্রাপ্ত সংবাদ সকল আমাকে দৃঢ়ভাবে প্রত্যয়ান্বিত করেছে যে, যতক্ষণ পর্যন্ত প্রাচীন আর্যদের নিয়মানুসারে ব্রহ্মচর্যকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত না করতে পারা যাবে এবং এই অস্পৃশ্যতার অভিশাপকে ভারতের সমাজ থেকে মুছে দিতে না পারা যাবে, কী কংগ্রেস কী অন্য কোনও দেশহিতৈষী সংস্থা, যা কংগ্রেসের বাইরেও স্বরাজ আনয়নের ক্ষেত্রে কোনও প্রচেষ্টাকেই সফলকাম করতে পারবে না। এবং যেহেতু জাতীয় আত্ম-উপলব্ধি এবং পৌরুষ সহকারে অস্তিত্বে থাকা স্বরাজ (স্বাধীনতা) ছাড়া অসম্ভব, আমি একজন সন্ন্যাসী হিসাবে এই দুইটি লক্ষ, যথা ব্রহ্মচর্য এবং জাতীয় ঐক্যের দিকে আমার জীবনের বাকি অংশটুকু নিয়োজিত করতে চাই।

২৩শে জুলাই

আপনার ইত্যাদি ইত্যাদি

শ্রদ্ধানন্দ সন্ন্যাসী

পরিশিষ্ট-II

অস্পৃশ্যদের জন্য রাজনৈতিক নিরাপত্তা

(রাউন্ড টেব্‌ল কনফারেন্সে) গোল টেবিল বৈঠকের নিকট ডাঃ ভীমরাও আর. আম্বেদকর এবং রাও বাহাদুর আর. শ্রীনিবাসন দ্বারা অস্পৃশ্যদের বিশেষ প্রতিনিধিত্বের দাবি সংবলিত অনুপূরক স্মারকলিপি।

গত বৎসর যে স্মারকলিপি, স্বশাসিত ভারতের সংবিধানে অস্পৃশ্যদের সুরক্ষার জন্য রাজনৈতিক নিরাপত্তার ব্যাপারে আমরা উপস্থাপিত করেছিলাম এবং যা লঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের জন্য উপ সমিতির (Minorities Sub-Committee) মুদ্রিত কার্যবিবরণীর ৩ নং পরিশিষ্ট হিসাবে পরিচিত এবং সংযোজিত তাতে আমরা দাবি করেছিলাম যে ওই সমস্ত নিরাপত্তার মধ্যে অন্যতম একটি হবে অস্পৃশ্যদের বিশেষ প্রতিনিধিত্ব। কিন্তু আমরা সেই সময় সেই সমস্ত বিশেষ প্রতিনিধিত্বের বিশদ বিবরণের প্রয়োজন অনুসারে কোনও পরিভাষা দিইনি। তার কারণ এই ছিল যে, আমাদের এই প্রশ্নে পৌঁছনোর পূর্বেই সংখ্যালঘু উপসমিতির কার্যবিবরণী সমাপ্ত হয়ে যায়। আমরা এখন সেই ত্রুটিকে দূর করার জন্য এই অনুপূরক স্মারকলিপি উপস্থাপিত করতে চাই, যার দ্বারা সংখ্যালঘু উপসমিতি যদি এই বৎসরেই প্রশ্নটিকে বিবেচনা করতে চায়, প্রয়োজনীয় বিশদ তথ্যাদি তার সম্মুখেই পাবে।

(১) বিশেষ প্রতিনিধিত্বের আয়তন

ক) প্রাদেশিক বিধানসভায় বিশেষ প্রতিনিধিত্ব—

(১) বাংলা, মধ্যপ্রদেশ, অসম, বিহার এবং ওড়িশা, পঞ্জাব এবং যুক্তপ্রদেশে, অস্পৃশ্যবর্গ, সাইমন কমিশন এবং ভারতীয় কেন্দ্রীয় কমিটি দ্বারা নিরূপিত জনসংখ্যার অনুপাতে প্রতিনিধিত্ব পাবে।

(২) মাদ্রাজে, অস্পৃশ্যবর্গ শতকরা বাইশ ভাগ (২২%) প্রতিনিধিত্ব পাবে।

(৩) বোম্বাই প্রদেশে,

(ক) যদি সিন্ধুপ্রদেশ বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অংশ হিসাবে চলতে থাকে; তবে অস্পৃশ্যবর্গ শতকরা ষোলো ভাগ (১৬%) প্রতিনিধিত্ব পাবে।

(খ) যদি সিন্ধুপ্রদেশ বোম্বাই প্রেসিডেন্সি থেকে পৃথক হয়ে যায় তবে অস্পৃশ্যবর্গ

সেই পরিমাণ প্রতিনিধিত্ব পাবে, যা ওই প্রেসিডেন্সির মুসলমানগণ পাবে—কারণ এই দুই গোষ্ঠীই জনসংখ্যায় সমান।

গ) সংঘীয় আইনসভায় বিশেষ প্রতিনিধিত্ব—

সংঘীয় আইনসভার দুই সদনেই অস্পৃশ্যবর্গ ভারতবর্ষে তাদের জনসংখ্যার অনুপাতে প্রতিনিধিত্ব পাবে।

সংরক্ষণ

আমরা বিধানসভায় (আইনসভায়) এই অনুপাত নির্ধারণ করেছি নিম্নলিখিত বিষয়গুলি মেনে নিয়ে—

(১) আমরা মেনে নিয়েছি যে অস্পৃশ্যদের জনসংখ্যার যে রাশিগুলি সাইমন কমিশন কর্তৃক (১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪০) এবং ভারতীয় কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক (রিপোর্ট, পৃষ্ঠা ৪৪) তা যথেষ্ট নির্ভুল এবং আসন বিলির জন্য আধার হিসাবে পরিগণিত বলে যা স্বীকৃত হবে।

(২) আমরা মেনে নিয়েছি যে, সংঘীয় আইনসভা সমগ্র ভারত নিয়ে গঠিত হবে এবং সে, ক্ষেত্রে ভারতীয় রাজ্যগুলিতে অস্পৃশ্যদের জনসংখ্যা, কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে তাদের জনসংখ্যা, এবং বাদ দেওয়া অঞ্চলগুলির জনসংখ্যা—তাছাড়া গভর্নরদের প্রদেশগুলির জনসংখ্যা সংঘীয় আইনসভায় অস্পৃশ্যদের প্রতিনিধিত্বের সংখ্যা নিরূপণের ব্যাপারে একটি অতিরিক্ত দফা হবে।

(৩) আমরা এও মেনে নিয়েছি যে, ব্রিটিশ ভারতের প্রদেশগুলির প্রশাসনিক ক্ষেত্রগুলি এখন যেমন আছে তেমনই থাকবে।

কিন্তু যদি জনসংখ্যার এই অঙ্কগুলির মান্যতা বা স্বীকৃতিকে আপত্তি করা হয়, যেহেতু কিছু স্বার্থান্বেষী দল এরকম করার জন্য শাসানি দিচ্ছে, এবং যদি নতুন জনগণনায় অস্পৃশ্যবর্গকে কম অনুপাতে দেখানো হয়, অথবা যদি প্রদেশগুলির প্রশাসনিক অঞ্চলের পরিবর্তন করা হয়, যার দ্বারা জনসংখ্যার এই ভারসাম্য বিঘ্নিত হয়, তবে অস্পৃশ্যগণ তাদের প্রতিনিধিত্বের অনুপাতের পরিবর্তন করবার অধিকার এবং এমনকী গুরুত্ব দাবি করার অধিকারকে আপাতত প্রয়োগ না করে ভবিষ্যতের জন্য জমা রাখবে। সেইরকম ভাবে যদি সর্বভারতীয় মহাসংঘ গঠিত না হয়, তারা সংঘীয় আইনসভায় তাদের প্রতিনিধিত্বের অনুপাতকে পূর্বে নির্ধারিত অনুপাতের সঙ্গে সমন্বয় সাধন করতে রাজি হবে।

(২) প্রতিনিধিত্বের প্রক্রিয়া

১. অস্পৃশ্যবর্গদের প্রাদেশিক এবং কেন্দ্রীয় আইনসভায় পৃথক নির্বাচক মণ্ডলীর মাধ্যমে, যা তাদেরই ভোটদাতা দ্বারা গঠিত, প্রতিনিধি নির্বাচনের অধিকার থাকবে।

কেন্দ্রীয় অথবা যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভার উচ্চতর কক্ষে তাদের প্রতিনিধিত্বের জন্য যদি প্রাদেশিক আইনসভার সদস্য দ্বারা পরোক্ষ নির্বাচনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, অস্পৃশ্যবর্গেরা তাদের পৃথক নির্বাচন মণ্ডলীর অধিকারকে ত্যাগ করবে, যতদূর পর্যন্ত তাদের উচ্চ কক্ষে প্রতিনিধিত্বের ব্যাপারটি সংশ্লিষ্ট, কেবলমাত্র এইটুকু শর্তে যে, যে-কোনও রকম সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের পদ্ধতিতে তাদের নির্ধারিত অংশের জন্য তাদের জামিন দিতে হবে।

২. অস্পৃশ্যবর্গের জন্য পৃথক নির্বাচকমণ্ডলীর ব্যবস্থাকে সংযুক্ত নির্বাচকমণ্ডলী এবং সংরক্ষিত আসন পদ্ধতির দ্বারা স্থানান্তরিত হবে না, কেবলমাত্র নিম্নলিখিত শর্তগুলি পূরণের ব্যতিক্রম ছাড়া :

(ক) কোনও আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রতিনিধিদের দ্বারা এবং যার মধ্যে অস্পৃশ্যবর্গের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রতিনিধি শামিল থাকবে, গণভোটের দাবি করা হবে এবং তা অনুষ্ঠিত হবে।

(খ) কুড়ি বছর পর্যন্ত এবং যতদিন না সর্বজনীন বয়স্ক ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়, ততদিন এইরূপ গণভোট (Refarendum) করা যাবে না।

(৩) অস্পৃশ্যবর্গের পরিভাষার প্রয়োজনীয়তা

অতীতে অস্পৃশ্যবর্গের প্রতিনিধিত্বের ব্যাপারটির সাংঘাতিকভাবে অপব্যবহার করা হয়েছে, যেহেতু অস্পৃশ্যবর্গের বাইরের লোককে প্রাদেশিক আইনসভায় তাদের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য মনোনীত করা হয়েছে, এবং এরকম ব্যাপারও খুব অবিদ্যমান নয় যে, কোনও ব্যক্তি/ব্যক্তিগণ অস্পৃশ্যবর্গভুক্ত না হওয়া সত্ত্বেও তাদের অস্পৃশ্য-বর্গের প্রতিনিধি হিসাবে মনোনয়ন করিয়ে নিয়েছে। এই অপব্যবহারটি হয়েছে, কারণ গভর্নরকে যেমন অস্পৃশ্যবর্গের প্রতিনিধি মনোনীত করার অধিকার দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু তাঁর মনোনয়নকে অস্পৃশ্যবর্গের ব্যক্তিদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার কথা বলা হয়নি। যেহেতু নতুন সংবিধানে মনোনয়নের পরিবর্তে নির্বাচন প্রতিস্থাপিত হবে, এই অপব্যবহারের আর কোনও সুযোগ থাকবে না। কিন্তু তাদের এই বিশেষ প্রতিনিধিত্বের উদ্দেশ্যকে পরাস্ত বা বানচাল করার কোনও রকম ফাঁক-ফোকর না রাখার জন্য আমরা দাবি করছি :

(১) যে অস্পৃশ্যবর্গেরা কেবলমাত্র তাদের পৃথক নির্বাচনমণ্ডলী পাওয়ার অধিকারী হবেন না, তাঁদের নিজস্ব লোকদেরই প্রতিনিধিত্ব পাওয়ার অধিকারী হবেন।

(২) প্রত্যেক প্রদেশে অস্পৃশ্যবর্গ কঠোরভাবে সংজ্ঞিত (Defined) হবে, যার অর্থ হবে সেই সমস্ত ব্যক্তি সেই স্থানে প্রচলিত অস্পৃশ্যতা ব্যবস্থার দ্বারা উৎপীড়িত বা দমিত এবং যাদের নাম নির্বাচনের উদ্দেশ্যে একটি তালিকায় তালিকাভুক্ত।

(৪) 'নামকরণ পদ্ধতি'

প্রশ্নটির এই অংশটি নিয়ে বিবেচনা করার ক্ষেত্রে আমরা উল্লেখ করতে পারি যে, অস্পৃশ্যবর্গের বিদ্যমান নামকরণের পদ্ধতির ব্যাপারে অস্পৃশ্যবর্গের দ্বারা, যাঁরা এ-বিষয়ে চিন্তাভাবনা করেছেন এবং বাইরের লোকেদের, যাঁরা তাদের ব্যাপারে আগ্রহান্বিত, আপত্তি আছে। এটি অত্যন্ত মর্যাদাহানিকর এবং অবজ্ঞাপূর্ণ, এবং নতুন সংবিধান খসড়া তৈরি করার সময় সমস্ত রকম কার্যালয় সম্বন্ধীয় ব্যাপারে বর্তমান নামকরণের পরিবর্তনের সুযোগ নেওয়া যেতে পারে। আমরা মনে করি তাদের নন-কাস্ট হিন্দুস, হিন্দুস প্রোটেস্টন অথবা নন-করফারমিস্ট হিন্দুস কিংবা অন্য কিছু নাম অস্পৃশ্যবর্গের পরিবর্তে দেওয়া যেতে পারে। কোনও বিশেষ নামকরণের ব্যাপারে চাপ দেওয়ার অধিকার আমাদের নেই। আমরা কেবল তাদের বিবেচনার জন্য উপস্থাপিত করতে পারি, এবং আমরা বিশ্বাস করি যে, যদি সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করা হয়, অস্পৃশ্যবর্গ তাদের পক্ষে যা যথাযথ বলে মনে হবে তা গ্রহণ করতে দ্বিধা করবে না।

ভারতের সমস্ত প্রান্ত থেকে, অস্পৃশ্যবর্গদের কাছ থেকে আমরা এই সমস্ত দাবি, যা এই স্মারকলিপিতে বর্ণিত হয়েছে, তার সমর্থনে বহু তারবার্তা পেয়েছি।

৪ঠা নভেম্বর ১৯৩১

পরিশিষ্ট-III

'সংখ্যালঘু চুক্তি'

মুসলমান, অস্পৃশ্য, ভারতীয় ক্রিশ্চান, ইঙ্গ-ভারতীয় এবং ইউরোপীয়দের দ্বারা সংযুক্তভাবে উপস্থাপিত সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানের ব্যবস্থাসমূহ।

সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের দাবি

১) কোনও ব্যক্তিই তার জন্ম, ধর্ম, জাতি অথবা পেশাগত কারণে সর্বসাধারণীয় বা সরকারি নিযুক্তি, ক্ষমতা বা সম্মান ভোগের আসন প্রাপ্তি, অথবা নাগরিক সুবিধা ভোগের অধিকার প্রাপ্তি, এবং কোনও পেশা বা বৃত্তি গ্রহণের ক্ষেত্রে পক্ষপাতিত্বের শিকার হবে না।

২) কোনও সম্প্রদায়ের উপরে ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করে এমন কোনও পক্ষপাতমূলক আইন প্রণয়নের বিরুদ্ধে সংবিধানে সুরক্ষার ব্যবস্থা সংযোজিত করতে হবে।

৩) জনগণের মধ্যে শৃঙ্খলা ও নৈতিকতা রক্ষা সাপেক্ষে সমস্ত সম্প্রদায়কে সম্পূর্ণ ধর্ম পালনের স্বাধীনতা—যার অর্থ হল, যে কোনও ধর্ম সম্বন্ধে বিশ্বাসের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা, বিশ্বাস, পূজাপাঠ, আচরণ, অনুষ্ঠান, প্রচার, সংগঠন এবং শিক্ষার স্বাধীনতা সুনিশ্চিত করতে হবে।

কোনও ব্যক্তিই কেবলমাত্র বিশ্বাসের পরিবর্তনের জন্য কোনও নাগরিক অধিকার বা সুবিধা লাভ থেকে বঞ্চিত হবে না অথবা কোনও শাস্তি ভোগ করতে হবে না।

৪) তাদের নিজস্ব খরচায় কোনও দাতব্য ধর্মীয় বা সামাজিক প্রতিষ্ঠানের স্থাপনা, ব্যবস্থাপনা এবং পরিচালনা, এবং বিদ্যালয় বা অন্য কোনও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের স্থাপনা, ব্যবস্থাপনা এবং পরিচালনার অধিকার দিতে হবে।

৫) সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলির ধর্ম, সংস্কৃতি এবং ব্যক্তিগত আইনগুলির সুরক্ষা এবং শিক্ষা, ভাষা তথা দাতব্য প্রতিষ্ঠানের উন্নতি এবং সুরক্ষার ব্যবস্থা সংবিধানের অঙ্গীভূত করতে হবে এবং রাজ্য ও স্বয়ংশাসিত সংস্থার দ্বারা প্রদত্ত অনুদান বা সাহায্যের যথাযথ তাদের প্রাপ্য অংশ দিতে হবে।

৬) সমস্ত নাগরিকের নাগরিক অধিকার ভোগ করা সুনিশ্চিত করতে হবে এবং তার জন্য এই সমস্ত অধিকার ভোগ করার ক্ষেত্রে কোনওরূপ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকে আইনের চক্ষে একটি অপরাধ এবং তা শাস্তি পাওয়ার যোগ্য বলে বিবেচনা করতে হবে।

৭) কেন্দ্রীয় সরকারে এবং (রাজ্য) প্রাদেশিক সরকারগুলিতে মন্ত্রী পরিষদ (Cabinet) গঠনে যতদূর সম্ভব মুসলমান সম্প্রদায় এবং অন্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোক বেশ কিছু সংখ্যায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে এবং তা প্রথাগত হিসাবেই করতে হবে।

৮) কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক সরকারে সংবিধিবদ্ধ বিভাগ রাখতে হবে যা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে সুরক্ষা দান করবে এবং তাদের কল্যাণের উন্নতি সাধন করবে।

৯) সমস্ত সম্প্রদায়ই যারা এখন যে কোনও বিধানসভায় মনোনয়ন বা নির্বাচনের দ্বারা প্রতিনিধিত্বের সুযোগ পেয়েছে, সমস্ত বিধানসভাতেই পৃথক নির্বাচক মণ্ডলীর দ্বারা নির্বাচিত হয়ে প্রতিনিধিত্বের সুযোগ পাবে এবং সংখ্যালঘুরা প্রতিনিধিত্ব পাবে, যা পরিশিষ্টে বর্ণিত অনুপাতের কম হবে না, কিন্তু কোনও সংখ্যাগরিষ্ঠকেই সংখ্যালঘু অথবা সমকক্ষতে পরিণত করা চলবে না। কিন্তু এই শর্তে যে, দশ বৎসর অতিবাহিত হওয়ার পরে, পঞ্জাবের এবং বাংলার মুসলমান এবং অন্য প্রদেশের যে কোনও সংখ্যালঘুর পক্ষে সংযুক্ত নির্বাচনমণ্ডলী বা আসন সংরক্ষণ সহ সংযুক্ত নির্বাচনমণ্ডলী গ্রহণ করার জন্য পথ খোলা থাকবে—যদিও এই ব্যবস্থা সেই সম্প্রদায়ের মতামত নিয়েই হবে। সেইরূপ দশ বৎসর অতিবাহিত হওয়ার পর, কেন্দ্রীয় সংসদেও যে কোনও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য সংযুক্ত নির্বাচকমণ্ডলীর (আসন সংরক্ষিত/অসংরক্ষিত) প্রথা, সেই সম্প্রদায়ের অভিমত অনুসারে, গ্রহণ করার জন্য পথ খোলা থাকবে।

অন্ত্যজ বা অস্পৃশ্যদের ব্যাপারে সংযুক্ত নির্বাচকমণ্ডলী এবং আসন সংরক্ষণের, কুড়ি বছরের পৃথক নির্বাচকমণ্ডলীর অভিজ্ঞতা পর্যন্ত এবং এই সম্প্রদায়ের জন্য সার্বিক বয়স্ক ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত, কোনও পরিবর্তন করা চলবে না।

১০) প্রত্যেক প্রদেশে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের সম্পর্কে, একটি জনসেবা আয়োগ নিযুক্ত করতে হবে, এবং জনসেবার সমস্ত রকম নিয়োগ, কেবলমাত্র সেই অনুপাত বাদে যা সংরক্ষিত এবং গভর্নর জেনারেল বা গভর্নরদের দ্বারা মনোনয়নের দ্বারা

পূরণ করতে হবে তা বাদ দিয়ে, এই আয়োগের মাধ্যমে করতে হবে এবং তা এমনভাবে করতে হবে যার দ্বারা পৃথক পৃথক সম্প্রদায় তাদের প্রয়োজনীয় শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং দক্ষতা অনুসারে যথাযথ প্রতিনিধিত্ব পায়। আদেশ-নির্দেশপত্রে এই সমস্ত ব্যাপার সন্নিবেশিত করে গভর্নর জেনারেল এবং গভর্নরদের অবহিত করাতে হবে যার দ্বারা নিয়োগের ব্যাপারে এই নীতিটি সফলীভূত হয় এবং সেজন্য এই সেবা আয়োগের গঠন বা নির্মিতি সময়ান্তে পুনর্বিবেচনা করতে হবে।

১১) যদি কোনও বিল অনুমোদিত হয়, যা কোনও বিধানসভার কোনও নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্বকারী সদস্যের দুই-তৃতীয়াংশের অভিমত অনুসারে তাদের ধর্ম বা ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত কোনও সামাজিক নিয়মকে খারাপভাবে প্রভাবান্বিত করে, অথবা মৌলিক অধিকারের বিষয়ে এক-তৃতীয়াংশ সদস্য আপত্তি করে, ওই সমস্ত সদস্য ওই কক্ষের সভাপতির কাছে তাদের আপত্তি, ওই বিল অনুমোদিত হওয়ার এক মাসের মধ্যে, জানাতে পারবে, এবং অধ্যক্ষ (সভাপতি) তা গভর্নর বা গভর্নর জেনারেলের (যে অবস্থায় যেমন হবে তেমনই) নিকট প্রেরণ করবেন এবং তিনি তদনুসারে ওই বিলের কার্যকারিতা (সক্রিয়তা) এক বৎসরের জন্য স্থগিত রাখবেন, এবং সেই অবধির অন্তে সেই বিলটিকে সংশ্লিষ্ট বিধানসভায় পুনঃ বিবেচনার জন্য প্রেরণ করবেন। যখন এইরকম কোনও বিল আইনসভা দ্বারা পুনর্বিবেচিত হবে, এবং সংশ্লিষ্ট বিধানসভা সেই সমস্ত আপত্তির মীমাংসার্থে পুনর্বিচারপূর্বক সংশোধন বা ঈষৎ পরিবর্তন সাধন করতে অস্বীকার করবে, গভর্নর বা গভর্নর জেনারেল (যে ক্ষেত্রে যেমন হবে) তাঁর স্বকীয় বিবেচনা অনুসারে তাঁর সম্মতি দিতে বা না দিতে পারেন, এই শর্তে যে, এই বিলের বৈধতার বিরোধিতা সুপ্রিম কোর্টে করা যাবে যে কোনও দুইজন ঐরূপ প্রভাবিত সদস্যের দ্বারা এই অভিযোগে যে আইনটি তাঁদের কোনও মৌলিক অধিকারকে ক্ষুণ্ণ করেছে।

মুসলমানদের বিশেষ দাবি

A. উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশকে অন্যান্য প্রদেশের ভিত্তিতেই একটি গভর্নরের প্রদেশ বলে গঠিত করতে হবে এবং সীমান্তের সুরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত রকম ব্যবস্থা করতে হবে।

এখানে প্রাদেশিক বিধানসভা গঠনের ক্ষেত্রে মনোনয়নের সংখ্যা সার্বিক সংখ্যার শতকরা দশ ভাগের অধিক হবে না।

B. সিন্ধুকে বোম্বাই প্রেসিডেন্সী থেকে পৃথক করতে হবে এবং ব্রিটিশ ইন্ডিয়ার

অন্যান্য প্রদেশের মতো একটি গভর্নর শাসিত প্রদেশে পরিণত করতে হবে।

C. কেন্দ্রীয় আইনসভায় মুসলমানদের প্রতিনিধিত্ব ওই কক্ষের সর্বসাকুল্য সংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ হবে এবং তাদের প্রতিনিধিত্ব কেন্দ্রীয় আইনসভায় পরিশিষ্টে বর্ণিত অনুপাত হতে কোনও মতেই কম হতে পারবে না।

অস্পৃশ্যবর্গের বিশেষ দাবিসমূহ

A. সংবিধান সেই সমস্ত প্রথা বা রীতি রেওয়াজকে অচল বলে ঘোষণা করবে—যার দ্বারা রাজ্যের (রাষ্ট্রের) কোনও প্রজার উপর শাস্তির ব্যবস্থা করবে, অথবা অসুবিধাজনক কিংবা অক্ষমতাজনক অবস্থা চাপিয়ে দেবে অথবা নাগরিক অধিকার উপভোগের ক্ষেত্রে অস্পৃশ্যতার জন্য কোনও রকম বিভেদের সৃষ্টি করবে।

B. জনসেবার কার্যে নিযুক্তির ব্যাপারে এবং পুলিশ এবং মিলিটারি সেবায় নিয়োগের জন্য নথিভুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে উদারতার সঙ্গে আচরণ করতে হবে।

C. পঞ্জাবের অস্পৃশ্যবর্গকে পঞ্জাব ভূমি হস্তান্তর আইনের সুফল বা ফায়দা ভোগ করতে দিতে হবে।

D. কার্যকারিণী স্বত্বাধিকারী দ্বারা কোনওরূপ ক্ষতিকর কার্য বা স্বার্থের অবহেলার বিরুদ্ধে গভর্নর কিংবা গভর্নর জেনারেলের নিকট প্রতিকারের জন্য আপিল করার অধিকার দিতে হবে।

E. অস্পৃশ্যবর্গ পরিশিষ্টে বর্ণিত প্রতিনিধিত্ব (তার চেয়ে কম নয়) পাবে।

অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান সম্প্রদায়ের বিশেষ দাবি

A. ৮নং উপসমিতি (Services) দ্বারা স্বীকৃত দাবিগুলির উদারতার সঙ্গে ব্যাখ্যা বা অনুবাদ, সেইভাবে যাতে, এই সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্যসূচক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে, জনসেবায় নিয়োগের দাবির ব্যাপারে, করতে হবে যার দ্বারা তারা যথাযথ মানে জীবনযাত্রা নির্বাহ করতে পারে।

B. এদের নিজস্ব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির শাসনব্যবস্থা পরিচালনা এবং নিয়ন্ত্রণের অধিকার দিতে হবে, উদাহরণ—ইউরোপীয় শিক্ষাব্যবস্থা—মন্ত্রীর দ্বারা নিয়ন্ত্রণ সাপেক্ষে। বর্তমান সাহায্য ব্যবস্থা অনুসারে উদার এবং যথাযথ সাহায্য অনুদান এবং বৃত্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

C. ভারতবর্ষে অন্য সম্প্রদায়ের দ্বারা প্রাপ্ত অধিকারের ন্যায় জুরির বিচারের

অধিকার—যা জুরিদের আইনসম্মত ভাবে জাত কিনা, বা বংশধররূপে উদ্ভূত কি না তার প্রমাণের শর্ত ছাড়াই পাওয়া যাবে এবং অভিযুক্ত ব্যক্তির একজন ইউরোপিয়ান বা ভারতীয় জুরির দ্বারা আইনত বিচারের অধিকার।

ইউরোপিয়ান সম্প্রদায়ের বিশেষ দাবি

A. ভারতবর্ষে জাত সমস্ত প্রজার ন্যায় সমস্ত ঔদ্যোগিক এবং বাণিজ্যিক ক্রিয়াকলাপের সুবিধা এবং অধিকার।

B. ফৌজদারি মামলায় অপরাধীর বিচারের বর্তমান পদ্ধতির সংরক্ষণ এবং গভর্নর জেনারেলের অনুমতি ছাড়া এই সমস্ত পদ্ধতির সংশোধন, পরিবর্তন এবং বিবেচনাপূর্বক সংশোধন করার জন্য কোনও আইনের খসড়া বা বিল আইনসভায় অনুমোদনের জন্য উত্থাপিত হবে না।

সম্মতি সহকারে—

মহারাজাধিরাজ আগা খান (মুসলমান)
ডঃ আম্বেদকর (অস্পৃশ্যবর্গ)
রাও বাহাদুর পন্নির সেলভম (ভারতীয় ক্রিশ্চান)
স্যার হেনরি গিডনি (অ্যাংলো ইন্ডিয়ান)
স্যার হিউবার্ট কার (ইউরোপিয়ান)

পরিশিষ্ট-IV

গান্ধীর অনশন সম্পর্কে বি. আর. আম্বেদকরের বক্তব্য

গোল টেবিল বৈঠকে অস্পৃশ্যদের প্রতি (শ্রী গান্ধীর) এবং তাদের সাংবিধানিক সুরক্ষার দাবিগুলির প্রতি শ্রী গান্ধীর মনোভাবের উপর বক্তব্য (১৯ শে সেপ্টেম্বর ১৯৩২)

আমার এ কথা বলার প্রয়োজন নেই যে, আমি সাম্প্রতিক কালে পত্রিকায় প্রকাশিত মহাত্মা গান্ধী, স্যার স্যামুয়েল হোর এবং প্রধানমন্ত্রীর (ব্রিটিশ) মধ্যে পত্র ব্যবহারগুলি পড়ে অত্যন্ত আতঙ্কে স্তম্ভিত হয়েছি, যাতে তিনি মত প্রকাশ করেছেন যে, যতক্ষণ না ব্রিটিশ সরকার, তাঁদের নিজেদের ইচ্ছা অনুসারে অথবা জনমতের চাপের ফলে তাঁদের মত পরিবর্তন করছেন এবং অস্পৃশ্যদের জন্য সম্প্রদায়গত প্রতিনিধিত্বের যোজনাটি তুলে নিচ্ছেন, তিনি আমরণ অনশন করার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। মহাত্মার এই আত্ম উৎসর্গের প্রতিজ্ঞা আমাকে যে ঈর্ষাহীন অবস্থায় স্থাপিত করেছে তা সহজেই অনুমেয়। এটা আমার উপলব্ধির ক্ষমতাকে অতিক্রম করে যে শ্রী গান্ধী কেন এই সাম্প্রদায়িক প্রশ্নের ইস্যুতে নিজের জীবনকে বাজি ধরবেন যখন তিনি নিজেই গোল টেবিল বৈঠকে বলেছিলেন যে, এ প্রশ্নটি তুলনামূলক ভাবে কম গুরুত্বপূর্ণ। বাস্তবিকই, শ্রী গান্ধীর চিন্তাধারার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ভাষা ব্যবহার করলে, সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্নটি ভারতের সংবিধান পুস্তকের একটি পরিশিষ্ট মাত্র এবং কোনও মতেই তা মুখ্য অধ্যায় নয়। এটি অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গত হত যদি শ্রী গান্ধী দেশের স্বাধীনতা প্রাপ্তির জন্য এরকম একটি চূড়ান্ত পদক্ষেপ নিতেন, যার জন্য তিনি গোল টেবিল বৈঠকের সমস্ত তর্কগুলিতে পীড়াপীড়ি করেছিলেন। এটি অত্যন্ত দুঃখপূর্ণ বিস্ময়ও যে, শ্রী গান্ধী সাম্প্রদায়িক চুক্তির মধ্যে কেবলমাত্র অস্পৃশ্যদের জন্য বিশেষ প্রতিনিধিত্বের ব্যাপারটিকেই তাঁর আত্মউৎসর্গের কৈফিয়ত হিসাবে তুলে ধরবেন। পৃথক নির্বাচনমণ্ডল কেবলমাত্র অস্পৃশ্যদের জন্যই মঞ্জুর হয়নি, বরং ভারতীয় ক্রিশ্চান, অ্যাংলো ইন্ডিয়ান, ইউরোপিয়ান, এমনকী মুসলমান এবং শিখদের জন্যও তা করা হয়েছে। পৃথক নির্বাচনমণ্ডল জমিদার, শ্রমিকবর্গ এবং ব্যবসায়ীদের জন্যও করা হয়েছে। কিন্তু শ্রী গান্ধী মুসলমান এবং শিখ ছাড়া অন্যান্য সমস্ত বর্গের জন্য বিশেষ প্রতিনিধিত্বের বিরোধিতা ঘোষণা করেছেন। তা

যাই হোক, শ্রী গান্ধী সকলকেই বিশেষ প্রতিনিধিত্বের সুবিধা দিতে বেছে নিতে পারেন—কেবলমাত্র অস্পৃশ্যদের বাদে।

অস্পৃশ্যদের প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থার ফলাফল সম্পর্কে শ্রী গান্ধীর যে ভয় হয়েছিল বা তিনি প্রকাশ করেছিলেন আমার মতে তা কল্পনাপ্রসূত। মুসলমান এবং শিখদের পৃথক নির্বাচন মণ্ডল দিলে যদি রাষ্ট্র (Nation) বিভক্ত হয়ে না যায় তাহলে অস্পৃশ্যদের পৃথক নির্বাচনমণ্ডল দিলে হিন্দু সমাজেরও বিভক্ত হওয়ার কোনও আশঙ্কা থাকতে পারে না। অন্যান্য বর্গ এবং সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক নির্বাচন মণ্ডলের ব্যবস্থা করলে, অস্পৃশ্যবর্গকে বাদ দিয়ে, যদি রাষ্ট্র বিভক্ত হয়ে যায়, তার জন্য তাঁর বিবেকে বাধে না।

আমি নিশ্চিত, একথা অনেকেই অনুভব করেছেন যে (স্বরাজ) স্বাধীন সংবিধানে সংখ্যাগরিষ্ঠদের অত্যাচার থেকে বাঁচাতে যদি কোনও শ্রেণীকে বিশেষ রাজনৈতিক অধিকার দিতে হয়, তাহলে তা হল অস্পৃশ্যবর্গ। এই একটি শ্রেণী, যারা নিঃসন্দেহে অস্তিত্বের লড়াইয়ে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে অপারগ। যে ধর্মের সঙ্গে তারা জড়িত, সেই ধর্ম তাদের কোনও সম্মানজনক জায়গা দেওয়ার পরিবর্তে তাদের অস্পৃশ্য কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত বানিয়ে রেখেছে, যাদের সঙ্গে কোনওরকম মেলামেশা বা আদান-প্রদান চলে না। অর্থনৈতিকভাবে, এটি একটি শ্রেণী, যার দৈনন্দিন রুটিরুজির ব্যাপারে নিজস্ব স্বতন্ত্র কোনও পথই খোলা নেই এবং উচ্চবর্ণ হিন্দুদের উপর সর্বতোভাবে নির্ভরশীল। কেবলমাত্র যে হিন্দুদের সামাজিক প্রতিকূলতা বা পক্ষপাতের জন্যই তাদের সব উপার্জনের দরজা বন্ধ হয়ে গেছে তা নয়, কিন্তু হিন্দু সমাজের প্রত্যেকটি স্তরেই একটি প্রচ্ছন্ন প্রচেষ্টা আছে যাতে অস্পৃশ্যবর্গের জন্য জীবনের সিঁড়িতে উপরে ওঠার সমস্ত দরজাই বন্ধ হয়ে যায়। বাস্তবিকপক্ষে এটা অতিশয়োক্তি হবে না যে, প্রতিটি গ্রামে হিন্দু জাতির লোকেরা, নিজেদের মধ্যে যতই বিভক্ত থাকুক না, অস্পৃশ্যদের, যারা ভারতের ক্ষুদ্রতম এবং বিক্ষিপ্ত অংশ মাত্র, তাদের যে কোনও প্রচেষ্টাকেই নির্মমভাবে দমিয়ে রাখার ব্যাপারে অটল এবং একজোটে ষড়যন্ত্রকারী।

এই পরিস্থিতিতে, সমস্ত শুভবুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তি এটা মেনে নেবে যে, এরকম একটি প্রতিবন্ধী সম্প্রদায়ের পক্ষে জীবন যুদ্ধে সংগঠিত অত্যাচারের বিরুদ্ধে নিজেদের রক্ষা করা এবং সফলকাম হওয়ার জন্য রাজনৈতিক শক্তির কিছু অংশ তাদের প্রধানতম প্রয়োজনীয়। আমার একথা ভাবা উচিত হত যে অস্পৃশ্যদের হিতাকাঙ্ক্ষী একজন, নতুন সংবিধানে তাদের যতটুকু সম্ভব রাজনৈতিক অধিকার পাইয়ে দেওয়ার

জন্য যথাশক্তি তেজ বীর্যের সঙ্গে লড়াই করবেন। কিন্তু মহাত্মার চিন্তার ধারাটি অত্যন্ত বিস্ময়জনক এবং সুনিশ্চিতভাবে আমার বোধগম্যতার বাইরে। অস্পৃশ্যবর্গেরা যে সামান্যমাত্র রাজনৈতিক অধিকার এই সাম্প্রদায়িক চুক্তির মাধ্যমে পেয়েছে, সেটিকে বৃদ্ধির বা প্রসারিত হওয়ার জন্য তিনি যে সামান্যমাত্রও প্রচেষ্টা করছেন না, বরং বিপরীত ভাবে তাদের সেটুকু প্রাপ্য থেকেও বঞ্চিত করার জন্য তিনি তাঁর জীবনকেই পণ করেছেন। অস্পৃশ্যবর্গদের রাজনৈতিক অস্তিত্বকে মুছে দেওয়ার জন্য মহাত্মার এটিই প্রথম প্রচেষ্টা নয়। তার বহু পূর্বেই সংখ্যালঘু চুক্তি হয়েছিল। এই মহাত্মা, মুসলমান এবং কংগ্রেসের সঙ্গে একটি চুক্তি করতে চেষ্টা করেছিলেন। তিনি মুসলমানদের প্রস্তাবিত চৌদ্দ দফা দাবি মেনে নিতে রাজি হয়েছিলেন এবং তার পরিবর্তে মুসলমানদের তাঁর সঙ্গে যোগ দিয়ে অস্পৃশ্যদের সামাজিক প্রতিনিধিত্বের দাবিগুলিকে প্রতিহত করার জন্য আহ্বান করেছিলেন। এটি মুসলমান প্রতিনিধিদের কৃতিত্ব বলে দাবি করা যায় যে তারা এইরকম একটি অন্যায় কর্মের সাক্ষী হতে অস্বীকার করে এবং অস্পৃশ্যবর্গের এক দুর্যোগের সম্ভাবনা, যা মুসলমান এবং শ্রী গান্ধীর একযোগে বিরোধিতায় উৎপন্ন হত, তা থেকে রক্ষা করে। শ্রী গান্ধীর সাম্প্রদায়িক রায়দানের প্রতি এরূপ বিরূপতার কারণ কী আমি বুঝতে পারি না। তিনি বলেন যে, এই সাম্প্রদায়িক রায় অস্পৃশ্যবর্গকে হিন্দু সম্প্রদায় থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে। অন্যদিকে, ডাঃ মুঞ্জে যিনি হিন্দুদের ব্যাপারে একজন শক্তিশালী প্রধান নায়ক, এবং এর একজন জঙ্গি প্রবক্তা, এ-ব্যাপারে সম্পূর্ণ অন্য মত পোষণ করেন। লন্ডন থেকে ফিরে এসে তাঁর সমস্ত বক্তৃতায় ডাঃ মুঞ্জে বারবার জোর দিয়ে বলেছেন যে, সাম্প্রদায়িক ফয়সলা হিন্দু এবং অস্পৃশ্যবর্গের মধ্যে কোনওরকম বিভেদ সৃষ্টি করেনি। বাস্তবিক পক্ষে তিনি সদম্ভে বলেছেন যে, তিনি, আমার হিন্দু এবং অস্পৃশ্যদের মধ্যে রাজনৈতিক বিভাজনের সমস্ত প্রচেষ্টাকে প্রতিহত করেছেন। আমি নিশ্চিত যে, ডাঃ মুঞ্জে তাঁর ফয়সলার ব্যাখ্যায় সঠিক, যদিও আমি মনে করি না যে এর জন্য সমস্ত কৃতিত্ব ডাঃ মুঞ্জের প্রাপ্য। এটি সেইজন্য বিস্ময়কর যে, মহাত্মা গান্ধী, যিনি একজন জাতীয়তাবাদী, এবং একজন সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতাপূর্ণ ব্যক্তি হিসাবে অপরিচিত ব্যক্তি, অস্পৃশ্যবর্গের সম্বন্ধে সম্পর্কিত এই সাম্প্রদায়িক ফয়সলাকে ডাঃ মুঞ্জের ভাবনার বিপরীতে চিন্তা করবেন। যদি ডাঃ মুঞ্জে এই সাম্প্রদায়িক ফয়সলায় অস্পৃশ্যবর্গ এবং হিন্দুদের মধ্যে বিভেদের কোনও গন্ধ পাননি বা বোধ করেননি, মহাত্মারও এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ পরিতৃপ্ত থাকা উচিত ছিল।

আমার মতে, এই সাম্প্রদায়িক ফয়সলা কেবলমাত্র হিন্দুদেরই সন্তুষ্ট করবে না, অস্পৃশ্যবর্গের মধ্যেও রায়বাহাদুর রাজা, মিঃ বালু অথবা মিঃ গোভাই-এর মতো

ব্যক্তি যাঁরা সংযুক্ত নির্বাচনমণ্ডলীর পৃষ্ঠপোষক, তাঁদেরও সন্তুষ্ট করবে। বিধান সভায় মিঃ রাজার নির্ঘোষ আমাকে খুবই আনন্দ (মজা) দিয়েছিল। পৃথক নির্বাচন মণ্ডলীর একজন প্রচণ্ড পৃষ্ঠপোষক এবং হিন্দুদের অত্যাচারের অত্যন্ত কট্টর এবং তীব্র সমালোচক এখন সংযুক্ত নির্বাচনমণ্ডলীর জন্য প্রচার করছেন এবং হিন্দু জাতির প্রতি ভালবাসা ঘোষণা করছেন। এর কতটা তাঁর গোল টেবিল বৈঠকের বাইরে থাকার জন্য বিস্মৃতি থেকে পুনরায় চৈতন্যলাভের জন্য, বা কতটা তাঁর বিশ্বাসের পরিবর্তনের প্রতি সততার জন্য, আমি তা নিয়ে আলোচনা করতে চাই না।

এই সাম্প্রদায়িক ফয়সলার উপরে মিঃ রাজা যে তাঁর সমালোচনার ঝড় তুলছেন তার বিষয়বস্তু হল দুটি। প্রথমটি হল যে, অস্পৃশ্যবর্গ জনসংখ্যার ভিত্তিতে যে সংখ্যায় আসন পেতে পারত তার থেকে কম আসন পেয়েছে, এবং অন্যটি হল যে, অস্পৃশ্যবর্গ হিন্দু সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে।

তাঁর প্রথম দাবিটি আমি স্বীকার করছি, কিন্তু যখন রায়বাহাদুর গোল টেবিল বৈঠকে অস্পৃশ্যদের প্রতিনিধিরা তাঁদের অধিকারকে বিক্রি করে দিয়েছে বলে গালিগালাজ করেন, তখন আমি, ভারতীয় কেন্দ্রীয় কমিটির দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করতে বাধ্য। সেই কমিটির রিপোর্টে অস্পৃশ্যবর্গদের, মাদ্রাজে ১৫০টা আসনের মধ্যে ১০টা আসন, বোম্বাইয়ে ১৪টার মধ্যে ৮টা, বাংলায় ২০০ আসনের মধ্যে ৮টা, ইউ. পি.-তে ১৮২টির মধ্যে ৮টা, পঞ্জাবে ১৫০টির মধ্যে ৬টা, বিহার এবং ওড়িশায় ১৫০টির মধ্যে ৬টা, (সেন্ট্রাল প্রভিন্সে) মধ্য প্রদেশে ১২৫ টার মধ্যে ৮টা, এবং আসামে ৭৫ টির মধ্যে অস্পৃশ্যদের এবং অভ্যন্তরীণ উদ্ভূত এবং আদিম জাতি মিলিয়ে সর্বসাকুল্যে ৯টা আসন দেওয়া হয়েছে। আমি এই তালিকাটিকে জনসংখ্যার অনুপাতে এই সংখ্যাগুলির তুলনামূলক বিচার দিয়ে মাত্রায় বাড়াতে চাই না। কিন্তু এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, এটি অস্পৃশ্যবর্গের প্রতিনিধিত্বের সর্বাধিক কম সংখ্যা সূচক। এই আসন বিতরণের ক্ষেত্রে মিঃ রাজাও একটি পক্ষ ছিলেন। এবং নিশ্চিত ভাবে, এই সাম্প্রদায়িক ফয়সলাকে সমালোচনা করার পূর্বে মিঃ রাজা ভেবে দেখবেন যে, অস্পৃশ্যদের প্রতিনিধি হয়ে এবং কেন্দ্রীয় কমিটির একজন সদস্য হয়ে বিনা প্রতিবাদে তিনি কী স্বীকার করেছিলেন। যদি প্রতিনিধিত্বের জন্য জনসংখ্যার অনুপাত অস্পৃশ্যদের স্বাভাবিক অধিকার ছিল, তবে তিনি কেন্দ্রীয় কমিটিতে সুযোগ থাকা সত্ত্বেও কেন পীড়াপীড়ি করলেন না?

তাঁর যুক্তি যে সাম্প্রদায়িক ফয়সলায় অস্পৃশ্যরা হিন্দু জাতিদের থেকে পৃথক হয়ে গেছে, আমি মানতে রাজি নই। যদি পৃথক নির্বাচনমন্ডলীর বিরুদ্ধে মিঃ রাজার

বিবেকবুদ্ধিপূর্ণ প্রতিবাদ আছে, তাহলে পৃথক নির্বাচনমণ্ডলীতে একজন প্রার্থী হয়ে দাঁড়াবার জন্য তাঁর উপর কোনও বাধ্যবাধকতা নেই। সর্বসাধারণীয় নির্বাচনমণ্ডলীতে একজন প্রার্থী হিসাবে দাঁড়াবার এবং ভোট দেওয়ার অধিকার তাঁর আছে এবং মিঃ রাজা সে সুযোগ নিতে পারেন। মিঃ রাজা চিৎকার করে ঘোষণা করছেন যে, অস্পৃশ্যদের প্রতি হিন্দুজাতির সম্পূর্ণভাবে দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হয়েছে। অস্পৃশ্যদের সন্তোষজনক ভাবে এটা প্রমাণ করার সুযোগ তিনি পাবেন, কিন্তু সাধারণ নির্বাচনমণ্ডলীতে নির্বাচিত হয়ে গেলেই তাঁর কথা কেউ বিশ্বাস করবে না। হিন্দুরা, যারা অস্পৃশ্যদের প্রতি প্রীতি এবং সহানুভূতি প্রচার করেন তাঁদেরও মিঃ রাজাকে নির্বাচিত করে তাঁদের আন্তরিকতার প্রমাণ দেওয়ার সুযোগ পাবেন।

সাম্প্রদায়িক ফয়সলা, সেইহেতু, আমার মতে দুই দলকেই, যাঁরা পৃথক নির্বাচন মণ্ডলী চান এবং যাঁরা সংযুক্ত নির্বাচনমণ্ডলী চান, সন্তুষ্ট করেছে। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে এটি ইতিমধ্যেই একটি আপস মীমাংসা এবং এটিকে সেইভাবেই গ্রহণ করা উচিত। মহাত্মার ব্যাপারে, আমি জানি না তিনি কী চান। এটি অনুমান করা হচ্ছে যে, যদিও মহাত্মা গান্ধী পৃথক নির্বাচনমণ্ডলীর বিরোধী, তবুও সংযুক্ত নির্বাচনমণ্ডলী এবং সংরক্ষিত আসনের পদ্ধতির বিরোধী নন। এটা একটা মস্ত বড় ভুল। এখন তাঁর মতামত যাই হোক না কেন, যখন লন্ডনে ছিলেন তিনি অস্পৃশ্যদের বিশেষ প্রতিনিধিত্বের প্রথার ব্যাপারে সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন, তা সংযুক্ত বা পৃথক নির্বাচনমণ্ডলী, যাই হোক না কেন। সাধারণ নির্বাচনমণ্ডলীতে বয়স্ক মতাধিকারের ভিত্তিতে ভোটদানের অধিকারে বাইরে, তিনি অস্পৃশ্যদের বিধানসভায় প্রতিনিধিত্ব অর্জনের মতো আর কোনও দাবিই স্বীকার করতে প্রস্তুত ছিলেন না। প্রথম দিকে তিনি এই অবস্থানই নিয়েছিলেন। গোল টেবিল বৈঠকের শেষের দিকে, তিনি আমাকে একটি যোজনার প্রস্তাব দিয়েছিলেন, যেটি তিনি বিবেচনা করবেন বলে বলেছিলেন। এটি একটি চিরাচরিত যোজনা ছিল এবং এটির পিছনে কোনও সাংবিধানিক স্বীকৃতি ছিল না এবং নির্বাচন আইনে অস্পৃশ্যদের জন্য একটিও আসন সংরক্ষিত ছিল না।

যোজনাটি নিম্নরূপ ছিল—

সাধারণ নির্বাচন ক্ষেত্রে অস্পৃশ্যবর্গের প্রার্থী অন্য হিন্দু উচ্চবর্ণ প্রার্থীদের বিরুদ্ধে দাঁড়াবেন। যদি অস্পৃশ্যবর্গের প্রার্থী নির্বাচনে পরাজিত হন, তিনি সেই রায়ের বিরুদ্ধে নির্বাচনী পিটিশন দাখিল করবেন এবং তিনি অস্পৃশ্য বলে পরাজিত হয়েছেন এই মর্মে একটি রায় অর্জন করবেন। যদি এরকম একটি রায় পাওয়া যায়, তাহলে, মহাত্মা বললেন, যে, তিনি কিছু হিন্দু সদস্যকে পদত্যাগ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করবেন

এবং এইভাবে একটি শূন্য পদের সৃষ্টি হবে। তখন সেখানে আর একবার নির্বাচন হবে এবং সেখানে সেই পরাজিত অস্পৃশ্যবর্গের প্রার্থী কিংবা অন্য কোনও অস্পৃশ্যবর্গের প্রার্থী আবার হিন্দু প্রার্থীর বিরুদ্ধে তাদের ভাগ্য পরীক্ষা করবে। আবার পরাজিত হলে, আবার ঐরকম একটি রায় যে তিনি অস্পৃশ্য বলে পরাস্ত হয়েছেন, তা প্রাপ্ত হবেন এবং এইভাবে অনন্তকাল পর্যন্ত চলবে। আমি এই ঘটনাটি প্রকাশ করছি তাদের জন্য যারা এখনও ধারণা করেন যে, বোধ হয় সংযুক্ত নির্বাচনমণ্ডল এবং সংরক্ষিত আসন মহাত্মার বিবেককে সন্তুষ্ট করবে। এটি এটাই দেখাবে যে আমি কী জন্য পীড়াপীড়ি করছিলাম যে যতক্ষণ পর্যন্ত মহাত্মার প্রকৃত প্রস্তাবটি না পাওয়া যাচ্ছে, ততক্ষণ এ বিষয়ে আলোচনা করার দরকার নেই।

আমি, তথাপি, একথা বলি যে, আমি মহাত্মার দেওয়া সেই প্রতিশ্রুতি, যে, 'তিনি এবং তাঁর কংগ্রেস এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় যথাকর্তব্য করবে—বিশ্বাস করি না। আমি আমার লোকেদের সুরক্ষার মত এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নকে চিরাচরিত প্রথা এবং বোঝাবুঝির উপর ছেড়ে দিতে পারি না। এই মহাত্মা একজন অমর ব্যক্তি নন, এবং কংগ্রেসও, একথা স্বীকার করে নিলেও যে এটি একটি অমঙ্গলকারী শক্তি নয়, কখনওই চিরস্থায়ী অস্তিত্বের অধিকারী নয়। ভারতে অনেক মহাত্মা এসেছেন যাঁদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ এবং অস্পৃশ্যদের উত্তরণ করা এবং নিবিষ্ট করা। কিন্তু তাঁরা প্রত্যেকেই তাঁদের উদ্দেশ্যে বিফল হয়েছেন। 'মহাত্মারা এসেছেন এবং মহাত্মারা চলে গেছেন।' কিন্তু অস্পৃশ্যরা অস্পৃশ্যই থেকে গেছে।

মাহাদ এবং নাসিকে যে প্রচণ্ড সংঘর্ষ হয়েছিল তা থেকে আমার এই সংস্কারের গতি সম্পর্কে এবং হিন্দু সমাজ সংস্কারকদের বিশ্বাস সম্পর্কে অনেক অভিজ্ঞতা হয়েছে, এবং বলতে পারি যে অস্পৃশ্যদের কোনও শুভচিন্তকই এই অস্পৃশ্যদের উন্নয়নের কাজটির ভার এই সমস্ত বিশ্বাসঘাতকদের কাঁধে তুলে দিতে চাইবেন না। এই সংস্কারকগণ, যাঁরা সংকটপূর্ণ পরিস্থিতিতে তাঁদের জাতিবর্গের আবেগ বা ভাবপ্রবণতাকে আঘাত করার পরিবর্তে নিজের নীতিকেই বিসর্জন দিতে বেশি আগ্রহ দেখান, অস্পৃশ্যবর্গদের তাঁরা কোনও কাজেই লাগবেন না।

আমি সেইজন্য আমার লোকেদের সুরক্ষার জন্য আইনের দায়িত্বের কথা বারবার বলতে বাধ্য। শ্রী গান্ধী যদি সাম্প্রদায়িক ফয়সলার পরিবর্তন করতে চান, তাহলে তাঁর প্রস্তাব তিনি পেশ করুন এবং প্রমাণ করুন যে ফয়সলায় যে সুরক্ষার জামিনের কথা আছে তার থেকে এগুলি বেশি কিছু দেবে।

আমি আশা করব যে মহাত্মা তাঁর বিবেচনাপ্রসূত চূড়ান্ত পদক্ষেপকে কার্যকরি করা থেকে বিরত হবেন। আমরা যখন পৃথক নির্বাচনমণ্ডলীর দাবি করি, আমরা হিন্দু সমাজের কোনও ক্ষতিসাধন করতে চাই না। আমরা যখন পৃথক নির্বাচনমণ্ডলী চাই, আমরা আমাদের ভাগ্যের বিষয়গুলির ব্যাপারে হিন্দু জাতির ইচ্ছার উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীলতাকে এড়াতেই তা করি। মহাত্মার মতো আমরাও আমাদের ভুল করার অধিকার দাবি করছি, এবং আমরা আশা করি যে তিনি আমাদের সেই অধিকার থেকে বঞ্চিত করবেন না। তাঁর এই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত, আমরণ অনশনের সংকল্প আরও কোনও বেশি ভাল কারণের জন্য যথার্থ। মহাত্মার এই চূড়ান্ত পদক্ষেপের সার্থকতা আমি ভালভাবে বুঝতে পারতাম যদি তিনি হিন্দু মুসলমানের দাঙ্গা রদ করার জন্য করতেন, কিংবা হিন্দু এবং অস্পৃশ্যদের মধ্যে দাঙ্গা রদ করার জন্য কিংবা অন্য কোনও রাষ্ট্রীয় কারণে এটা করতেন। এই অনশন নিশ্চিত ভাবেই অস্পৃশ্যদের ভাগ্যের উন্নতি করতে পারবে না। তিনি এটা জানেন কি জানেন না, মহাত্মার এই কাজে আর কিছুই হবে না, কেবল তাঁর অনুসরণকারীদের দ্বারা সারা দেশে অস্পৃশ্যদের উপর অত্যাচারকেই প্রশ্রয় দেবে।

এইভাবে জোর করে বাধ্য করানো অস্পৃশ্যদের হিন্দু সমাজে ফিরিয়ে আনতে পারবে না, যদি তারা বাইরে যেতে দৃঢ় সংকল্প। এবং যদি মহাত্মা অস্পৃশ্যবর্গদের হিন্দু ধর্ম অথবা রাজনৈতিক ক্ষমতা এই দুইয়ের মধ্যে তাদের পছন্দ করতে বলেন, আমি নিশ্চিত যে অস্পৃশ্যবর্গ রাজনৈতিক ক্ষমতাকেই বেছে নেবে এবং মহাত্মাকে আত্ম উৎসর্গ থেকে রক্ষা করবে। যদি শ্রী গান্ধী ঠাণ্ডা মাথায় তাঁর এই কর্মের ফলাফল সম্বন্ধে বিবেচনা করেন, আমার খুবই সন্দেহ আছে যে তিনি এই জয়কে পাওয়ার যোগ্য বলে বিবেচনা করবেন। এ বিষয়ে লক্ষ করা আরও গুরুত্বপূর্ণ যে, মহাত্মা তাঁর এই কর্মের দ্বারা প্রতিক্রিয়াশীল এবং অদম্য শক্তিকেই ছেড়ে দিচ্ছেন এবং হিন্দু সম্প্রদায় এবং অস্পৃশ্যদের মধ্যে ঘৃণার ভাবকেই উস্কানি দিচ্ছেন তাঁর এই প্রক্রিয়ার দ্বারা এবং এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে যে ব্যবধান আছে তাকে বাড়িয়ে তুলছেন।

গোল টেবিল বৈঠকে আমি যখন শ্রী গান্ধীর বিরোধিতা করেছিলাম, সারা দেশে আমার বিরুদ্ধে চিৎকার চেঁচামেচি শুরু হয়ে গিয়েছিল, এবং তথাকথিত রাষ্ট্রীয় প্রেসে (সংবাদপত্রে) আমাকে রাষ্ট্রের ব্যাপারে বিশ্বাসঘাতক সাব্যস্ত করার জন্য ষড়যন্ত্র চলেছিল, আমার তরফ থেকে আসা সমস্ত চিঠিপত্র চাপা দেওয়া হত এবং আমার পার্টির বিরুদ্ধে প্রচারের জন্য নানারকম সভা এবং সম্মেলনের কথা বাড়িয়ে বলা হত, যেগুলি আদৌ সংগঠিত হয়নি। অস্পৃশ্যদের মধ্যে ঝগড়া এবং বিভেদ সৃষ্টির

জন্য ("Silver Bullets) টাকাপয়সার ছড়াছড়ি হয়েছিল। কিছু সংঘর্ষও হয়েছিল, যা হিংস্রতায় পরিণত হয়েছিল।

যদি মহাত্মা এই সমস্ত ব্যাপারের আরও বড় পরিমাপে পুনরাবৃত্তি না চান, ভগবানের দোহাই, তিনি তাঁর সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করুন এবং ওই সমস্ত সর্বনাশা ফলাফলকে প্রতিহত করুন। আমি বিশ্বাস করি, মহাত্মা এটা চান না। কিন্তু তাঁর ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও যদি বিরত না হন, এই সমস্ত ঘটনা ঘটবেই—যেমন দিনের পরে রাত অবশ্যই হয়।

এই বিবৃতি শেষ করার পূর্বে, আমি জনগণকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, যদিও আমি বলতে পারি যে, এ বিষয়টির পরিসমাপ্তি হয়েছে, আমি মহাত্মার প্রস্তাব বিবেচনা করতে প্রস্তুত। আমি তৎসত্ত্বেও বিশ্বাস করি যে, মহাত্মা আমাকে তাঁর জীবন এবং আমার জনগণের অধিকারের মধ্যে পছন্দ করবার জন্য চালিত করবেন না। কারণ আমি কখনওই আমার লোকেদের হাত-পা বেঁধে হিন্দু জাতির কাছে আগত বংশ পরম্পরার জন্য ফেলে দিতে পারব না।

—বি. আর. আম্বেদকর।

পরিশিষ্ট-V

ত্রিবাঙ্কুরে মন্দির প্রবেশ

মহামহিম ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজা ১৯৩৬ সালের ১২ই নভেম্বর তাঁর রাজ্যে মন্দিরগুলি অস্পৃশ্যদের জন্য খুলে দিয়ে একটি ঘোষণাপত্র জারি করেন। এই ঘোষণাটি নিম্নরূপ ছিল—

'আমাদের ধর্মের সত্যতা এবং বৈধতা সম্পর্কে গভীর ভাবে প্রত্যয়ান্বিত হয়ে, এমত বিশ্বাস করে যে, এই ধর্ম স্বর্গীয় নির্দেশের উপর এবং সর্বজনবোধ্য গ্রহণশীলতার উপর আধারিত, এটা বিশ্বাস করে যে, এর অনুষ্ঠানের দ্বারা শতাব্দী ধরে এটি সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে নিজের সামঞ্জস্য স্থাপন করেছে, এবং এভাবে প্রত্যাশিত হয়ে যে আমাদের কোনও হিন্দু প্রজাকেই, তার জন্ম, জাতি এবং সম্প্রদায়ের কারণে, হিন্দু বিশ্বাসের আশ্বাস এবং সান্ত্বনা থেকে বঞ্চিত করা হবে না, আমরা এই মর্মে সিদ্ধান্ত নিয়েছি এবং আদেশের সঙ্গে ঘোষণা করছি যে, সময় সময় যে সমস্ত নিয়ম এবং অনুশাসন প্রবর্তিত হবে তা পালনের শর্তে, এবং তা মন্দিরের যথাযথ পরিবেশ স্থাপন এবং অনুষ্ঠানাদির এবং আচারের পালনের জন্য করা হবে, অতঃপর কোনও হিন্দু, তা জন্মজাত বা ধর্মগত হিসাবেই হোক, হিন্দুর জন্য পরিচালিত এই সমস্ত মন্দিরে, আমাদের সরকার দ্বারা নিয়মিত প্রবেশ বা পূজা উপাসনা করার বাধা বা নিষেধাজ্ঞা রইল না।'

এই ঘোষণা সম্পর্কে শ্রী গান্ধী এবং কংগ্রেসিদের দ্বারা অনেক প্রচার করা হয়েছে। এটাকে হিন্দু জগতে এক নতুন বিবেকের জন্ম বলে ঘোষণা করা হয়েছে। আমি এ ব্যাপারে সেরকম নিশ্চিত বোধ করি না। তা যাই হোক, এর বিপরীতেও কিছু ঘটনা আছে, যা মনে রাখার যোগ্য।

এই ঘোষণাপত্রটি ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজার নামে প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু এই দৃশ্যের অন্তরালে যে সক্রিয় শক্তিটি ছিল তা হল প্রধানমন্ত্রী, সার সি. পি. রামস্বামী আয়ার। এটি তাঁরই প্রেরণা ছিল, এটা আমাদের বোঝা দরকার। ১৯৩২ সালে স্যর সি. পি. রামস্বামী আয়ার ত্রিবাঙ্কুরের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। ১৯৩২ সালে যখন শ্রী গান্ধী গুরুভায়ুর মন্দিরে অস্পৃশ্যদের প্রবেশের ব্যাপারে একটি বিতর্কের সূত্রপাত করেছিলেন, স্যর সি. পি. রামস্বামী আয়ার বিতর্কে অংশ নিয়ে মন্দির প্রবেশের বিরোধীদের দলে ভিড়েছিলেন। এই বিতর্ক চলাকালীন, স্যর সি. পি. রামস্বামী

আয়ার প্রেসকে একটি বিবৃতি দান করেন। তিনি বলেছিলেন—

'ব্যক্তিগত ভাবে আমি জাতি প্রথার নিয়ম পালন করি না। আমি উপলব্ধি করি যে, এই ব্যাপারে কিছু মানুষের মনে শক্তিশালী ধারণা আছে, যদিও স্পষ্টরূপে উচ্চারিত নয়, যাঁরা বিশ্বাস করেন যে মন্দিরে উপাসনার বর্তমান পদ্ধতি এবং বিস্তারিত বিষয়গুলি স্বর্গীয় অধ্যাদেশের উপর আধারিত। এই সমস্যার স্থায়ী সমাধান হতে পারে কেবলমাত্র পারস্পরিক সমন্বয় সাধনের দ্বারা এবং হিন্দু সমাজের ধর্মীয় এবং সামাজিক নেতাদের মধ্যে বর্তমান বাস্তবিকতার পক্ষে এবং হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য এবং সংহতি বজায় রাখার ব্যাপারে তাঁদের জাগরণ ঘটিয়ে। আঘাত-কৌশল এর উদ্দেশ্য সাধন করবে না এবং সরাসরি আচরণ এই ক্ষেত্রে রাজনৈতিক ক্ষেত্রের চেয়েও মারাত্মক হবে। আমি শ্রী গান্ধীর সঙ্গে ভিন্নমত হওয়ার জন্য দুর্ভাগ্য বলে মনে করি, যখন তিনি বলেন যে এই মন্দির প্রবেশের ব্যাপারটিকে পঙক্তি বা সহভোজনের বিষয়বস্তু থেকে পৃথক করা যেতে পারে, এবং আমি ডাঃ আম্বেদকরের সঙ্গে একমত যে, অস্পৃশ্যদের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নেই আমাদের তাৎক্ষণিক এবং জরুরি কার্যক্রম হওয়া উচিত।'[1]

এই বিবৃতিটি এটাই প্রমাণ করে যে, ১৯৩৩ সালে আধ্যাত্মিক সুবিবেচনা স্যর সি. পি. রামস্বামী আয়ারকে প্রভাবান্বিত করতে পারেনি। আধ্যাত্মিক সুবিবেচনা ১৯৩৩ সালের পরে কার্যকর হয়েছে। স্যর রামস্বামী আয়ারের ১৯৩৬ সালে দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনের কারণ কী? ত্রিবাঙ্কুরে ১৯৩৬ সালে এমন কী হয়েছিল যার দ্বারা এইরূপ মত পরিবর্তন করতে বাধ্য করাল? এটা স্মরণ করা যেতে পারে যে, ১৯৩৬ সালে ত্রিবাঙ্কুরে ইয়েজওয়া সম্প্রদায়ের একটি সম্মেলন হয়েছিল। এই ইয়েজওয়া একটি অস্পৃশ্য সম্প্রদায় যা সমস্ত মালাবারে ছড়িয়ে আছে। এটি একটি শিক্ষিত সম্প্রদায় এবং অর্থনৈতিক দিক দিয়েও যথেষ্ট শক্তিশালী। এটি একটি স্পষ্টবাদী এবং বলিয়ে সম্প্রদায় এবং সামাজিক ও ধার্মিক অক্ষমতার বিরুদ্ধে রাজ্যে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল এই বিবেচনা করার জন্য যে, ইয়েজওয়ারা হিন্দু ধর্ম পরিত্যাগ করে অন্য ধর্ম গ্রহণ করবে কি না। ইয়েজওয়ারা একটি বৃহৎ সম্প্রদায়। এমন একটি বৃহৎ সম্প্রদায়ের বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া হিন্দুদের পক্ষে মৃত্যুঘন্টা হবে এবং এই সম্মেলন সেই বিপদকে বাস্তবে পরিণত করতে চলেছে।

---

1. Times of India, dated November 10, 1932.

এটা বোধ হয় খুব বাড়িয়ে বলা হবে না যে, এই বিপদকে প্রতিহত করার জন্যই এই ঘোষণাপত্রটি প্রকাশিত হয়েছিল। এটা যদি সঠিক হয়, তা হলে এই ঘোষণার পিছনে অতি অল্পই আধ্যাত্মিক সারবস্তু ছিল। এটা ভুলে গেলে চলবে না যে, স্যর সি. পি. রামস্বামী আয়ারের বস্তুবাদী (বাস্তব) ঘটনাকে আধ্যাত্মিক রূপ দেওয়ার একটি নিজস্ব রীতি আছে। হিন্দু আইন হিন্দু ল অনুসারে ব্রাহ্মণেরা প্রাণদণ্ড থেকে অব্যাহতি প্রাপ্ত, এবং তা সমস্ত ব্রাহ্মণের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। এটি বাছবিচারের একটি জ্বলন্ত উদাহরণ। স্যার সি. পি. রামস্বামী আয়ার সাম্প্রতিক কালে ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে প্রাণদণ্ডের উচ্ছেদ ঘোষণা করেন এবং একটি মহান মানবিক সংস্কার সাধনের কৃতিত্ব গ্রহণ করেছেন। বস্তুত এটির উদ্দেশ্য ছিল ব্রাহ্মণদের আইনের চোখে সমানতার নীতি অনুসারে, গিলোটিনের আওতার বহির্ভূত রাখা।

এই রাজ-ঘোষণা কতদূর ঘটনার পরিবর্তন এনেছে এবং কতদূরই বা এটি একটি প্রদর্শনী হয়ে থেকে গেছে। ত্রিবাঙ্কুরে কী অবস্থা চলছে সে সম্বন্ধে বাস্তব তথ্য পাওয়া সম্ভব নয়। মাদ্রাজ বিধানসভায় 'মন্দির প্রবেশ বিল' (টেম্পল এন্ট্রি বিল) আলোচনার সময় ত্রিবাঙ্কুরের কিছু ঘটনা স্যর টি. পন্নিরসেলভম দ্বারা উল্লেখিত হয়েছিল, এবং যদি তা সত্য হয়, তাহলে দেখা যাবে যে, সমস্ত ব্যাপারটাই ফাঁপা, সারহীন।

স্যর টি. পন্নিরসেলভম বলেছিলেন—

'প্রধানমন্ত্রীর দ্বারা অগ্রসারিত তর্কের মধ্যে একটি ছিল যে, ত্রিবাঙ্কুরে মন্দিরগুলি অস্পৃশ্যদেরকে খুলে দেওয়া হয়েছে। একজন স্বেচ্ছাচারী কর্তৃক সম্পন্ন মহারাজা তাঁর আদেশে এটা করেছেন। কিন্তু এটা সেখানে কেমন কার্যকর হয়েছে। যে সমস্ত বর্ণনা পাওয়া গেছে, তার থেকে তাঁর বিশ্বাস যে, উৎসাহের প্রথম ঝলকের পরেই হরিজনরা মন্দিরে যাওয়া ছেড়ে দিয়েছে এবং যে সমস্ত লোক আগে মন্দিরে পুজো দিতে যেত, হরিজনদের মন্দির প্রবেশের অনুমতি দেওয়ার পূর্বে তারাও মন্দিরে পুজো করা ছেড়ে দিয়েছে। তিনি সরকারকে প্রশ্ন করছেন যে, তাঁরা বলুন এই পদ্ধতিটি কি ত্রিবাঙ্কুরে সার্থক হয়েছে?'

এই বিলটির তৃতীয়বার পাঠের সময় স্যর টি. পন্নিরসেলভম একটি বিবৃতি দিয়েছিলেন, তা অনেকের কাছে বিস্ময়কর বলে প্রকাশ পায়। তিনি বলেছিলেন—

'তিনি জানতে চেয়েছিলেন যে জ্যেষ্ঠা মহারানীর ব্যক্তিগত মন্দিরগুলি এই ঘোষণার আওতার বহির্ভূত রাখা হয়েছিল কিনা। এর কারণ কী? আবার জ্যেষ্ঠা মহারানীর মেয়ের বিয়ের সময়, ওই মন্দিরের শোধনকরণ অনুষ্ঠান, তাঁকে ঐরকমই বলা

হয়েছিল, করা হয়। যদি এরকম শোধন অনুষ্ঠানই হয়ে তাকে, তবে ওই ঘোষণার কী হয়েছিল?'

এই সমস্ত ঘটনার, স্যর রামস্বামী আয়ার অথবা সি. রাজাগোপালাচারিয়ার, কারও দ্বারাই প্রতিবাদ করা হয়নি। স্পষ্টতই এগুলির প্রতিবাদ বা আপত্তি হতে পারে না। যদি এগুলি অবিসংবাদিত হয়, তাহলে 'মালাবারের মন্দির প্রবেশ' ঘোষণা-পত্রের আধ্যাত্মিক সাক্ষ্যস্বরূপতার ব্যাপারে যত কম বলা যায় ততই ভাল।

তাহলে ত্রিবাঙ্কুরের এই মন্দির প্রবেশই কি ত্রিবাঙ্কুরের সামাজিক সংস্কারের শুরু এবং শেষ সব কিছু? শুধুই কি মন্দির প্রবেশ, আর কিছু নয়? না কি এটা ধর্মীয় পদমর্যাদার ব্যাপারে সমানতার দিকে নিয়ে যাবে? উদাহরণস্বরূপ, দেবস্থান বিভাগটি কি অস্পৃশ্যদের এবং শূদ্রদের হাতে তুলে দেওয়া হবে? এই ঘোষণাপত্রের প্রকাশনার পরে নয় বৎসর পার হয়েছে, কিন্তু এখনও পর্যন্ত ত্রিবাঙ্কুরে ধর্মের গণতন্ত্রীকরণের পথে একচুলও নড়া হয়নি।

ত্রিবাঙ্কুরের অস্পৃশ্যদের কি মন্দির প্রবেশের জন্য মূল্য দিতে হবে? আমি বলতে পারি না। কিন্তু আমি এখানে আমাকে উদ্দেশ করে প্রেরিত একটি চিঠি উদ্ধৃত করতে চাই, যেটি 'অল্ ত্রিবাঙ্কুর পুলায়ার চেরামার ঐক্য মহা সংঘম'-এর শ্রী নারায়ণ স্বামী লিখেছেন। এটির তারিখ ২৪ শে নভেম্বর ১৯৩৮।

'ক্যাম্প মায়ানাদ'
কুইলন, ২৪-১১-৩৮

প্রতি

ডাঃ আম্বেদকর
বোম্বে।

মাননীয় মহাশয়,

নিম্নোক্ত ঘটনার প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে এবং আপনার মূল্যবান পরামর্শ পেতে আমার আন্তরিক আনন্দ হচ্ছে। ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের একটি হরিজন সম্প্রদায়ের নেতা হিসাবে, আমি মনে করি, রাজ্যের হরিজন সম্প্রদায় কী কী দাবি পোষণ করে, তা আপনাকে অবহিত করানো, আমার প্রধান কর্তব্য।

১) মহামহিম মহারাজা কর্তৃক মন্দির প্রবেশ ঘোষণা পত্রটি নিঃসন্দেহে হরিজনদের প্রতি বরদানস্বরূপ; কিন্তু হরিজনরা মন্দির প্রবেশ ছাড়া, অন্য সমস্ত রকম সামাজিক

অক্ষমতা ভোগ করছে। সরকার হরিজনদের দুর্দশা দূর করবার জন্য কোনও পদক্ষেপই নেয় না।

২) পনের লাখ হরিজনের মধ্যে মুষ্টিমেয় কিছু গ্র্যাজুয়েট (স্নাতক) আছে, আধ ডজন আন্ডার গ্র্যাজুয়েট, পঞ্চাশ জন স্কুল ফাইন্যাল এবং দু'শোর বেশি মাতৃভাষার শংসাপত্রধারী আছে। যদিও সরকার একটি 'জনসেবা আয়োগ' নিযুক্ত করেছেন, হরিজনদের নিয়োগ অতি অল্প পরিমাণে। সমস্ত নিযুক্তিই সবর্ণদের দেওয়া হচ্ছে। যদি কোনও হরিজনের নিযুক্তি হয়, তা হবে এক সপ্তাহ বা দু'সপ্তাহের জন্য। জনসেবায় কর্মে নিযুক্তির নিয়ম অনুসারে কোনও দরখাস্তকারীকে এক বছর পরে আবার দরখাস্ত করার অনুমতি দেওয়া হয়; কিন্তু একজন সবর্ণকে এক বছর বা তার বেশি সময়ের জন্য নিযুক্তি দেওয়া হয়। (অ্যাসেম্বলি) বিধানসভায় এই নিযুক্তির তালিকা যখন উপস্থাপিত করা হয়, তখন নিযুক্তির সংখ্যা সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্বের সমান হয়। কিন্তু সমস্ত হরিজনদের পদের অবধি সর্বসাকুল্যে একজন সবর্ণের সমান হয়। অধিকর্তাগণ এইরূপ প্রতারণার সঙ্গে জড়িত। এইভাবে জনসেবা সবর্ণদের সর্বজনিক সম্পত্তি হয়ে পড়েছে। কোনও হরিজনেই এর দ্বারা উপকৃত হয়নি।

৩) মহামহিম মহারাজার কাছ থেকে কয়েক বৎসর আগে, একটি ঘোষণাপত্র জারি করা হয়েছিল যে, প্রত্যেক হরিজনকে তিন একর জমি বাস করার জন্য দেওয়া হবে। কিন্তু এই সবর্ণ অফিসারগণ এই ঘোষণাকে কার্যকর করতে সর্বদাই অনিচ্ছুক। যদিও সরকার বৃহৎ পরিমাণে জমি হরিজনদিগকে শহরের কাছে পশুচারণের জন্য দিতে ইচ্ছুক, একটুকরো জমিও হরিজনদের দেওয়া হয়নি। হরিজনরা এখনও সবর্ণদের আঙিনাতেই বাস করে এবং বহুবিধ অসুবিধা সহ্য করছে। যদিও বৃহৎ পরিমাণে জমি 'সংরক্ষিত' এলাকায় আছে, ওই জমি পাওয়ার জন্য হরিজনদের কোনও দরখাস্তই গুরুত্ব সহকারে বিচার করা হয় না অথবা শোনা হয় না। বেশিরভাগ জমিই সবর্ণরা ভোগ দখল করছে।

৪) সরকার প্রতি বছরই বিধানসভায় নির্বাচনের জন্য হরিজন সম্প্রদায় থেকে একজন সদস্যের মনোনয়ন করে। যদিও তারা বিধানসভায় হরিজনদের অভিযোগগুলি তুলে ধরার জন্য নির্বাচিত, কার্যত দেখা যায় যে তারা সরকারি যন্ত্ররূপে পরিগণিত হয়, অর্থাৎ সবর্ণ অফিসারদের হাতের পুতুল হয়ে যায় এবং এই অফিসারগণ লাভবান হয়। এইভাবে হরিজনদের দুঃখের মোচন কোনও দিনই হয় না।

৫) ত্রিবাঙ্কুরে সমস্ত হরিজনই মাঠে কিংবা অঙ্গনে শ্রমিক। তারা সবর্ণদের চাকর এবং সবর্ণরা তাদের প্রতি পশুর মতো ব্যবহার করে—তাদের রক্ষা করার কেউ

নেই। রাজ্যের বেশিরভাগ অংশেই হরিজনরা দৈনিক এক আনা মজুরি পায়। মন্দির প্রবেশের অধিকারের পরেও তাদের সামাজিক অক্ষমতাগুলি তেমনই আছে। ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের বিভিন্ন অংশে কারখানার শ্রমিকরা এবং রাজ্যের অফিসারগণ সকলেই সবর্ণ এবং এখন তারা দায়িত্বশীল সরকারের জন্য আন্দোলন করছে। এখন হরিজনগণ সরকারে এবং কারখানায় কাজের দাবি করছে কিন্তু ত্রিবাঙ্কুরের এই আন্দোলন সবর্ণদের আন্দোলন এবং এর দ্বারা তারা সরকারি চাকরি এবং কারখানা থেকে হরিজনদের তাড়াবার ব্যবস্থা করছে। তারা বেশি বেতন এবং আরও সুবিধার জন্য ওকালতি করছে। যদিও ত্রিবাঙ্কুরে কারখানার শ্রমিকদের আন্দোলনে লোক পাগল হয়ে উঠেছে, তারা হরিজন শ্রমিকদের প্রতি কোনও নজরই দেয় না। হরিজন শ্রমিকদের বেতনের মান অত্যন্ত নিচু, যদিও একজন কারখানার শ্রমিকের বেতনের মান তার থেকে তিনগুণ বেশি।

৬) ক্ষুধায় পীড়িত হওয়ার জন্য এবং জীবনযাত্রা নির্বাহের সাধনের অভাবে হরিজনদের ছেলেমেয়েদের মাথা সবসময় গরম হয়ে থাকে এবং তার ফলে তারা স্কুলে ফেল করে। অধিঘোষণার (Proclamation) পূর্বে, উচ্চ বিদ্যালয়ে বৃত্তির অবধি ছয় বৎসরের জন্য ছিল। এখন এটিকে কমিয়ে তিন বৎসর করা হয়েছে এবং এর ফলে বেশ কিছু ছাত্র ফেল করার পরে পড়াশোনা ছেড়ে দিয়েছে।

৭) অস্পৃশ্য বর্গের জন্য একটি বিভাগ আছে যার প্রধান অধিকর্তা হলেন মিঃ সি. ও. দামোদরন (অনগ্রসর জাতির রক্ষাকর্তা)। যদিও প্রতি বৎসর বৃহৎ পরিমাণে টাকা খরচের জন্য মঞ্জুর হয়, বৎসরের শেষে ওই টাকার দুই-তৃ-তীয়াংশ তাঁর বিচক্ষণতার জন্য তামাদি হয়ে যায়। তিনি ওই টাকা খরচের কোনও রাস্তা বা উপায় নেই বলে সরকারকে রিপোর্ট দেন। অস্পৃশ্যবর্গের জন্য আবন্টিত টাকার ৯৫ % (পঁচানব্বুই শতাংশ) অফিসারদের বেতন দিতে খরচ হয়, যাদের অধিকাংশই সবর্ণ, এবং শতকরা পাঁচভাগ মাত্র লাভবান হয়। এখন সরকার ত্রিবাঙ্কুরের তিনটি অংশে কতকগুলি কলোনি (উপনিবেশ) তৈরি করতে যাচ্ছে। এই অফিসারগণ সকলেই সবর্ণ। আমার মতে, যেহেতু এই যোজনাটি সফল নয়, সরকার এদিকে বেশি নজর দিচ্ছে না। আমি দুঃখের সঙ্গে জানাই যে, ত্রিবাঙ্কুর সরকার হরিজনদের মঙ্গলের জন্য এক আনা খরচ করে, যেখানে কোচিন রাজ্য একই কারণে এক টাকা খরচ করে।

৮) ত্রিবাঙ্কুরের সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রজা এখন 'রাজ্য কংগ্রেস'-এর ছত্রছায়ায় দায়িত্বশীল সরকারের জন্য আন্দোলন করছে। এই জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠানের নেতাগণ রাজ্যের চারটি

সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত, যথাক্রমে, নায়ার, মহম্মেডান (মুসলমান), ক্রিশ্চান এবং 'এজাওয়া' সম্প্রদায়। রাজ্য কংগ্রেসের সভাপতি, মিঃ থানু পিল্লাই একটি বিবৃতি প্রদান করেছেন, যাতে তিনি গুরুত্ব দিয়েছেন যে, অস্পৃশ্যদের বিশেষ সুবিধা দেওয়া হবে। অস্পৃশ্যবর্গের সব নেতাই এখন রাজ্য কংগ্রেসের মনোবৃত্তি দেখার জন্য সময়ের প্রতীক্ষা করছে। এখন আমরা জানতে পেরেছি যে, এই সমস্ত নেতাদের প্রতিশ্রুতির কোনও বাস্তবতা নেই।

৯) এখন আমি নিশ্চিত যে, নেতাগণ অস্পৃশ্যবর্গের হিতের ব্যাপারটি অবহেলা করেছেন। 'রাজ্য কংগ্রেস' প্রতিষ্ঠানটি জাতীয়তাবাদের নীতির উপর ভিত্তি করে শুরু হয়েছিল এবং এখন এটি জাতিবাদের প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। নেতাদের মধ্যে এখন সাম্প্রদায়িক মানসিকতা কাজ করছে। প্রত্যেকটি ভাষণে, বিবৃতি অথবা লেখ প্রকাশনায় নেতারা কেবলমাত্র চারটি সম্প্রদায়ের উল্লেখ করেন, কিন্তু আমাদের ব্যাপারে তাঁদের কোনও চিন্তাই নেই। আমার ভয় হয়, যদি ত্রিবাঙ্কুরে রাজনৈতিক আন্দোলনের নেতাগণের এই স্বরূপ হয়, তাহলে যখন দায়িত্বশীল সরকার গঠন করা হবে বা প্রাপ্ত হবে, অস্পৃশ্যদের অবস্থা আরও শোচনীয় হবে, কারণ সরকারের সমস্ত সম্পত্তি তখন ওই সমস্ত সম্প্রদায়ের হাতের মুঠোয় থাকবে, এবং অস্পৃশ্যদের সমস্ত সুযোগ সুবিধা এবং অধিকার পূর্বোক্তদের দ্বারা গ্রাস করা হবে। রাজ্য কংগ্রেসের সভাগুলিতে দুই-তৃতীয়াংশ সময় 'অ্যালেপ্পি কয়্যার ফ্যাক্ট্রি'র ধর্মঘট নিয়ে আলোচনায় নিয়োজিত হচ্ছে ; কিন্তু ওই মিটিং এ হরিজন শ্রমিক, যারা অশেষ অসুবিধার মধ্যে অতিবাহিত করছে, তাদের ব্যাপারে কিছুই উল্লেখ করা হয় না। এই কারখানার কর্মিগণ সবর্ণ, এবং দায়িত্বশীল সরকার **(Resposible Government)** প্রাপ্তির জন্য আন্দোলন একটি হরিজন-বিরোধী আন্দোলন মাত্র। রাজ্য কংগ্রেসের প্রত্যেকটি নেতার উদ্দেশ্যই হচ্ছে সবর্ণদের অবস্থার উন্নতি সাধন। এই সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের নেতাদের 'ভাড়ায় কাজ করা লোকের মতো' মনোবৃত্তি আছে, যারা তাদের নিজেদের প্রগতির জন্য অস্পৃশ্যদের বলিদান দিতে চলেছে।

১০) এ রাজ্যের অস্পৃশ্যদের অবস্থা এইরকম। এখন এ রাজ্যে আমাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করার উপায় কী? আমি আপনাকে এই পরিস্থিতিতে আপনার পরামর্শদানের জন্য অনুরোধ করি। আপনার জবাবের প্রতীক্ষায় রইলাম।

আপনাকে কষ্ট দেওয়ার জন্য ক্ষমাপ্রার্থী।

আপনার বিশ্বস্ত
শ্রী নারায়ণ স্বামী'

যদি মন্দির প্রবেশের যোজনাটি সর্বশেষে অস্পৃশ্যদের আইনত অধিকার থেকে বঞ্চিত করায় উপনীত হয়, তাহলে এই আন্দোলন আধ্যাত্মিক তো নয়ই, বরং এটি অবধারিত ভাবে ক্ষতিকারক এবং সমস্ত সৎ ব্যক্তির কর্তব্য হবে অস্পৃশ্যদিগকে এর থেকে সতর্ক করে দেওয়া।

পরিশিষ্ট-VI

অস্পৃশ্যদের পৃথক সত্তা হিসাবে মান্যতা ভারতের সংবিধানে অস্পৃশ্যদের অবস্থান সম্পর্কে ব্রিটিশ সরকারের ঘোষণা।

ভূমিকা

ভাইসরয়গণ এবং সেক্রেটারি অফ্ স্টেটদের দেওয়া ঘোষণার পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন হয়েছে এইজন্য যে, সাম্প্রতিক শ্রী গান্ধীকে লেখা লর্ড ওয়াভেল-এর ১৫ই আগস্ট ১৯৪৪-এর জবাবটি সংবাদপত্রে সমালোচিত হয়েছে, যে জবাবে বলা হয়েছিল যে, তফসিলি সম্প্রদায় ভারতের জাতীয় জীবনে একটি পৃথক তত্ত্ব এবং ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের পূর্বে সংবিধান বিষয়ে তাদের মতামত অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এই সমালোচনা এই অনুমানের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল যে ক্রিপ্‌সের প্রস্তাবে তফসিলি সম্প্রদায়কে পৃথক তত্ত্ব বলে মান্যতা দেয়নি এবং তাদের মতামতকেও প্রয়োজনীয় বলে অভিহিত করেনি। এই ঘটনার উপর আস্থা স্থাপন করা হয় যে, ক্রিপ্‌সের প্রস্তাব কেবলমাত্র 'জাতীয় এবং ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের' ব্যাপারে বলেছিল এবং তর্ক করা হয় যে তফসিলি সম্প্রদায় জাতীয় (Racial) অথবা ধর্মীয় সংখ্যালঘু কোনওটাই ছিল না।

এটা নির্দেশ করার দরকার নেই যে, এই সমালোচনা কীরকম মূর্খতাপূর্ণ ছিল। তফসিলি সম্প্রদায় বাস্তবিকই ধর্মীয় সংখ্যালঘু। হিন্দু ধর্ম তার অস্পৃশ্যতার বদ্ধমূল ধারণার দ্বারা তফসিলি জাতিকে হিন্দুদের মূল অঙ্গ থেকে এমনভাবে পৃথক করে রেখেছে যে, এই পৃথকীকরণ হিন্দু মুসলমান, অথবা হিন্দু শিখ অথবা হিন্দু এবং ক্রিশ্চানদের পৃথকতা থেকেও বেশি বাস্তবিক এবং বেশি বিস্তৃত। অস্পৃশ্যতার নীতি থেকে পৃথকীকরণ ও বিচ্ছেদের আর কোনও বেশি কার্যকরী প্রক্রিয়া অনুমোদন করা অসম্ভব এবং এরা সেই ব্যক্তি, যারা বিদ্বেষজনিত মানসিকতার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তফসিলি সম্প্রদায়কে তাদের রাজনৈতিক অধিকারের দাবি থেকে বঞ্চিত করতে এরকম ভোজবাজী দেখানো কথাবার্তায় প্রবৃত্ত হয়। যাঁরা লর্ড ওয়াভেল-এর এই বক্তব্যকে তাঁর নতুন সরে আসা বা 'ব্যতিক্রম' বলে মনে করেন, তাঁরা ভুলে

গেছেন যে মহামহিম সরকার, যখন এই ব্রিটিশ-এর কাছ থেকে ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতার হস্তান্তরের ব্যাপারটি চিন্তা করা হয়েছিল তখন থেকেই, তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি এই তফসিলি সম্প্রদায়ের প্রতি কী ছিল। সেই ১৯১৭ সাল থেকেই, যখন মন্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড রিপোর্টে দায়িত্বশীল সরকারের ব্যাপার সমর্থন করা হয়েছিল, তখন থেকেই ব্রিটিশ সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে, তাঁরা কোনও অবস্থাতেই ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতার হস্তান্তর করবেন না যতক্ষণ না তাঁরা এ-ব্যাপারে সন্তুষ্ট হন যে সাংবিধানিক ব্যবস্থার দ্বারা তফসিলি সম্প্রদায়ের অবস্থার সুরক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই সমস্ত রাজ-সচিব (Secretary of State) এবং ভারতের ভাইসরয়দের ১৯১৭ থেকে ১৯৪১ পর্যন্ত দেওয়া ঘোষণাগুলির কিছু কিছু পরবর্তী অংশে সংকলিত হয়েছে। এর থেকে দেখা যাবে যে তফসিলি সম্প্রদায়ের জাতীয় জীবনে পৃথক এবং গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্বের স্বীকৃতি এবং তাদের মতামত যে প্রয়োজনীয়, এগুলি কোনওক্রমেই নতুন প্রস্তাব নয়। এই উভয় বিবৃতিই সরকারের দায়িত্বশীল প্রতিনিধি, যথা রাজ-সচিব (Secretary) এবং ভাইসরয় কর্তৃক প্রদত্ত এবং তা ক্রিপ্‌সের প্রস্তাবের জন্মের অনেক আগে দেওয়া হয়েছিল। এ ব্যাপারে ১৪ই আগস্ট ১৯৪০ তারিখের মিঃ আমরের বিবৃতি এবং ১০ই জানুয়ারি ১৯৪০ তারিখে লর্ড লিন্‌লিথ্‌গোর বিবৃতির প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করা হচ্ছে। এটা আশা করা যায় যে, এই ঘোষণাপত্রগুলি মনোযোগের সঙ্গে পাঠ করা হলে, যারা তফসিলি সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক অধিকারের দাবিকে নস্যাৎ করতে চাইছেন, তাঁরা বুঝতে পারবেন যে, তাঁদের এই প্রচার বোকামি এবং বিদ্বেষপূর্ণ উভয়ই।

(১)

ভারতের সাংবিধানিক সংস্কার—১৯১৭
মন্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড রিপোর্টের উদ্ধৃতাংশ

১৫৫)... ... আমরা দেখিয়েছি যে প্রজাদের রাজনৈতিক শিক্ষা খুব তাড়াতাড়ি হতে পারে না, এবং খুবই কঠিন প্রক্রিয়া। যতদিন না এটি হচ্ছে, ততদিন সে তার থেকে চতুর এবং শক্তিশালী লোকের উৎপীড়নের ঝুঁকির নাগালের মধ্যেই থাকতে বাধ্য; এবং যতক্ষণ না এটা পরিষ্কার হচ্ছে যে তার স্বার্থ তার নিজের হাতে দেওয়া যেতে পারে বা বিধান পরিষদ তার স্বার্থের বিবেচনা করে এবং তার প্রতিনিধিত্ব করে, তার সুরক্ষার জন্য আমাদের সমস্ত ক্ষমতা আমাদের অধিকারে রাখা উচিত। এবং সেইরকম ভাবে অস্পৃশ্যবর্গদের জন্যও। আমরা তাদের প্রতিনিধিত্বের সুবন্দোবস্ত করতে ইচ্ছুক ; যার দ্বারা অবশেষে তারাও নিজেদের

আত্মরক্ষার শিক্ষা নিতে পারে। কিন্তু যদি দেখা যায় যে তাদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হচ্ছে বা তারা সাধারণ উন্নতির অংশীদার হচ্ছে না, তাদের সাহায্য করার জন্য সাধনের সমস্ত স্রোতগুলি আমাদের অধিকারে রেখে দেওয়া উচিত।

(২)

ভারত সরকারের পঞ্চম ডেসপ্যাচ তাং ২৩ শে এপ্রিল ১৯১৯— ভোটাধিকারের উপর সাউথবরো কমিটির রিপোর্টের বিষয় সংক্রান্ত

১৩) কমিটির মতে যে সমস্ত গোষ্ঠীস্বার্থ বেসরকারি মনোনয়নের দ্বারা প্রতিনিধিত্ব পাবে, তার তালিকাটি আমরা বিশ্লেষণ করেছি।

আমরা এই প্রস্তাবগুলি সাধারণভাবে গ্রহণ করেছি। কিন্তু একটি সম্প্রদায় আছে, যার ব্যাপারে কমিটির প্রদত্ত বিবেচনার থেকে আরও বেশি অপেক্ষা রাখে বলে আমাদের মনে হয়। 'ভারতীয় সাংবিধানিক সংস্কার'-এর রিপোর্টে অস্পৃশ্যবর্গের সমস্যাকে পরিষ্কার ভাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে এবং তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে একটি অঙ্গীকারও করেছে। 'তাদের প্রতিনিধিত্বের জন্য যতটা সুবন্দোবস্ত আমরা করতে পারি তা আমরা করতে ইচ্ছুক।'
*(Table, page No. 191)

কমিটির রিপোর্টে 'হিন্দু এবং অন্যান্য' বলে বর্ণিত জাতিগুলি, যদিও বিভিন্ন নামে সংজ্ঞা নিরূপিত, বিশেষভাবে বলতে গেলে তারা একই রকম লোক। তাদের পরিত্যাগ করার কঠোরতার তারতম্য ছাড়া, তারা কম-বেশি মাদ্রাজের পঞ্চমাদের স্থলাভিষিক্ত এবং হিন্দু সম্প্রদায়ের সেই অংশের বাহিরের, যাদের মন্দিরে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। তারা মোট জনসংখ্যার প্রায় $^1/_5$ (এক পঞ্চমাংশ) অংশ, এবং মর্লি-মিন্টো পরিষদে তাদের কোনও প্রতিনিধিত্ব করা হয়নি। কমিটির রিপোর্টে অস্পৃশ্যবর্গের দুবার উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু এটা শুধু এই ব্যাখ্যার জন্য যে তাদের সন্তোষজনক নির্বাচনমণ্ডলী না থাকার জন্য তাদের মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে। এই রিপোর্ট এই লোকেদের অবস্থা বা তাদের নিজেদের দেখাশোনা করার ক্ষমতা সম্বন্ধে কোন আলোচনা করেনি। না এটা ব্যাখ্যা করেছে কি এদের কত সংখ্যা মনোনয়ন দেওয়ার সালিশী করছে। রিপোর্টের ২৪তম প্যারাগ্রাফে মনোনীত আসনের সীমাবদ্ধতার ন্যায্যতা প্রতিবাদন করার যে কারণ দেখানো হয়েছে তা অস্পৃশ্যবর্গের ব্যাপারে নির্দেশ করে না। এই সম্প্রদায়ের জন্য তারা যে প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করে তা হল এইরূপ। যথা—

—	মোট জনসংখ্যা	অস্পৃশ্যদের জনসংখ্যা	মোট আসন	অস্পৃশ্য বর্গের আসন
মাদ্রাজ......	(দশ লক্ষ)	(দশ লক্ষে)		
	৩৯.৮	৬.৩	১২০	২
বোম্বাই.....	১৯.৫	.৬	১১৩	১
বাংলা.....	৪৫.০	৯.৯	১২৭	১
যুক্ত প্রদেশ....	৪৭.০	১০.১	১২০	১
পঞ্জাব......	১৯.৫	১.৭	৮৫	—
বিহার ও ওড়িশা	৩২.৪	৯.৩	১০০	১
কেন্দ্রীয় প্রদেশে	১২.২	৩.৭	৭২	১
অসম......	৬.০	০.৩	৫৪	—
মোট	২২১.৪	৪১.৯	৭৯১	৭

এই সংখ্যাগুলি নিজেদের হয়েই কথা বলে। এতে প্রস্তাব করা হয়েছে যে ব্রিটিশ ভারতের সমগ্র জনসংখ্যার ১/৫ অংশের জন্য, মোট আসন প্রায় ৮০০ শতের মধ্যে ৭টা আসন তাদের জন্য বিতরণ করা হোক। এটা সত্যি যে সমস্ত পরিষদেই প্রায় ১/৬ এক ষষ্ঠাংশ কর্মকর্তা থাকবেন যাঁরা অস্পৃশ্যবর্গের স্বার্থের ব্যাপারগুলো মাথায় রাখবেন; কিন্তু এই ব্যবস্থা আমাদের মতে, সংস্কারের রিপোর্ট চায় যা তা নয়। এই রিপোর্টের গ্রন্থকারগণ বলেছেন যে অস্পৃশ্যগণ তাদের স্বয়ং-সুরক্ষার বিষয়গুলিও শিখে নেবেন। এরূপ আশা করা নিশ্চয়ই উদ্ভট কল্পনা যে বিধানসভায় একজন সদস্য, যেখানে ষাট অথবা সত্তরজন হিন্দু জাতির সদস্য থাকবে, যুক্ত হলেই আশানুরূপ ফল হবে। রিপোর্টের প্যারা ১৫১, ১৫২, ১৫৪ এবং ১৫৫-কে লাভজনক করে তুলতে আমাদের এই অস্পৃশ্যদের প্রতি উদারতার সঙ্গে ব্যবহার করতে হবে। আমরা মনে করি যে প্রত্যেক কাউন্সিল পরিষদে অস্পৃশ্যবর্গের পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রতিনিধি থাকা দরকার, যার দ্বারা তাদের পরিষদে সম্পূর্ণ ডুবে যাওয়ার থেকে রক্ষা করা যায় এবং সামুহিক ক্রিয়াকলাপের জন্যও কিছু শক্তিকে উদ্দীপিত করা যায়। মাদ্রাজের ক্ষেত্রে, আমরা প্রস্তাব দিতে চাই যে, তাদের ছয়টা আসন দেওয়া হোক; বাংলায়, যুক্ত প্রদেশে, এবং বিহার এবং ওড়িশায় আমরা তাদের চারটি করে আসন দিতে চাই; বোম্বাই এবং সেন্ট্রাল প্রভিন্সে (কেন্দ্রীয় প্রদেশে) দুটি করে এবং অন্যত্র একটি করে আসন দিতে চাই। এই ব্যাপারে, আমরা মনে করি যে কমিটির রিপোর্টটিকে পরিষ্কার ভাবে সংশোধনের দরকার।

ভারতের সঙ্গে দীর্ঘদিন স্থায়ী সম্পর্ক মহামান্য সরকারের উপর কিছু কৃতজ্ঞতাজনিত বাধ্যবাধকতা চাপিয়ে দিয়েছে, যা তার সরকার গঠনের ব্যাপারে উদাসীনতা দেখিয়ে দূরে ছুড়ে ফেলা যায় না। উপরন্তু গভর্নর জেনারেলের সঙ্গে ইদানীং সমস্ত দলের এবং স্বার্থসংশ্লিষ্ট প্রতিনিধিদের যে আলোচনা চলছে তার এক অত্যন্ত লক্ষণীয় ফলাফল হল যে, সরকার কর্তৃক ভারতের সঙ্গে তাদের সমস্ত অবস্থা বা সম্পর্কের জলাঞ্জলি দিয়ে কোনও ঘোষণা ভারতীয় জনগণের এক বৃহৎ অংশের দ্বারাই গ্রহণীয় হবে না।

(৯)

ভাইসরয় তথা গভর্নর জেনারেল, মহামান্য লর্ড লিনলিথগো কর্তৃক ১৫ই জানুয়ারি ১৯৪০, ওরিয়েন্ট ক্লাব, বোম্বেতে প্রদত্ত ভাষণের উদ্ধৃতাংশ।

'যে কোনও সাংবিধানিক যোজনায় ভারতের একতার স্বার্থেই, ভারতীয় রাজ্যগুলির অন্তর্ভুক্তির প্রয়োজনীয়তার কথা আমাদের ভুলে গেলে চলবে না।

সংখ্যালঘুদেরও কিছু নাছোড়বান্দা দাবি আছে।

আমি কেবলমাত্র দুটির প্রসঙ্গ উল্লেখ করতে চাই—বৃহৎ মুসলিম সংখ্যালঘু এবং অনুসূচিত জাতি—অতীতে এদের জন্য কিছু সুরক্ষার নিশ্চিত প্রতিশ্রুতিও দেওয়া হয়েছে এবং এই যে তাদের অবস্থার সুরক্ষা দিতে হবে এবং সেইসব প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে হবে।'

(১০)

ভারতের জন্য রাষ্ট্রসচিব, মহামান্য মিঃ এল. এস. আমেরী কর্তৃক হাউস অফ কমন্সে ১৪ই আগস্ট ১৯৪০-এ প্রদত্ত ভাষণের উদ্ধৃতাংশ।

'কংগ্রেসের নেতৃবর্গ, একটি অসাধারণ প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছে, যা ভারতবর্ষে অত্যন্ত দক্ষতাপূর্ণ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান—এবং যদি তারা ভারতের জাতীয় জীবনের সমস্ত মুখ্য তত্ত্বগুলির ব্যাপারে কথা বলতে পারত—যা অবশ্য তারা সর্বদাই বলে থাকে—এই বলাটাই তাদের পেশা, তা হলে তাদের দাবিগুলি যতই অগ্রসর বা উন্নতিশীল হোক না কেন, আমাদের সমস্যাগুলি আজকের অবস্থার চেয়ে অনেক সুগম এবং সহজতর হত। এটা সত্যি যে, ব্রিটিশ ভারতে তারাই সংখ্যার দিক দিয়ে একমাত্র বৃহৎ দল, কিন্তু সেই হিসাবে যে তারা ভারতের হয়ে কথা বলবে, এটা ভারতীয় জনজীবনের প্রধান প্রধান তত্ত্বগুলি অস্বীকার করে। এই অন্যান্য তত্ত্বগুলি কেবলমাত্র সংখ্যালঘু হিসাবে গণ্য করার জন্য নয়, বরং ভারতের ভবিষ্যৎ

—	মোট জনসংখ্যা	অস্পৃশ্যদের জনসংখ্যা	মোট আসন	অস্পৃশ্য বর্গের আসন
মাদ্রাজ......	(দশ লক্ষ)	(দশ লক্ষে)		
	৩৯.৮	৬.৩	১২০	২
বোম্বাই.....	১৯.৫	.৬	১১৩	১
বাংলা.....	৪৫.০	৯.৯	১২৭	১
যুক্ত প্রদেশ....	৪৭.০	১০.১	১২০	১
পঞ্জাব......	১৯.৫	১.৭	৮৫	—
বিহার ও ওড়িশা	৩২.৪	৯.৩	১০০	১
কেন্দ্রীয় প্রদেশে	১২.২	৩.৭	৭২	১
অসম......	৬.০	০.৩	৫৪	—
মোট	২২১.৪	৪১.৯	৭৯১	৭

এই সংখ্যাগুলি নিজেদের হয়েই কথা বলে। এতে প্রস্তাব করা হয়েছে যে ব্রিটিশ ভারতের সমগ্র জনসংখ্যার ১/৬ অংশের জন্য, মোট আসন প্রায় ৮০০ শতের মধ্যে ৭টা আসন তাদের জন্য বিতরণ করা হোক। এটা সত্যি যে সমস্ত পরিষদেই প্রায় ১/৬ এক ষষ্ঠাংশ কর্মকর্তা থাকবেন যাঁরা অস্পৃশ্যবর্গের স্বার্থের ব্যাপারগুলো মাথায় রাখবেন; কিন্তু এই ব্যবস্থা আমাদের মতে, সংস্কারের রিপোর্ট চায় যা তা নয়। এই রিপোর্টের গ্রন্থকারগণ বলেছেন যে অস্পৃশ্যগণ তাদের স্বয়ং-সুরক্ষার বিষয়গুলিও শিখে নেবেন। এরূপ আশা করা নিশ্চয়ই উদ্ভট কল্পনা যে বিধানসভায় একজন সদস্য, যেখানে যাট অথবা সত্তরজন হিন্দু জাতির সদস্য থাকবে, যুক্ত হলেই আশানুরূপ ফল হবে। রিপোর্টের প্যারা ১৫১, ১৫২, ১৫৪ এবং ১৫৫-কে লাভজনক করে তুলতে আমাদের এই অস্পৃশ্যদের প্রতি উদারতার সঙ্গে ব্যবহার করতে হবে। আমরা মনে করি যে প্রত্যেক কাউন্সিল পরিষদে অস্পৃশ্যবর্গের পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রতিনিধি থাকা দরকার, যার দ্বারা তাদের পরিষদে সম্পূর্ণ ডুবে যাওয়ার থেকে রক্ষা করা যায় এবং সামুহিক ক্রিয়াকলাপের জন্যও কিছু শক্তিকে উদ্দীপিত করা যায়। মাদ্রাজের ক্ষেত্রে, আমরা প্রস্তাব দিতে চাই যে, তাদের ছয়টা আসন দেওয়া হোক; বাংলায়, যুক্ত প্রদেশে, এবং বিহার এবং ওড়িশায় আমরা তাদের চারটি করে আসন দিতে চাই; বোম্বাই এবং সেন্ট্রাল প্রভিন্সে (কেন্দ্রীয় প্রদেশে) দুটি করে এবং অন্যত্র একটি করে আসন দিতে চাই। এই ব্যাপারে, আমরা মনে করি যে কমিটির রিপোর্টটিকে পরিষ্কার ভাবে সংশোধনের দরকার।

(3)

লর্ড বার্কেনহেড, সেক্রেটারি অফ্ স্টেট ফর ইন্ডিয়া দ্বারা ৩০ শে মার্চ ১৯২৭, হাউস অফ্ লর্ডস-এ প্রদত্ত সংবিধিবদ্ধ কমিশনের নিযুক্তির ব্যাপারে ভাষণের কিছু অংশ।

...আমাকে এখন অস্পৃশ্যবর্গের ব্যাপারে কিছু বলতে দেওয়া হোক। ভারতবর্ষের এক বিরাট জনসংখ্যা, এমনকী যে জনসংখ্যার ব্যাপারে আমরা আলোচনা করছি তার অনুপাতেও প্রায় ছয় কোটি হল অস্পৃশ্যবর্গ। তাদের অবস্থা অতীতের মতো অত্যন্ত শোচনীয় এবং মর্মভেদী না হলেও শোচনীয় এবং মর্মভেদী। তারা সমস্ত রকম সামাজিক আদানপ্রদান থেকে বিতাড়িত। তারা যদি সূর্যের করুণাময় কিরণ এবং বিদ্বেষী ব্যক্তির মাঝখানে এসে পড়ে, তবে সেই বিদ্বেষী ব্যক্তির নিকট সূর্যও বিকৃত হয়। তারা জনসাধারণের ব্যবহার্য জল সরবরাহ থেকে পানের জন্য জল নিতে পারে না। তৃষ্ণা মেটাবার জন্য তাদের মাইলের পর মাইল ভিন্ন পথে হাঁটতে হয়, এবং তারা দুর্ভাগ্যবশত, এবং পুরুষানুক্রমে 'অস্পৃশ্য' বলে পরিচিত। ভারতবর্ষে তাদের সংখ্যা ৬০ মিলিয়ন (ছয় কোটি)। আমাকে কি এই কমিশনে তাদের একজন প্রতিনিধি নিতে হবে? কখনও না, কখনও আমি এরকম কমিশন নিযুক্ত করতাম না, অথবা কোনও গণতান্ত্রিক দেশেই এমন করত না, না আমার বিরোধী পক্ষের বন্ধুরাই অনুমোদন করতেন এরকম একটি কমিশন নিযুক্ত করতে, যার থেকে এরকম একটি শ্রেণীর সদস্যকে বাদ দেওয়া হয়েছে, যাদের প্রতিনিধিত্ব অন্য যে কোন শ্রেণীর থেকে বেশি প্রয়োজন, অবশ্য যদি আপনারা এই ব্যাপারটি একটি মিশ্রিত জুরি, যেমন আমি নির্দেশ করছি, তার কাছে তুলে ধরতে চান—তবে নিশ্চয়ই না।

(৪)

সাইমন কমিশনের রিপোর্ট ভলিউম—২ থেকে উদ্ধৃতাংশ

৭৮. .....অন্য কোন প্রদেশেই অস্পৃশ্যবর্গ যারা ভোট দেওয়ার যোগ্য, তাদের সংখ্যার আনুমানিক হিসাব পাওয়া সম্ভব হয়নি। এটা পরিষ্কার যে ভোটদানের বয়স বেশ কিছু কমিয়েও—যা অস্পৃশ্যবর্গ ভোটদাতার অনুপাত কিছুটা বাড়িয়ে দেবে—অস্পৃশ্য-বর্গের নিজস্ব প্রতিনিধি সাধারণের জন্য নির্দিষ্ট মতদান ক্ষেত্রে নির্বাচিত হয়ে আসার কোনও আশাই নেই—যতক্ষণ না এর জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়। অবশেষে অস্পৃশ্যবর্গের উন্নতি, যা তাদের রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে আদায় করা যেতে পারে, তাদের যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান প্রাপ্তির উপর নির্ভর করবে, যখন

অন্য সম্প্রদায়ের লোকেরা তাদের সাহায্য চাইবে এবং তাদের প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করবে।

৮০. সুতরাং এটা দেখা যাবে যে, আমরা অস্পৃশ্যবর্গদের সম্পূর্ণ জনসংখ্যার অনুপাতে আসন বিতরণ করা অনুমোদন করিনি। যে পরিমাণে সংরক্ষিত আসনের অনুমোদন করা হয়েছে তাতে অস্পৃশ্যবর্গ থেকে নেওয়া এম. এল. সি-দের সংখ্যা বেশ বৃদ্ধি পাবে। তাদের মধ্যে যে বহুধা বিস্তৃত দারিদ্র্য দ্বারা প্রতিনিধিত্ব এবং শিক্ষার অভাব বিদ্যমান, তার দ্বারা এটা অত্যন্ত সন্দেহজনক যে তারা সেরকম বিপুল সংখ্যায় যথেষ্ট শিক্ষার দ্বারা সজ্জিত সদস্য ব্যবস্থা করতে পারবে এবং সেই জন্য তাদের পক্ষে শিক্ষিত প্রবক্তার দ্বারা প্রতিনিধিত্ব পাওয়া অনেক ভাল হবে, তুলনামূলক ভাবে বেশি সংখ্যক অক্ষম প্রতিনিধির চেয়ে, যারা উচ্চবর্ণের গোলামসুলভ মনোবৃত্তির অধিকারী হয়ে উঠবে। বিভিন্ন প্রকার প্রতিনিধির মধ্যে আসনের পুনর্বিতরণের যে প্রচেষ্টা চলছে তা কখনই চিরস্থায়ী হতে পারে না, এবং এর পুনর্বিচার পূর্বক সংশোধনের ব্যবস্থা রাখা একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু আমরা মনে করি যে আমাদের প্রস্তাব বর্তমানের জন্য যথাযথ, বিশেষত যখন আসন সংরক্ষণের দ্বারা মতের প্রতিনিধিত্ব, অসংরক্ষিত আসন অধিকারের সম্ভাবনাকে হটাতে পারে না।

(৫)

সাইমন কমিশন দ্বারা বর্ণিত সাংবিধানিক সংস্কারের প্রস্তাবের উপর ভারত সরকারের দ্রুত প্রেরিত বার্তা —উদ্ধৃতাংশ

৩৫. অস্পৃশ্যবর্গের প্রতিনিধিত্ব—অস্পৃশ্যবর্গের প্রতিনিধিত্বের ব্যাপারে কমিশন যে প্রস্তাব করেছে, প্রাদশিক সরকারগুলি দ্বারা তার অত্যন্ত সমালোচনা করা হয়েছে। এই বর্গের বিশেষ প্রতিনিধিত্বের যোজনার (মনোনয়ন ছাড়া অন্য যে কোনও পদ্ধতির দ্বারা) মধ্যে প্রত্যেক প্রদেশের জন্য 'অস্পৃশ্যবর্গের' পরিভাষা গঠন করার ঝামেলা অন্তর্নিহিত আছে। কিন্তু কমিশনের প্রস্তাব গভর্নরের উপর একটি অদ্ভূত বিহ্বলতাপূর্ণ কাজের, অস্পৃশ্যবর্গের প্রার্থী হয়ে দাঁড়ানোর জন্য অনুমোদিত ব্যক্তিকে শংসাপত্র (Certificate) দেওয়ার ভার দিয়েছে। এবং প্রতিনিধিত্বের যে অনুপাত কমিশন প্রস্তাব করেছে, যা হল প্রদেশের সেই মতাধিকার ক্ষেত্রের মোট জনসংখ্যার অনুপাতে অস্পৃশ্যবর্গের জনসংখ্যার তিন-চতুর্থাংশ, অনেক বেশি বলে প্রতীয়মান হয়। যুক্ত প্রদেশের সরকার হিসাব করে দেখেছেন যে ওই প্রদেশে কমিশনের প্রস্তাব অনুসারে সেই বর্গের বর্তমানে একজন মনোনীত প্রতিনিধির পরিবর্তে কমপক্ষে চল্লিশজন

প্রতিনিধি প্রাদেশিক বিধানসভায় নির্বাচিত হয়ে আসবেন। অস্পৃশ্যবর্গের প্রতিনিধিত্বের গোটা সমস্যাটিরই ভোটাধিকার কমিটি (Franctise Committee) দ্বারা সতর্কতার সঙ্গে পরীক্ষা করা প্রয়োজন। এবং এই পরিস্থিতিতে আমরা সহজভাবে বলতে চাই যে, আমাদের মতে তাদের জন্য যথেষ্ট প্রতিনিধিত্ব পাওয়ার ব্যবস্থা যা কার্যকর হতে পারে এমন সর্বোত্তম প্রক্রিয়ার দ্বারা করা উচিত। যদিও এ ব্যাপারে সম্প্রদায়ের মধ্যেই মতভেদ আছে, অস্পৃশ্যবর্গদের সংগঠনের সাম্প্রতিক সভায় পৃথক নির্বাচন মণ্ডলীর উপর তাদের বিশ্বাসকেই পুনঃ সমর্থন করেছে।

(৬)

লোথিয়ান কমিটির (ভোটাধিকার ১৯৩২ সংক্রান্ত) বিচার্য বিষয়-এর উদ্ধৃতাংশ

৩. আপনারা বোধ হয় জানেন যে ভারতীয় প্রদেশগুলিতে বর্তমান নির্বাচন মণ্ডলীর সংখ্যা, সমস্ত ক্ষেত্রের, যারা প্রাদেশিক বিধান পরিষদে সদস্য নির্বাচিত করে পাঠায়, শতকরা তিনভাগ মাত্র, এবং এটা স্পষ্টতই বোধগম্য যে এইরূপ সীমিত ভোটাধিকারের দ্বারা জনগণের গরিষ্ঠ সংখ্যক ব্যক্তি এবং জনসমুদয়ের বৃহৎ এবং গুরুত্বপূর্ণ অংশ বিধানসভায় কোনও ফলদায়ক বা সক্রিয় প্রতিনিধিত্ব পেতে পারে না। মহামহিম সরকারের দ্বারা দায়িত্বশীল সংঘীয় সরকার, কিছু কিছু সংরক্ষণ, এবং নিরাপত্তা সাপেক্ষে, এর নীতি গ্রহণ করা হয়েছে, এবং এও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে গভর্নরদের প্রদেশগুলি দায়িত্বশীল শাসিত রাজ্য হবে, এবং তাদের নিজস্ব ক্ষেত্রে নিজস্ব নীতির অনুশীলনে বাধাহীন স্বাধীনতা উপভোগ করবে। এই পরিস্থিতিতে ভোটাধিকার ক্ষেত্রের (নির্বাচনমণ্ডলীর) প্রসারণ একান্ত প্রয়োজন, যার দ্বারা বিধানসভাগুলি জনসংখ্যার প্রকৃত প্রতিনিধি হয়ে উঠতে পারে এবং জনসমুদয়ের কোনও গুরুত্বপূর্ণ অংশই যেন তাদের প্রয়োজন এবং মতামত অভিব্যক্ত করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত না হয়।

৬. সম্মেলনে যে সমস্ত বিষয় আলোচনা হয়েছে তা থেকে এটা স্পষ্টতই প্রতীয়মান যে, নতুন সংবিধানে অস্পৃশ্যবর্গের প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজন এবং মনোনয়নের দ্বারা প্রতিনিধিত্ব এখন আর যথোপযুক্ত নয়। আপনি জানেন যে, অস্পৃশ্যবর্গকে পৃথক নির্বাচনমণ্ডল দেওয়ার ব্যাপারে মতভেদ আছে এবং আপনাদের এই কমিটির পরীক্ষা বা অনুসন্ধান এই প্রশ্নের সিদ্ধান্তের উপর হবে এবং নির্দেশ করবে যে অস্পৃশ্যগণ কী পরিমাণে এই সাধারণ নির্বাচনমণ্ডলে তাদের ভোটের অধিকার নিশ্চিত করতে পারবে, এইরূপ ভোটের অধিকারের সাধারণ

নীতির ক্ষেত্রে তারা যে পৃথক সংগঠিত উপাদান, তার অধিকারের কথা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করে। এই তত্ত্বগুলির সর্বাগ্রে রয়েছে বৃহৎ মুসলমান সম্প্রদায়। ভৌগোলিক নির্বাচন ক্ষেত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটের দ্বারা নির্বাচিত বিধানসভার দ্বারা রচিত সংবিধানের উপর তাদের কোনও আশা-ভরসা নেই। যে কোনও সাংবিধানিক আলোচনায় তারা সংখ্যাতত্ত্বের দিক দিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠের নির্ণয়ের বিরুদ্ধে তাদের একটি সত্তা হিসাবে গণ্য হওয়ার অধিকারের দাবি করে। এই একই ব্যাপার সেই বৃহৎ জনসমুদয়ের ব্যাপারেও প্রযোজ্য, যারা অনুসূচিত বা অস্পৃশ্য জাতি বলে পরিচিত, যারা মনে করে যে তাদের হয়ে শ্রী গান্ধীর আন্তরিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও সম্প্রদায় হিসাবে তারা হিন্দু সম্প্রদায়ের মূল স্রোতের বাইরে দাঁড়িয়ে আছে আর এই হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব করছে কংগ্রেস।'

(১১)

মহামান্য মিঃ এল. এস. আমেরী, ভারতের জন্য রাষ্ট্রসচিব দ্বারা ২৩ শে এপ্রিল, ১৯৪১-এ হাউস অফ্ কমন্স-এ প্রদত্ত ভাষণের উদ্ধৃতাংশ।

'ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ সংবিধান ভারতীয়দের নিজেদের দ্বারাই রচিত হবে এবং ব্রিটিশ সরকারের দ্বারা নয়। ভারতের ভবিষ্যৎ সংবিধানটি অপরিহার্যভাবে একটি ভারতীয় সংবিধান হবে এবং তা ভারতীয়দের, ভারতের অবস্থা এবং ভারতীয় জনগণের প্রয়োজন সম্বন্ধে বোধ এবং ধারণার উপর নির্ভর করে রচিত হবে। একমাত্র এটিই অপরিহার্য শর্ত হবে যে, ভারতীয় সংবিধানটি এবং যারা এটি রচনা করবে, তা জাতীয় জীবনের সমস্ত তত্ত্বগুলির মধ্যে সম্মতির ফলস্বরূপ হবে।'

(১২)

মহামহিম বড়লাট লর্ড লিনলিথগো কর্তৃক ৮ই আগস্ট ১৯৪০-এ প্রদত্ত বিবৃতির উদ্ধৃতাংশ।

'এই দুটি হল প্রধান আলোচ্য বিষয় যা উদ্ভূত হয়েছে। মহামান্য সরকার এই দুটি বিষয়ের উপর তাঁদের অবস্থাটি আমাকে পরিষ্কার ভাবে বলতে বলেছেন। প্রথমটি হল ভবিষ্যতের সাংবিধানিক যোজনায় সংখ্যালঘুদের অবস্থান সম্পর্কিত। .....এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, মহামান্য সরকার ভারতের শান্তি এবং কল্যাণের জন্য এমন কোনও সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করার ব্যাপারে বিবেচনা করতে পারেন না যার কর্তৃত্ব ভারতের জাতীয় জীবনের এক বৃহৎ এবং শক্তিশালী সমুদয় (তত্ত্ব) কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হবে। না এই সরকার, ওই সমস্ত সমুদয় বা তত্ত্বের উপর সরকারের বশ্যতা স্বীকারের জন্য বলপ্রয়োগের অংশীদার হবে।'

পরিশিষ্ট-VII

সংখ্যালঘু এবং গুরুত্ব

মন্টেগু-চেম্‌সফোর্ড রিপোর্ট এবং সাইমন কমিশনের নিরপেক্ষ গুরুত্ব বিতরণের উপর অভিমত।

(১)

মন্টেগু-চেম্‌সফোর্ড রিপোর্ট ঃ ভারতের সাংবিধানিক সংস্কারের উপর মন্টেগু-চেম্‌সফোর্ডের রিপোর্টের উদ্ধৃতাংশ।

163) সংখ্যালঘুর প্রতিনিধিত্ব : এটা প্রস্তাবিত হয়েছে যে, গুরুত্বপূর্ণ সংখ্যালঘুদের প্রতিনিধিত্ব নির্বাচনের দ্বারা হবে। এটি একটি বিশেষ পদ্ধতির দিকে নির্দেশ করে, যা পরবর্তীকালে কেবলমাত্র মুসলমানদের জন্যই বিশেষভাবে উল্লিখিত, যারা নিজেদের জন্য বিশিষ্ট এবং সাধারণ নির্বাচন ক্ষেত্রে দু' জায়গাতেই মতদান করতে পারবে না। অন্য কিছু সম্প্রদায়কে এ ব্যাপারে বঞ্চিত করার অসুবিধার ব্যাপারে আমরা রিপোর্টের অন্যত্র উল্লেখ করেছি, যেমন পঞ্জাবে শিখদের, যে বিশেষ সুবিধা মুসলমানদের দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন প্রদেশে মুসলমানদের নির্বাচনমণ্ডলীতে যে অনুপাতে আসন সংরক্ষিত হবে সে ব্যাপারেও এই যোজনার প্রণেতাগণ রাজি হয়েছেন এবং রিপোর্টে উল্লেখ করেছেন। আমরা জানি না, আলাপ আলোচনা ছাড়া আর কী উপায়ে এই অঙ্কগুলিকে নির্ণয় করা হয়েছে। সমস্ত প্রদেশেই পৃথক নির্বাচন মণ্ডলীর প্রস্তাব করা হয়েছে যেখানে মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা আছে ; এবং যেখানেই তারা সংখ্যাগত ভাবে দুর্বল, সেখানে অনুপাতটি বর্তমান প্রতিনিধিত্ব অথবা তাদের সংখ্যাগত শক্তির চেয়ে বেশি করে প্রস্তাব করা হয়েছে। একই সময়ে, সমস্ত মুসলিম সংগঠনগুলি আমাদের কাছে আবেদন করেছে যে, এটিকে আরও বাড়াতে হবে। এখন বিরোধিতা একটি সুবিধাজনক পরিস্থিতিতে, যে যদি অন্য কোনও সম্প্রদায় পৃথক আসনের জন্য দাবি করে, তাহলে অ-মুসলমান আসন থেকে সেই সংখ্যার আসন বাদ দিয়ে তাদের সন্তুষ্ট করা যেতে পারে, অথবা মুসলমান এবং অ-মুসলমান উভয় পক্ষের আসন কমিয়ে তা করা যেতে পারে; এবং হিন্দু মুসলমান সম্প্রদায় এই পদ্ধতির কোনটি প্রচলন করা যেতে পারে সে বিষয়ে কখনওই একমত হবে না। সুতরাং, যখন আমরা মুসলমানদের জন্য পৃথক প্রতিনিধিত্বের

অভিমত প্রকাশ করছি, এর কারণটি পরবর্তীকালে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, আমরা আমাদের নিকট উপস্থাপিত প্রস্তাব সম্পর্কে আমাদের অনুমোদন, অন্য সম্প্রদায়ের উপর তার প্রভাব কী হবে না জানা পর্যন্ত, এবং যতক্ষণ না সে ব্যাপারে সুষ্ঠু কোনও বন্দোবস্ত করা হয়েছে ততক্ষণ পর্যন্ত স্থগিত রাখা হচ্ছে। আমরা এই প্রস্তাবের প্রণেতাদের সঙ্গে একমত যে, মুসলমানগণ তাদের জন্য বিশেষ মতদান ক্ষেত্রে এবং সাধারণ নির্বাচন ক্ষেত্রে দু'জায়গায় মতদান করতে পারবে না—এবং মুসলিম লিগ দ্বারা এই বর্তমান ব্যবস্থার সংশোধনের ব্যাপারে যে সম্মতি দেওয়া হয়েছে তাকে আমরা স্বাগত জানাই।

(২)

ভারতীয় সংবিধিবদ্ধ কমিশনের রিপোর্ট—খণ্ড II থেকে উদ্ধৃতাংশ

মুসলমানদের আসনসংখ্যা

প্যারাগ্রাফ ৮৫ : এখন আমরা বিভিন্ন প্রাদেশিক পরিষদে মুসলমান সদস্যদের জন্য কী অনুপাতে আসন ছেড়ে দিতে হবে সেই প্রশ্নটি বিবেচনা করিব।

লক্ষ্ণৌ চুক্তি, যা আমরা ইতিমধ্যেই নির্দেশ করেছি, হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে প্রত্যেক প্রদেশে ভারতীয়দের নির্বাচিত আসনের মধ্যে মুসলমানদের বিতরণ করার জন্য অনুপাতের ব্যাপারে একটি স্বীকারপত্র এর অন্তর্ভুক্ত এবং এর শর্তগুলি প্রাদেশিক বিধানসভায় মুসলমানদের আসন বিতরণের ব্যাপারে প্রায় অনুসরণ করা হয়েছে। এই চুক্তিকে প্রতিনিধিত্বের ন্যায়সঙ্গত আধার বলে আর কোনও পক্ষই স্বীকার করতে চায় না এবং নানা বিরোধী যুক্তি উপস্থাপনা করা হচ্ছে—যা প্যারাগ্রাফ ৭০-এ উল্লিখিত হয়েছে। এখন আশা করা হচ্ছে যে, উভয় সম্প্রদায়ই একটি নতুন সমঝোতায় পৌছনোর জন্য পুনরায় প্রচেষ্টা করবে; কিন্তু যদি কোনও সমন্বয় না হয়, তাহলে অন্য পক্ষকে একটি সিদ্ধান্ত নিতে হবে, অবশ্য এই ধারণা করে যে, পৃথক নির্বাচনমণ্ডলী থাকছেই। আমাদের নিজস্ব অভিমত এই যে, বর্তমান পরিস্থিতি, এবং আটটি প্রদেশের মধ্যে দুইটিতে মুসলমানদের দুর্বলতার পরিপ্রেক্ষিতে, মুসলমানদের সপক্ষে বর্তমান গুরুত্বের পরিমাপটি যথাযথ ভাবে বজায় রাখা হোক। অতএব এতদনুসারে 'সাধারণ' নির্বাচনমণ্ডলীতে তাদের আসনের অনুপাত (ইউরোপিয়ানদের জন্য সাধারণ নির্বাচন ক্ষেত্র বাদে) বর্তমানের মতো নির্ধারিত হবে। কিন্তু মুসলমানদের প্রতিনিধিত্বের গ্যারান্টির জন্য আরও একটি দাবি উপস্থাপিত

করা হয়েছে, যা আরও কিছুটা এগিয়ে—এর জন্য প্যারা ৭০ এবং এই অধ্যায়ের শেষে পরিশিষ্ট VII দেখুন। এই দাবিটি হল, ছয়টি প্রদেশে মুসলমানদের যে প্রতিনিধিত্ব দেওয়া হয়েছে তার সুরক্ষা চেয়ে, এবং সেই সময়ে বাংলা এবং পঞ্জাবে যে অনুপাতে এই সম্প্রদায় পৃথক নির্বাচনমন্ডলীর দ্বারা যে আসন পেয়েছে তার প্রসারণ জনসংখ্যার অনুপাতে। এটি মুসলমানদের দুই প্রদেশেই 'সাধারণ নির্বাচন ক্ষেত্রে' একটি নির্দিষ্ট এবং অপরিবর্তনীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতা দেবে। আমরা অতদূর যেতে পারি না। বর্তমানে ছয়টি প্রদেশে যে গুরুত্বের পরিমাপ আছে তা দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে কোনওরূপ নতুন চুক্তি ছাড়া, কখনওই সমভাবে এতদূর সংযুক্ত করা যাবে না, যেখানে বাংলা এবং পঞ্জাবের আসন বিতরণের ব্যবস্থা বর্তমান ব্যবস্থার থেকে অনেক দূরে সরে যাবে।

এটা অত্যন্ত অশোভন বা অনায্য হবে যে, মুসলমানগণ ছয়টি প্রদেশে যে পরিমাণ গুরুত্ব উপভোগ করছে তা বজায় রাখবে, এবং তৎসঙ্গে হিন্দু এবং শিখদের বিরোধিতা সত্ত্বেও, বাংলা এবং পঞ্জাবে একটি সুনিশ্চিত সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবে, যা নির্বাচকমণ্ডলীর কাছে আবেদন ছাড়াই অপরিবর্তনীয় থাকবে। অন্যদিকে, যদি বাংলা কোনও চুক্তি বা সংবিদার দ্বারা পৃথক নির্বাচনমণ্ডলী ছেড়ে দেওয়া হয় (ত্যাগ করা হয়), এবং তার দ্বারা সেই প্রদেশে প্রত্যেক সম্প্রদায়কে জনসাধারণের কাছে আবেদন করে যতগুলি পারে আসন জিততে পারে, তার জন্য ছেড়ে দেওয়া হয়, তা হলে আমরা ছয়টি প্রদেশে, যেখানে তারা সংখ্যালঘিষ্ঠ হয়ে আছে সেখানে তাদের গুরুত্ব (Weightage) পাওয়া থেকে আমরা বঞ্চিত করতে চাই না। সেইরূপ একই ভাবে যদি পঞ্জাবে মুসলমান, শিখ এবং হিন্দু সম্প্রদায়যুক্ত নির্বাচনমণ্ডলীর মধ্যে যাতে তিনটি সম্প্রদায়ের লোকই অন্তর্ভুক্ত থাকবে, থেকেই নির্বাচন করবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করে, আমরা তবুও রাজি আছি যে এই তিনটি সম্প্রদায় একত্রিত হোক, অবশ্য অন্য ছয়টি প্রদেশে মুসলমানগণ পৃথক নির্বাচনমণ্ডলীর দ্বারা যে সংখ্যাগত অনুপাত পেয়েছে, তা অক্ষুণ্ণ রেখেই।

আমরা আমাদের এই শেষোক্ত প্রস্তাবটি করছি, যা বাস্তবিকই মুসলমান সম্প্রদায়কে দুটো পথের যে কোনও একটি বেছে নেওয়ার সুবিধা দিচ্ছে, কারণ আমরা আন্তরিক ভাবে সমস্তরকম প্রচেষ্টা করে দেখতে ইচ্ছুক, যার দ্বারা এই পৃথক নির্বাচন মণ্ডলীকে যতদূর সম্ভব কমানো যায় এবং অন্য পদ্ধতিকে একটি পরীক্ষামূলক ভাবে যাচাই করে দেখতে চাই।

পরিশিষ্ট-VIII

ক্রিপ্‌সের প্রস্তাব

ভারতীয় নেতাদের সঙ্গে আলোচনার জন্য খসড়া ঘোষণা

ব্রিটিশ যুদ্ধকালীন মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত যা স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্‌স ভারতীয় নেতাদের সঙ্গে আলোচনার জন্য সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন, এবং এই আলোচনার, যা এখন হতে চলেছে, ফলাফলের উপর নির্ভর করবে যে ওই বিষয়গুলি কার্যে পরিণত বা সম্পাদিত হবে কি না।

মহামান্য সরকার, ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ-এর ব্যাপারে যে সমস্ত অঙ্গীকার করেছেন সেগুলির পূরণের ব্যাপারে এ দেশে এবং ভারতে যে উদ্বিগ্নতা প্রকাশ পেয়েছে সেগুলি বিবেচনা করে, ভারতবর্ষে খুব শীঘ্রই স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা প্রচলন করার জন্য যে সমস্ত পদক্ষেপ নিতে প্রস্তাব করেছেন, সেগুলি সংক্ষিপ্ত নির্ভুল এবং পরিচ্ছন্ন ভাষায় উপস্থাপনা করতে চান। এর উদ্দেশ্য হল ভারতকে একটি নতুন ভারতীয় সংঘ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করা এবং যুক্তরাজ্যের ইউ. কে অধীনে একটি স্বয়ংশাসিত রাজ্যে পরিণত হবে এবং যুক্তরাজ্যের সঙ্গে অন্যান্য সংঘগুলির সহযোগে ইংল্যান্ডের ক্রাউন-এর প্রতি আনুগত্য স্বীকার করবে, কিন্তু এই সংঘগুলি সর্বতোভাবে সমান হবে এবং তার অভ্যন্তরীণ বা বাহ্যিক ব্যাপারে এদের অধীন হবে না।

সেইজন্য মহামান্য সরকার নিম্নোক্ত ঘোষণাটি করছেন—

(ক) যুদ্ধবিগ্রহের সমাপ্তির অব্যবহিত পরেই ভারতবর্ষে একটি নির্বাচিত সংগঠন স্থাপিত করা হবে (যার গঠনের পদ্ধতি পরে বর্ণিত হচ্ছে), যাদের কাজ হবে ভারতবর্ষের জন্য একটি নতুন সংবিধান প্রণয়ন করা।

(খ) সংবিধান নির্মাণের সংস্থায় ভারতীয় রাজ্যগুলির যোগদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

(গ) নিম্নোক্ত শর্তগুলির সাপেক্ষে মহামান্য সরকার সেই সংবিধান গ্রহণ এবং প্রচলন করতে অঙ্গীকার করছে। শর্তগুলি হল, যথা—

(i) ব্রিটিশ ভারতের যে কোনও প্রদেশের এই নতুন সংবিধান গ্রহণ না করার

অধিকার থাকবে, এবং তার বর্তমান সাংবিধানিক অবস্থা (স্থিতি) বজায় রাখার অধিকার থাকবে এবং যদি তারা পরবর্তীকালে সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত হতে চায় তবে তা হতে পারবে, এর জন্য ব্যবস্থা রাখতে হবে।

এইরূপ ভারতের যুক্তরাজ্যের সঙ্গে মিলতে অ-রাজি প্রদেশগুলিকে, যদি তারা চায়, মহামান্য সরকার একটি নতুন সংবিধান তৈরি করে দেবে এবং ভারতের যুক্তরাজ্যের মতোই তাদের প্রতিষ্ঠা বা পদমর্যাদা থাকবে এবং সেই সংবিধান এই রিপোর্টে বর্ণিত পদ্ধতির দ্বারাই তৈরি হবে।

(ii) মহামান্য সরকার এবং সংবিধান প্রস্তুতি সংগঠনের মধ্যে একটি সন্ধিপত্র হবে, যাতে দুই পক্ষই দস্তখত করবে। এই সন্ধিপত্রে ব্রিটিশের হাত থেকে ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতার সম্পূর্ণ হস্তান্তরের ব্যাপারে উদ্ভূত সমস্ত প্রয়োজনীয় ব্যাপারে পুনর্ব্যবস্থা থাকবে; এতে মহামান্য সরকার কর্তৃক অঙ্গীকৃত, সাম্প্রদায়িক এবং ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের সুরক্ষার ব্যাপারে ব্যবস্থা থাকবে; কিন্তু ব্রিটিশ কমনওয়েল্‌থের সদস্য কোনও রাজ্যের সঙ্গে সম্পর্কে ভারতীয় যুক্তরাজ্যের ইচ্ছামতো স্থাপনের ব্যাপারে কোনও প্রতিবন্ধকতা আরোপ করবে না।

ভারতের কোনও রাজ্য এই সংবিধানকে স্বীকার করুক বা অস্বীকার করুক না কেন এই সন্ধিপত্রের সংশোধনের জন্য, যা নতুন পরিস্থিতিতে প্রয়োজন হতে পারে, তাদের সঙ্গে ঐকমত্য প্রতিপাদনের জন্য আলোচনা করতে হবে।

(ঘ) এই সংবিধান-প্রস্তুতি সংগঠন, যতক্ষণ পর্যন্ত না ভারতের মুখ্য সম্প্রদায়গুলির নেতৃবর্গ যুদ্ধবিগ্রহের সমাপ্তির পূর্বে অন্য কোনওরূপ সংগঠনের রূপরেখার ব্যাপারে রাজি হচ্ছেন, ততক্ষণ নিম্নোক্তভাবে গঠিত হবে—

যুদ্ধ সমাপ্তির পরে যার প্রয়োজন হবে, প্রাদেশিক নির্বাচনের ফলাফল জানার অব্যবহিত পরেই, প্রাদেশিক বিধানসভার নিম্নকক্ষের সদস্যগণ, একটি একক নির্বাচন মণ্ডলী হিসাবে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের পদ্ধতিতে এই সংবিধান-প্রস্তুতি সংগঠনের নির্বাচন করবে। এই নতুন সংস্থায় নির্বাচন মণ্ডলীর ১/১০ অংশ (এক-দশমাংশ) সংখ্যায় সদস্য থাকবে।

ভারতীয় রাজ্যগুলিকেও তাদের জনসংখ্যার একই অনুপাতে, যেমন সমগ্র ব্রিটিশ ভারতের প্রতিনিধিদের জন্য বলা হয়েছে এবং ব্রিটিশ ভারতীয় সদস্যদের মতোই ক্ষমতাপ্রাপ্ত, প্রতিনিধি নিযুক্ত করার জন্য আমন্ত্রণ জানাতে হবে।

(ঙ) ভারতের এই চরম সংকটপূর্ণ সময়ে, এবং যতক্ষণ পর্যন্ত নতুন সংবিধান

রচিত না হচ্ছে, মহামান্য ব্রিটিশ সরকার তাঁদের যুদ্ধের প্রচেষ্টার অঙ্গ হিসাবে, ভারতের প্রতিরক্ষার নিয়ন্ত্রণ এবং নির্দেশনার দায়িত্ব নিজেদের হাতেই রাখবেন, কিন্তু ভারতের মিলিটারি, নৈতিক এবং আর্থিক সম্পদের সুব্যবস্থা করার দায়িত্ব ভারতের জনগণের সহযোগিতায় ভারতের সরকারের উপর বর্তাবে। মহামান্য সরকার ভারতের জনগণের এবং তাদের মুখ্য অংশের নেতাদের শুভবুদ্ধির কামনা করে এবং তাঁদের নিজস্ব দেশ, কমনওয়েল্‌থ এবং রাষ্ট্রসংঘের নেতাদের সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রিত করে। এইভাবে তাঁরা এই মহত্বপূর্ণ কর্ম সম্পাদনের জন্য, এবং যা ভারতের ভবিষ্যৎ স্বাধীনতার জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হবে, তার জন্য সক্রিয় এবং গঠনমূলক সাহায্য করতে সক্ষম হবে।

পরিশিষ্ট-IX

ক্রিপ্‌সের প্রস্তাবের প্রতিবাদ

ক্রিপ্‌সের প্রস্তাব কীভাবে অস্পৃশ্যদের উপর ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করবে তা দেখিয়ে আম্বেদকরের বিবৃতি।

যুদ্ধকালীন মন্ত্রিসভা (War Cabinet) প্রস্তাবগুলি মহামান্য ব্রিটিশ সরকারের হঠাৎ তর্ক পরিবর্তনের দৃষ্টান্তস্বরূপ। এইরূপ প্রস্তাবের উপস্থাপনা, যা সংখ্যালঘুদের অধিকারের উপর আক্রমণ বলে তাঁদের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত, ক্ষমতাপ্রাপ্তির জন্য অধিকারের সম্পূর্ণ সমর্পণের নিদর্শনস্বরূপ। এই প্রস্তাব 'মিউনিক' মানসিকতা মাত্র, যার সারমর্ম হল অন্যের বলিদানের দ্বারা নিজেদের রক্ষা করা। এবং এই প্রস্তাবের সর্বত্রই এইটিই বৃহদাক্ষরে লিখিত। সংবাদে প্রকাশ যে, মহামান্য সরকারের এই প্রস্তাব ভারতীয়দের দ্বারা প্রত্যাখ্যান এবং স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্‌সের মিশন অসফল হওয়ার জন্য আমেরিকা এবং ইংল্যান্ডের জনগণ ভারতীয়দের উপর বিরক্ত। আমেরিকানদের এই মনোভাবের জন্য ক্ষমা করে দেওয়া যেতে পারে, কিন্তু ইংল্যান্ডের জনগণ এবং স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্‌স-এর এ-ব্যাপারে ভালভাবে বোঝা উচিত। মনে হয় এটা তাঁদের বোধগম্য হয়নি যে মহামান্য ব্রিটিশ সরকার এখন যে প্রস্তাব দিচ্ছেন, কিছু মাস পূর্বে ওই একই প্রস্তাব মহামান্য সরকার কর্তৃক চরম নিকৃষ্ট বলে প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল। যাঁরা এটা বুঝবেন, তাঁরা নিশ্চয়ই বলবেন যে, সাংবিধানিক অগ্রগতির সমস্ত কার্যক্রমটির মধ্যে এটিই হল জঘন্যতম অংশ, যা মহামান্য সরকার তাঁদের পূর্ব প্রতিশ্রুতির বিরুদ্ধে হঠাৎ করতে চলেছেন। এই প্রস্তাব তিনটি অংশে বিভক্ত—

(১) ভারতের সংবিধান তৈরির অধিকার নিয়ে একটি সংবিধান সভা গঠন করতে হবে। এই সংবিধান সভার সংবিধান প্রস্তুতির জন্য সম্পূর্ণ ক্ষমতা থাকবে, যা সভার সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য যেমন চাইবে।

(২) এই সংবিধান ভারতের বর্তমান প্রদেশগুলির সবগুলিকেই অন্তর্ভুক্ত করবে না, বরং সেই সমস্ত প্রদেশ, যারা এই সংবিধানের মধ্যে আবদ্ধ হতে ইচ্ছুক তাদেরই অন্তর্ভুক্ত করবে। এর জন্য প্রদেশগুলিকে এ বিষয়ে, যে তারা সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত হবে কিনা, নির্ণয় নিতে অধিকার দেওয়া হয়েছে। এটি গণভোটের মাধ্যমে করতে হবে, যাতে কেবলমাত্র সংখ্যাগরিষ্ঠতাই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে যথেষ্ট।

(৩) এই সংবিধান সভাকে ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে একটি সন্ধিপত্রে চুক্তি করতে হবে। এই সন্ধিপত্রে সাম্প্রদায়িক এবং জাতিগত ও ধর্মগত সংখ্যালঘুদের সুরক্ষা এবং নিরাপত্তার ব্যবস্থা রাখতে হবে। এইরূপ সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হওয়ার পর ব্রিটিশ সরকার তাদের সার্বভৌমত্ব তুলে নেবে এবং সংবিধান সভা কর্তৃক রচিত সংবিধান কার্যকরী হবে।

এই হল মহামান্য সরকারের দেওয়া স্কিম বা যোজনার সংক্ষিপ্ত রূপরেখা। সংবিধান সভার এই প্রস্তাব কোনও নতুন প্রস্তাব নয়। যখন যুদ্ধ শুরু হয়েছিল তখন কংগ্রেস এই প্রস্তাব উপস্থাপনা করেছিল, কিন্তু যেটা গুরুত্বপূর্ণ সেটা হল যে, কংগ্রেসের সেই প্রস্তাব মহামান্য সরকার কর্তৃক প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল। সংবিধান সভা সম্পর্কে মিঃ আমেরি ১৪ই আগস্ট ১৯৪০-এ হাউস অফ কমন্সে নিম্নলিখিত বক্তব্য রাখেন—

'কংগ্রেস নেতৃবর্গ..... একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সংগঠন গড়ে তুলেছেন, যা ভারতে অত্যন্ত দক্ষ রাজনৈতিক সংগঠন (যন্ত্র)। কিন্তু তাঁরা যদি সফলকাম হতেন, যদিও কংগ্রেস তা প্রচার করে, ভারতের জাতীয় জীবনের সমস্ত তত্ত্বগুলির পক্ষ নিয়ে কথা বলতে পারতেন তা হলে তাঁদের দাবি যতই জটিল বা অগ্রসর হোক না কেন, আমাদের সমস্যা আজকের চেয়ে কিছু সহজ হত। এটা সত্য যে, ব্রিটিশ ভারতে সংখ্যাগত দিক দিয়ে একমাত্র বৃহৎ দল, কিন্তু তারা যে ভারতের সকলের পক্ষে কথা বলতে পারে এটা ভারতের জটিল জাতীয় জীবনের অনেক গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্বই সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করে। এই অন্যেরা কেবলমাত্র সংখ্যাতত্ত্ব ভাবে সংখ্যালঘু হয়ে পরিচিত হতে চায় না, বরং তারা ভারতের ভবিষ্যৎ নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে পৃথক মৌলিক উপাদান হিসাবে গণ্য হওয়ার অধিকার দাবি করে। এই তত্ত্বগুলির সর্বাগ্রে বৃহৎ মুসলমান সম্প্রদায় আছে। ভৌগোলিক মতদান ক্ষেত্রের সংখ্যাধিক্য ভোটের দ্বারা গঠিত এই সংবিধান সভার দ্বারা রচিত সংবিধানের প্রতি তাদের কোনও আস্থা নেই বা প্রয়োজনও নেই। যে কোনও সাংবিধানিক আলোচনায় তারা তাদের একটি পৃথক সত্তা হিসাবে মান্য করার অধিকার দাবি করে, এবং সেইরকমই সংবিধান স্বীকার করতে কৃতসংকল্প, যাতে তাদের কেবলমাত্র সংখ্যাগত ভাবে গরিষ্ঠ বলে স্বীকৃতি না দিয়ে তাদের একটি পৃথক সত্তা বলে তাদের অবস্থানকে মান্যতা দেবে। এই ব্যাপারটি সেই বিশাল জনসাধারণের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য, যারা অনুসূচিত জাতি বলে পরিচিত এবং যারা, শ্রী গান্ধীর ঐকান্তিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও মনে করে যে, তারা সম্প্রদায় হিসাবে হিন্দু সম্প্রদায়ের মূল সংগঠনের, যার কংগ্রেস প্রতিনিধিত্ব করে, বাইরের একটি সম্প্রদায়।'

এই বিবৃতি মিঃ আমেরি কর্তৃক দেওয়া হয়েছিল যখন তিনি ভাইসরয়ের ৮ই আগস্ট ১৯৪১-এর ঘোষণার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করছিলেন, যাতে তিনি তাঁর মহামান্য সরকার কর্তৃক সংখ্যালঘুদের প্রতি নিম্নলিখিত অঙ্গীকার করা হয়েছিল।

'এর থেকে দুটি দিক উদ্ভূত হয়েছে। এখন মহামান্য সরকার কর্তৃক আমাকে এই দুইটি Point (দিক)-এর অবস্থা পরিষ্কার করে বলতে বলা হয়েছে। প্রথমটি হল ভারতের ভবিষ্যৎ সাংবিধানিক যোজনায় সংখ্যালঘুদের অবস্থান সম্পর্কে। এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, তাঁরা (মহামান্য ব্রিটিশ সরকার) ভারতের শান্তি এবং কল্যাণের জন্য এমন কোনও শাসন পদ্ধতির হাতে তাঁদের উত্তর-দায়িত্ব হস্তান্তরের ব্যাপারে চিন্তা করছেন না, যার প্রাধিকারকে (আইনসঙ্গত অধিকার) ভারতের জাতীয় জীবনের এক বিরাট এবং শক্তিশালী তত্ত্ব অস্বীকার করে। তাঁরা এরূপ কোনও শক্তি প্রয়োগেরও পৃষ্ঠপোষক নন, যার দ্বারা এই তত্ত্বগুলি এরূপ একটি সরকারের বাধ্যতা স্বীকার করে।'

পুনরায় মিঃ আমেরি ২৩ শে এপ্রিল ১৯৪১ সালে সংবিধান সভার জন্য দাবির প্রতি প্রসঙ্গ উল্লেখ করেন এবং নিম্নোক্তভাবে নিজেকে প্রকাশ করেন—

'ভারতের ভবিষ্যৎ সংবিধান ভারতীয়দের নিজেদের দ্বারাই রচিত হওয়া উচিত এবং ব্রিটিশ সরকারের দ্বারা নয়। ভারতের ভবিষ্যৎ সংবিধান অপরিহার্যভাবে একটি ভারতীয় সংবিধান হওয়া উচিত, যা ভারতীয়দের অবস্থা এবং ভারতের প্রয়োজনের ভারতীয়দের বোধ অনুসারে রচিত হওয়া উচিত। কেবলমাত্র একটি শর্ত যে, ভারতের সংবিধানটি এবং এর রচনাকারী সংগঠনটি ভারতের জাতীয় জীবনের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্বগুলির মধ্যে একটি ঐকমত্যের দ্বারা রচিত এবং সংগঠিত হবে।'

সংবিধান সভার ব্যাপারে মহামান্য সরকার কর্তৃক এইরূপই মত প্রকাশ এবং অঙ্গীকার করা হয়েছিল, যা এখন মেনে নেওয়া হচ্ছে। পাকিস্তানের দাবির ব্যাপারে, এই দাবিটি মুসলিম লীগ কর্তৃক অগ্রসারিত হয়েছিল। মহামান্য সরকার দ্বারা এই দাবিটিও অগ্রাহ্য করা হয়েছিল। ১৯৪০ সালের ১লা আগস্ট মিঃ আমেরি হাউস অফ কমন্‌সে এ-ব্যাপারে এইভাবে বলেছিলেন—

'কংগ্রেস রাজ' অথবা 'হিন্দুরাজ', এর বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া এতদূর গড়িয়েছে যে, মুসলমানদের তরফ থেকে এখন ভারতকে হিন্দু এবং মুসলমান দুটি রাষ্ট্রে ভাগ করার দাবি সোচ্চার হচ্ছে। এই দাবির বিরুদ্ধে নানাবিধ এবং অনতিক্রম্য প্রতিবাদের সম্পর্কে, যা এখন চূড়ান্ত আকারে বিদ্যমান, আমি কিছুই বলতে চাই না। আমি কেবল এইটুকুই লিখে রাখতে চাই যে, এই দাবি স্থায়ী সংখ্যালঘুদের সমস্যাটিকে

একটি ছোট ক্ষেত্রে স্থানান্তরণ করে এবং এর সমাধান না করেই।'

পুনরায় ২৩শে এপ্রিল ১৯৪১-এ তিনি হাউস অফ কমন্সে তাঁর বক্তৃতায় এই প্রসঙ্গের উল্লেখ নিম্নোক্ত ভাষায় করেন—

'আমি এখানে তথাকথিত পাকিস্তান পরিযোজনার যে সমস্ত গভীর ব্যবহারিক এবং প্রয়োগ সম্বন্ধীয় সংকট উৎপন্ন হবে সে সম্বন্ধে আলোচনায় সংশ্লিষ্ট নই, অথবা আমি অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারতের ইতিহাসের অন্ধকারাচ্ছন্ন ঘটনাতে ফিরে যেতে চাই না, অথবা আমাদের চোখের সামনে ঘটিত বলকান দেশসমূহের বিপর্যয়পূর্ণ অভিজ্ঞতার কথাও বলতে চাই না, এটি বোঝাতে যে ভারতের এই ঐক্যের ভাঙনে কী পরিমাণ বিপদ, অন্তত বহির্বিশ্বের সঙ্গে তার সম্পর্কের ব্যাপারে, অন্তর্নিহিত আছে। অবশেষে, ভারতের এই ঐক্য—যার জন্য আমাদের গর্ব করার কারণ আছে—আমরাই তাকে এই ঐক্য দিয়েছিলাম—এর ভাঙনে আমাদের কোনও স্বার্থই সম্পাদিত হবে না।'

এই ছিল সংবিধান সভা এবং পাকিস্তান সম্পর্কে মহামান্য সরকারের মাত্র এক বছর আগে মতাদর্শ বা দৃষ্টিভঙ্গি।

এটা স্পষ্টতই বোধগম্য যে, এই সংবিধান সভার প্রস্তাবটি ছিল কংগ্রেসকে নিজের মতের দিকে টানার জন্য এবং পাকিস্তানের প্রস্তাবটি ছিল মুসলিম লীগকে নিজের দলে টানার জন্য। কিন্তু এই প্রস্তাবগুলি অস্পৃশ্যবর্গের সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করবে? সংক্ষেপে বলতে গেলে, তাদের হাতে-পায়ে বেঁধে হিন্দু জাতির কাছে সমর্পণ করা হবে। তারা তাদের কিছুই দেবে না, 'রুটীর বদলে পাথর'। কারণ এই সংবিধান সভা অস্পৃশ্যবর্গের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা ছাড়া কিছুই নয়। এই সংবিধান সভায় অস্পৃশ্যদের কী অবস্থান হবে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই ; অথবা এই সংবিধান সভার রাজনৈতিক প্রোগ্রাম কী হবে সে বিষয়েও সন্দেহ নেই। এই সংবিধান সভায় অস্পৃশ্যবর্গের কোনও প্রতিনিধি নাও থাকতে পারে, কারণ এই প্রস্তাবে কোনওরূপ সাম্প্রদায়িক নির্ধারিত অংশ (quota) নেই। যদিও তারা কেউ সেখানে থাকেও, তাদের কোনও স্বাধীন, মুক্ত এবং সিদ্ধান্ত নির্ণয়কারী ভোট থাকবে না। প্রথমত, অস্পৃশ্যবর্গের প্রতিনিধিগণ সেখানে শোচনীয় সংখ্যালঘু হবে। দ্বিতীয়ত, এই সংবিধান সভার সমস্ত সিদ্ধান্তই ঐক্য ভোটের দ্বারাই গৃহীত হবে এমন কোনও কথা নেই। কোনও প্রশ্নের সাংবিধানিক গুরুত্ব যতই থাকুক না কেন, সংখ্যাগরিষ্ঠ মতদানই সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে যথেষ্ট হবে। এটা এখন পরিষ্কার যে, এই পদ্ধতি অনুসারে অস্পৃশ্যবর্গের আওয়াজের এই সংবিধান সভায় কোনও মান্যতা হবে না।

তৃতীয়ত, বর্তমানে যে সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের নিয়মে এই সংবিধান সভার সদস্যগণ নির্বাচিত হবে, যেহেতু মহামান্য সরকারের প্রস্তাবে এই নিয়মই বলা হয়েছে, তাতে শেষ পর্যন্ত হিন্দু জাতির সদস্যগণই অস্পৃশ্যদের প্রতিনিধিদের সংবিধান সভায় মনোনয়ন দেবে। অস্পৃশ্যদের এরকম প্রতিনিধিরা হিন্দুদের হাতের পুতুলে পরিণত হবে। চতুর্থত, সংবিধান সভা কংগ্রেসীদের দ্বারা ভর্তি হয়ে যাবে এবং তারাই প্রধানতম সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হবে এবং নিজেদের কার্যক্রমকে চালিয়ে নিয়ে যেতে সক্ষম হবে। এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে শ্রী. গান্ধী, অস্পৃশ্যবর্গের সামাজিক উন্নয়নের ব্যাপারে তাঁর প্রচেষ্টার কথা যতই বলা হোক না কেন, অস্পৃশ্যবর্গকে সংবিধানে রাজনৈতিক স্বীকৃতি দেওয়ার এবং ভারতের জাতীয় জীবনে একটি পৃথক এবং বিশিষ্ট তত্ত্ব হিসাবে মান্যতা দেওয়ার ঘোরতর বিরোধী। যেহেতু ব্যাপারটি এইরকম, সংবিধান সভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের কাজ হবে অস্পৃশ্যবর্গকে বর্তমান সংবিধানে যে রাজনৈতিক সুরক্ষা ইতিমধ্যেই দেওয়া হয়েছে সেগুলিকে মুছে ফেলা। যে কোনও ব্যক্তি, যিনি এই সংবিধান সভার অন্তর্নিহিত ব্যাপারটি অনুধাবন করবেন, স্বীকার করবেন যে, মহামান্য সরকার তাঁদের এই প্রস্তাবের দ্বারা অস্পৃশ্যবর্গকে আক্ষরিক অর্থে নেকড়ের মুখে ছুড়ে দিয়েছেন। একথা বলা যেতে পারে যে, যেখানে সংবিধান সভা অস্পৃশ্যবর্গকে সাংবিধানিক সুরক্ষা দিতে অস্বীকার করতে পারে, সেখানে মহামান্য সরকার অত্যন্ত সতর্ক হয়ে তাঁদের প্রস্তাবে সংবিধান সভার সঙ্গে একটি সন্ধিপত্র বা চুক্তির ব্যবস্থা রেখেছেন, যার প্রধান উদ্দেশ্যই হল অস্পৃশ্য-বর্গের স্বার্থের সুরক্ষা করা। এই চুক্তির প্রস্তাবটি বাস্তবিক ভাবে আইরিশদের সঙ্গে বিবাদ মেটানোর জন্য যে যোজনা মহামান্য সরকার করেছিলেন, সেখান থেকে ধার নেওয়া। এই সন্ধিপত্রের প্রস্তাবটিতে কী কী সুরক্ষার ব্যাপার মহামান্য সরকার অন্তর্ভুক্ত করতে চান সেকথা কিছুই বলা নেই। এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিক, কারণ রাজনৈতিক সুরক্ষার প্রকৃতি, সংখ্যা এবং পদ্ধতির ব্যাপারে, মহামান্য সরকার এবং অস্পৃশ্যবর্গের মধ্যে মতানৈক্য হতে পারে, যা নতুন সংবিধানে অস্পৃশ্যদের স্বার্থরক্ষার জন্য প্রয়োজন হবে। এই সন্ধিপত্র সম্পর্কে দ্বিতীয় প্রশ্নটি হল, এই সন্ধিপত্রের পিছনে অনুমোদন বা বৈধতা কী হবে? এই সন্ধিপত্রটি কি সংবিধান সভা দ্বারা রচিত সংবিধানের অংশ হিসাবে গণ্য হবে, যার দ্বারা কোনও সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত ব্যবস্থা এই সন্ধিপত্রের বিরোধী হলে তা রদ বা অকার্যকর হবে? অথবা এই সন্ধির মতো হবে? ভারতের জাতীয় সরকার এবং মহামান্য ব্রিটিশ সরকার-এর মধ্যে কোনও বাণিজ্যিক চুক্তির মতো? যদি এই সন্ধিপত্রটি প্রথমোক্তটির মতো হয়, তাহলে এটি দেশের আইনস্বরূপ হবে এবং এর পিছনে ভারত সরকারের অনুমোদন থাকবে।

অন্যদিকে, যদি এই সন্ধিপত্রটি পরবর্তী হয়, এটা স্পষ্টতই প্রতীয়মান যে, এটি দেশের আইন হিসাবে গণ্য হবে না এবং এর পিছনে কোনও আইনগত অনুমোদন থাকবে না। এর অনুমোদন হবে সম্পূর্ণ রাজনৈতিক অনুমোদন। এখন একটি সন্ধিপত্র কখনওই জাতীয় সরকার দ্বারা রচিত সংবিধানকে বাতিল করতে পারে না, কারণ স্পষ্টত যে এরকম একটি ব্যাপার, যা আইরিশে স্বাধীন রাষ্ট্রে দেখা গিয়েছিল, অধীন রাষ্ট্রের স্বায়ত্ত শাসন অধিকারের সঙ্গে অসঙ্গত। এইরূপ সন্ধিপত্রের অনুমোদন কেবলমাত্র রাজনৈতিক অনুমোদন। এটা স্পষ্টত প্রতীয়মান যে, ঐরূপ স্বীকৃতির বা অনুমোদনের ব্যবহার সরকারের বৈশিষ্ট্য বা চরিত্রের উপর এবং জনমতের অবস্থার উপর নির্ভর করবে। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এখন দুটি প্রশ্ন উদ্ভব হয় : (১) মহামান্য সরকারের নিকট এমন কী উপায় আছে, যার দ্বারা তাঁরা এই সন্ধিপত্রের বাধ্যবাধকতা চালু করবেন? (২) দ্বিতীয়ত, মহামান্য ব্রিটিশ সরকার কি ভারতের জাতীয় সরকারের উপর এই উপায়গুলি প্রয়োগ করে সন্ধিপত্রের বাধ্যবাধকতা পালন করাতে দমন নীতি অবলম্বন করবেন? প্রথম প্রশ্নটির সম্বন্ধে বলা যায় যে, এই সন্ধির প্রচলন করার ব্যাপারে উপায়গুলি দু'রকমের—শক্তির প্রয়োগ এবং বাণিজ্যিক যুদ্ধ। মিলিটারি শক্তির ব্যাপারে বলা যায় যে, ভারতীয় সেনা পাওয়া যাবে না। কারণ এটি সম্পূর্ণভাবে নতুন ভারতের জাতীয় সরকারের কাছে হস্তান্তরিত হয়ে যাবে। সুতরাং মহামান্য সরকার সন্ধিপত্রটি লাগু (চালু) করার এই উপায়টি হারাচ্ছেন। এটা বিশ্বাস করা অসম্ভব যে, মহামান্য সরকার তাঁর নিজের সৈন্য পাঠাবেন জাতীয় সরকারকে সন্ধিপত্রের শর্ত পূরণ করাতে। বাণিজ্যিক যুদ্ধও সম্ভব নয়। এটি একটি আত্মঘাতী নীতি এবং আইরিশ স্বাধীন রাষ্ট্রের সঙ্গে জমির শুল্ক বা বৃত্তি আদায়ের যুদ্ধের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে, একটি (বেনিয়াসুলভ) দোকানদারের জাতি কখনও তা মঞ্জুর করবে না, যদিও এটা তাদেরই স্বার্থ এবং সম্মান রক্ষা করবে। এই সন্ধিপত্র, সেহেতু একটি শূন্যগর্ভ সূত্র মাত্র, যদি অস্পৃশ্যবর্গের প্রতি একটি নিষ্ঠুর উপহাস না হয়। মহামান্য সরকার এই প্রস্তাবগুলি ভারতীয়দের দ্বারা সানন্দে অভ্যর্থিত হওয়ার জন্য পাঠিয়েছেন। কিন্তু মহামান্য সরকার বা স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্‌স কেউই ব্যাখ্যা করেননি যে, কেন তাঁরা ভারতীয়দের কাছে সেই প্রস্তাবটিই দিচ্ছেন, যা একমাস আগে মহামান্য সরকার তীব্র ভাষায় নিন্দা করেছিলেন। এক বৎসর আগে, মহামান্য সরকার বলেছিলেন যে, তাঁরা সংবিধান সভা মঞ্জুর করবেন না, কারণ তা সংখ্যালঘুদের উপর পীড়ন হবে। মহামান্য সরকার এখন সংবিধান সভা মঞ্জুর করতে প্রস্তুত এবং সংখ্যালঘুদের পীড়ন করতেও প্রস্তুত। এক বৎসর আগে, মহামান্য সরকার বলেছিলেন যে, তাঁরা পাকিস্তান মঞ্জুর করবেন না, কারণ

তাতে ভারতবর্ষকে বলবান দেশের মতো করা হবে। আজ তাঁরা ভারতবর্ষকে বিভাজন হতে দিতে রাজি। এক বিরাট সাম্রাজ্যের সরকার কী করে তার সমস্ত নীতিজ্ঞান হারিয়ে ফেলে? এর একমাত্র ব্যাখ্যা এই যে, মহামান্য সরকার যুদ্ধের পরে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছে। এই প্রস্তাবগুলি সরকারের স্নায়ুদৌর্বল্যেরই লক্ষণ। মহামান্য সরকার কী পরিমাণ ভীতিগ্রস্ত হয়েছে তা বোঝা যাবে যদি কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগ কর্তৃক উত্থাপিত দাবিগুলির সঙ্গে সরকার কর্তৃক এই প্রস্তাবে দেওয়া সুবিধাগুলির তুলনা করা হয়। কংগ্রেস দাবি করেছিল যে সংবিধান সভা, যা সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে বা মতদানের দ্বারা নির্মিত হবে, সংবিধান তৈরি করবে। অন্যদিকে যখন ভাইসরয় ঘোষণা করলেন যে, কংগ্রেসের দাবিতে সংখ্যালঘুদের উপর নিপীড়নের ব্যবস্থা যা অন্তর্নিহিত আছে, তারসঙ্গে ব্রিটিশ সরকার নিজেকে জড়াবে না ; কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটি (কার্যকরী সমিতি) তার ২২ শে আগস্ট ১৯৪০ তারিখে ওয়ার্ধায় অনুষ্ঠিত সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি অনুমোদন করে—

‘এই কমিটি অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানায় যে, যদিও কংগ্রেস কোনওদিন কোনও সংখ্যালঘুর পীড়নের কথা চিন্তাও করে না, এমনকী ব্রিটিশ সরকার করতে বললেও নয়, সংবিধানের দাবিটির সমাধান একটি যথারীতি নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা গঠিত একটি সংবিধান সভার দ্বারা করতে চাওয়া হয়েছে, তাকে সংখ্যালঘুদের পীড়ন বলে ভুল বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, এবং সংখ্যালঘুদের বিষয়টিকে ভারতের প্রগতির পথে একটি অনতিক্রম্য বাধা হিসাবে তৈরি করা হয়েছে।’

কংগ্রেস আরও সংযোজন করল যে—

‘কংগ্রেস প্রস্তাব করছে যে, সংখ্যালঘুদের অধিকার সংখ্যালঘুদের নিকট প্রতিনিধিদের সঙ্গে চুক্তির দ্বারা রক্ষা করতে হবে।’

এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, এমনকী কংগ্রেসও সংখ্যালঘুদের অধিকার সম্বন্ধীয় সিদ্ধান্তকে সংবিধান সভার এক্তিয়ারের অন্তর্ভুক্ত করার দাবি করেনি। মহামান্য ব্রিটিশ সরকার, তৎসত্ত্বেও, সংখ্যালঘুদের অধিকার সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত কেবলমাত্র সংখ্যাগরিষ্ঠ মতদানের দ্বারা হবে বলে একটি অতিরিক্ত অধিকার তাদের দিয়েছিলেন। পাকিস্তানের প্রশ্নেও, একই মনোবৃত্তি দেখতে পাওয়া যায়। মুসলিম লীগ এমন দাবি করেনি যে তৎক্ষণাৎ পাকিস্তান-এর দাবি মেনে নিতে হবে। মুসলিম লীগ এইটুকু চেয়েছিল যে সংবিধানের পরবর্তী সংশোধনের সময় মুসলমানদের পাকিস্তানের প্রশ্নটি উত্থাপন করতে বাধা দেওয়া চলবে না। কিন্তু বর্তমান প্রস্তাবগুলি আরও এক পা এগিয়ে গেছে, এবং মুসলিম লীগকে পরিষ্কার ভাবে পাকিস্তান তৈরি করার অধিকার দিয়েছে।

এগুলি সংবিধান সম্বন্ধীয় প্রস্তাব। এগুলি এই উদ্দেশ্যেই করা হয়েছে যেন ভারতবর্ষ হিন্দু, মুসলমান, অস্পৃশ্যবর্গ এবং শিখদের মধ্যে একটি বৃহৎ যুদ্ধে সর্বান্তঃকরণে নিজেকে জড়িয়ে ফেলে। তথাপি স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্‌স মহামান্য সরকারের অনুমতিতে কিংবা বিনা অনুমতিতেই, গরিষ্ঠ এবং লঘিষ্ঠ দলের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করছেন। সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হবে তারা, যাদের সম্মতির প্রয়োজন হবে। সংখ্যালঘিষ্ঠ দল হবে তারা, যাদের সঙ্গে আলোচনাই যথেষ্ট বলে বিবেচিত হবে। এটি একটি নতুন বৈশিষ্ট্য। নিশ্চিতভাবে, মহামান্য সরকারের অথবা ভাইসরয়ের পূর্ব ঘোষণায় কখনওই বলা হয়নি। পূর্ব ঘোষণায় যা বলা হয়েছিল তা হল 'ভারতের জাতীয় জীবনে প্রধান প্রধান তত্ত্বগুলির সম্মতি।'

যতদূর পর্যন্ত অস্পৃশ্যবর্গেরা সংশ্লিষ্ট আছে, আমি এমন কোনও ঘোষণা সম্পর্কে অবহিত নই, যাতে অস্পৃশ্যবর্গকে মুসলমানদের থেকে নিচু স্তরে রাখা হয়েছিল। আমি ১০ই জানুয়ারি ১৯৪১-এ ভাইসরয়ের বোম্বাই-এ দেওয়া বক্তৃতার উদ্ধৃতি দিচ্ছি, যাতে দেখা যাবে যে, অস্পৃশ্যবর্গকে মুসলমানদের সঙ্গে একই বন্ধনীর মধ্যে রাখা হয়েছে।—

'সংখ্যালঘুদের গোঁ ধরা দাবি আছে। আমি কেবলমাত্র দুটির প্রসঙ্গ উল্লেখ করতে চাই। যা হল, বৃহৎ মুসলমান সংখ্যালঘু এবং অস্পৃশ্যবর্গ (অনুসূচিত জাতি) অতীতে এই সংখ্যালঘুদের জমানত (গ্যারান্টি) দেওয়া হয়েছিল যে তাদের অবস্থা বা স্থিতিকে সুরক্ষিত রাখতে হবে এবং সেই প্রতিশ্রুতি বা জমানতকে সম্মান দিতে হবে।'

এখন যে বিরাগপূর্ণ বিভেদ করা হচ্ছে তা সেই সমস্ত সংখ্যালঘুদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা হবে, যা তাদের অবস্থার এইরূপ পক্ষপাতের দ্বারা অবনমন ঘটাবে। সামগ্রিক যুদ্ধের একটি সাংবিধানিক দৃষ্টিভঙ্গির দিক দিয়ে বিচার করলে, এটি দেশের মধ্যে আরও বিরূপতা এবং রাজদ্রোহীতা সৃষ্টি করতে বাধ্য। এটা কিন্তু ইংরেজদের বিবেচ্য যে, তাঁরা এক দলের সখ্যতা, যারা ইতিপূর্বেই সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে তারা অন্যের সঙ্গে বন্ধুত্ব করবে, লাভের জন্য তাদের প্রকৃত বন্ধুদের হারাবে। এই প্রস্তাব মহামান্য সরকারের পক্ষে হঠাৎ মত পরিবর্তন রূপে দৃষ্ট হয়। যে প্রস্তাব একদিন তাঁরা ঘোর নিন্দা করেছিলেন এই বলে যে, এর দ্বারা সংখ্যালঘুদের অধিকারের উপর আক্রমণ হবে, তারই উত্থাপন যে কোন, উপায়ে অধিকারের বিসর্জন দিয়ে ক্ষমতাপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যেরই নিদর্শনস্বরূপ। এইটাই হল 'মিউনিখ মনোবৃত্তি', যার মূল ধারণাটি হল, একজনকে রক্ষা করতে অপরজনকে

বলিদান দেওয়া, এবং এই প্রস্তাবের সর্বত্রই এই মনোবৃত্তিই পরিদৃশ্য। ব্রিটিশ সরকারের প্রতি আমার পরামর্শ এই যে, তাঁদের এই প্রস্তাবগুলি তুলে নেওয়া উচিত। যদি তাঁরা ন্যায়, অধিকার এবং তাদের অঙ্গীকৃত বাক্যের রক্ষার জন্য লড়াই করতে না পারেন, তবে তাঁদের শান্তিস্থাপনা করাই যথাযথ হবে। এর দ্বারা অন্তত তাঁরা তাঁদের সম্মান রক্ষা করতে পারবেন।

পরিশিষ্ট-X

লর্ড ওয়েভেল এবং শ্রী গান্ধীর মধ্যে পত্র আদানপ্রদান-১৯৪৪

১. ১৫ই জুলাই ১৯৪৪-এ লেখা শ্রী গান্ধীর ভাইসরয়কে লেখা চিঠি।

প্রিয় বন্ধু,

News Chronicle পত্রিকার মিঃ গেল্ডারকে দেওয়া আমার বক্তব্যের আসল প্রতিলিপিগুলি, যা ভারতীয় সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে, নিঃসন্দেহে আপনি দেখেছেন। আমি সংবাদপত্রকে বলেছিলাম যে, এগুলি প্রাথমিকভাবে আপনাকে দেখানোর জন্যই ছিল। কিন্তু মিঃ গেল্ডার, হয়তো ভাল উদ্দেশ্যেই, এই সাক্ষাৎকারকে অসময়োচিত ভাবে প্রচার করেছেন। আমি এর জন্য দুঃখিত। এই প্রকাশনা হয়তো তৎসত্ত্বেও ছদ্মরূপে আশীর্বাদই হবে, যদি এটি আমার ১৭ই জুন ১৯৪৪-এ লেখা চিঠির অনুরোধগুলির মধ্যে একটিও মঞ্জুর করতে আপনাকে সক্ষম করে।

ভবদীয়

সা: এম. কে. গান্ধী।

২. শ্রী গান্ধীকে ভাইসরয়ের জবাব, ২২ শে জুলাই ১৯৪৪।

প্রিয় শ্রী গান্ধী,

আপনার ১৫ই জুলাই-এর চিঠির জন্য ধন্যবাদ। মিঃ গেল্ডারকে দেওয়া আপনার বিবৃতিগুলি আমি দেখেছি এবং পরবর্তীকালে তাদের ব্যাখ্যাগুলিও দেখেছি। আমি মনে করি না যে, বর্তমানে আমি এগুলির ওপর যথাযোগ্য মন্তব্য করতে পারি, কেবলমাত্র এইটুকু বাদ দিয়ে যে আমি আমার শেষ চিঠিতে যেমন বলেছি যে, যদি আপনি আমাকে একটি নির্দিষ্ট এবং রচনাত্মক নীতি দেন, আমি তা সানন্দে বিবেচনা করব।

আপনার বিশ্বাসী

(স্বাঃ) ওয়াভেল।

3. রাজ প্রতিনিধিকে (Viceroy) লেখা গান্ধীর চিঠি—তাং ২৭ শে জুলাই ১৯৪৪।

'প্রিয় বন্ধু,

আমি অবশ্যই স্বীকার করব যে আপনার ২২ শে জুলাই-এর চিঠি আমাকে হতাশ করেছে। কিন্তু আমি হতাশার মুখেও কাজ করতে অভ্যস্ত। আমার পূর্ণ প্রস্তাব হল এইরূপ।

আমি কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটিকে এই বলে পরামর্শ দিতে রাজি যে, পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে, ১৯৪২-এর আগস্টের প্রস্তাব অনুসারে জনসাধারণের আইন অমান্য আন্দোলন এখন করা যাবে না এবং যুদ্ধের ব্যাপারে কংগ্রেস দ্বারা সম্পূর্ণ সহযোগিতা দেওয়া হবে যদি তৎক্ষণাৎ ভারতের স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয় এবং এই শর্তে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার প্রতি উত্তরদায়ী জাতীয় সরকার গঠন করা হয় যে, যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে বর্তমানে সৈন্য পরিচালনা যেমন চলছে তেমনই চলবে কিন্তু ভারতের উপর তার জন্য কোনও আর্থিক দায়ভার বর্তাবে না। ব্রিটিশ সরকারের যদি মীমাংসার ইচ্ছা থাকে তবে পত্র আদানপ্রদান-এর পরিবর্তে সৌহার্দ্যপূর্ণ কথাবার্তা শুরু করা উচিৎ। কিন্তু আমি তো আপনার হাতের কাছেই আছি। যতক্ষণ পযন্ত সম্মানীয় মীমাংসার ক্ষীণতম আশাও আছে, আমি আপনার দরজায় টোকা মেরে যাব।

পূর্বে লিখিত বক্তব্য লেখার পরে লর্ড মুনস্টারের হাউস অফ লর্ডসে দেওয়া বক্তৃতা আমি দেখলাম। হাউস অব লর্ডসে তিনি যে সংক্ষিপ্ত বয়ান দিয়েছেন, তা আমার বক্তব্যেরই যথারীতি প্রতিনিধিত্ব করে। এই সংক্ষিপ্ত বক্তৃতাটিই বন্ধুত্বপূর্ণ পারস্পরিক আলোচনার আধার হিসাবে কাজ করতে পারে।

আপনার বিশ্বস্ত

(স্বাঃ) এম. কে. গান্ধী।'

শ্রী গান্ধীকে দেওয়া ভাইসরয়ের জবাব—তাং ১৫ই আগস্ট ১৯৪৪

'প্রিয় শ্রী গান্ধী,

আপনার ২৭ শে জুলাই-এর পত্রের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। আপনার প্রস্তাবগুলি হল—

১. যে, আপনি ওয়ার্কিং কমিটিকে পরামর্শ দেবেন (a) 'যে পরিস্থিতির পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে গণ আইন অমান্য আন্দোলন, যা ১৯৪২-এ প্রস্তাবিত হয়েছিল,

চলতে দেওয়া হবে না,' এবং (b) কংগ্রেস দ্বারা যুদ্ধের প্রচেষ্টায় সব রকম সম্পূর্ণ সহযোগিতা করা হবে, এই শর্তে যে—

২. মহামান্য সরকার (a) অবিলম্বে ভারতের স্বাধীনতা ঘোষণা করবেন, এবং (b) কেন্দ্রীয় সংসদের প্রতি উত্তরদায়িত্বশীল জাতীয় সরকার গঠন করা হবে, এই শর্তসাপেক্ষে যে, যুদ্ধ স্থগিত কালে মিলিটারি ক্রিয়াকলাপ যেমন চলছিল তেমনই চলবে কিন্তু ভারতের উপর কোনওরূপ অর্থনৈতিক ব্যয়ভার চাপানো হবে না।'

মহামান্য সরকার ভারতীয় সমস্যার একটি সুষ্ঠু সমাধানের ব্যাপারে অত্যন্ত উৎকণ্ঠায় আছেন। কিন্তু আপনি যে প্রস্তাবগুলি উত্থাপন করেছেন, সেগুলিকে আলোচনার আধার স্বরূপ মেনে নিতে, মহামান্য সরকারের নিকট মোটেই গ্রহণীয় বা বাঞ্ছনীয় নয়, এবং আপনি নিশ্চয়ই এই ব্যাপারে উপলব্ধি করেছেন যদি আপনি গত ২৮ শে জুলাই হাউস অফ্ কমন্সে মিঃ আমেরির বক্তব্য পড়েছেন এই প্রস্তাবগুলি এপ্রিল ১৯৪২-এ স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্সকে মিঃ মৌলানা আবুল কালাম আজাদের দেওয়া প্রস্তাবগুলির মতোই এবং এগুলি অগ্রাহ্য করার কারণগুলিও সেই পূর্বেকার মতোই।

৩. সেই সমস্ত কারণগুলি বিস্তারিতভাবে স্মরণ না করে, আমি আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, মহামান্য সরকার সে সময়ে পরিষ্কার ভাবে বলেছিলেন :

(ক) যে যুদ্ধবিগ্রহ থেমে যাওয়ার পর তাঁরা কোনওরূপ শর্ত ছাড়া স্বাধীনতা প্রদান এই শর্তাধীন ছিল যে, ভারতীয় জাতীয় জীবনে প্রধান প্রধান তত্ত্বগুলির দ্বারা স্বীকৃত একটি সংবিধান তৈরি করতে হবে এবং মহামান্য সরকারের সঙ্গে প্রয়োজনীয় চুক্তির ব্যবস্থার জন্য আলোচনা করতে হবে।

(খ) যে যুদ্ধবিগ্রহের সময়ে বর্তমান সংবিধানের কোনওরূপ পরিবর্তন—যার অর্থ একটাই 'একটি জাতীয় সরকার' যা আপনি প্রস্তাব দিয়েছেন, কেন্দ্রীয় সংসদের প্রতি উত্তরদায়ী হবে, অসম্ভব।

এই শর্তগুলির একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল যে, অস্পৃশ্যবর্গের মতো জাতিগত এবং সম্প্রদায়গত সংখ্যালঘুদের স্বার্থরক্ষার প্রতি তাঁদের কর্তব্য পালন এবং ভারতীয় রাজ্যগুলির সঙ্গে সন্ধিপত্রের বাধ্যবাধকতার পরিপালন।

(৪) মহামান্য সরকার যে ভারতীয় নেতাদের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে যোগ দিতে আমন্ত্রণ করেছিলেন, যা বর্তমান সংবিধানের অধীনে পরিচালিত হবে তা ছিল উপরোক্ত শর্তনির্ভর। আমি এটা পরিষ্কার করে দিতে চাই যে, যতক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ

শেষ না হচ্ছে, প্রতিরক্ষা এবং সেনাবাহিনীর পরিচালনা সরকারের অন্যান্য দায়িত্বগুলি থেকে বিভাজন হতে পারে না, এবং যতক্ষণ না বিগ্রহ শান্ত হচ্ছে এবং নতুন সংবিধান প্রচলিত না হচ্ছে, মহামান্য সরকার এবং গভর্নর জেনারেল এই সমস্ত ক্ষেত্রে তাঁদের দায়িত্ব এবং ক্ষমতা বজায় রাখবেন। যতদূর যুদ্ধের খরচে ভারতের অংশের ব্যাপারটি সংশ্লিষ্ট, এটি নিশ্চিতভাবে মহামান্য ব্রিটিশ সরকার এবং ভারত সরকারের মধ্যে ফয়সলার ব্যাপার, এবং অধুনা বিদ্যমান অর্থ ব্যবস্থাটি যে, কোনও এক পক্ষের দ্বারা আলোচিত হতে পারে।

(5.) এই পরিপ্রেক্ষিতে এটা পরিষ্কার যে, আপনার প্রস্তাবিত আধারের উপর কোনও আলোচনাই ফলপ্রসূ হবে না। যদি তৎসত্ত্বেও, হিন্দু, মুসলমান এবং অন্যান্য প্রধান প্রধান সংখ্যালঘুদের নেতৃবর্গ বর্তমান সংবিধানের অন্তর্গত একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার স্থাপিত করার এবং তার অন্তর্গত হয়ে কাজ করার ইচ্ছা রাখেন, আমার মনে হয় ভাল অগ্রগতি হবে। এরূপ পরিবর্তনকালীন বা অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে সাফল্য লাভ করতে হলে, তা গঠনের পূর্বেই সংবিধান প্রণয়নের প্রক্রিয়ার ব্যাপারে হিন্দু, মুসলমান এবং অন্যান্য প্রধান প্রধান তত্ত্বগুলির মধ্যে নীতিগত ভাবে একটি চুক্তি হওয়া দরকার। অবশ্য এই চুক্তি ভারতীয়দের নিজেদের ব্যাপার।

ভারতীয় নেতৃবর্গ যতক্ষণ পর্য্যন্ত না আরও ঘনিষ্ঠ হতে (বর্তমানের চেয়ে) পারছে, আমার সন্দেহ আছে যে আমি কোনওরকম সাহায্য করতে পারব না। আমি আপনাকেও স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, সংখ্যালঘু সমস্যাগুলি এত সহজ নয়। সেগুলি বাস্তবিক এবং কেবলমাত্র পারস্পরিক আপস মীমাংসা এবং সহিষ্ণুতার দ্বারাই সমাধান হতে পারে।

6. যুদ্ধবিগ্রহের অন্তে যে অবধি এই পরিবর্তনকালীন সরকার স্থায়ী থাকবে তা নতুন সংবিধান রচনার গতির উপর নির্ভর করবে। আমি কোনও কারণ খুঁজে পাচ্ছি না কেন, যে মুহূর্তে ভারতীয় নেতারা সে ব্যাপারে সাহায্য করতে প্রস্তুত, নতুন সংবিধানের প্রাথমিক কাজকর্ম শুরু হচ্ছে না। যদি তাঁরা এই সংবিধান তৈরির প্রক্রিয়ার উপরে একটি প্রকৃত ঐক্যমত্যে পৌছতে পারেন, তাহলে যুদ্ধ শেষ মুহূর্তে পৌছনোর পরে এবং মহামান্য সরকারের সঙ্গে সন্ধিপত্রের ব্যবস্থার পরে আর সময় নষ্ট না করে তা শুরু করে দিতে পারেন। এখানেও পুনরায় সমস্ত দায়িত্ব ভারতীয় নেতাদের উপরেই বর্তায়।

আপনার বিশ্বস্ত

(স্বাঃ) ওয়াভেল।

পরিশিষ্ট-XI

অস্পৃশ্যদের রাজনৈতিক দাবি

অল্ ইন্ডিয়া সিডিউলড্ কাস্ট ফেডারেশনের কার্যকারিণী সমিতি দ্বারা মাদ্রাজে ২৩ শে সেপ্টেম্বর ১৯৪৪ রাও বাহাদুর এন শিবা রাজ, বি. এ. বি. এল, এম. এল. এ.-র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে অস্পৃশ্যদের নতুন সংবিধানে সুরক্ষার ব্যাপারে অনুমোদিত প্রস্তাবসমূহ।

প্রস্তাব নং ১

বিষয় : অস্পৃশ্যদেরকে একটি পৃথক তত্ত্ব বলে মান্যতা দান

অল্ ইন্ডিয়া সিডিউলড্ কাস্ট ফেডারেশনের কার্যকারিণী সমিতি এটা লক্ষ্য করেছে যে ভারতের সংবাদপত্র মহলের এক বিশেষ অংশ দোষারোপ করছে যে, মহামান্য ভাইসরয় কর্তৃক শ্রী গান্ধীকে লেখা ১৫ই আগস্ট ১৯৪৪-এর চিঠিতে যে বিবৃতিতে বলেছেন যে, অস্পৃশ্যবর্গ ভারতের জাতীয় জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং পৃথক তত্ত্ব এবং ভারতের সংবিধান তৈরির ব্যাপারে তাদের সম্মতির ব্যাপারটি যে ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের পূর্বশর্ত, এটি ক্রিপ্‌স প্রস্তাবে ব্যাখ্যাত মহামান্য সরকারের বক্তব্য বা অবস্থান থেকে দূরে সরে যাওয়ার মতো। এই সমিতি এই প্রচারের প্রতি ঘৃণামিশ্রিত ক্রোধ প্রকাশ করে এবং অত্যন্ত জোরের সঙ্গে এবং ব্যতিক্রমহীন শব্দে প্রতিবাদ করে বলতে চায় যে, অস্পৃশ্যবর্গ (অধিসূচিত জাতি) ভারতীয় জাতীয় জীবনে একটি বিশিষ্ট এবং পৃথক তত্ত্ব এবং ক্রিপ্‌সের প্রস্তাব অনুসারে শিখ এবং মুসলমানদের চেয়ে অনেক বেশিভাবে তারা ধর্মীয় সংখ্যালঘু। কার্যকারিণী সমিতি উল্লেখ করতে চায় যে, লর্ড ওয়াভেল কর্তৃক শ্রী গান্ধীকে লিখিত পত্রে মহামান্য সরকারের যে স্থিতির কথা বলা হয়েছে, তা যত শীঘ্র সম্ভব ১৯১৭ সাল থেকে পরিষ্কারভাবে মন্টেগু-চেম্‌সফোর্ডের রিপোর্টের প্রবক্তাগণ কর্তৃক বলা হয়েছিল এবং তৎসঙ্গে যুগপৎ ভাবে তাঁদের দ্বারা দায়িত্বশীল সরকার যে ভারতের রাজনৈতিক অভ্যুত্থানের লক্ষ্য—এও বলা হয়েছিল এবং মহামান্য সরকার দ্বারা, গোল টেবিল বৈঠকে, সংযুক্ত সংসদীয় কমিটিতে এবং ভারত শাসন আইন ১৯৩৫-এ তাদের পৃথক প্রতিনিধিত্ব দান করা হয়েছিল এবং তাদের হিন্দুদের থেকে পৃথক, একটি স্বীকৃত সংখ্যালঘু বলে মেনে নেওয়া হয়েছিল। সেজন্য কার্যকারিণী সমিতি

এটা বলতে একটুও ইতস্তত করে না যে, মহামান্য সরকার তাঁদের নীতি থেকে দূরে সরে এসেছেন বলে যে প্রচার করা হচ্ছে, তা সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং বিদ্বেষপরায়ণ, এবং সমিতি এটাকে অধিসূচিত জাতির শত্রুদের দ্বারা তাদের যথাযথ এবং ন্যায়ত দাবিকে পরাহত করতে একটি কৌশল মাত্র, এবং ভারতের রাজনৈতিক তথা বিশেষ করে হিন্দু নেতাদের প্রতি তাঁদের (ওয়ার্কিং কমিটির) অনুরোধ যে তাদের বক্তব্যকে তাঁরা স্বীকার করবেন অন্তত হিন্দু এবং অস্পৃশ্যবর্গের মধ্যে শান্তি এবং সদ্ভাবনা বজায় রাখতে এবং ভারতের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনকে সফলীভূত করতে।

প্রস্তাব নং : ২

বিষয় : মহামান্য সরকার কর্তৃক অনুসূচিত জাতি এবং সংবিধান সম্পর্কে ঘোষণা

'অল ইন্ডিয়া অনুসূচিত জাতি মহাসংঘ'-এর কার্য্যকারিণী সমিতি মহামান্য সরকার কর্তৃক ঘোষণা এবং মহামান্য ভাইসরয় কর্তৃক তার পুনরাবৃত্তিকে স্বাগত জানায় যে মহামান্য সরকার, অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে, অস্পৃশ্য জাতির, স্বাধীন ভারতের সংবিধান নির্মাণে, সম্মতিকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের পূর্বশর্ত হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছেন। তৎসঙ্গে কার্যকারিণী সমিতি মহামান্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চায় তাদের প্রতি যে কংগ্রেস এবং দেশের অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলি যারা মহামান্য সরকারের এই ঘোষণাকে একটি সদুদ্দেশ্যপূর্ণ ঘোষণা বলে মানতে চায় না, এবং তাদের প্রতি যারা বলে যে এই ঘোষণাকে সম্মান দিয়ে কার্যে পরিণত করার জন্য ঘোষণা করা হয়নি এবং ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যাপারে অযথা কালক্ষেপণের জন্য একটি কৌশল মাত্র, এবং তাদের প্রতি যারা সংখ্যাগরিষ্ঠের অস্পৃশ্যদের সঙ্গে আপস মীমাংসা করার প্রতি অনীহা পোষণ করে। কার্যকারিণী সমিতি এই সমস্ত দোষারোপণকে ভিত্তিহীন বলে মনে করে এবং মহামান্য সরকারকে অনুরোধ করে যে, যেন এই সমস্ত সন্দেহকে কোনওরূপ স্থান না দেওয়া হয় এবং পরিষ্কার ভাবে বুঝিয়েছেন যে, তাঁরা তাঁদের ঘোষণার মর্যাদা দিতে সবসময়ে সব পরিস্থিতিতেই তৈরি।

প্রস্তাব নং : ৩

বিষয় : সাংবিধানিক সুরক্ষার প্রকৃতি

কার্যকারিণী সমিতি ঘোষণা করছে যে, কোনও সংবিধানই অস্পৃশ্য জাতিদের (অধিসূচিত জাতি) কাছে গ্রাহ্য হবে না, যতক্ষণ না—

(ক) ইহা অধিসূচিত জাতির সম্মতি প্রাপ্ত হয় ;

(খ) এটি (সংবিধান) অধিসূচিত জাতিকে একটি বিশিষ্ট এবং পৃথক তত্ত্ব হিসাবে মান্যতা দেয় ;

(গ) এর মধ্যে নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যগুলির সাধনের ব্যবস্থা উল্লিখিত থাকে—

(১) প্রাদেশিক এবং কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেটে অনুসূচিত জাতির মাধ্যমিক, বিশ্ববিদ্যালয় এবং উন্নত শিক্ষার জন্য একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের বরাদ্দ করা হয়।

(২) অনুসূচিত জাতির পুনর্বাসনের জন্য পুনর্বাসন কমিশনের মাধ্যমে পৃথক সরকারি জমি সংরক্ষিত করা হয়।

(৩) তাদের প্রয়োজন, সংখ্যা এবং গুরুত্ব অনুসারে অনুসূচিত জাতির প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করা হয়,

(ক) সংসদে (আইনসভায়)

(খ) কার্যকারিণীতে,

(গ) মিউনিসিপ্যালিটি এবং লোক্যাল বোর্ডগুলিতে,

(ঘ) সর্বজনিক সেবার ক্ষেত্রে,

(ঙ) সর্বজনিক সেবা আয়োগে।

(৪) উপরোক্ত ব্যবস্থাগুলিকে মৌলিক অধিকারের মতো মান্যতা দেওয়ার এবং সংসদ বা কার্যকারিণীর এগুলিকে সংশোধন, পরিবর্তন বা বাতিল করার ক্ষমতা না থাকার ব্যবস্থা।

(৫) (গভর্নর অফ ইন্ডিয়া অ্যাক্ট ১৯৩৫) ভারত শাসন আইন ১৯৩৫-এর ১৬৬ ধারা অনুসারে নিযুক্ত মহালেখা পরীক্ষক (Auditor General)-এর সম পদমর্যাদা বিশিষ্ট একজন অফিসার মৌলিক অধিকারের বিষয়গুলি কার্যকর হচ্ছে কিনা দেখাশোনা এবং রিপোর্ট করার জন্য নিযুক্ত করতে হবে এবং তাঁর পদ থেকে অপসারণের কারণ এবং পদ্ধতি ফেডারেল কোর্টের একজন বিচারকের জন্য প্রচলিত পদ্ধতি হবে, তার ব্যবস্থা করা।

প্রস্তাব নং : ৪

বিষয় : সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান

(সর্বভারতীয়) নিখিল ভারত অনুসূচিত জাতি মহাসংঘের কার্যকারিণী সমিতি একদিকে যেমন সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানের জন্য অত্যন্ত আগ্রহী, তেমনই শ্রী গান্ধী এবং মিঃ জিন্নার মধ্যে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে ফয়সলার বা মীমাংসার জন্য যে গোপন আলাপ আলোচনা চলছে তাও অননুমোদন করে। কার্যকারিণী সমিতি মনে করে যে, সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধানের আংশিক চরিত্র সবসময়েই সবদিক দিয়েই ক্ষতিকর। এটি ক্ষতিকর এইজন্য যে, এটি অন্য সম্প্রদায়ের স্বার্থের অবজ্ঞা করে। এটি এইজন্যও ক্ষতিকর যে, এটি অন্য সম্প্রদায়ের মধ্যে সন্দেহ সৃষ্টি করে যে তাদের স্বার্থহানির জন্য দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে কোনও অসৎ লেনদেন বা বোঝাপড়া চলছে। এটা দেশের সামগ্রিক স্বার্থের পক্ষেও ক্ষতিকর, এইজন্য যে, অন্য সম্প্রদায়গুলি থেকে বিচ্ছিন্ন করে, বিশেষ সুবিধা সুযোগ, যা সুরক্ষার জন্য প্রয়োজন নয় কিন্তু প্রতিপত্তি বা মর্যাদার জন্য চাওয়া হয়েছে, দেওয়ার ব্যবস্থা, বিভিন্ন দলের মর্যাদার ব্যাপারে পার্থক্য সৃষ্টি করে, এবং এটা সমস্ত নাগরিকের জন্য সমান নাগরিকত্বের মর্যাদার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অসমর্থনীয় এবং নিন্দার যোগ্য। কার্যকারিণী সমিতি, অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত যে শ্রী গান্ধী যিনি বারংবার নিজেকে জনসাধারণের কার্যে নিযুক্ত কোনও কাজে গোপনতা অবলম্বনের বিরোধী বলে ঘোষণা করেছেন, হিন্দু মুসলমান সমস্যার সমাধানের জন্য গোপন কূটনীতির কার্যে নিযুক্ত হয়েছেন। কার্যকারিণী সমিতি দৃঢ়ভাবে তাদের অভিমত প্রকাশ করে যে, সমস্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে সুরক্ষার উপলব্ধি করানোর জন্য এবং সকলকে সমান এবং ন্যায্য বিচার দেওয়া নিশ্চিত করার জন্য, বিভিন্ন স্বার্থসংশ্লিষ্ট দাবিগুলি জনসমক্ষে এবং বিভিন্ন স্বার্থসম্বন্ধীয় প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে এবং সঙ্গে আলোচনা করা উচিত।

প্রস্তাব নং : ৫

বিষয় : সংবিধানের সংশোধন

(অল ইন্ডিয়া সিডিউল্ড কাস্ট ফেডারেশন) নিখিল ভারত অধিসূচিত জাতি মহাসংঘের কার্যকারিণী সমিতির অভিমত এই যে, বর্তমান সংবিধানে সংখ্যালঘুদের প্রতিনিধিত্ব সম্পর্কিত ব্যাপারগুলির যা ব্যবস্থা রয়েছে তা কোনও বোধগম্য নীতির ওপর আধারিত নয়। কমিটি দেখেছে যে, এখন যে পদ্ধতি বর্তমান আছে তাতে কোনও কোনও সংখ্যালঘু দল জনসংখ্যার অনুপাতেও প্রতিনিধিত্ব পায়নি, অথচ

কোনও কোনও সংখ্যালঘু গোষ্ঠী জনসংখ্যার অনুপাতের উপরন্তু প্রভাবের গুরুত্বও দেওয়া হয়েছে, যা তাদের ঐতিহাসিক এবং সৈন্যাধিপত্যের গুরুত্বের জন্য তাদের দাবির উপরেও সুবিধাজনক। কার্যকারিণী সমিতি এরূপ দাবির প্রতি মান্যতা দেওয়াকে অন্য সংখ্যালঘুদের স্বার্থের হানিকারক বলে মনে করে এবং ভারতীয়দের যে সামাজিক ও রাজনৈতিক গণতন্ত্রের আদর্শ লক্ষ বলে নির্ধারিত হয়ে আছে, তারও সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ এবং তা কখনও বরদাস্ত করা হবে না। এই প্রসঙ্গে কার্যকারিণী সমিতি এই ব্যাপারটির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চায় যে, মন্টেগু-চেম্‌সফোর্ডের রিপোর্টের প্রণেতাগণ এবং সাইমন কমিশন দ্বারাও এরূপ বিশেষভাবে নির্বাচিত কোনও সংখ্যালঘু দলকে গুরুত্ব দেওয়ার নীতিকে নিন্দা করা হয়েছে। এই সমিতি দাবি করছে যে, যেহেতু ভারতের পরবর্তী সংবিধানটি ভারতের জন্য এবং একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে নির্মিত হবে, সংখ্যালঘুদের সংশ্লিষ্ট ব্যাপারগুলি সংশোধন করতে হবে এবং সমস্ত সংখ্যালঘুদের প্রতি ব্যবহারের সাম্য নীতির অনুকূল করতে হবে।

প্রস্তাব নং : ৬

বিষয় : বিধান মণ্ডল এবং কার্যকারিণীতে প্রতিনিধিত্ব

নিখিল ভারত তফসিলি জাতি মহাসংঘের কার্যকারিণী সমিতি অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে এবং স্পষ্টভাবে বলতে চায় যে, তফসিলি জাতিবর্গ (অধিসূচিত জাতি) প্রতিনিধিত্বের ব্যাপারে এক সম্প্রদায়ের সঙ্গে অন্য সম্প্রদায়ের পক্ষপাতমূলক বিচার বরদাস্ত করবে না এবং প্রাদেশিক এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় বা কার্যকারিণীতে তাদের আসনের ব্যাপারে মুসলমান সম্প্রদায়ের দাবির মতোই একই নীতিতে নির্ধারণের জন্য বারবার দাবি করবে।

প্রস্তাব নং : ৭

বিষয় : নির্বচক মণ্ডলী

নিখিল ভারত অনুসূচিত বর্গ মহাসংঘের কার্যকারিণী সমিতি অভিমত প্রকাশ করে যে, ভারত-শাসন আইনের অধীনে গত নির্বাচনে এই অভিজ্ঞতা হয়েছে যে, সংযুক্ত নির্বাচকমণ্ডলী অস্পৃশ্যবর্গকে তাদের সত্য এবং ফলপ্রদ বা সক্রিয় প্রতিনিধি পাঠাবার অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে এবং হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠদের সেই সমস্ত অস্পৃশ্যবর্গের সদস্যকে মনোনয়ন করার যথার্থ অধিকার দিয়েছে, যারা হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠদের হাতের পুতুল হয়ে থাকতে চায়। মহাসংঘের কার্যকারিণী সমিতি সেইহেতু দাবি করছে যে, এই সংযুক্ত নির্বাচকমণ্ডলীর প্রথার বিলোপ করতে হবে এবং তার জায়গায় পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী প্রবর্তন করতে হবে।

প্রস্তাব নং : ৮

বিষয় : কার্যনির্বাহি সরকারের কাঠামো

অল্‌ ইন্ডিয়া সিডিউল্‌ড কাস্ট ফেডারেশনের কার্যকারিণী সমিতি লক্ষ্য করেছে যে, কেবলমাত্র দেশের সমস্ত ধন, সম্পত্তি, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং শিল্পোদ্যোগ সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের হাতে আছে এমন নয়, বরং রাজ্যের সমস্ত শাসন সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত, এবং রাজ্যের সেবায় নিযুক্ত সমস্ত পদগুলিতে, কী শ্রেষ্ঠ, কী নিকৃষ্ট, নির্বিচারে, তাদের সদস্যরাই একাধিপত্য করছে। নিখিল ভারত অস্পৃশ্য জাতি মহাসংঘের কার্যকারিণী সমিতি এই অবস্থাকে অত্যন্ত বিপজ্জনক পরিস্থিতি বলে মনে করে এবং সংখ্যালঘুদের মনে গভীর আশঙ্কা সৃষ্টি করে যে, এই সমস্ত পরিস্থিতির সমাবেশ সংখ্যাগরিষ্ঠদের সংখ্যালঘুদের গলা টিপে ধরিতে এবং আয়ত্তে রাখতে সমস্ত ক্ষমতা প্রদান করেছে। ভারত শাসন আইন ১৯৩৫-এর সাংবিধানিক বিধি, যা সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠদের সরকার গঠনের অনুমতি দিয়েছে এবং সংখ্যালঘুদের ইচ্ছাকে কোনওরকম মান্যতা না দিয়েই, এবং শাসকবর্গ নির্বাচনের পদ্ধতি এই গলা টিপে ধরার ভয়কে আরও বাড়িয়ে তুলেছে।

অখিল ভারত অনুসূচিত জাতি মহাসংঘের কার্যকারিণী সমিতি মনে করে (অনুভব করে) যে, যখন সংসদীয় প্রথার সরকারকে, অন্য কোনও বিকল্প পদ্ধতি না থাকায়, মেনে নিতেই হবে, এই সমিতি সংসদীয় মন্ত্রিসভার বিরোধিতা করে এইজন্য যে, এই প্রথা স্বয়ংচালিত ভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের হাতে সমস্ত শাসন সংক্রান্ত ক্ষমতা ন্যস্ত করে দেবে এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়, যারা শাসনযন্ত্রের লোহার কাঠামোতে ঢুকে পড়েছে, তাদেরই কর্তৃত্বকে সুদৃঢ় করবে এবং সংখ্যালঘুদের নিকট এটা একটা মহা বিপদের উৎপত্তিস্থল হয়ে দাঁড়িয়েছে। কার্যকারিণী সমিতি এইজন্য এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে, সংসদীয় মন্ত্রিমণ্ডলের পদ্ধতি ভারতীয় পরিস্থিতির পক্ষে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় এবং সেইজন্য একটি পৃথক পদ্ধতি, যার দ্বারা শাসকীয় সরকার সংখ্যালঘুদের ইচ্ছা অনুসারে তাদের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে গঠন করতে হবে, যার দ্বারা সংখ্যালঘুরা বেশি সুরক্ষা বোধ করবে, অনুসরণ করতে হবে।

কার্যকারিণী সমিতি সেইজন্য বারবার দাবি করে যে, প্রাদেশিক এবং কেন্দ্রীয় সরকারে কার্যনির্বাহক (Executive) নিম্নলিখিত উপায়ে গঠন করতে হবে।—

(১) একজন প্রধানমন্ত্রী এবং অন্যান্য মন্ত্রী যাঁরা সংবিধানে বর্ণিত নির্দিষ্ট প্রথানুসারে আনুপাতিক ভিত্তিতে সাধারণ এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যে থেকে নেওয়া হবে এমন ভাবে কার্যনির্বাহী দল বা কার্যপালিকা গঠন করতে হবে।

(২) সাধারণ সম্প্রদায় থেকে নেওয়া প্রধানমন্ত্রী এবং অন্যান্য মন্ত্রিগণ সম্পূর্ণ কক্ষের (সংসদ বা বিধানসভা) সদস্যদের একক পরিবর্তনীয় মতাধিকার দ্বারা কার্যপালিকার জন্য নির্বাচিত হবে।

(৩) সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্বকারী মন্ত্রিগণ, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি সদস্যদের দ্বারা একক পরিবর্তনীয় মতাধিকার (Vote) দ্বারা নির্বাচিত হবে।

(৪) কার্যপালিকার সদস্যগণ বিধানসভার লেজিসলেচার সদস্য হবেন এবং সমস্ত রকম প্রশ্নের উত্তর দেবেন, মতাধিকার প্রদান করবেন এবং তর্কে অংশগ্রহণ করবেন।

(৫) কার্যপালিকার যে কোনও শূন্যস্থান বা শূন্যপদ প্রারম্ভিক নিযুক্তির বিধি অনুসারে পূরণ করা হবে।

(৬) কার্যপালিকার পদস্থ থাকার অবধি বিধানসভার (আইনসভা) অবধির সঙ্গেই পরিসমাপ্তি হবে।

প্রস্তাব নং : ৯

বিষয় : জনসেবা

একটি সরকারের পরিকল্পনায় যেমন মানুষের শাসন না হয়ে, আইনের সরকার বা শাসন আকাঙ্ক্ষিত, তেমনই এটাও ভুলে যাওয়া যেতে পারে না যে, সরকার যেমনভাবেই সংগঠিত হোক না কেন এটা অবশ্যই মানুষের সরকার হবে। এইরূপ হলে, সরকার ভাল কিংবা মন্দ—যা দক্ষ সরকার থেকে আলাদাভাবে নির্দিষ্ট—এবং কতদূর জনসাধারণের বিষয়গুলির পরিচালনা অরাজনৈতিক এবং নিরপেক্ষ হবে তা আইনের পরিচালনাকারীদের মনন, দৃষ্টিভঙ্গি এবং ন্যায়নীতি বোধের উপর নির্ভর করবে। নিখিল ভারত অনুসূচিত জাতি মহাসংঘের কার্যকারিণী সমিতি দৃঢ়প্রত্যয়ী যে, অস্পৃশ্যবর্গেরা কখনওই বর্তমান শাসনব্যবস্থার নিকট থেকে সুরক্ষা, ন্যায় এবং সমবেদনা পেতে পারে না, কারণ এই শাসনব্যবস্থা সেই সমস্ত লোকেদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, যারা জাত্যভিমানী, সংকীর্ণমনা, এবং ন্যায়নীতি দোষে দুষ্ট এবং অস্পৃশ্যদের প্রতি যাদের অত্যন্ত অবজ্ঞা এবং ঘৃণা বর্তমান। কার্যকারিণী সমিতি সেইজন্য দাবি করে যে, জনসেবায় অস্পৃশ্যদের জন্য সংরক্ষণের অধিকার মুসলমান সম্প্রদায়ের দাবির সম অনুপাতে দেওয়াকে সংবিধানে মান্যতা অবশ্যই দিতে হবে।

প্রস্তাব নং : ১০

বিষয় : শিক্ষার ব্যবস্থা

নিখিল ভারত অনুসূচিত জাতি মহাসংঘের কার্যকারিণী সমিতি অনুভব করে যে, যতক্ষণ পর্যন্ত অস্পৃশ্যবর্গের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিগণ সেই সমস্ত কার্যকারিণী স্বত্বাধিকার বিশিষ্ট পদগুলি অধিকার করতে না পারে, ততদিন অস্পৃশ্যবর্গের লোকেদের অতীতের বা পূর্বমত সরকার এবং জনগণের দ্বারা আরোপিত সমস্ত রকম অন্যায় এবং অপমানকর নিপীড়ন ভোগ করতে হবে। সেইজন্য কার্যকারিণী সমিতি অস্পৃশ্যবর্গের মধ্যে উচ্চতর এবং অগ্রসারিত শিক্ষার প্রসারকে গুরুত্বপূর্ণ বলে গণ্য করে। কিন্তু এটাও অস্বীকার করা যেতে পারে না যে, এরূপ অগ্রসারিত বা উন্নত শিক্ষা অস্পৃশ্যবর্গের সাধ্যের বাইরে। কার্যকারিণী সমিতি এটি অত্যন্ত আবশ্যক মনে করে যে, রাষ্ট্রের উপর এ-ব্যাপারে একটি নির্দিষ্ট দায়ভার চাপানো উচিত যার দ্বারা তারা সেজন্য যথেষ্ট অর্থের ব্যবস্থা করে এবং দাবি করে যে সংবিধান প্রাদেশিক এবং কেন্দ্রীয় সরকারের উপর বাধ্যতামূলক শর্ত আরোপ করবে যেন তারা, সংবিধানে বিশেষভাবে উল্লিখিত পরিমাণ অর্থ আলাদা করে, অস্পৃশ্যবর্গের উন্নত শিক্ষার খাতে তাদের বাৎসরিক আয়ব্যয়ের বাজেটে রেখে দেয়, এবং সেই অর্থকে যেন তাদের রাজস্বের উপরে সর্বপ্রথম ব্যয়ের ব্যবস্থা বলে গ্রহণ করে।

প্রস্তাব নং : ১১

বিষয় : পৃথক ভূ-ব্যবস্থা

নিখিল ভারত অস্পৃশ্য জাতি মহাসংঘের কার্যকারিণী সমিতি মনে করে যে—

(ক) যতদিন পর্যন্ত অস্পৃশ্যবর্গ হিন্দু গ্রামসমূহের উপান্তে, বহিরাগত লোকের মতো, জীবনধারনের জন্য সহায়সম্বলহীন ভাবে এবং হিন্দুদের তুলনায় অত্যন্ত কম সংখ্যক হয়ে বাস করবে, ততদিন তারা অস্পৃশ্য হয়েই থাকবে, এবং হিন্দুদের অত্যাচার এবং পীড়নে নিপীড়িত হবে এবং কখনওই স্বাধীন এবং সম্পূর্ণ জীবন উপভোগ করতে পারবে না, এবং—

(খ) অস্পৃশ্যবর্গকে হিন্দু জাতির অত্যাচার এবং দমন থেকে রক্ষার জন্য, এবং এই অত্যাচার এবং দমন স্বতন্ত্রতায় আরও নিদারুণ রূপ ধারণ করতে পারে, এবং অস্পৃশ্যবর্গ যাতে তাদের সম্পূর্ণ মনুষ্যত্বে উন্নত হতে পারে, তাদের অর্থনৈতিক এবং সামাজিক সুরক্ষা প্রদান করতে, এবং অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের পথকে সুগম করতে, কার্যকারিণী সমিতি দাবি করে যে, সংবিধানে নিম্নোক্ত বিষয়গুলির ব্যবস্থা

থাকবে, যেমন :

(১) অস্পৃশ্যবর্গ বা অনুসূচিত জাতির লোকদের বর্তমান বাসস্থান থেকে স্থানান্তরণ এবং পৃথক, হিন্দু গ্রাম থেকে দূরে অস্পৃশ্যবর্গের বা অনুসূচিত জাতির গ্রাম স্থাপন করা।

(২) তফসিলি জাতি বা অস্পৃশ্যবর্গের নতুন গ্রামে প্রতিস্থাপনার জন্য সংবিধানে একটি উপনিবেশ আয়ুক্তের প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা।

(৩) যে সমস্ত জমি চাষের যোগ্য এবং চাষের জন্য অধিকৃত নয়, এবং যে সমস্ত জমি পুনরুদ্ধার করা যেতে পারে, তা এই আয়ুক্তকে অর্পণ করতে হবে এবং এই আয়োগ কমিশন অনুসূচিত জাতি বা অস্পৃশ্যবর্গের উপনিবেশ স্থাপনার জন্য অছি হিসাবে এই জমি রাখবে।

(৪) এই কমিশনকে ভূমি অধিগ্রহণ আইন অনুসারে ব্যক্তি মালিকের নিকট থেকে জমি ক্রয় করার ক্ষমতা দিতে হবে, যাতে অনুসূচিত জাতির পুনর্বাসন বা উপনিবেশের যোজনা সম্পূর্ণ হতে পারে।

(৫) সংবিধানে ব্যবস্থা রাখতে হবে যে, কেন্দ্রীয় সরকার এই উপনিবেশ আয়ুক্তকে (Settlement Commission) প্রতি বৎসর পাঁচ কোটি টাকা তাদের এই কাজ নির্বাহের জন্য মঞ্জুর করবে।

প্রস্তাব নং : ১২

এ. আই. এস. সি. মহাসংঘের কার্যকারিণী সমিতি সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব করে যে, এই সমিতি ডা: বি. আর. আম্বেদকরের উপর সম্পূর্ণ আস্থা স্থাপন করে এবং অস্পৃশ্যবর্গের হয়ে এবং এই সমিতির হয়ে অন্য রাজনৈতিক দলের অথবা তাদের নেতাদের সঙ্গে প্রয়োজনসাপেক্ষে ঐকমত্য আনয়নের জন্য আলোচনা চালাবার ক্ষমতা অর্পণ করে।'

পরিশিষ্ট - XII

ব্রিটিশ-ভারতে সংখ্যালঘু শ্রেণীর সম্প্রদায়গত বিভাজন

প্রদেশ	মোট জনসংখ্যা	মুসলমান		তফসিলি জাতি		ভারতীয় খ্রিস্টান		শিখ	
		জনসংখ্যা	শতকরা	জনসংখ্যা	শতকরা	জনসংখ্যা	শতকরা	জনসংখ্যা	শতকরা
আজমের মেবাড়	৫৮৩,৬৯৩	৮৯,৮৯৯	১৫.৪	শূন্য (?)	......	৩,৮৯৫	০.৮	৮৬৭	০.১৫
আন্দামান নিকোবর	৩৩,৭৬৮	৮,০০৫	২৩.৭	শূন্য	......	৭৭৯	২.৩	৭৪৪	২.২
অসম	১০,২০৪,৭৩৩	৩,৪৪২,৪৭৯	৩৩.৭	৬৭৬,২৯১	৬.৬	৩৭,৭৫০	০.৪	৩,৪৬৪	০.০৩
ব্রিটিশ বেলুচিস্তান	৫০১,৬৩১	৪৩৮,৯৩০	৮৭.৫	৫,১০২	১.০	২,৬৩৩	০.৫	১১,৯১৮	২.৩
বাংলা	৬০,৩০৬,৫২৫	৩৩,০০৫,৪৩৪	৫৪.৭	৭,৮৭৮,৯৭০	১৩.০	১১০,৯২৩	০.২	১৬,২৮১	০.০৩
বিহার*	৩৬,৩৪০,১৫১	৪,৭১৬,৩১৪	১২.৯	৪,৮৪০,৩৭৯	১৩.৩	২৪,৬৯৩	০.৭	১৩,২১৩	০.০৪
বোম্বাই	২০,৮৪৯,৮৪০	১,৯২০,৩৬৮	৯.২	১,৮৫৫,১৪৮	৮.৯	৩৩৮,৮১২	১.৬	৮,০১১	০.০৪
মধ্য প্রদেশ এবং বেরার	১৬,৮১৩,৫৮৫	৭৮৩,৬৯৭	৪.৭	৩,০৫১,৪১৩	১৮.১	৪৮,২৬০	০.৩	১৪,৯৯৬	০.০৯
কুর্গ	১৬৮,৭২৬	১৪,৭৮০	৮.৮	২৫,৭৪০	১৫.৩	৩,৩০৯	২.০	শূন্য	....
দিল্লি	৯১৭,৯৩৯	৩০৪,৯৭১	৩৩.২	১২১,৬৯৩	১৩.৩	১০,৪৯৪	১.১	১৬,১৫৭	১.৮
মাদ্রাজ	৪৯,৩৪১,৮১০	৩,৮৯৬,৪৫২	৭.৯	৮,০৬৮,৪৯২	১৬.৪	২,০০১,০৮২	৪.০৬	৪১৮	০.০০১
উ.প.সী.প্র	৩,০৩৮,০৬৭	২,৭৮৮,৭৯৭	৯১.৮	শূন্য	—	৫,৪২৬	০.২	৫৭,৯৮৯	১.৯

[পরের পৃষ্ঠায়]

[আগের পৃষ্ঠার পর]

পরিশিষ্ট - XII

ব্রিটিশ-ভারতে সংখ্যালঘু শ্রেণীর সম্প্রদায়গত বিভাজন

প্রদেশ	মোট জনসংখ্যা	মুসলমান		তফসিলি জাতি		ভারতীয় খ্রিস্টান		শিখ	
		জনসংখ্যা	শতকরা	জনসংখ্যা	শতকরা	জনসংখ্যা	শতকরা	জনসংখ্যা	শতকরা
ওড়িশা	৮,৭২৮,৫৪৪	১৪৬,৩০১	১.৭	১,২৩৮,১৭১	১৪.২	২৬,৫৮৪	০.৩	২৩২	০.০০৩
পঞ্জাব	২৮,৪১৮,৮১৯	১৬,২১৭,২৪২	৫৭.০	১,২৪৮,৬৩৫	৪.৪	৪৮৬,০৩৮	১.৭	৩,৭৫৭,৪০১	১৩.২
পন্ত পিপলোদা	৫,২৬৭	২৫১	৪.৮	৯১৮	১৭.৪	২১৮	৪.১	শূন্য	
সিন্ধু	৪,২২৯,২২১	৩,০৫৪,৬৩৫	৭২.২	১৯১,৬৩৪	৪.৫	১৩,২৩২	০.৩	৩১,০১১	০.৭
যুক্তপ্রদেশ	৫৫,০২০,৬১৭	৮,৪১৬,৩০৮	১৫.৩	১১,৭১৭,১৫৮	২১.৩	১৩১,৩২৭	০.২	২৩২,৪৪৫	০.৪
মোট	২৯৫,৫০২,৯৩৫	৭৯,৩৪৪,৮৬৩	২৬.৯	৪০,৯১৯,৭৪৪	১৩.৯	৩,২৪৫,৪৫৩	১	৪,১৫৫,১৪৭	১
* বিহার	২৮,৮২৩,৮০২	৪,১৬৮,৪৭০	১৪.৪	৩,৯১৯,৬১৯	১৩.৬	১২,৬৫১	.০৪	৩,২০৪	.০১
ছোটনাগপুর	৭,৫১৬,৩৪৯	৫৪৭,৮৪৪	৭.৩	৪২০,৭৬০	৫.৬	১২,০৪২	০.২	১০,০০৯	০.১
† মধ্যপ্রদেশ	১৩,২০৮,৭১৮	৪৪৮,৫২৮	৩.৪	২,৩৫৯,৪৩৬	১৭.৯	৪২,১৩৫	০.৩	১২,৭৬৬	০.০৫
বেরার	৩,৬০৪,৮৬৬	৩৩৫,১৬৯	৯.৩	৬৯১,৫৭৭	১৯.২	৬,১২৫	০.২	২,২৩০	০.০৫
আগ্রা	৪০,৯০৬,১৪৭	৬,২৩১,০৬২	১৫.২	৮,০১৮,৮০৩	১৯.৬	১২০,৫৪৯	০.৩	২২৬,০৯৬	০.৫
অযোধ্যা	১৪,১১৪,৪৭০	২,১৮৫,২৪৬	১৫.৫	৩,৬৯৮,৩৫৫	২৬.২	১০,৭৭৮	.০৮	৬,৩৪৯	০.০৫

পরিশিষ্ট - XIII

দেশীয় রাজ্যে সংখ্যালঘু শ্রেণীর সম্প্রদায়গত বিভাজন

রাজ্য এবং এজেন্সি	মোট জনসংখ্যা	মুসলমান		তফসিলি জাতি		ভারতীয় খ্রিস্টান		শিখ	
		জনসংখ্যা	শতকরা	জনসংখ্যা	শতকরা	জনসংখ্যা	শতকরা	জনসংখ্যা	শতকরা
অসম	৭২৫,৬৫৫	৩১,৬৬২	৪.৪	২৬৫	০.০৪	২৫,৯১৩	৩.৬	৩৮১	০.০৫
বেলুচিস্তান	৩৫৬,২০৪	৩৪৬,২৫১	৯৭.২	৬৫	০.০২	৪০	০.০১	১২৬	০.০৪
বরোদা	২,৮৫৫,০১০	২২৩,৬১০	৭.৮	২৩০,৭৯৪	৮.১	৯,১৮২	০.৩	৫৬৬	০.০২
বাংলা	২,১৪৪,৮২৯	৩৭২,১১৩	১৭.৩	২৬৯,৭২৯	১২.৬	৫৬৪	০.০৩	২৮	০.০০১
মধ্যভারত	৭,৫০৬,৪২৭	৪৩৯,৮৫০	৫.৯	১,০২৭,০০৯	১৩.৭	৭,৫৮২	০.১	২,৭৩১	০.০৪
ছত্রিশগড়	৪,০৫০,০০০	২৮,৭৭৩	০.৭	৪৮৩,১৩২	১১.৯	১১,৮২০	০.৩	৫০৭	০.০১
কোচিন	১,৪২২,৮৭৫	১০৯,১৮৮	৭.৭	১৪১,১৫৪	৯.৯	৩৯৯,৩৯৪	২৮.১	৯	—
দাক্ষিনাত্য (এবং কোলাপুর)	২,৭৮৫,৪২৮	১৮২,০৩৬	৬.৫	৩০৬,৮৯৮	১১.০	১৭,২৩৬	০.৬	২২	০.০০১
গুজরাট	১,৪৫৮,৭০২	৫৮,০০০	৩.৯	৫৫,২০৪	৩.৮	৪,২১৫	০.৩	১৮৩	০.০১
গোয়ালিয়র	৪,০০৬,১৫৯	২৪০,৯০৩	৬.০	—	—	১,৩৫২	০.০৩	২,৩৪২	০.০৬
হায়দ্রাবাদ	১৬,৩৩৮,৫৩৪	২,০৯৭,৪৭৫	১২.৮	২,৯২৮,০৪৮	১৭.৯	২১৫,৯৮৯	১.৩	৫,৩৩০	০.০৩
কাশ্মীর এবং সামন্ত-প্রথানুযায়ী ভুক্তিত রাজ্য	৪,০২১,৬১৬	৩,০৭৩,৫৪০	৭৬.৪	১১৩,৪৬৪	২.৮	৩,০৭৯	০.০৮	৬৫,৯০৩	১.৬

[পরের পৃষ্ঠায়]

[আগের পৃষ্ঠার পর]

পরিশিষ্ট - XIII

দেশীয় রাজ্যে সংখ্যালঘু শ্রেণীর সম্প্রদায়গত বিভাজন

রাজ্য এবং এজেন্সি	মোট জনসংখ্যা	মুসলমান		তফসিলি জাতি		ভারতীয় খ্রিস্টান		শিখ	
		জনসংখ্যা	শতকরা	জনসংখ্যা	শতকরা	জনসংখ্যা	শতকরা	জনসংখ্যা	শতকরা
মাদ্রাজ	৪৯৮,৭৫৪	৩০,২৬৩	৬.০	৮৩,৭৩৪	১৬.৮	২০,৮০৬	৪.২	৫	—
মহীশূর	৭,৩২৯,১৪০	৪৮৫,২৩০	৬.৬	১,৪০৫,০৬৭	১৯.২	৯৮,৫৮০	১.৩	২৬৯	০.০০৪
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ	৪৬,২৬৭	২২,০৬৮	৪৭.৭	শূন্য	—	৫৭১	১.২	৪,৪৭২	৯.১
ওড়িশা	৩,০২৩,৭৩১	১৪,৩৫৫	০.৪৭	৩৫২,০৮৮	১১.৬	২,২৪৯	০.০৭	১৫১	০.০০৫
পঞ্জাব	৫,৫০৩,৫৫৪	২,২৫১,৪৫৯	৪০.৯	৩৪৯,৯৬২	৬.৪	৬,৯৫২	০.১	১,৩৪২,৬৮৫	২৪.৪
পঞ্জাব হিল	১,০৯০,৬৪৪	৪৬,৬৭৮	৪.৩	২৩৮,৭৭৪	২১.৯	১৮৮	০.০২	১৭,৭৩৯	১.৬
রাজপুতানা	১৩,৬৭০,২০৮	১,২৯৮,৮৪১	৯.৫	—	—	৪,৩৪৯	০.০৩	৮১,৮৯৬	০.৬
সিকিম	১২১,৫২০	৮৩	০.০৭	৭৬	০.০৬	৩৪	০.০৩	১	—
ত্রিবাঙ্কুর	৬,০৭০,০১৮	৪৩৪,১৫০	৭.২	৩৯৫,৯৫২	৬.৫	১,৯৫৮,৪৯১	৩২.৩	৩১	—
যুক্তপ্রদেশ	৯২৮,৪৭০	২৭৩,৬২৫	২৯.৫	১৫২,৯২৭	১৬.৫	১,২৮১	০.০১	৭৩১	০.০৮
পশ্চিম ভারত	৪,৯০৪,১৫৬	৬০০,৪৪০	১২.২	৩৫৮,০৩৮	৭.৩	৩,১০৫	০.৬	২৩৯	০.০০৫
মোট	৯০,৮৫৭,৯০১	১২,৬৫৯,৫৯৩	১৩.৯	৮,৮৯২,৩৮০	৯.৭	২,৭৯২,৯৭২	৩.১	১,৫২৬,৩৪৬	১.৭

পরিশিষ্ট - XIV

রাজ্যওয়ারি তফসিলি জাতের নির্বাচন কেন্দ্র

১. মাদ্রাজ

২. বোম্বাই

৩. বাংলা

৪. যুক্তপ্রদেশ

৫. পঞ্জাব

৬. বিহার

৭. মধ্যপ্রদেশ ও বেরার

৮. অসম

৯. ওড়িশা

পরিশিষ্ট - XIV (১) মাদ্রাজ

নির্বাচন কেন্দ্রের নাম	মোট আসন সংখ্যা		মোট প্রার্থী সংখ্যা		নির্বাচনকেন্দ্রে মোট ভোটদাতার সংখ্যা		
	সাধারণ	তফসিলি	সাধারণ	তফসিলি	সাধারণ	তফসিলি	সাধারণের সঙ্গে তফসিলি প্রার্থীর শতকরা
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
মাদ্রাজ শহর, দক্ষিণ মধ্য	১	১	৪	১	১৩,৩১৮	২,৯০৯	২২
চিকালোল	১	১	৪	৪	৫৪,০১২	৭,৪৬১	১৪
অমালাপুরম	১	১	২	৩	৪৬,১৬৩	২৩,১১০	৫০
কোকনদ	১	১	৩	১	৫০,৩৮৪	১২,০৬৬	২৪
এল্লোর	১	১	৩	৩	৪৫,৪৫২	১১,৪৬৩	২৫
ওঙ্গোলে	১	১	২	২	৬৭,৮৫১	১০,৮৮৫	১৬
গুড়ুর	১	১	২	৪	৩৫,০৯৪	৭,৪৩৬	২১
কুড্ডাপা	১	১	২	৩	৭৪,৪৯৭	১০,৬৩০	১৪
পেনুকুন্ডা	১	১	২	২	৫৪,৮৬৪	১১,৩৯৬	২১
বেলারি	১	১	৩	২	৬৩,০৯২	৯,২৩২	১৫
কুর্নুল	১	১	২	৩	৫৩,৬৮৭	১৩,৪৩৩	২৫

[পরের পৃষ্ঠায়]

[আগের পৃষ্ঠার পর]

পরিশিষ্ট - XIV (১) মাদ্রাজ

নির্বাচন কেন্দ্রের নাম	মোট আসন সংখ্যা		মোট প্রার্থী সংখ্যা		নির্বাচনকেন্দ্রে মোট ভোটদাতার সংখ্যা		
	সাধারণ	তফসিলি	সাধারণ	তফসিলি	সাধারণ	তফসিলি	সাধারণের সঙ্গে তফসিলি প্রার্থীর শতকরা
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
তিরুতান্নি	১	১	২	৪	৫২,৮৭৫	৬,৩৫০	১২
চিঙলেপেট	১	১	২	৪	৪৬,২৩৭	১৯,৩৬৬	৪২
থিরুভালুর	১	১	৩	৪	৫৭,০২৯	২১,০৩৩	৩৭
রানিপেট	১	১	৩	১	৫৩,৬৩২	১০,৩৭০	১৯
তিরুবন্নামালাই	১	১	৩	২	৬৭,৮৬১	১৬,৭০৫	২৫
তিন্ডিবনম	১	১	২	১	৬৩,৪৮৫	১৯,৫০০	৩১
চিদাম্বরম	১	১	১	৪	৬৮,৭১৩	১৯,৯৪৭	২৯
তিরুকোয়িলুর	১	১	৩	৩	৭৫,৮৭৪	২২,৯৮৬	৩০
তাঞ্জোর	১	১	২	২	৭৮,৮৭৪	১৪,৭১৮	১৯
মানারগুডি	১	১	২	২	৪৫,২৮৩	১১,৭৬৭	২৬
আরিয়ালুর	১	১	২	৩	৮৫,১২৫	১৬,০৭৬	১৯

[আগের পৃষ্ঠার পর]

পরিশিষ্ট - XIV (১) মাদ্রাজ

নির্বাচন কেন্দ্রের নাম	মোট আসন সংখ্যা		মোট প্রার্থী সংখ্যা		নির্বাচনকেন্দ্রে মোট ভোটদাতার সংখ্যা		
	সাধারণ	তফসিলি	সাধারণ	তফসিলি	সাধারণ	তফসিলি	সাধারণের সঙ্গে তফসিলি প্রার্থীর শতকরা
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
পালানি	১	১	২	৪	৬০,৪৫৩	১১,৪০০	১৯
সাত্তুর	১	১	২	২	৫৮,৬৪৮	৬,৮৪৩	১২
কোয়েলপট্টি	১	১	২	৩	৫৯,১০১	১২,৫২৬	২১
পোল্লাচি	১	১	২	৩	৩৯,২৩৯	১২,৯১৯	৩২
নমাক্কল	১	১	২	৩	৪৩,৪৩৭	১৪,৫৬১	৩৪
কুড্ডাপুর	১	১	২	৩	৩৫,৬৭৯	৮,৮৪৩	২৫
মালাপুরম	১	১	২	৪	৪৭,২৯৯	১০,৩৫০	২২

পরিশিষ্ট XIV (২) বোম্বাই

নির্বাচন কেন্দ্রের নাম	মোট আসন সংখ্যা		মোট প্রার্থীর সংখ্যা		নির্বাচন কেন্দ্রে মোট ভোটদাতার সংখ্যা		
	সাধারণ	তফসিলি	সাধারণ	তফসিলি	সাধারণ	তফসিলি	সাধারণের সঙ্গে তফসিলি প্রার্থীদের শতকরা
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
বোম্বাই নগরী, উত্তর এবং বোম্বাই শহরতলি	২	১	৬	৪	৬১,৮৮১	৯,৮৮০	১৬
বোম্বাই নগরী (বাইকুলা এবং প্যারেল)	২	১	৪	৩	৭১,১০০	১০,৪৮৬	১৫
খেড়া জেলা	৩	১	৪	১	৯২,৩৮৮	৬,২৩১	৭
সুরাট জেলা	৩	১	৬	৪	৫১,৭১১	৩,৯২৯	৮
থানে, দক্ষিণ	২	১	৩	৩	৪২,০০৩	২,২৬৩	৫
আহমেদনগর, দক্ষিণ	২	১	৪	৩	৩৬,০৬৫	৪,৮১৪	১৩
পূর্ব খান্দেশ	৩	১	৭	৪	৫৬,৭৩৩	৪,৮৪২	৯
নাসিক, পশ্চিম	৩	১	৭	২	৪৪,৫১৭	৮,৮৮১	২০
পুনা, পশ্চিম	২	১	৪	২	৪৩,১৪৭	৭,২০৬	১৭

[পরের পৃষ্ঠায়]

[আগের পৃষ্ঠার পর]

পরিশিষ্ট XIV (২) বোম্বাই

নির্বাচন কেন্দ্রের নাম	মোট আসন সংখ্যা		মোট প্রার্থীর সংখ্যা		নির্বাচন কেন্দ্রে মোট ভোটদাতার সংখ্যা		
	সাধারণ	তফসিলি	সাধারণ	তফসিলি	সাধারণ	তফসিলি	সাধারণের সঙ্গে তফসিলি প্রার্থীদের শতকরা
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
সাতারা, উত্তর	৩	১	৫	৪	৫৭,৮৩৯	৬,৬৯২	১২
শোলাপুর, উত্তর-পশ্চিম	২	১	৬	৪	৩৬,২১০	৬,৭৪১	১৯
বেলগাঁও, উত্তর	৩	১	৬	৪	৪৯,৫০৭	১২,৪৯৩	২৫
বিজাপুর, উত্তর	২	১	৪	৪	৪২,৩০১	৭,৫২৫	১৮
কোলাবা জেলা	৩	১	৭	৩	৫৯,৪৯০	৪,৮০৪	৮
রত্নগিরি, উত্তর	৩	১	৮	৩	২১,৯০৮	৩,৯৬১	১৮

পরিশিষ্ট XIV (৩) বাংলা

নির্বাচন কেন্দ্রের নাম	মোট আসন সংখ্যা		মোট প্রার্থীর সংখ্যা		নির্বাচন কেন্দ্রে মোট ভোটদাতার সংখ্যা		
	সাধারণ	তফসিলি	সাধারণ	তফসিলি	সাধারণ	তফসিলি	সাধারণের সঙ্গে তফসিলি প্রার্থীদের শতকরা
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
বর্ধমান, মধ্য	১	১	২	৩	৩৫,২৯৪	১৪,৪৫০	৪১
বর্ধমান, উত্তর-পশ্চিম	১	১	২	৩	৪১,৮১৭	৮,৬৯৩	২১
বীরভূম	১	১	৩	৩	৫২,৫৬৯	১৮,৫০৬	৩৫
বাঁকুড়া, পশ্চিম	১	১	১	৪	৪৪,১১৫	১৯,২৭২	৪৪
মেদিনীপুর, মধ্য	১	১	২	২	৭৫,৯০৩	১৯,৬৬৪	২৬
ঝাড়গ্রাম ও ঘাটাল	১	১	২	৪	৪০,৫৯৬	৯,৯১৭	২৪
হুগলি, উত্তর-পূর্ব	১	১	৩	৩	৩৫,৫০০	১২,২৫৪	৩৫
হাওড়া	১	১	২	৩	৬৮,৫২৬	২২,৪৭০	৩৩
২৪ পরগনা,, দক্ষিণ-পশ্চিম	১	১	৩	৩	২৯,৩৪২	৩৭,৫৫৬	১২৮
২৪পরগনা, উত্তর-পূর্ব	১	১	২	৪	৪২,২১৪	২৪,৪০৪	৫৮
নদীয়া	১	১	২	৪	৫৩,২৪৭	২০,৯৫৭	৩৯

[পরের পৃষ্ঠায়]

[আগের পৃষ্ঠার পর]

পরিশিষ্ট XIV (৩) বাংলা

নির্বাচন কেন্দ্রের নাম	মোট আসন সংখ্যা		মোট প্রার্থীর সংখ্যা		নির্বাচন কেন্দ্রে মোট ভোটদাতার সংখ্যা		
	সাধারণ	তফসিলি	সাধারণ	তফসিলি	সাধারণ	তফসিলি	সাধারণের সঙ্গে তফসিলি প্রার্থীদের শতকরা
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
মুর্শিদাবাদ	১	১	২	৩	৪৬,১২২	১১,৬৯২	২৫
যশোহর	১	১	৪	২	৫০,৯৬৬	৪৩,৪২৫	৮৫
খুলনা	১	২	৩	৬	৪১,৬৩৯	৫৪,৫৩০	১৩১
মালদহ	১	১	২	৪	৩০,৯১৬	২২,৭২৮	৭৪
দিনাজপুর	১	২	১	২	২৫,৯৮৫	৮৯,৮৮০	৩৪৬
জলপাইগুড়ি ও শিলিগুড়ি	১	২	৩	৮	৯,০৭৪	৫৪,৬৫৭	৬০২
রংপুর	১	২	২	৫	২১,৪৯৭	৬৮,৭৫৯	৩২০
বগুড়া ও পাবনা	১	১	৩	৪	৪১,৫৩৯	৩১,৪৫৯	৭৬
ঢাকা, পূর্ব	১	১	২	৪	৩৮,৮১০	৩৬,৭৪৯	৯৫
ময়মনসিংহ, পশ্চিম	১	১	২	৪	৪৭,৯৭৪	৩০,০৩৬	৬৩
ময়মনসিংহ, পূর্ব	১	১	২	৪	৪২,২৩৭	২৯,৭৪৫	৭০
ফরিদপুর	১	২	২	৮	৬৩,৫৩২	৭৩,৯৪৬	১১৬
বাখরগঞ্জ, দক্ষিণ-পশ্চিম	১	১	১	৪	২৩,৪৭৭	৩৭,৮৯৫	১৬১
ত্রিপুরা	১	১	৩	৪	৬৫,৮৯৮	২৭,৪৭৫	৪১

পরিশিষ্ট - XIV (৪) যুক্তপ্রদেশ

নির্বাচন কেন্দ্রের নাম	মোট আসন সংখ্যা		মোট প্রার্থীর সংখ্যা		নির্বাচন কেন্দ্রে মোট ভোটদাতার সংখ্যা		
	সাধারণ	তফসিলি	সাধারণ	তফসিলি	সাধারণ	তফসিলি	সাধারণের সঙ্গে তফসিলি প্রার্থীদের শতকরা
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
লখনউ শহর	১	১	৩	৪	২৯,১৩৩	৬,৮২১	২৩
কানপুর শহর	১	১	২	৪	৪৯,৪৮৫	১৪,৪৬২	২৯
আগ্রা শহর	১	১	২	৪	২৭,৮০৫	৬,১০৩	২২
এলাহাবাদ শহর	১	১	১	৪	২৭,৩১৩	৬,৫০৩	২৪
চরণপুর জেলা, দক্ষিণ-পূর্ব	১	১	২	২	২৭,০৫৩	৩,৭২০	১৪
বুলন্দশহর জেলা, দক্ষিণ-পূর্ব	১	১	৪	৩	৩২,৪৩৪	৪,৬৪৮	১৪
আগ্রা জেলা, উত্তর পূর্ব	১	১	৩	৪	৩৩,২৩০	৪,৪৭৬	১৩
মৈনপুরী জেলা, উত্তর-পূর্ব	১	১	৩	৪	৪১,০৪৪	৫,৩৫৬	১৩
বদাউঁ জেলা, পূর্ব	১	১	৪	৪	৩২,৭৬৩	৭,৫৫৮	২৩
জালৌণ জেলা	১	১	২	৪	৪০,৮৬২	১০,৩৫৬	২৫

[পরের পৃষ্ঠায়]

[আগের পৃষ্ঠার পর]

পরিশিষ্ট - XIV (৪) যুক্তপ্রদেশ

নির্বাচন কেন্দ্রের নাম	মোট আসন সংখ্যা		মোট প্রার্থীর সংখ্যা		নির্বাচন কেন্দ্রে মোট ভোটদাতার সংখ্যা		
	সাধারণ	তফসিলি	সাধারণ	তফসিলি	সাধারণ	তফসিলি	সাধারণের সঙ্গে তফসিলি প্রার্থীদের শতকরা
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
মির্জাপুর জেলা, উত্তর	১	১	২	১	২৬,৮০৩	২,৯৬৯	১১
গোরখপুর জেলা, উত্তর	১	১	২	৪	২৫,১১৩	৩,৬৯৭	১৫
বস্তি জেলা, দক্ষিণ	১	১	২	১	২৭,১৯৩	৪,১৪৩	১৫
আজমগড় জেলা, পশ্চিম	১	১	৩	২	৩৬,৫৪১	৭,২৩১	২০
আলমোড়া জেলা	১	১	৩	১	৯৩,৩৮০	১৭,৮০৯	১৯
রায়বেরিলি জেলা, উত্তর-পূর্ব	১	১	২	১	৩৮,৩২০	১০,৮২৯	২৮
সীতাপুর জেলা, উত্তর-পূর্ব	১	১	৩	৩	৪৫,১৩০	১৮,৮৬৮	৪২
ফৈজাবাদ জেলা, পূর্ব	১	১	৪	২	৪৬,৩৩৭	১০,০৩৫	২২
গোন্ডা জেলা, উত্তর-পূর্ব	১	১	২	১	৪৭,৬৬৬	৭,৪২৮	১৬
বারাবাংকি জেলা, উত্তর	১	১	২	৪	৪১,৯৫০	১৪,৬৪৯	৩৫

পরিশিষ্ট XIV (৫) পঞ্জাব

নির্বাচন কেন্দ্রের নাম	মোট আসন সংখ্যা		মোট প্রার্থীর সংখ্যা		নির্বাচন কেন্দ্রে মোট ভোটদাতার সংখ্যা		
	সাধারণ	তফসিলি	সাধারণ	তফসিলি	সাধারণ	তফসিলি	সাধারণের সঙ্গে তফসিলি প্রার্থীদের শতকরা
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
দক্ষিণ-পূর্ব গুরগাঁও	১	১	৪	১	২৭,১৭৭	২,৮৪২	১০
কর্নাল, উত্তর	১	১	৪	৩	২৩,২২৪	২,৬৯৮	১২
আম্বালা ও সিমলা	১	১	৫	৩	২৬,৯১৮	৭,৬১১	২৮
হোসিয়ারপুর, পশ্চিম	১	১	২	৪	২৭,৫৮৯	১১,৭০১	৪২
জলন্ধর	১	১	২	৪	১২,৯৬৭	১৪,৭৪৪	১১৪
লুধিয়ানা ও ফিরোজপুর	১	১	৪	৪	২০,৩৩৪	১২,২৯৯	৬০
অমৃতসর ও শিয়ালকোট	১	১	২	১	২১,৬১০	৫,৩৭৪	২৫
লায়লপুর ও ঝংগ	১	১	২	৩	১৩,৯০৯	৩,৮০৫	২৭

পরিশিষ্ট XIV (৬) বিহার

নির্বাচন কেন্দ্রের নাম	মোট আসন সংখ্যা		মোট প্রার্থীর সংখ্যা		নির্বাচন কেন্দ্রে মোট ভোটদাতার সংখ্যা		
	সাধারণ	তফসিলি	সাধারণ	তফসিলি	সাধারণ	তফসিলি	সাধারণের সঙ্গে তফসিলি প্রার্থীদের শতকরা
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
পূর্ব বিহার	১	১	২	২	২৩,৯৬৬	৩,৯৪৪	১৬
দক্ষিণ গয়া	১	১	২	১	৩৫,১০৪	৯,৬৭৫	২৮
নওয়াদা	১	১	৩	২	২৮,১৪৯	৭,০৬০	২৫
পূর্ব-মধ্য শাহাবাদ	১	১	৪	১	৩৪,১৩৮	৬,৪৯১	১৯
পশ্চিম গোপালগঞ্জ	১	১	৩	১	২৫,৪১৯	৩,৩৬১	১৩
উত্তর বেতিয়া	১	১	২	১	২২,৫৯৬	২,৯৮৫	১৩
পূর্ব মজঃফরপুর সদর	১	১	২	১	২৩,০০৭	৩,৩৮২	১৫
দ্বারভাঙ্গা সদর	১	১	৩	১	২২,১৮৯	২,০১৮	৯
দক্ষিণ-পূর্ব সমস্তিপুর	১	১	২	১	২৯,৫৯৫	২,৬৪২	৯
দক্ষিণ মুঙ্গের সদর	১	১	৩	১	৩৮,৭৭২	৫,৭৩৯	১৫

[পরের পৃষ্ঠায়]

[আগের পৃষ্ঠার পর]

পরিশিষ্ট XIV (৬) বিহার

নির্বাচন কেন্দ্রের নাম	মোট আসন সংখ্যা		মোট প্রার্থীর সংখ্যা		নির্বাচন কেন্দ্রে মোট ভোটদাতার সংখ্যা		
	সাধারণ	তফসিলি	সাধারণ	তফসিলি	সাধারণ	তফসিলি	সাধারণের সঙ্গে তফসিলি প্রার্থীদের শতকরা
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
মাধেপুরা	১	১	২	২	২১,২৫১	১,৩৮৩	৬
দক্ষিণ-পশ্চিম পূর্ণিয়া	১	১	২	২	৩৩,০৭১	২,৪৪০	৭
গিরিডি-ঘাত্‌রা	১	১	২	১	৩৯,৬৭০	৪,৫২৮	১১
উত্তর-পূর্ব পালামৌ	১	১	২	২	১৩,৮৫৩	৪,১৭৪	৩০
মধ্য-মানভূম	১	১	২	২	২২,৯৩০	৫,০৭৫	২২

পরিশিষ্ট XIV (৭) মধ্যপ্রদেশ ও বেরার

নির্বাচন কেন্দ্রের নাম	মোট আসন সংখ্যা		মোট প্রার্থীর সংখ্যা		নির্বাচন কেন্দ্রে মোট ভোটদাতার সংখ্যা		
	সাধারণ	তফসিলি	সাধারণ	তফসিলি	সাধারণ	তফসিলি	সাধারণের সঙ্গে তফসিলি প্রার্থীদের শতকরা
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
নাগপুর শহর	১	১	২	৪	৩৪,৮১৬	৮,৫৭৪	২৪
নাগপুর-উম্‌রের	১	১	৩	৪	২০,৭৯৫	৫,৪৫১	২৬
হিঙ্গনঘাট-ওয়ার্ধা	১	১	৩	৪	২৫,২৭৫	৩,০৮৮	১২
চন্দা-ব্রহ্মপুরী	১	১	৩	৪	২১,৭৪৭	৪,৫৮২	২১
ছিন্দওয়াড়া-সনসদ	১	১	৩	৪	৩২,০৪০	৩,৯২৯	১২
জব্বলপুর-পাটন	১	১	৩	৪	২৩,৬৬৭	১,৫১৯	৬
সওগড়-খুরাই	১	১	৩	২	২৩,৪৮৭	৪,৬৭৯	২০
দামো-হাত্তা	১	১	৩	২	২৯,০৬৯	৩,৪৬১	১২
নরসিংপুর-গদরওয়ারা	১	১	৪	২	৩১,৮৭৩	১,৯২৭	৬
রায়পুর	১	১	২	২	২০,২০৯	১০,৮৮৫	৫৪

[পরের পৃষ্ঠায়]

[আগের পৃষ্ঠার পর]

পরিশিষ্ট XIV (৭) মধ্যপ্রদেশ ও বেরার

নির্বাচন কেন্দ্রের নাম	মোট আসন সংখ্যা		মোট প্রার্থীর সংখ্যা		নির্বাচন কেন্দ্রে মোট ভোটদাতার সংখ্যা		
	সাধারণ	তফসিলি	সাধারণ	তফসিলি	সাধারণ	তফসিলি	সাধারণের সঙ্গে তফসিলি প্রার্থীদের শতকরা
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
বলোদা বাজার	১	১	২	৩	২৭,০৪৫	১৪,৩৮৬	৫৩
বিলাসপুর	১	১	২	৩	২২,৩৪৩	১০,৯৬৩	৪৯
মুঙ্গেলি	১	১	২	৩	১৭,৪১২	১০,৩০২	৫৮
তাঁজগীর দুর্গ	১	১	২	৩	২৮,৩০৩	১৩,৬৪১	৪৮
ভান্দ্রা-সকোলি	১	১	৩	১	২৩,৪৯৩	৮,৬৬৩	৩৭
এলিচপুর-দায়পুর	১	১	২	৪	৬৮,৮৮৯	৮,৫৯১	১৩
নেলঘাট	১	১	৩	৪	২১,৮৬২	২,১৮৩	১০
অকোদা-বালাপুর	১	১	৩	৪	২০,৫২৯	২,৭৬১	১৩
ইয়তমল-দরবাহ	১	১	৩	৩	৩১,০৫২	১,৯৫৪	৬
চিখলি মেখর	১	১	৫	৩	২৮,৯৭১	২,৭৯২	১০

পরিশিষ্ট XIV (৮) অসম

নির্বাচন কেন্দ্রের নাম	মোট আসন সংখ্যা		মোট প্রার্থীর সংখ্যা		নির্বাচন কেন্দ্রে মোট ভোটদাতার সংখ্যা		
	সাধারণ	তফসিলি	সাধারণ	তফসিলি	সাধারণ	তফসিলি	সাধারণের সঙ্গে তফসিলি প্রার্থীদের শতকরা
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
কামরূপ সাদর (দক্ষিণ)	২	১	২	৪	১৭,৫০১	১,২০৩	৭
নওগাঁও	১	১	৩	৪	১৩,১৭৩	১,৮২৫	১৪
জোড়হাট, উত্তর	১	১	৬	২	১২,৭৮৫	৬৫৭	৫
সুনামগঞ্জ	১	১	২	১	১৫,৯০৭	৬,৫০২	৪১
হাবিবগঞ্জ	১	১	৩	৩	১২,৬২৮	৭,৬১৫	৬০
করিমগঞ্জ	১	১	৪	২	৯,৬১১	৭,৩২৩	৭৬
শিলচর	১	১	২	৩	১৫,৪৫৯	১,৫৮৭	১০

পরিশিষ্ট XIV (৯) ওড়িশা

নির্বাচন কেন্দ্রের নাম	মোট আসন সংখ্যা		মোট প্রার্থীর সংখ্যা		নির্বাচন কেন্দ্রে মোট ভোটদাতার সংখ্যা		
	সাধারণ	তফসিলি	সাধারণ	তফসিলি	সাধারণ	তফসিলি	সাধারণের সঙ্গে তফসিলি প্রার্থীদের শতকরা
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
উত্তর কটক সদর	১	১	২	১	১৭,২৮৮	৪,১৫৯	২৪
পূর্ব জাজপুর	১	১	৩	২	১৫,৩৩৮	৪,৮০৮	৩১
উত্তর পুরী সদর	১	১	৪	২	১৩,৮০৩	৩,১৮২	২৩
পূর্ব বরগড়	১	১	৩	১	২২,৮৪৯	১,২৩৭	৫
পশ্চিম ভদ্রক	১	১	২	৩	১৬,১৮৭	৫,১৫২	৩২
আস্কা	১	১	২	৪	২৪,৯১৪	১,৪৭৫	৬

পরিশিষ্ট XV

প্রদেশওয়ারি তফসিলিদের জন্য সংরক্ষিত কেন্দ্রের বিস্তৃত বিবরণ

১. মাদ্রাজ

২. বোম্বাই

৩. বাংলা

৪. যুক্তপ্রদেশ

৫. পঞ্জাব

৬. বিহার

৭. মধ্যপ্রদেশ ও বেরার

৮. অসম

৯. ওড়িশা

দ্রষ্টব্য : ৮ নং স্তম্ভ ছাড়া বাকি সংখ্যা। সঠিক। ৮নং স্তম্ভের সংখ্যা তথ্যের অভাবে সঠিক হতে পারেনি। অনুমানের ওপর ভিত্তি করে তা করা হয়েছে। তফসিলি এবং হিন্দু ভোটদাতারা সমসংখ্যক ভোট দিয়েছেন, এই তথ্যের ওপর ভিত্তি করে তা করা হয়েছে। এই পদ্ধতি কতখানি যুক্তিযুক্ত তা বলা সম্ভব নয়।

পরিশিষ্ট XV (১) মাদ্রাজ

নির্বাচন কেন্দ্রের নাম	প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়েছে/ বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায়	জয়ী প্রার্থী/ কোন দলের	জয়ী প্রার্থীর প্রাপ্ত তফসিলি ও হিন্দু ভোট			পরাজিত প্রার্থীর প্রাপ্ত ভোট	তফসিলি : মোটপ্রদত্ত ভোট
			তফসিলি ভোট	হিন্দু ভোট	মোট ভোট		
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
মাদ্রাজ শহর, দক্ষিণ মধ্য	বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায়	অ-কংগ্রেস	—	—	—	—	—
চিকাকোল	হয়েছে	কংগ্রেস	২,৩৮০	৫,২৫৯	৭,৬৩৯	৪,০৩৬	৬,৪১৬
অমালাপুরম	হয়েছে	কংগ্রেস	৯,৭৪২	শূন্য	৯,৭৪২	—	—
কোকনদ	বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায়	কংগ্রেস	—	—	—	—	—
এল্লোর	হয়েছে	কংগ্রেস	৭,৫৩২	৬,৭৯৬	১৪,৩২৮	৪,৮৪৮	১২,৩৮০
বন্দার	হয়েছে	কংগ্রেস	৯,৯৩৫	শূন্য	৯,৯৩৫	২,০০৪	১৮,৩৯৩
ওঙ্গোল	হয়েছে	কংগ্রেস	৬,৫১৩	শূন্য	৬,৫১৩	৩,৮০৭	১১,৯৭৩
গুড়ুর	হয়েছে	কংগ্রেস	৪,২৯৩	৩৪৪	৪,৬৩৭	৪,৭৭৮	৯,০৭২
কুড্ডাপা	হয়েছে	কংগ্রেস	৮,২৮৪	৩৪৪	৮,৬২৮	৪,০৪৭	১২,৩৩১
পেনুকোন্ডা	হয়েছে	কংগ্রেস	৪,৭৩১	শূন্য	৪,৭৩১	১,৭৪৯	৯,৮০১
বেলারি	হয়েছে	কংগ্রেস	৪,০১৯	শূন্য	৪,০১৯	৯১০	৮,১২৪
কুর্নুল	হয়েছে	কংগ্রেস	৫,৩৬২	শূন্য	৫,৩৬২	৫,৯২৯	১৩,১৬৪
তিরুতান্নি	হয়েছে	কংগ্রেস	৪,৯৬৬	শূন্য	৪,৯৬৬	৭৪১	৮,১২৮

[পরের পৃষ্ঠায়]

পরিশিষ্ট XV (১) মাদ্রাজ

নির্বাচন কেন্দ্রের নাম	প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়েছে/ বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায়	জয়ী প্রার্থী/ কোন দলের	জয়ী প্রার্থীর প্রাপ্ত তফসিলি ও হিন্দু ভোট			পরাজিত প্রার্থীর প্রাপ্ত ভোট	তফসিলি : মোটপ্রদত্ত ভোট
			তফসিলি ভোট	হিন্দু ভোট	মোট ভোট		
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
চিঙ্গলপেট	হয়েছে	অ-কংগ্রেস	১২,৩৬০	শূন্য	১২,৩৬০	৬,১১০	২২,৮৫২
থিরুভালুর	হয়েছে	কংগ্রেস	৩,১০৭	৬,২১৬	৯,৩২৩	১৪,১৪০	১৭,২৪৭
রানিপেট	হয়েছে	অ-কংগ্রেস	২,৯৬৯	শূন্য	২,৯৬৯	৪,০০০	৮,২৯৬
তিরুবন্নামালাই	হয়েছে	কংগ্রেস	৩,৩৪২	শূন্য	৩,৩৪২	৪,৯৩৮	১২,৬৯৬
তিন্ডিবনম	হয়েছে	কংগ্রেস	৬,৩৯৬	শূন্য	৬,৩৯৬	২,৫৪১	১২,৪৮০
চিদাম্বরম	বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায়	অ-কংগ্রেস	—	—	—	—	—
তিরুকোয়িলুর	হয়েছে	কংগ্রেস	৯,৯৫৭	৪,৪৩৬	১৪,৩৯৩	৬,১৩৩	১৬,০৯০
তাঞ্জোর	বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায়	কংগ্রেস	—	—	—	—	—
মানারগুডি	হয়েছে	কংগ্রেস	২,২৯৪	২০,৪৯৪	২২,৭৮৮	৮,২৯৬	১০,৫৯০
আরিয়ালুর	হয়েছে	কংগ্রেস	১,২০৮	১০,০৮৪	১১,২৯২	৮,৭৫৯	৯,৯৬৭
পালানি	হয়েছে	কংগ্রেস	১,৪৬৯	২৯,৪৩৬	৩০,৯০৫	১০,৬১৫	১২,০৮৪
সাত্তুর	হয়েছে	কংগ্রেস	শূন্য	১৮,৫১৪	১৮,৫১৪	১১,৮৯৪	৬,৯৮০

[পরের পৃষ্ঠায়]

[আগের পৃষ্ঠার পর]

পরিশিষ্ট XV (১) মাদ্রাজ

নির্বাচন কেন্দ্রের নাম	প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়েছে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায়	জয়ী প্রার্থী/ কোন দলের	জয়ী প্রার্থীর প্রাপ্ত তফসিলি ও হিন্দু ভোট			পরাজিত প্রার্থীর প্রাপ্ত ভোট	তফসিলি : মোটপ্রদত্ত ভোট
			তফসিলি ভোট	হিন্দু ভোট	মোট ভোট		
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
কোইলপট্টি	হয়েছে	কংগ্রেস	৪,১৯৯	৬,২৮৪	১০,৪৮৩	৮১১	৫,০১০
পোল্লাচি	হয়েছে	কংগ্রেস	৯,৭০৩	শূন্য	৯,৭০৩	২,২১৭	১৫,২৪৪
নমাকল্ল	হয়েছে	কংগ্রেস	৮,১৪১	৮,১৫৩	১৬,২৯৪	৩,২১৭	১১,৩৫৮
কুন্ডাপুর	হয়েছে	কংগ্রেস	১,৪২৫	শূন্য	১,৪২৫	১,৭৯৮	১১,৬৭৩
মালাপুরম	হয়েছে	কংগ্রেস	৭,১৫৪	শূন্য	৭,১৫৪	২,৬০৬	১০,১৪৮
কংগ্রেস প্রার্থীদের প্রাপ্ত তফসিলি ভোট			১২৬,১৫২			মোট	৩২১,৬১৬

তফসিলি মোট প্রদত্ত মোট ৩২১,৬১৬

কংগ্রেসের প্রাপ্ত মোট তফসিলি ভোট ১২৬,১৫২

অ-কংগ্রেসের প্রাপ্ত মোট তফসিলি ভোট ১৯৫,৪৬৪

পরিশিষ্ট XV (২) বোম্বাই

নির্বাচন কেন্দ্রের নাম	প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়েছে/ বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায়	জয়ী প্রার্থী/ কোন দলের	জয়ী প্রার্থীর প্রাপ্ত তফসিলি ও হিন্দু ভোট			পরাজিত প্রার্থীর প্রাপ্ত ভোট	তফসিলি : মোটপ্রদত্ত ভোট
			তফসিলি ভোট	হিন্দু ভোট	মোট ভোট		
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
বোম্বাই নগরী, উত্তর ও শহরতলী	হয়েছে	কংগ্রেস	২,৪১৪	১৫,০০৪	১৭,৪১৮	৯,৭৩৮	১২,১৫২
বোম্বাহ নগরী (ভায়কুলা ও প্যারেল)	হয়েছে	অ-কংগ্রেস	৮,৪৯৪	৪,৭৫১	১৩,২৪৫	১১,৬৬২	৮,৪৯৪
খেড়া জেলা	বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায়	কংগ্রেস	—	—	—	—	—
সুরাট জেলা	হয়েছে	কংগ্রেস	৭,৯১৩	শূন্য	৭,৯১৩	৭,২৪৫	১২,১০১
থানে, দক্ষিণ	হয়েছে	অ-কংগ্রেস	৪,০০৬	২২৭	৪,২২৩	২,৭৩৩	৪,০০৬
আহমেদনগর, দক্ষিণ	হয়েছে	অ-কংগ্রেস	৬,৪৯৯	২৯৬	৬,৭৯৫	১,৯৭৬	৬,৪৯৯
পূর্ব খান্দেশ	হয়েছে	অ-কংগ্রেস	৯,৫১৯	শূন্য	৯,৫১৯	৪,৬৮৯	১০,৮৬৪
নাসিক, পশ্চিম	হয়েছে	অ-কংগ্রেস	১৬,৬০৫	শূন্য	১৬,০০৫	৫,৬৭৯	১৮,৪৭২
পুণা, পশ্চিম	হয়েছে	অ-কংগ্রেস	৯,৫১২	২,৫৯৯	১২,১১১	৫৩২	৯,৫১২
সাতারা, উত্তর	হয়েছে	অ-কংগ্রেস	৬,৭৩৬	শূন্য	৬,৭৩৬	১০,৯৮৪	১১,২৪৩
শোলাপুর, উত্তর-পূর্ব	হয়েছে	অ-কংগ্রেস	৭,৬২২	শূন্য	৭,৬২২	২,৮৯১	৯,৩০৩

[পরের পৃষ্ঠায়]

[আগের পৃষ্ঠার পর]

পরিশিষ্ট XV (২) বোম্বাই

নির্বাচন কেন্দ্রের নাম	প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়েছে/ বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায়	জয়ী প্রার্থী/ কোন দলের	জয়ী প্রার্থীর প্রাপ্ত তফসিলি ও হিন্দু ভোট			পরাজিত প্রার্থীর প্রাপ্ত ভোট	তফসিলি : মোটপ্রদত্ত ভোট
			তফসিলি ভোট	হিন্দু ভোট	মোট ভোট		
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
বেলগাও, উত্তর	হয়েছে	অ-কংগ্রেস	২১,৩২২	শূন্য	২১,৩২২	৬,৫৯৬	৩৬,৯৭৯
বিজাপুর, উত্তর	হয়েছে	অ-কংগ্রেস	৪,৫৬৬	শূন্য	৪,৫৬৬	৪,৪২৩	১১,৯৬৫
কোলাবা জেলা	হয়েছে	কংগ্রেস	২,৬৪৪	৪,৭৮১	৭,৪২৫	৮,১১৭	১০,৭৬১
রত্নগিরি, উত্তর	হয়েছে	অ-কংগ্রেস	৫,৫২৩	শূন্য	৫,৫২৩	জানা নেই	৮,৭১৪
কংগ্রেস প্রার্থীদের প্রাপ্ত মোট তফসিলি ভোট			১২,৯৭১			মোট........	১৭১,০৪৭

তফসিলি মোট প্রদত্ত	১৭১,০৪৭
কংগ্রেসের প্রাপ্ত মোট তফসিলি ভোট	১২,৯৭১
অ-কংগ্রেসের প্রাপ্ত মোট তফসিলি ভোট	১,৫৮,০৭৬

পরিশিষ্ট XV (৩) বাংলা

নির্বাচন কেন্দ্রের নাম	প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়েছে/ বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায়	জয়ী প্রার্থী/ কোন দলের	জয়ী প্রার্থীর প্রাপ্ত তফসিলি ও হিন্দু ভোট			পরাজিত প্রার্থীর প্রাপ্ত ভোট	তফসিলি : মোটপ্রদত্ত ভোট
			তফসিলি ভোট	হিন্দু ভোট	মোট ভোট		
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
বর্ধমান, মধ্য	হয়েছে	অ-কংগ্রেস	২,৩৮৩	শূন্য	২,৩৮৩	২,৭২৮	১৭,৯১৮
ধর্ধমান, উত্তর পশ্চিম	হয়েছে	অ-কংগ্রেস	২,৩৩২	শূন্য	২,৩৩২	২,৫০৬	৯,৩৮৮
বীরভূম	হয়েছে	অ-কংগ্রেস	৪,৮৩২	শূন্য	৪,৮৩২	৮৪৮	১৮,৮৭৬
বাঁকুড়া, পশ্চিম	হয়েছে	কংগ্রেস	৫,১০০	শূন্য	৯,৬০১	১,৮৩৮	৬,৯৩৮
মেদিনীপুর, মধ্য	হয়েছে	অ-কংগ্রেস	১,৮৫১	শূন্য	১,৮৫১	১,৭৩৩	১৬,১২৪
ঝাড়গ্রাম-ঘাটাল	হয়েছে	কংগ্রেস	১,১৭১	শূন্য	১,১৭১	৮৬৯	১১,৩০৫
হুগলি, উত্তর-পূর্ব	হয়েছে	কংগ্রেস	১,৬৩৮	শূন্য	১,৬৩৮	১,৬১৩	১১,৭৬৪
হাওড়া	হয়েছে	অ-কংগ্রেস	১০,৩৭৩	শূন্য	১০,৩৭৩	৫,৯৮৬	১৪,৩৮০
২৪-পরগনা, দক্ষিণ-পূর্ব	হয়েছে	অ-কংগ্রেস	৭,২৮৯	শূন্য	৭,২৮৯	৭৪৫	২৭,৭৯১
২৪-পরগনা, উত্তর-পশ্চিম	হয়েছে	কংগ্রেস	১৪,৯৬৪	শূন্য	১৪,৯৬৪	২,৩৬১	২০,৯৮৭
নদিয়া	হয়েছে	অ-কংগ্রেস	৫,২১৯	শূন্য	৫,২১৯	৮,৯৬৭	২০,৯৫৭
মুর্শিদাবাদ	হয়েছে	অ-কংগ্রেস	২,৫২৯	শূন্য	২,৫১৯	২,১২৯	১০,৫২২
যশোহর	হয়েছে	কংগ্রেস	২০,১৯৮	১৫	২০,২১৩	১১,৯৩৬	৩২,১৩৪

[পরের পৃষ্ঠায়]

পরিশিষ্ট XV (৩) বাংলা

নির্বাচন কেন্দ্রের নাম	প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়েছে/ বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায়	জয়ী প্রার্থী/ কোন দলের	জয়ী প্রার্থীর প্রাপ্ত তফসিলি ও হিন্দু ভোট			পরাজিত প্রার্থীর প্রাপ্ত ভোট	তফসিলি : মোটপ্রদত্ত ভোট
			তফসিলি ভোট	হিন্দু ভোট	মোট ভোট		
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
খুলনা	হয়েছে	কংগ্রেস	১৬,৫৭৫	শূন্য	১৬,৫৭৫	২০,৩০৭	৭৬,৮৮৭
		অ-কংগ্রেস	৩২,৬৬২	শূন্য	৩২,৬৬২		
মালদহ	হয়েছে	অ-কংগ্রেস	২,২২৯	শূন্য	২,২২৯	১,৪১৩	২১,৩৬৪
দিনাজপুর	বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায়	অ-কংগ্রেস	—	—	—	—	—
		অ-কংগ্রেস	—	—	—	—	—
জলপাইগুড়ি-শিলিগুড়ি	হয়েছে	অ-কংগ্রেস	১৬,২৪৪	শূন্য	১৬,২৪৪	১৯,৫১৩	৪৯,১৯১
		অ-কংগ্রেস	৭,২৬১	শূন্য	৭,২৬১		
রংপুর	হয়েছে	অ-কংগ্রেস	১২,২১২	শূন্য	১২,২১২	১৭,৩৪৫	৫৩,৬৩২
		অ-কংগ্রেস	১১,৯১৪	শূন্য	১১,৯১৪		
বগুড়া-পাবনা	হয়েছে	অ-কংগ্রেস	১০,৫০২	শূন্য	১০,৫০২	৯,৯২০	২৭,০৫৪
ঢাকা, পূর্ব	হয়েছে	অ-কংগ্রেস	১৭,৪১৩	শূন্য	১৭,৪১৩	১২,০৬২	৩০,৮৬৯
ময়মনসিংহ, পশ্চিম	হয়েছে	অ-কংগ্রেস	১১,৮২২	শূন্য	১১,৮২২	৮,৯৮৭	২১,০২৫
ময়মনসিংহ, পূর্ব	হয়েছে	অ-কংগ্রেস	১০,৭২০	শূন্য	১০,৭২০	১৬,৫০৯	৩১,৫৩০

[পরের পৃষ্ঠায়]

[আগের পৃষ্ঠার পর]

পরিশিষ্ট XV (৩) বাংলা

নির্বাচন কেন্দ্রের নাম	প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়েছে/ বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায়	জয়ী প্রার্থী/ কোন দলের	জয়ী প্রার্থীর প্রাপ্ত তফসিলি ও হিন্দু ভোট			পরাজিত প্রার্থীর প্রাপ্ত ভোট	তফসিলি : মোটপ্রদত্ত ভোট
			তফসিলি ভোট	হিন্দু ভোট	মোট ভোট		
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
ফরিদপুর	হয়েছে	অ-কংগ্রেস	২৭,৩৪২	শূন্য	২৭,৩৪২	৫৭,৬৯৯	৯৭,৬০৮
		অ-কংগ্রেস	২৫,৯২৪	শূন্য	২৫,৯২৪		
বাখরগঞ্জ, দক্ষিণ-পশ্চিম	হয়েছে	অ-কংগ্রেস	১০,৫১৫	শূন্য	১০,৫১৫	১৮,৮০১	২৬,৫২৬
ত্রিপুরা	হয়েছে	অ-কংগ্রেস	১৯,৩৮৮	শূন্য	১৯,৩৮৮	৮,০১৭	২৯,৬৭৩
কংগ্রেস প্রার্থীদের প্রাপ্ত মোট তফসিলি ভোট			৫৯,৬৪৬			মোট	৬৮৪,৪৪৩

তফসিলি মোট প্রদত্ত মোট ৬৮৪,৪৪৩

কংগ্রেসের প্রাপ্ত মোট তফসিলি ভোট ৫৯,৬৪৬

অ-কংগ্রেসের প্রাপ্ত মোট তফসিলি ভোট ৬২৪,৭৯৭

পরিশিষ্ট XV (৪) যুক্তপ্রদেশ

নির্বাচন কেন্দ্রের নাম	প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়েছে/বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায়	জয়ী প্রার্থী কোন দলের	জয়ী প্রার্থীর প্রাপ্ত তফসিলি ও হিন্দু ভোট			পরাজিত প্রার্থীর প্রাপ্ত ভোট	তফসিলি ঃ মোট প্রদত্ত ভোট
			তফসিলি ভোট	হিন্দু ভোট	মোট ভোট		
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
লখনউ শহর	হয়েছে	কংগ্রেস	১,৯১০	২,৩২৭	৪,২৩৭	৪,০৯২	৬,০০২
কানপুর শহর	হয়েছে	কংগ্রেস	৪,৪৮৩	৪,৯০১	৯,৩৮৪	১,৩০১	৫,৭৮৪
আগ্রা শহর	হয়েছে	কংগ্রেস	১,০১৮	৪,৩৮৯	৫,৪০৭	৩,১৩২	৪,১৫০
এলাহাবাদ শহর	হয়েছে	কংগ্রেস	৩৮৫	৯,২৮৫	৯,৬৭০	৪,০৩৭	৪,৪২২
সাহারানপুর জেলা	হয়েছে	কংগ্রেস	৩,২৫২	শূন্য	৩,২৫২	৬৪৮	৫,২৮২
বুলন্দশহর জেলা	হয়েছে	কংগ্রেস	৩,৮৫৩	৫৮৭	৪,৪৪০	২,৩৬৫	৬,২২৮
আগ্রা জেলা	হয়েছে	অ-কংগ্রেস	১,৮৫১	শূন্য	১,৮৫১	২,৫১৩	৫,৫৫০
মৈনপুরী জেলা	হয়েছে	কংগ্রেস	২,৩১৭	৯৩২	৩,২৪৯	৪,৪৩১	৬,৭৫৮
বদাউন জেলা	হয়েছে	কংগ্রেস	১,৫৫৭	শূন্য	১,৫৫৭	২,৬৭৬	৯,০৭০
জলউন জেলা	হয়েছে	কংগ্রেস	৩,৭৯১	শূন্য	৩,৭৯১	৪,৮৪০	১২,৪২৮
মির্জাপুর জেলা	বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায়	কংগ্রেস	—	—	—	—	—
গোরখপুর জেলা	হয়েছে	কংগ্রেস	২,৭৬২	শূন্য	২,৭৬২	৮১৯	৪,৯৫৪
বস্তি জেলা	বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায়	কংগ্রেস	—	—	—	—	—

[পরের পৃষ্ঠায়]

[আগের পৃষ্ঠার পর]

পরিশিষ্ট XV (৪) যুক্তপ্রদেশ

নির্বাচন কেন্দ্রের নাম	প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়েছে/বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায়	জয়ী প্রার্থী কোন দলের	জয়ী প্রার্থীর প্রাপ্ত তফসিলি ও হিন্দু ভোট			পরাজিত প্রার্থীর প্রাপ্ত ভোট	তফসিলি ঃ মোট প্রদত্ত ভোট
			তফসিলি ভোট	হিন্দু ভোট	মোট ভোট		
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
আজমগড় জেলা	হয়েছে	কংগ্রেস	৯৪৯	শূন্য	৯৪৯	১৯৬	৯,২৫৬
আলমোড়া জেলা	বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায়	অ-কংগ্রেস	—	—	—	—	—
রায়বেরিলি জেলা	বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায়	অ-কংগ্রেস	—	—	—	—	—
সীতাপুর জেলা	হয়েছে	কংগ্রেস	১২,৫৩৫	শূন্য	১২,৫৩৫	৯৫৫	২০,০০০
ফৈজাবাদ জেলা	হয়েছে	কংগ্রেস	৫,৭৭১	শূন্য	৫,৭৭১	২২	১৩,৮৪৮
গোণ্ডা জেলা	বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায়	অ-কংগ্রেস	—	—	—	—	—
বারাবাঙ্কি জেলা	হয়েছে	কংগ্রেস	৮,০২৬	শূন্য	৮,০২৬	৭,২৮৩	১৮,৪৫৮
কংগ্রেস প্রার্থীদের প্রাপ্ত মোট তফসিলি ভোট			৫২,৬০৯			মোট ঃ	১৩২,১৮০

তফসিলি মোট প্রদত্ত ভোট ১৩২,১৮০

কংগ্রেসের প্রাপ্ত মোট তফসিলি ভোট ৫২,৬০৯

অ-কংগ্রেসের প্রাপ্ত মোট তফসিলি ভোট ৭৯,৫৭১

পরিশিষ্ট XV (৫) পঞ্জাব

নির্বাচন কেন্দ্রের নাম	প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়েছে/বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায়	জয়ী প্রার্থী কোন দলের	জয়ী প্রার্থীর প্রাপ্ত তফসিলি ও হিন্দু ভোট			পরাজিত প্রার্থীর প্রাপ্ত ভোট	তফসিলি : মোট প্রদত্ত ভোট
			তফসিলি ভোট	হিন্দু ভোট	মোট ভোট		
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
দক্ষিণ-পূর্ব গুরগাঁও	বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায়	অ-কংগ্রেস	—	—	—	—	—
কর্ণাল	হয়েছে	অ-কংগ্রেস	৩,৩১৮	শূন্য	৩,৩১৮	১,২৯৯	৩,৭৭
আম্বালা ও সিমলা	হয়েছে	অ-কংগ্রেস	৫,২৩৭	শূন্য	৫,২৩৭	৪,৯১১	১০,৯৬০
হোসিয়ারপুর, পশ্চিম	হয়েছে	অ-কংগ্রেস	৮,৫৯৯	শূন্য	৮,৫৯৯	১৪,৬৪০	১১,৭০১
জলন্ধর	হয়েছে	অ-কংগ্রেস	১৩,১৩৫	শূন্য	১৩,১৩৫	৯,১৭৬	২০,৩৭৪
লুধিয়ানা-ফিরোজপুর	হয়েছে	অ-কংগ্রেস	৭,২৮৫	শূন্য	৭,২৮৫	৬,০২৪	১৬,৪৮১
অমৃতসর ও শিয়ালকোট	বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায়	অ-কংগ্রেস	—	—	—	—	—
লায়লপুর ও ঝংগ	হয়েছে	অ-কংগ্রেস	২,৯০৩	শূন্য	২,৯০৩	২,১৪৩	৫,৮৬০
কংগ্রেস প্রার্থীদের প্রাপ্ত মোট তফসিলি ভোট						মোট :	৬৯,১২৬

তফসিলি মোট প্রদত্ত ভোট ৬৯,১২৬

কংগ্রেসের প্রাপ্ত মোট তফসিলি ভোট ..... শূন্য

অ-কংগ্রেসের প্রাপ্ত মোট তফসিলি ভোট ৬৯,১২৬

পরিশিষ্ট XV (৬) বিহার

নির্বাচন কেন্দ্রের নাম	প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়েছে/বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায়	জয়ী প্রার্থী কোন দলের	জয়ী প্রার্থীর প্রাপ্ত তফসিলি ও হিন্দু ভোট			পরাজিত প্রার্থীর প্রাপ্ত ভোট	তফসিলি ঃ মোট প্রদত্ত ভোট
			তফসিলি ভোট	হিন্দু ভোট	মোট ভোট		
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
পূর্ব বিহার	হয়েছে	অ-কংগ্রেস	২,৪৭১	শূন্য	২,৪৭১	৫১৯	৫,৪৪৩
দক্ষিণ গয়া	বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায়	কংগ্রেস	—	—	—	—	—
নওয়াদা	হয়েছে	কংগ্রেস	৩,০৭৯	শূন্য	৩,০৭৯	১,৬২৯	১০,৪৪৯
পূর্ব-মধ্য শাহাবাদ	বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায়	অ-কংগ্রেস	—	—	—	—	—
পশ্চিম গোপালগঞ্জ	বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায়	অ-কংগ্রেস	—	—	—	—	—
উত্তর বেতিয়া	বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায়	কংগ্রেস	—	—	—	—	—
পূর্ব মজঃফরপুর সদর	বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায়	কংগ্রেস	—	—	—	—	—
দ্বারভাঙ্গা সদর	বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায়	কংগ্রেস	—	—	—	—	—
দক্ষিণ-পূর্ব সমস্তিপুর	বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায়	কংগ্রেস	—	—	—	—	—

[পরের পৃষ্ঠায়]

[আগের পৃষ্ঠার পর]

পরিশিষ্ট XV (৬) বিহার

নির্বাচন কেন্দ্রের নাম	প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়েছে/বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায়	জয়ী প্রার্থী কোন দলের	জয়ী প্রার্থীর প্রাপ্ত তফসিলি ও হিন্দু ভোট			পরাজিত প্রার্থীর প্রাপ্ত ভোট	তফসিলি ঃ মোট প্রদত্ত ভোট
			তফসিলি ভোট	হিন্দু ভোট	মোট ভোট		
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
দক্ষিণ সদর মুঙ্গের	বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায়	কংগ্রেস	—	—	—	—	—
মাধেপুরা	হয়েছে	কংগ্রেস	৭০	১,৬৮৮	১,৭৫	১,৭০০	১,৭৭০
দক্ষিণ-পশ্চিম পূর্ণিয়া	হয়েছে	কংগ্রেস	২,০৪০	২,৮৭৮	৪,৯১৮	১,৬৬৯	৩,৭০৯
গিরিডি	বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায়	কংগ্রেস	—	—	—	—	—
উত্তর-পূর্ব পালামৌ	হয়েছে	কংগ্রেস	৩,৪৬৫	৩,৪১৯	৬,৮৮৪	৬২৬	৪,০৯১
মধ্য মানভূম	হয়েছে	অ-কংগ্রেস	২,৫৩৯	শূন্য	২,৫৩৯	১,৯৭৩	৫,৩৭৯
কংগ্রেস প্রার্থীদের প্রাপ্ত মোট তফসিলি ভোট			৮,৬৫৪			মোট ঃ	৩০,৮৪১

তফসিলি মোট প্রদত্ত ভোট ৩০,৮৪১

কংগ্রেসের প্রাপ্ত মোট তফসিলি ভোট ৮,৬৫৪

অ-কংগ্রেসের প্রাপ্ত মোট তফসিলি ভোট ২২,১৮৭

পরিশিষ্ট XV (৭) মধ্যপ্রদেশ ও বেরার

নির্বাচন কেন্দ্রের নাম	প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়েছে/বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায়	জয়ী প্রার্থী কোন দলের	জয়ী প্রার্থীর প্রাপ্ত তফসিলি ও হিন্দু ভোট			পরাজিত প্রার্থীর প্রাপ্ত ভোট	তফসিলি ঃ মোট প্রদত্ত ভোট
			তফসিলি ভোট	হিন্দু ভোট	মোট ভোট		
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
নাগপুর শহর	হয়েছে	অ-কংগ্রেস	৭,৭৯৬	শূন্য	৭,৭৯৬	৩,৭৮৭	৯,০৮৮
নাগপুর-উমরের	হয়েছে	অ-কংগ্রেস	৩,৬৬৭	শূন্য	৩,৬৬৭	২,৭৭৪	৬,৩২৩
হিঙ্গনঘাট-ওয়ার্ধা	হয়েছে	অ-কংগ্রেস	২,৯৬৪	২৬২	৩,২২৬	৩,০৯৩	২,৯৬৪
চন্দা-ব্রহ্মপুরী	হয়েছে	অ-কংগ্রেস	৫,১৩০	শূন্য	৫,১৩০	১,৭৬৪	৫,৫৯০
ছিন্দওয়ারা-সৌসর	হয়েছে	অ-কংগ্রেস	১,৪৭৭	শূন্য	১,৪৭৭	৪,০৩৫	৪,৪০০
জব্বলপুর-পাটন	হয়েছে	কংগ্রেস	৪৭৩	২,০১৭	১,১৯৮	১,১৯৮	১,৬৭১
সওগড়-খুরাই	হয়েছে	কংগ্রেস	২,৯৮৬	শূন্য	২,৯৮৬	১,৪১৭	৫,১৪৭
দামো-হাত্তা	হয়েছে	কংগ্রেস	৩,০৫৬	২৫৯	৩,৩১৫	৯৫৮	৪,০১৪
নরসিংহপুর-গারওয়ারা	হয়েছে	কংগ্রেস	১,০২৩	৯৫	১,১১৮	৪৮০	১,৫০৩
রায়পুর	হয়েছে	কংগ্রেস	৩,৮৫৬	শূন্য	৩,৮৫৬	১,৩০২	৯,৩৬১
বলোদা বাজার	হয়েছে	কংগ্রেস	৮,১১৩	শূন্য	৮,১১৩	৪,৪৫১	১৭,৫৫১
বিলাসপুর	হয়েছে	অ-কংগ্রেস	১,৯০০	শূন্য	১,৯০০	১,৬৫৫	১৫,৩৪৮
মুঙ্গেলি	হয়েছে	অ-কংগ্রেস	৫,৩৫৭	শূন্য	৫,৩৫৭	৪,৭৩০	১৪,০৪৫

[পরের পৃষ্ঠায়]

[আগের পৃষ্ঠার পর]

পরিশিষ্ট XV (৭) মধ্যপ্রদেশ ও বেরার

নির্বাচন কেন্দ্রের নাম	প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়েছে/বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায়	জয়ী প্রার্থী কোন দলের	জয়ী প্রার্থীর প্রাপ্ত তফসিলি ও হিন্দু ভোট			পরাজিত প্রার্থীর প্রাপ্ত ভোট	তফসিলি : মোট প্রদত্ত ভোট
			তফসিলি ভোট	হিন্দু ভোট	মোট ভোট		
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
জঁগীর	হয়েছে	অ-কংগ্রেস	২,৪১১	শূন্য	২,৪১১	৩,২৯৯	১৭,১৮৮
দুর্গ	বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায়	কংগ্রেস	—	—	—	—	—
ভাণ্ডারা-সকোলি	হয়েছে	অ-কংগ্রেস	৭,৯১৬	শূন্য	৭,৯১৬	৫,১৯৭	১০,৩০০
এলিচ্পুর-দর্জাপুর- মেলঘাট	হয়েছে	অ-কংগ্রেস	১,৬৯৭	শূন্য	১,৬৯৭	৩,০৮৬	২,৫৩২
অকোলা-বালাপুর	হয়েছে	অ-কংগ্রেস	১,৮২৩	শূন্য	১,৮২৩	১,৭২৬	৩,২০৩
ইয়তমল-দরওয়াহ	হয়েছে	অ-কংগ্রেস	১,১৫০	শূন্য	১,১৫০	৮৬৪	১,৩২৯
চিখলি-মেখর	হয়েছে	অ-কংগ্রেস	২,১৯৪	শূন্য	২,১৯৪	২,১৬৪	৩,২৯৫
কংগ্রেস প্রার্থীদের প্রাপ্ত মোট তফসিলি ভোট			১৯,৫০৭			মোট :	১৩৪,৮৬১

তফসিলি মোট প্রদত্ত ভোট ১৩৪,৮৬১

কংগ্রেসের প্রাপ্ত মোট তফসিলি ভোট ১৯,৫০৭

অ-কংগ্রেসের প্রাপ্ত মোট তফসিলি ভোট ১১৫,৩৫৪

পরিশিষ্ট XV (৮) অসম

নির্বাচন কেন্দ্রের নাম	প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়েছে/বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায়	জয়ী প্রার্থী কোন দলের	জয়ী প্রার্থীর প্রাপ্ত তফসিলি ও হিন্দু ভোট			পরাজিত প্রার্থীর প্রাপ্ত ভোট	তফসিলি ঃ মোট প্রদত্ত ভোট
			তফসিলি ভোট	হিন্দু ভোট	মোট ভোট		
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
কামরূপ সদর (দক্ষিণ), সাধারণ	হয়েছে	কংগ্রেস	শূন্য	৪,৮৩২	৪,৮৩২	৩,৬৬৫	১,৮৪১
নওগাঁও (উত্তর-পূর্ব), সাধারণ	হয়েছে	অ-কংগ্রেস	১,৫৯৬	শূন্য	১,৫৯৬	৩,০৪৫	২,২২৬
জোরহাট (উত্তর), সাধারণ	হয়েছে	কংগ্রেস	৪৫৭	৪৯৫	৯৫২	৩৭১	৮২৮
সুনামগঞ্জ, সাধারণ	বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায়	কংগ্রেস	—	—	—	—	—
হাবিবগঞ্জ (উত্তর), সাধারণ	হয়েছে	কংগ্রেস	৪,৮৬৩	শূন্য	৪,৮৬৩	৪,৩৯৭	১০,৩৫৬
করিমগঞ্জ (পূর্ব), সাধারণ	হয়েছে	অ-কংগ্রেস	৩,২৫২	শূন্য	৩,২৫২	১,১১৯	১০,২৫২
শিলচর, সাধারণ	হয়েছে	অ-কংগ্রেস	২,১০৮	শূন্য	২,১০৮	২,১৯৭	২,২৫৪
কংগ্রেস প্রার্থীদের প্রাপ্ত মোট তফসিলি ভোট			৫,৩২০			মোট ঃ	২৭,৭৫৭

তফসিলি মোট প্রদত্ত ভোট	.....	২৭,৭৫৭
কংগ্রেসের প্রাপ্ত মোট তফসিলি ভোট	.....	৫,৩২০
অ-কংগ্রেসের প্রাপ্ত মোট তফসিলি ভোট	.....	২২,৪৩৭

পরিশিষ্ট XV (৯) ওড়িশা

নির্বাচন কেন্দ্রের নাম	প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়েছে/বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায়	জয়ী প্রার্থী কোন দলের	জয়ী প্রার্থীর প্রাপ্ত তফসিলি ও হিন্দু ভোট			পরাজিত প্রার্থীর প্রাপ্ত ভোট	তফসিলি : মোট প্রদত্ত ভোট
			তফসিলি ভোট	হিন্দু ভোট	মোট ভোট		
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
কটক সদর, উত্তর	বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায়	অ-কংগ্রেস	—	—	—	—	—
পূর্ব জাজপুর	হয়েছে	কংগ্রেস	৯৫৮	শূন্য	৯৫৮	৫৭১	৪,৮০৮
পশ্চিম পুরী সদর	হয়েছে	কংগ্রেস	৩,৪১৬	৬০২	৪,০১৮	৩৩৯	৩,৭৫৫
পূর্ব বরগড়	বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায়	অ-কংগ্রেস	—	—	—	—	—
পশ্চিম ভদ্রক	হয়েছে	কংগ্রেস	১,৫০৪	শূন্য	১,৫০৪	৭৩৪	৫,০৪৯
আস্কা-সুরাদা	হয়েছে	কংগ্রেস	শূন্য	৯১৭	৯১৭	১,৪০২	৯৭৩
কংগ্রেস প্রার্থীদের প্রাপ্ত মোট তফসিলি ভোট			৫,৮৭৮			মোট :	১৪,৫৮৫

তফসিলি মোট প্রদত্ত ভোট ১৪,৫৮৫

কংগ্রেসের প্রাপ্ত মোট তফসিলি ভোট ৫,৮৭৮

অ-কংগ্রেসের প্রাপ্ত মোট তফসিলি ভোট ৮,৭০৭

পরিশিষ্ট XVI

ওয়েভেল পরিকল্পনা

(i) ১৯৪৫ সালের ১৪ জুন ব্যবস্থাপক সভায় ভারতের সরকার সম্বন্ধে ভারত সচিবের মাধ্যমে মহামান্য সম্রাট যে শ্বেতপত্র প্রকাশ করেছিলেন ঃ

১. ফিল্ড মার্শাল ভিসকাউন্ট ওয়েভেলের এদেশে সাম্প্রতিক ভ্রমণের সময়ে মহামান্য সম্রাটের সরকার তাঁর সঙ্গে বিবিধ সমস্যা, বিশেষ করে বর্তমান রাজনৈতিক সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেন।

২. সদস্যরা অবহিত আছেন যে, ১৯৪২ সালের মার্চ মাসে মহামান্য সম্রাটের সরকারের পক্ষ থেকে যে প্রস্তাব করা হয়েছিল, তার পর থেকে ভারতীয় সাংবিধানিক সংকটের সমাধানে নতুন কোনও প্রস্তাব হয়নি।

৩. তখন যা বলা হয়েছিল, অর্থাৎ ভারতের নতুন সাংবিধানিক পদ্ধতি, তা কেবলমাত্র ভারতের জনগণের দ্বারাই তা কার্যকরী হতে পারে।

৪. মহামান্য সম্রাটের সরকার সর্বদাই ভারতের সাংবিধানিক বন্দোবস্ত করতে সচেষ্ট হলেও অনিচ্ছুক ভারতীয়দের ওপর স্বায়ত্তশাসন চাপিয়ে দেওয়া হবে এক ধরনের বৈপরীত্য। এ-রকম কিছু সম্ভব নয়, অথবা এমন প্রাতিষ্ঠানিক দায়িত্ব চাপিয়ে দিতে পারি না এমন এক সময়ে যখন আমরা সব দিক থেকেই ভারতীয়দের ওপর ব্রিটিশ অবস্থান তুলে নিচ্ছি।

৫. প্রধান সাংবিধানিক অচলাবস্থা যেমন ছিল তেমনই রইল। ১৯৪২ সালের মার্চ মাসে যে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল, তা সকল অর্থে অপরিবর্তিত রইল। মহামান্য সম্রাটের সরকার তবু আশা করে যে, ভারতের রাজনৈতিক নেতারা ঐকমত্যে আসবেন ভারতের ভবিষ্যৎ স্থায়ী সরকারের প্রকৃতি নির্ধারণ করতে।

৬. মহামান্য সম্রাটের সরকার এই অচলাবস্থা দূরীকরণে বাস্তবোচিত সমাধানে সাহায্য করতে চিন্তিত। এই অচলাবস্থা কেবল রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নয়, সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রগতিকেও ব্যাহত করছে।

৭. ভারতের শাসন-ব্যবস্থা জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরবর্তী পরিস্থিতিতে ভারাক্রান্ত, তার ওপর রাজনৈতিক উত্তেজনা তাকে আরও জটিল করে তুলেছে।

৮. কৃষি ও শিল্পক্ষেত্রে প্রগতির জন্য এবং ভারতের কৃষক শ্রমিকদের সমস্যার সমাধানের জন্য যা একান্ত জরুরি, তা ভারতের সমস্ত সম্প্রদায়ের সর্বান্তকরণে সহযোগিতা ছাড়া সম্ভব নয়।

৯. এই অন্তবর্তীকালীন সময়ে এমন কিছু করা যায় কিনা, তা নিয়ে মহামান্য সম্রাটের সরকার অনেক ভাবনা-চিন্তা করেছেন, যা বর্তমান পরিস্থিতিতে ভারতীয়দের ভবিষ্যৎ সাংবিধানিক ব্যবস্থাকে সরিয়ে রেখে প্রধান সম্প্রদায় ও রাজনৈতিক দলগুলি যাতে আরও ঘনিষ্ঠভাবে ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করতে পারে, ভারতের জনসাধারণের সামগ্রিক উপকারের কথা ভেবে।

১০. ভারতের প্রধান সম্প্রদায়গুলির ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনও পরিবর্তন সাধনের ইচ্ছা মহামান্য সম্রাটের সরকারের নেই। তবে তাঁরা সম্ভাব্য কিছু পদক্ষেপ নিতে পারেন অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে, যাতে প্রধান রাজনৈতিক দলগুলির নেতৃবৃন্দ তাঁদের সঙ্গে সহযোগিতার জন্য এগিয়ে আসেন। জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সফল পরিণতি এবং ভারতে সংস্কারমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করার ফলস্বরূপ তাহলে আসবে তাঁদের শেষ জয়।

১১. এই উদ্দেশ্যে তাঁরা ভাইসরয় শাসন পরিষদের (Viceroy's Executive) উল্লেখ্য পরিবর্তন ঘটাতেও প্রস্তুত। বর্তমান বিধিবদ্ধ আইনে (Statute Laws) ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের নবম তফসিল ছাড়া অন্য কোনও পরিবর্তন না করেও তা সম্ভব। এই তফসিলে আছে, ন্যূনপক্ষে ৩ জন সদস্যকে ভারতের সম্রাটের অধীনে ১০ বছর কাজের অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হবে। এই প্রস্তাব যা আমি এখন উত্থাপন করতে যাচ্ছি এই সভায়। যদি গৃহীত হয় তবে এই খণ্ডের (Clause) প্রয়োজন অনুযায়ী পরিবর্তন করতে হবে।

১২. শাসন পরিষদ পুনর্গঠিত করতে হবে এমনভাবে, যাতে পরে বড়লাট তাঁর মনোনীত সদস্যদের নাম সম্রাটের অনুমোদনের জন্য পাঠাতে পারেন তাঁর শাসন পরিষদের সদস্য হিসাবে নিযুক্তির জন্য। কেন্দ্র এবং প্রদেশের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায় থেকে সমান সংখ্যক এবং অন্য সম্প্রদায় থেকে আনুপাতিক সদস্য নিয়ে এই শাসন পরিষদ পুনর্গঠিত হবে।

১৩. এই উদ্দেশ্য সাধনের উদ্দেশ্যে ভাইসরয় ভারতের প্রধান রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে এবং বিভিন্ন প্রদেশে প্রধান মন্ত্রী হিসাবে কাজ করার সম্প্রতিক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তিদের একটি সম্মেলনে আহ্বান করবেন, সঙ্গে কিছু বিশেষ অভিজ্ঞ ব্যক্তিকেও। এই সম্মেলনে বড়লাট আগে বর্ণিত পরিষদ্ পনর্গঠনের জন্য আমন্ত্রিতদের কাছ থেকে তালিকা চাইবেন। এই তালিকা থেকে, আশা করা যায়, তিনি সম্রাটের অনুমোদনের সাপেক্ষে নির্ধারিত সদস্যদের মনোনীত করতে পারবেন তাঁর শাসন পরিষদ পুনর্গঠনের জন্য, যদিও মনোনয়নের পুরো দায়িত্ব থাকবে তাঁর এবং এ-ব্যাপারে বাধাহীন স্বাধীনতা ভোগ করবেন তিনি।

১৪. এই ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে যাঁরা পরিষদের সদস্য মনোনীত হবেন, তাঁরা অবশ্যই জাপানের বিরুদ্ধে জয়ের জন্য সর্বতোভাবে সাহায্য এবং সহযোগিতার জন্য তাঁরা অঙ্গীকারবদ্ধ থাকবেন।

১৫. পরিষদের মনোনীত সদস্যরা হবেন ভারতীয়, কেবল ভাইসরয় এবং প্রধান সেনাপতি ছাড়া যিনি তাঁর মর্যাদা পাবেন যুদ্ধ প্রতিনিধি হিসাবে। যতদিন ভারতের সীমান্ত রক্ষার দায়িত্ব ব্রিটিশের ওপর থাকবে, ততদিন এই ব্যবস্থা একান্ত জরুরি।

১৬. এই ব্যবস্থার কোনটিই ভারতের দেশীয় রাজ্যগুলির সঙ্গে সম্রাটের সম্পর্কে কোনও প্রভাব ফেলবে না, যদিও বড়লাট সম্রাটের প্রতিনিধিত্ব করবেন।

১৭. মহামান্য সম্রাটের সরকার ভাইসরয়ে এই ক্ষমতা প্রদান করছেন যে, তিনি এই প্রস্তাব ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সামনে পেশ করবেন। মহামান্য সম্রাটের সরকার বিশ্বাস করে যে, ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ এই প্রস্তাবে সাড়া দেবেন। এই প্রস্তাবের সাফল্য নির্ভর করছে ভারতে এর স্বীকৃতির ওপর এবং এই অন্তবর্তীকালীন সময়ে কিভাবে ভারতীয় নেতৃবৃন্দ সাহায্য করেন, তার ওপর। যদি এই ব্যবস্থা গৃহীত না হয়, তাহলে চালু ব্যবস্থাই থাকবে।

১৮. যদি এই সহযোগিতা কেন্দ্রের জন্য অর্জন করা যায়, তাহলে তা প্রদেশগুলিতেও প্রতিফলিত হবে যাতে দায়িত্বশীল সরকার আবার গঠন করা যায়, যেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল সরকারে যোগ না দেওয়ায় সরকার গঠিত হয়নি। এবং সেখানে ১৯৩৫ সালের আইনের ৯৩ ধারা প্রয়োগ করতে হয়েছে। আশা করা যেতে পারে যে, এর ফলে প্রধান রাজনৈতিক দলগুলির অংশগ্রহণে সাম্প্রদায়িক বিভেদ কমবে এবং মন্ত্রীরা তাঁদের গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করতে পারবেন।

১৯. যদি এই প্রস্তাবগুলি গৃহীত হয়, তাহলে আরও কিছু পরিবর্তনের কথা মহামান্য সম্রাটের সরকার মনে করেন প্রয়োজনীয়, সেগুলি হল নিম্নরূপ ঃ

২০. পররাষ্ট্র দপ্তরের (আদিবাসী ও সীমান্তবর্তী সমস্যা ব্যতীত, যা ভারতে প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের অধীন) দায়িত্বে আসবেন বড়লাটের শাসন-পরিষদের একজন ভারতীয় প্রতিনিধি এবং তাঁরা ভারতের বাইরে প্রতিনিধিত্ব করবার ক্ষমতাপ্রাপ্ত হবেন।

২১. এই প্রস্তাব গ্রহণ করে এবং এই প্রকল্পের সঙ্গে সহযোগিতা করে ভারতীয় নেতৃবৃন্দ ভারত বিষয়েই দ্রুত অবদান রাখতেই সক্ষম হবেন না, উপরন্তু সরকারে তাঁদের অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির জন্য নতুন সাংবিধানিক ব্যবস্থা সম্বন্ধে দায়িত্ব পালন করতে পারবেন।

২২. মহামান্য সম্রাটের সরকার মনে করেন, প্রশ্নটির যত্নপূর্বক বিশ্লেষণের পর, যে প্রকল্প এখন প্রস্তাব করতে যাওয়া হচ্ছে, তা যতদূর সম্ভব বর্তমান সংবিধানের মধ্যে সর্বাধিক বাস্তব কার্যকরী ব্যবস্থা। যে-সব পরিবর্তনের কথা বলা হয়েছে, তা কোনভাবেই ভারতের ভবিষ্যৎ স্থায়ী সংবিধানকে প্রভাবিত করবে না।

২৩. মহামান্য সম্রাটের সরকার নিশ্চিতভাবেই মনে করে যে, শুভবুদ্ধি এবং আন্তরিক সদিচ্ছা ব্রিটিশ এবং ভারত উভয়ের সহযোগিতা, অতি অবশ্যই ভারত ও ইংলন্ডের জনসাধারণের মধ্যে যুগ্মভাবে এক পা অগ্রসর হতে সাহায্য করবে স্বায়ত্তশাসনের লক্ষ্যে এবং যোগ্যস্থান অধিকার করে রাষ্ট্রপুঞ্জে ভারতের প্রভাবকে মজবুদ করবে।

(ii) নতুন দিল্লিতে ভাইসরয়ের বেতার ভাষণ, ১৪ জুন, ১৯৪৫

বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে স্বাভাবিক করে ভারতের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন অর্জনের লক্ষ্যে এগিয়ে যাবার জন্য ভারতের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সামনে কিছু প্রস্তাব উত্থাপনের জন্য আমি মহামান্য সম্রাট কর্তৃক অধিকার প্রাপ্ত হয়েছি। প্রস্তাবগুলি ব্যবস্থাপক সভায় এই মুহূর্তে ভারত-সচিব কর্তৃক ব্যাখ্যাত হচ্ছে। আমার এই বেতার ভাষণের উদ্দেশ্য হল, আপনাদের সামনে এই প্রস্তাবগুলি ব্যাখ্যা করা এবং এর অন্তরালে কি আদর্শ রয়েছে আর সেগুলিকে কার্যকরী করবার জন্য কি পদ্ধতি নেওয়া হবে, তার পর্যালোচনা।

এটা কোনও সাংবিধানিক বন্দোবস্ত সাধন করা বা চাপিয়ে দেবার প্রচেষ্টা নয়।

মহামান্য সম্রাটের সরকার আশা করেছিল যে, ভারতীয় নেতৃবৃন্দ নিজেদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সমঝোতায় আসবে, যে সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি প্রস্তরখণ্ডের মতো প্রধান বাধা হয়ে আছে; কিন্তু সেই আশা সফল হয়নি।

ভারতের প্রধান দলগুলি এর মধ্যে পেতে পারে প্রবল সুযোগ, যা নির্ভর করে তাঁদের সকলের সচেষ্ট প্রয়াসের ওপর। আমি তাই মহামান্য সম্রাটের পূর্ণ সমর্থনে কেন্দ্র ও প্রদেশের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে নতুন শাসন পরিষদে সংগঠিত দলগুলির আরও সদস্য গ্রহণের জন্য আমার সঙ্গে পরামর্শ করতে অনুরোধ করছি।

প্রস্তাবিত নতুন শাসন-পরিষদে থাকবে প্রধান সম্প্রদায়গুলি এবং বর্ণ হিন্দু ও মুসলমানদের সমান প্রতিনিধিত্ব। যদি তা গঠিত হয়, তা হলে বর্তমান সংবিধান মেনেই কাজ করবে। এটা হবে সম্পূর্ণভাবেই ভারতীয়, কেবল ভাইসরয় এবং প্রধান সেনাপতি থাকবেন যুদ্ধ সদস্য হিসাবে। আরও প্রস্তাব করা হয়েছে যে, পররাষ্ট্র দফতর যা এতদিন বড়লাটের অধীনে ছিল, তা শাসন পরিষদের একজন ভারতীয় সদস্যের ওপর বর্তাবে, ব্রিটিশ-ভারতের স্বার্থে যতদূর প্রয়োজন।

মহামান্য সম্রাটের সরকার আরও এক ধাপ এগিয়ে প্রস্তাব করছে, ভারতে একজন ব্রিটিশ হাই কমিশনার নিযুক্তির জন্য, যেমন অধিরাজ্যগুলিতে (Dominion) আছে, গ্রেট ব্রিটেনের বাণিজ্যিক ও অন্যান্য দিক লক্ষ্য করার জন্য।

এই নতুন শাসন-পরিষদ, আপনারা অনুভব করবেন, স্বায়ত্তশাসনের পথে নিশ্চিতই এগিয়ে দেবে। এটা হবে পুরোপুরিভাবেই প্রায় ভারতীয়, এবং এই প্রথম অর্থ ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী হবেন ভারতীয়দের থেকে। তদুপরি সদস্যরা মনোনীত হবেন বড়লাটের (Governor General) দ্বারা রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে। অবশ্য তাঁদের মনোনয়ন মহামান্য সম্রাটের অনুমোদন সাপেক্ষ হবে।

শাসন-পরিষদ কাজ করবে চালু সংবিধানের মধ্যে; বড়লাটের সাংবিধানিক ক্ষমতা প্রয়োগ সম্বন্ধে কোনও প্রশ্ন থাকবে না; অবশ্য তা যুক্তিহীনভাবে প্রয়োগ করা হবে না।

আমি স্পষ্ট করে দিতে চাই যে, এই অন্তর্বর্তীকালীন সরকার কোনমতেই অন্তিম সাংবিধানিক বন্দোবস্তকে প্রভাবিত করবে না। এই নতুন শাসন-পরিষদের দায়িত্ব হবে;

প্রথমত, সর্বশক্তি দিয়ে জাপানি-যুদ্ধকে প্রতিহত করা, যতক্ষণ না জাপান সম্পূর্ণ পরাজিত হয়;

দ্বিতীয়ত, ব্রিটিশ-ভারতের সরকার চালিয়ে যাওয়া, যুদ্ধ পরবর্তী বহু গঠনমূলক কাজ চালিয়ে যাওয়া, যতক্ষণ না নতুন স্থায়ী সংবিধান নিয়ে সম্মতি হয় এবং তা কার্যকরী হয়;

তৃতীয়ত, সরকারের সদস্যরা সিদ্ধান্ত নেবেন, কখন কি উপায়ে এই সমঝোতা করা যাবে। তৃতীয় দায়িত্বটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমি বিষয়টি স্পষ্ট করে বলতে চাই, না আমি না মহামান্যসম্রাটের সরকার এর দার্ঘকালীন সমাধানের কথা ভুলে যাইনি এবং বর্তমান প্রস্তাবগুলি সেই দীর্ঘকালীন সমাধান সহজতর করার কথা মনে রেখেই করা হয়েছে।

আমি এই ধরণের একটি পরিষদ গঠন করার বিষয়ে সমস্ত দিক বিবেচনা করেছি। আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি নিচে উল্লিখিত সদস্যদের ভাইসরয়ের শাসন পরিষদে আমন্ত্রণ জানাব ঃ

প্রাদেশিক সরকারে যাঁরা এখন প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করছেন অথবা ধারা ৯৩-এর অন্তর্গত প্রাদেশিক সরকারে বিগত প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব সামলেছেন।

কেন্দ্রীয় আইনসভায় কংগ্রেস দলের নেতা ও মুসলিম লীগের উপনেতা; কাউন্সিল অব স্টেটের কংগ্রেস দলের এবং মুসলিম লীগের নেতা; এ ছাড়াও বিধানসভায় ন্যাশানালিস্ট ও ইউরোপীয় গোষ্ঠীর নেতৃবৃন্দ। শ্রী গান্ধী ও জনাব জিন্না, যাঁরা দুই প্রধান দলের স্বীকৃত নেতা; তফসিলি সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠিত নেতা হিসাবে রাও বাহাদুর এন. শিবরাজ; শিখ প্রতিনিধি হিসাবে মাস্টার তারা সিং। আজ তাঁদের আমন্ত্রণ পাঠানো হয়েছে এবং স্থির হয়েছে আগামী ২৫ জুন সিমলায় দিল্লির চেয়ে ঠান্ডা জায়গায় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে।

আশা করি, যাঁরা আমন্ত্রিত হয়েছেন, তাঁরা সকলেই সম্মেলনে যোগ দিয়ে আমাকে সাহায্য করবেন। আমার ও তাঁদের ওপর ভারতের ভবিষ্যৎ বন্দোবস্ত সম্বন্ধে একটি গুরু দায়িত্ব বর্তাবে এই নতুন প্রচেষ্টার মাধ্যমে।

যদি সম্মেলন সফল হয়, আশা করি—কেন্দ্রে নতুন শাসন-পরিষদ্ গঠনে সম্মত হতে পারব। আরও আশা করি যে, এর ফলে প্রদেশের মন্ত্রীরা নতুন করে কার্যভার গ্রহণ করতে পারবেন। সংবিধান আইনের ৯৩নং ধারায় যে সমস্ত প্রদেশ শাসিত হচ্ছে সেখানে তাঁরা সহযোজিত হতে পারবেন।

যদি দুর্ভাগ্যবশত সম্মেলন সফল না হয়, তাহলে এখনকার মতোই আমরা কাজ

চালিয়ে যেতে থাকব, যতক্ষণ না দলগুলি সমঝোতায় আসে। বর্তমান শাসন-পরিষদ্, যা ভারতের জন্য অনেক মূল্যবান কাজ করেছে, তা চালিয়ে যেতে থাকবে যদি না অন্য কোনও ব্যবস্থা হয়।

কিন্তু আমি সর্বতোভাবে বিশ্বাস করি যে এই সম্মেলন সফল হবে, যদি দলের নেতৃবৃন্দ সমস্যার সমাধানে আন্তরিকভাবে এগিয়ে আসেন আমার সঙ্গে ও একে অন্যের সঙ্গে কাজ করতে। তাঁদের এই বলে আমি আশ্বস্ত করতে পারি যে, এই প্রস্তাবের প্রেক্ষাপটে রয়েছে ইংলন্ডের নেতৃবৃন্দ ও জনসাধারণের ভারতের ঈপ্সিত লক্ষ্য পূরণের জন্য সদিচ্ছা। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সেই লক্ষ্য পূরণের এই প্রয়াস কেবল একটি পদক্ষেপ নয়, সঠিক পথে সুদীর্ঘ পদক্ষেপ।

স্পষ্ট করে একথাও বলতে চাই যে, এই প্রস্তাবগুলি গৃহীত হলে, কেবল ব্রিটিশ ভারতকে প্রভাবিত করবে, রাজণ্যবর্গের সঙ্গে সম্রাটের প্রতিনিধির সম্পর্কের কোনও হের-ফের হবে না।

সম্রাটের সরকারের অনুমোদন নিয়ে আমার শাসন-পরিষদ্ অবিলম্বে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের মধ্যে যাঁরা এখনও জেলে আছেন, তাঁদের মুক্তির আদেশ দিচ্ছে। ১৯৪২ সালের গোলমালে আরও যাঁরা ধৃত হয়েছেন, তাঁদের মুক্তির ব্যাপারে অন্তিম সিদ্ধান্ত নেবার সিদ্ধান্ত আমি নতুন কেন্দ্রীয় সরকার, যদি গঠিত হয়, এবং প্রাদেশিক সরকারগুলিকে দেবার প্রস্তাব করছি।

সম্মেলনে কেন্দ্র ও প্রাদেশিক সরকার নতুনভাবে গটনের জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠান নিয়ে আলোচনা হবে।

সবশেষে আমি আপনাদের সকলের কাছে আবেদন করছি, সদিচ্ছা ও পরস্পর বিশ্বাসের বাতাবরণ সৃষ্টি করা যা আমাদের পক্ষে একান্ত জরুরি। এই বৃহৎ দেশের বহু কোটি মানুষ, যাঁরা তাঁদের নেতৃবৃন্দের বুদ্ধি ও বিবেচনার ওপর নির্ভর করে কর্মে ও চিন্তায় বেঁচে আছেন, ভারতের এই তাঁদের নিয়তি নিহিত আছে এর মধ্যেই।

ভারতের সামরিক শক্তির সুনাম কখনও এখনকার মতো ছিল না। দেশের বিভিন্ন অংশ থেকে আসা এই সন্তানদের ধন্যবাদ। আন্তর্জাতিক সম্মেলনে তাঁর প্রতিনিধিরা রাষ্ট্রনেতার মতো উচ্চ সম্মান অর্জন করেছে। ভারতের সমৃদ্ধির জন্য আশা ও অগ্রগতির প্রতি এত ব্যাপক সহানুভূতি এর আগে দেখা যায়নি। আমাদের

তাই রয়েছে মহৎ সম্পদ বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে ব্যবহারের জন্য। কিন্তু এটা খুব সহজ ব্যাপার নয়, খুব তাড়াতাড়িও তা সম্ভব নয়। অনেক কিছু করার আছে, কিন্তু পথ খানা-খন্দ ও ভয়ে ভরা। উভয় পক্ষের-ই রয়েছে কিছু ভোলার ও ক্ষমা করার।

আমি ভারতের ভবিষ্যতে বিশ্বাসী এবং আমার যা করার রয়েছে তা হল, ভারতের মহত্ত্বকে বৃদ্ধি করা। আমি আপনাদের সকলের সদিচ্ছা ও সহযোগিতা কামনা করি।

(iii) শ্রী গান্ধীর বিবৃতি

বেতার ভাষণটি শোনার সঙ্গে সঙ্গেই আমি মহামান্য ভাইসরয়কে টেলিগ্রাম করে এই বিষয়ে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করি যে কংগ্রেসের প্রতিনিধিত্ব করবার আমার কোনও স্থিত্যাধিকার (Locus standi) নেই। সেই অধিকার রয়েছে কংগ্রেস সভাপতির অথবা বিশেষ ঘটনার ক্ষেত্রে যাঁকে মনোনীত করা হয়, তাঁরা কয়েক বছর ধরে, পদাধিকার ছাড়াই আমি প্রয়োজনে কংগ্রেসের পরামর্শদাতার কাজ করে আসছি। জনসাধারণের মনে থাকার কথা যে, আমি কায়দে আজম জিন্নার সঙ্গেও কথা চালিয়ে যাচ্ছি পদাধিকার ছাড়াই এবং আমি এছাড়া কোনও পদ ব্রিটিশের কাছ থেকে গ্রহণ করতে পারি না। এক্ষেত্রে যা ভাইসরয় করতে চাইছেন।

ভাইসরয়ের বেতার ভাষণে একটি দিক নিশ্চিতভাবেই আমাকে অসন্তুষ্ট করেছে। আমার ধারণা, প্রত্যেক রাজনীতিমনস্ক হিন্দুকেই তা করবে। আমি 'বর্ণ হিন্দু' শব্দ ব্যবহারের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করছি। আমি দাবি করতে পারি যে, এমন কোনও ব্যক্তি নেই, যিনি রাজনৈতিকভাবে নিজেকে 'বর্ণ হিন্দু' বলেন। সারা ভারতের প্রতিনিধিস্বরূপ কংগ্রেসকে, যে ভারতের রাজনৈতিক স্বাধীনতা আকাঙ্খা করছে, তাকেই প্রতিনিধিত্ব করতে বলা হোক। হিন্দু মহাসভার বীর সভারকর অথবা ড, শ্যামাপ্রসাদ কি বর্ণহিন্দুদের প্রতিনিধিত্ব করেন? তাঁরা কি জাতপাতহীন সকল হিন্দুর প্রতিনিধিত্ব করেন না? তাঁরা কি অস্পৃশ্যদের অন্তর্ভুক্ত করেন না? তাঁরা কি নিজেদেরকে 'বর্ণ হিন্দু' হিসাবে দাবি করেন? আশা করি, না। সমস্ত রাজনীতিমনস্ক হিন্দু, এমন কি শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত মালব্যজি যিনি জাত-ব্যবস্থাকে মান্য করেন, তাঁকে 'বর্ণ হিন্দু' হিসাবে আখ্যাত করতে আপত্তি করবেন। হিন্দু ধর্মের আধুনিক প্রবণতা হল সব জাত-ব্যবস্থার বিনাশ এবং আমি তা মান্য করি, হিন্দু সমাজের প্রতিক্রিয়াশীল দিকগুলি আমার জানা সত্ত্বেও। তাই আমার মনে হয়, ভাইসরয় এই শব্দের ব্যবহার করেছেন গভীর অজ্ঞতা থেকে। তিনি সব জেনে হিন্দু সমাজের সংবেদনশীলতায় আঘাত

করেছেন ও বিভাজন সৃষ্টি করছেন, এর থেকে আমি তাঁকে রেহাই দিচ্ছি। আমি এই ব্যাপারটি নিয়ে উদ্বিগ্ন হতাম না, যদি না তা হিন্দুদের রাজনৈতিক মনকে স্পর্শ করত তার সংবেদনশীল স্থানে আঘাত করত এবং তার সঙ্গে রাজনৈতিক নির্যাতন না চলত।

প্রস্তাবিত সম্মেলন অনেক উপযোগী হতে পারে, যদি তা উপযুক্ত রাজনৈতিক পটভূমিতে স্থাপন করে এবং আরম্ভেই বিভেদমূলক প্রবণতার প্রয়াসকে দূরে রাখে। নিঃসন্দেহে, সব আমন্ত্রিতই সমবেতভাবে ভারতের স্বাভাবিক উদ্দেশ্য সাধনে সচেষ্ট হবেন, ভারতীয় সমাজের কোনও বিশেষ অংশের প্রতিনিধি হিসাবে নয়।

ভোলাভাই-লিয়াকত আলি সমঝোতাকে আমি এভাবেই দেখেছি, এবং মনে করি, তাঁরা আসন্ন সম্মেলনের প্রস্থানভূমি স্থির করে দিয়েছেন। ভোলাভাই দেশাইয়ের প্রস্তাবে তেমন কোনও রঙ চাপানো ছিল না, যা ভাইসরয়ের বেতার ভাষণে ছিল। ভোলাভাই দেশাইয়ের প্রস্তাব, যেমন বুঝেছি, আমাকে খুব আকৃষ্ট করেছে এই কারণে যে আমিও ভারতের সাম্প্রদায়িক জট খুলতে আগ্রহী। তাঁকে আমি আশ্বাস দিয়েছিলাম যে, ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের মধ্যে আমি আমার প্রভাব খাটিয়ে এই প্রস্তাব গ্রহণের পক্ষে যুক্তি দেখাব। যদি উভয় দল সঠিকভাবে তাদের সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব করে, এবং ভারতের স্বাধীনতাকেই লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করে, তাহলে সব কিছু যথাযথ রূপ লাভ করবে।

এখানেই আমি থামছি। ওয়ার্কিং কমিটিকে সূত্রটি ধরতে হবে। ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের এই জ্বলন্ত সমস্যা সম্বন্ধে কংগ্রেসের মানসিকতা কি, তা ঘোষণা করতে হবে।

আম্বেদকর রচনা-সম্ভার : ষোড়শ খণ্ড

অনুবাদে

- ড. সজল বসু (পৃষ্ঠা : ১৭-২৪৩) : প্রাক্তন ফেলো, ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব্ অ্যাডভান্স স্টাডি, সিমলা; সিনিয়র ফেলো, ভারতীয় সমাজ বিজ্ঞান পর্ষদ; প্রাবন্ধিক, অনুবাদক ও সাংবাদিক।

- স্নেহাশিস সান্যাল (পৃষ্ঠা : ২৪৫-৩৮৩) : প্রাবন্ধিক ও অনুবাদক ; কলকাতা দূরদর্শনের বার্তা বিভাগের উচ্চপদস্থ আধিকারিক।

- অন্তরা ঘোষ (পৃষ্ঠা : ৩৮৪-৩৮৯) : প্রাবন্ধিক ও অনুবাদক ; তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের উচ্চপদস্থ আধিকারিক ; বর্তমানে 'ধনে-ধান্যে' পত্রিকার সহকারি সম্পাদক।

- আশিস সান্যাল (পৃষ্ঠা : ৩৯০-৪৩৮) : 'আম্বেদকর রচনা-সম্ভার'-এর বাংলা সংস্করণের সম্পাদক।

অনুমোদনে

- আশিস সান্যাল : বিশিষ্ট কবি, প্রাবন্ধিক, শিশু সাহিত্যিক, ঔপন্যাসিক ও অনুবাদক। বিভিন্ন পুরস্কারে সম্মানিত। বাংলা ও ইংরেজিতে পঞ্চাশের বেশি গ্রন্থের লেখক।

নির্ঘণ্ট